স্মরণীয় ৭ই * অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতি থি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

'রবীন্দ্রজীবনী'-কার
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

শ্রীকানাই সামন্তের
গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ
রবীন্দ্রপ্রতিভা ১০·০০

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-কথা ২·০০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
লৌকীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের
কবি-প্রণাম ৫·০০
[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন]

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

স্বামাপদ চক্রবর্তীর
অলঙ্কার চন্দ্রিকা ৫·৫০

শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত
দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০

ডঃ শুকদাস ভট্টাচার্যের
বাংলা কাব্যে শিব

প্রাণতোষ ঘটকের
রত্নমালা (সমার্থ-অভিধান) ২·৫০
[Dictionary of Synonyms]

প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুরের
অবনীন্দ্র চরিতম্

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের
(গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ)
বঙ্কিমচন্দ্র

সুধীরচন্দ্র সরকারের
বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০
[বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন প্রকার অভিধান। প্রায় ১০০০০ হাজার শব্দের সমন্বয়ে রচিত]

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড)

স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড)

• আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি •

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ ৫·০০; শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫·০০। মণি বাগচী রচিত—রামমোহন ৪·০০; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪·৫০; কেশবচন্দ্র ৮·৫০; মাইকেল ৪·০০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪·৫০; শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০·০০; রমেশচন্দ্র ৫·০০। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫·০০, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৭·৫০ অমিত দত্ত—বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১২·০০; ভবতোষ দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬·০০; ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য-বিচিত্রা ৮·৫০; দিলীপকুমার বাগ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮·০০; ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮·০০; সত্যব্রত দে—চর্যাগীতি পরিচয়—৫·০০; অরুণ ভট্টাচার্য—কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার আধুনিক ৪·০০; ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—ভারতচন্দ্র ৩·০০; নারায়ণ চৌধুরী—আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩·৫০; প্রশান্ত রায়—সাহিত্য সৃষ্টি ৪·০০; আজহারউদ্দীন খান—বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫·০০; প্রফুল্লকুমার দাস—রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) ৩·৫০; ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য—নাটক ও নাট্যকৌশল ২·৫০, নাটক লেখার মূলসূত্র ৫·০০; রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৬·০০।

॥ বি জ্ঞা সা ॥

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥ ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলি-২৯

বাঙালী মানসিকতার বিবর্তনে সাময়িকপত্রের অবদান-এর কথা এই সর্ব-প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে বিবৃত হচ্ছে। এই সংকলনগ্রন্থ

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য

নিছক তথ্যপঞ্জী নয়। 'দিগ্দর্শন' প্রকাশের তারিখ থেকে এ পর্যন্ত সাময়িক-সাহিত্যের ঐতিহ্য বাঙালীর ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যচিন্তায় নিপুণ তুলিল।

সম্পাদনা করেছেন

অরুণ ভট্টাচার্য

লেখকবর্গ : বিনয় ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও অরুণ ভট্টাচার্য ॥ ১৮১৮ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সাময়িকপত্রের একটি নির্বাচিত তালিকা সংকলন করেছেন সনৎকুমার গুপ্ত ও মানস রায়চৌধুরী

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

রেনেশাঁস পাবলিশার্স

এ্যালবার্ট হল, ভিতল। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দশম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা উত্তরসূরী কার্তিক-চৈত্র : ১৩৬৯-৭০

ছবি

সুনয়নী দেবী। পুতুল, বাঁকুড়া। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

প্রবন্ধ

অমলেন্দু বসু : সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা ১। অমি বাগচী : আত্মচরিত ও জীবনচরিত ১০। তপতী রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমসাময়িক সমাজ ও কাল ২১। আশুতোষ ভট্টাচার্য : ছেলে-ভুলানো ছড়ায় বিবাহ ৪৯। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ৫১। গুরুদাস ভট্টাচার্য : ময়মনসিংহ গীতিকায় চিত্রকল্প ৭১।

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী। প্রেমেন্দ্র মিত্র। দিলীপকুমার রায়। অনীশ দেব। বিষ্ণু দে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩১-৪৪। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গোপাল ভৌমিক। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনিল চক্রবর্তী। অরুণকুমার সরকার। লোকনাথ ভট্টাচার্য। চিত্ত ঘোষ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অরুণ ভট্টাচার্য। শামসুর রাহমান। রাম বসু। কমল সাহাবুদ্দিন। কৃষ্ণ ধর। বটকৃষ্ণ দাস। আলোক সরকার। সুনীলকুমার নন্দী। হেনা হালদার। বটকৃষ্ণ দে। শোভন সোম। অসিতকুমার ভট্টাচার্য। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। অশ্রুকুমার সিকদার। মানস রায়চৌধুরী। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। প্রকৃতি ভট্টাচার্য। স্বদেশরঞ্জন দত্ত। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। দিব্যেন্দু পালিত। ভারাপদ রায়। আলিস সাণ্ডাল। শান্তি লাহিড়ী। অনিরুদ্ধ কর। তুষার চট্টোপাধ্যায়। পরিমল চক্রবর্তী। তুষার দত্ত। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। অমিতাভ দাশগুপ্ত। মলিভূষণ ভট্টাচার্য। সুশান্ত বসু। অশোক মুখোপাধ্যায়। বহ্নি দাশগুপ্ত ১১২—১৩৭।

বিদেশী কবিতা

রিল্কের আরো দুটি কবিতা : নলিনীকান্ত গুপ্ত। এ্যালেন টিমসবারি হাউই : বিভিরকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক বর্ণ শিপলের টীকা-সহ। জাপানী কবিতা : দিলীপ দত্ত। জর্মন কবিতা : বার্টোলট ব্রেখ্‌ট : অমিত দত্ত। ১৩-২৫ ন.

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাচিত্র : জীবেন্দ্রকুমার গুহ

আলোচনা

Camus-র উচ্চারণ প্রসঙ্গে : অরুণ মিত্র

শাড়ী

বলে

বৈচিত্র্য

অনুপম

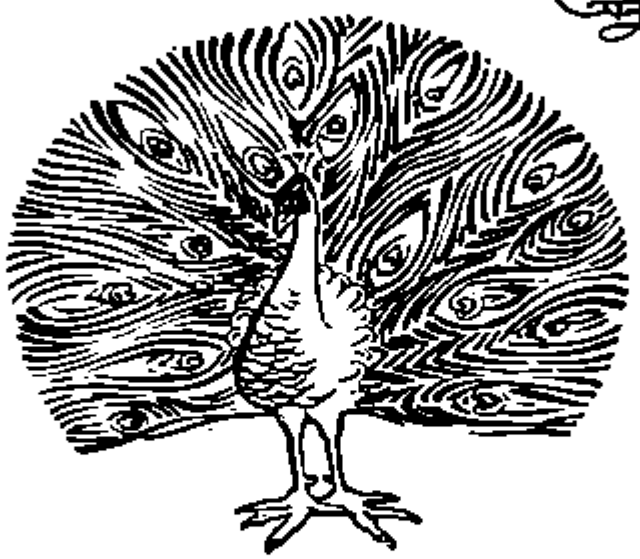

ইণ্ডিয়ান

সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

শিল্পী : গুরুসদয় দত্ত

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

শিল্পী : সুরবেদী দেবী

চিত্রটি মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৮৯

সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা

অমলেন্দু বসু

সাহিত্যের ইতিহাসে ও সমালোচনায় কোনো সম্পর্ক আছে কি? সাহিত্যের ইতিহাসকারকে কি ইতিহাস-রচনার জন্যই সমালোচক বলব? সাহিত্যকর্মের মূল্য কি তার ঐতিহাসিক মূল্যের সঙ্গে জড়িত অথবা বলব যে যদিও ইতিহাসকার ও সমালোচক একই বস্তুতে নিবদ্ধদৃষ্টি তথাপি তাঁদের কর্মতন্ত্র, চিন্তাভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি স্বতন্ত্র, সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে ও সমালোচনায় কোনো প্রবল সম্পর্ক নেই?

এ-প্রশ্নের উদ্ভব সাহিত্যের ভারতীয় ঐতিহ্যে নিহিত নয়, ইওরোপীয় সাহিত্যেও মাত্র দুই তিন শতক যাবৎ সমালোচনার সঙ্গে ইতিহাস মিশেছে আর রেনেসাঁসের পূর্বে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। ভারতীয় সাহিত্যে আলঙ্কারিক ও টীকাকারের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল কাব্যবস্তুটিতে, কাব্যের বাহিরে কোনো মূল্য থাকে কিনা সে কথায় তাঁদের কৌতূহল ছিল না। কবির জীবনীর সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কী সে বিষয় তাঁদের আলোচ্য নয়, কোনো কবিকর্ম পূর্বের এবং পরবর্তী অন্যান্য কবিকর্মের সঙ্গে একযোগে কেমনভাবে ইতিহাস রচনা করেছে সে প্রশ্নও তাঁদের নয়। বস্তুত, না বৈদিক যুগে না ক্লাসিক যুগে, ভারতীয় মানস ব্যক্তিসত্তার মানদণ্ডে শিল্পের মূল্য নিরূপণ করেনি। গ্রীকো-রোমান সভ্যতায় ট্যাসিটাস্, হেরোডোটাস্ প্রমুখ ইতিহাসবিৎ সম্ভব ছিলেন, ইসলামী জগতের ইব্‌ন্ খাল্‌দুনকে তো আর্নল্ড টয়নবি বলেছেন

প্রতিভাধর ইতিহাসতাত্ত্বিক। ভারতে অনুরূপ মনীষী কেউ ছিলেন না। কাশ্মীরী কহ্লন কাহিনীকথনে যতটা পটু ছিলেন ইতিহাসের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে তদনুরূপ নিপুণচিন্তার অধিকারী ছিলেন না, ইতিহাসকে তরঙ্গপ্রবাহ ব'লে মেনেছিলেন কিন্তু প্রবাহের মধ্যে কোনো দার্শনিক সূত্রের সন্ধান করেন নি। সুতরাং ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে ইতিহাস-চেতনা নেই, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রী কখনো ইতিহাসশাস্ত্রীর দৃষ্টিতে কাব্যের বিচার করেন নি। পক্ষান্তরে ইওরোপীয় কাব্যপাঠক সতেরো আঠারো শতক থেকে বিশেষত উনিশ শতক থেকে, ক্রমেই সাহিত্যকর্মের ইতিহাসে উৎসুক হতে লাগলেন, কাব্যবিশেষ অধ্যয়নে যে-সুখ উপভোগ করলেন তারই সঙ্গে পুঞ্জীভূত কাব্যের কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনায়ও তৃপ্তি পেলেন। সৃষ্টি হ'ল এক নতুন বিদ্যার, সাহিত্যের ইতিহাসের। অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত হল, বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎতুল্য জ্ঞানচর্চা-কেন্দ্রগুলিতে এই বিদ্যার অনুশীলন ও চর্চা হতে থাকল, ক্রমে সাহিত্যের পঠনপাঠন এমন প্রবলভাবে ইতিহাসপন্থী হয়ে পড়ল যে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রকট উদ্দেশ্য হ'ল সাহিত্যকর্মের শিল্পরূপ অনুধাবন করা নয়, তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। স্টাডি অব্ লিটারেচর্ হয়ে দাঁড়াল স্টাডি অব্ দি হিস্টরি অব্ লিটারেচর্। সাহিত্যের অধ্যাপকের মহৎ গুণ হ'ল, শিল্প-সংবেদনা নয়, 'স্কলারশিপ', যার এই বিশেষ উল্লেখে মানে হ'ল সাহিত্যকর্মের চতুষ্পার্শ্বস্থ নানারকম তথ্যসংগ্রহ। একটি ইংরেজি বাক্যসমষ্টির অনুসরণে বলতে পারি, গাছসাজালি এত বেশি হয়েছে যে অরণ্যের সমগ্র রূপ আর দর্শনসাধ্য নেই।

সাহিত্যের ইতিহাসের, লিটারেরি হিস্টরির এই প্রচণ্ড অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বহুযুগ-অনুসৃত, গতানুগতিক সাহিত্য-সমালোচনা। বিদ্যায়তনে পাণ্ডিত্যের মর্যাদা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমালোচনা-কর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংকুচিত হতে হতে ক্ষীণপ্রাণ হয়ে গেল, সমালোচনা কোনো ক্রমে সাহিত্যের ইতিহাসের গ্রন্থে সংলগ্ন হয়ে গিয়ে, পরধর্মে স্বধর্ম মিলিয়ে দিয়ে যা হোক ক'রে আত্মরক্ষা করল। বস্তুত আজকের দিনে জনপ্রিয় কয়েকটি সমালোচনা পদ্ধতির কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে সমালোচনা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইতিহাস চর্চার অনুযায়ী। সমালোচনার এক পদ্ধতিতে কবির জীবনচরিত মস্ত এক আলোচ্য বিষয়, জীবনচরিতের পরিপ্রেক্ষিতে (অর্থাৎ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবন প্রবাহের যে কয়টি তরঙ্গ আমাদের জ্ঞানসাধ্য তার হিসাবে) বিশ্লিষ্ট কবিতাগুলির ও সমগ্র

কাব্যধারার মূল্যায়ন চেষ্টা। যতক্ষণ না জানছি মার্গেরিতে ছিলেন বাস্তবিক কোন মেয়েটি যাঁর উদ্দেশে ব্যাবিউ আর্ণল্ড কয়েকটি সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন, যতক্ষণ না গোটে ও বায়রনের প্রত্যেক প্রণয়িনী বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সঙ্কলন করতে পারছি অথবা কীট্‌স্-এর মৃত্যুর পরে ফানি ব্রন্-এর কী হ'ল সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ হচ্ছে (অক্সফোর্ডের অধ্যাপক বেইটসন ক্ষমা ক'রে বলেছেন যে টেনিসন-এর 'ইন্ মেমরিআম' পড়ার পরে তাঁর মনে নিয়ত এক প্রশ্ন জাগছে, কবি-ভগ্নী এমিলি টেনিসন যে আর্থার হ্যালাম-এর স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবন কাটানোর বদলে বিয়ে থাওয়া ক'রে নিবিড় ঘরসংসার বেঁধেছিলেন সে কারণে কবি কি ভগ্নীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ?) অনেক সাহিত্যপাঠকের বিশ্বাসে ততক্ষণ আমাদের সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, সমালোচনা-কর্মের প্রবৃত্তি দৃঢ় হচ্ছেনা। এসব বিভ্রান্ত সাহিত্যপাঠকের বেলায় দৃষ্টিকোণের কিঞ্চিৎ প্রভেদে, মূল্যবোধের সামান্য হেরফেরে সমালোচনা কর্ম পর্যবসিত হয় জীবন চারিত্রিক কৌতূহলের কাছে। প্রবৃত্তি হয় মুখ্য কর্ম আর পরিণতি গৌণ। সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে সাহিত্য সমালোচনার এহেন পরাজয় অন্যান্য বিচার পদ্ধতিতেও অজ্ঞাত নয়। আর্টিফ্যাক্ট অথবা শিল্পবস্তুটির সামাজিক পরিবেশ নিয়ে যখন আলোচনা করি, শিল্পে ব্যবহৃত চিন্তা ও ভাবগুলিকে যখন চিন্তাজগতের অনুরূপ ভাব ও চিন্তার প্রবহমান ধারার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ ইদানীং হিস্‌টরি অব আইডিয়াস্ নামে যে নূতন বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে তার অংশ হিসাবে আলোচনা করি, যে সব বাক্‌প্রতিমা ও কল্পনা আধেয় হয়েছে আলোচ্য শিল্পটির আধারে, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে তাদের আদি মধ্য পরিণতি কোথায় সে বিষয়ে গবেষণা করি, এমন কি 'বিশুদ্ধ' শৈল্পিক সমালোচনার প্রবৃত্ত হয়ে শিল্পবস্তুটির উদ্ভব কোন ঘটনায় বা ঘটনাবলীতে, তার 'ফর্ম' বা রূপকল্পের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত হই, অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় আলোচ্য শিল্পটি কী পরিমাণ প্রভাবশালী অথবা প্রভাবগ্রাহী, এসব দূরপ্রসারী বিষয়ের অনুসন্ধানে শিল্পবস্তু থেকে ক্রমেই 'দূরে সরে' পড়ি—তখন সর্বক্ষেত্রেই সমালোচনার পণ্ডিতী পারিপার্শ্বিকের কাছে সমালোচনার সার উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'য়ে পড়ে।

৯

ইতিহাস ইওরোপীয় চিন্তায় চিরকালই প্রভাবশালী। সাহিত্য-আলোচনায় আরিস্টটলের কালেও ইতিহাস-চেতনা বর্তমান ছিল। আরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ইতিহাস-চেতনা সক্রিয়। তবুও নানা-কারণে আঠারো শতকেই ফরাসী এন্সাইক্লোপিডিস্ট নামক পণ্ডিত গোষ্ঠীর প্রবর্তনায় ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসাহ ও উদ্যমের নবপর্যায় শুরু হ'ল। ইংরেজি ভাষায় গিবন্-এর বিশাল ও মহৎ ইতিহাস রচিত হ'ল, উনিশ শতকে দশ বারোজন এমন ইতিহাসবিদের উদ্ভব হ'ল যাঁদের তথ্যভাণ্ডার তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় কম সমৃদ্ধ ছিল না। ইতিহাস মানে কি শুধুই তথ্যপঞ্জী, না তথ্যস্তূপের ভিত্তিতে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-বিষয়ে কৌতূহলী হ'লেন অনেকে, আর ১১২৪ সনে জিয়ামবাটিস্টা ভিকো'র 'সায়েন্‌ৎসা নুয়োভা' রচিত হবার পরে উনিশ শতকে অন্তত দু'জন মহৎ দার্শনিক ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, হেগেল ও কার্ল মার্ক্স্। ইতিহাস অংশত সমস্তচেতন দার্শনিকের চিত্তে জাগিয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এক কালে হেরা-ক্লিটাস্ বুঝেছিলেন যে নদীর চূর্ণিত তরঙ্গগুলি স্বতন্ত্র নয়, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের, Space and Time এর অন্তর্গত, মহাকালের স্থান ও কালশায়িত অংশমাত্র। উপনিষৎকার একদা মহাকালের সর্বব্যাপী নিয়তিক্রমতার স্তুতিগান করেছিলেন ও মহাকালকেই জগৎনিয়ন্তা জ্ঞান ক'রেছিলেন, আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চেয়েছে ইতিহাসে প্যাটার্ন খুঁজতে। ইতিহাস মানে কি কেবল ঘটনাপুঞ্জ-রূপী তথ্যস্তূপ; না তথ্যরাজির মধ্যে কোনো বিশিষ্ট ছাঁদ? ইবন্-খল্‌দুন্, হেগেল, মার্ক্স্, স্পেংলার, ক্রোচে, টয়ন্‌বি, সবাই মূলত একই সন্ধানে নিরত—বিভিন্ন ঘটনা সমাবেশের অন্তর্লীন ঐক্যের বা ছাঁদের সন্ধান। ইতিহাস চক্রবৎ হোক, কম্পরেখ হোক, প্রবহরেখ হোক, ইতিহাসের একটা মানে আছে, এ বিশ্বাসে পশ্চিম জগতে বারংবার ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা, পুনর্বিন্যাস, পুনরালোচনা হচ্ছে, হচ্ছে সমগ্র ইতিহাসের গতির, আর সেই সঙ্গে বর্তমান অর্থ নৈতিক সাহিত্যিক প্রভৃতি আংশিক ইতিহাসের গতির। ইংরেজি সাহিত্যে আঠারো শতকে টমাস্ ওয়ার্টন্ সাহিত্যের দুই ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাঁর পরে থেকে অনেক মনীষী পণ্ডিত এ কাজে হাত দিয়েছেন।

ইতিহাসবিদ্‌গণ যেমন তথ্যপুঞ্জের মধ্যে নানারকম ছাঁদ দেখতে পান,

সাহিত্যের ইতিহাসকারগণও (আমি এই মুহূর্তে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের কথাই ভাবছি কারণ লিটারারি হিস্টরি হিসাবে শ্রেষ্ঠ ইতিবৃত্তগুলি ইংরেজি সাহিত্য নিয়েই লেখা হয়েছে) তেমনি সাহিত্যতথ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিন্যাস, বিভিন্ন নিয়ম দেখতে পেয়েছেন অথবা দেখতে চেয়েছেন। কার্লাইল এ-বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছিলেন :

The history of a nation's poetry is the essence of its history, political, scientific, religious. With all these the complete Historian of Poetry will be familiar : the national physiognomy, in its finest traits, and through its successive stages of growth, will be clear to him ; he will discern the grand spiritual tendency of every period, which was the highest Aim and Enthusiasm of mankind in each, and how one epoch evolved in itself from the other.

(কোনো জাতির কাব্যের ইতিহাস সে-জাতির রাজনৈতিক, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ধর্মীয় ইতিহাসের সার কথা। কাব্যের নিখুঁত ইতিহাসবিৎ এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে সুপরিচিত থাকবেন। তিনি জানবেন জাতীয় সত্তার শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলি কিভাবে পর্যায়ের পরে পর্যায়ে বেড়ে উঠেছে। প্রত্যেক যুগের মহৎ অধ্যাত্মপ্রেরণাগুলিতে মানবের তুঙ্গতম উদ্দেশ্য ও উৎসাহ কি ভাবে প্রকট হয়েছে, কি ভাবে এক যুগ থেকে বিবর্তিত হয়েছে অন্য যুগে, একথাও তিনি জানবেন।)

কার্লাইল সাহিত্যের মধ্যে খুঁজেছিলেন জাতির অধ্যাত্মরূপ। জড়বাদী সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদও হ'ল অন্যরকম :

The methods of production in material life determine the general character of the social, political, and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being determines their consciousness.

(জড়বাস্তব জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি দিয়েই জীবনের সামাজিক, রাজ-

নৈতিক ও আত্মিক প্রগতি নিরূপিত হয়। মানুষের চেতনায় তার অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হয় না, বরং তার সমাজ জীবনেই তার চেতনা নির্দ্ধারিত হয়।)

In every historical epoch, the prevailing mode of economic production and exchange, and the social organization necessarily following from it, form the basis upon which is built up, and from which alone can be explained, the political and intellectual history of that epoch.

(প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের ভিত্তিতে সেই যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি বিদ্যমান এবং কেবল এই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতেই সেই যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা হতে পারে।)

মার্কস্ ও এঙ্গেলসের দু'টি উক্তি। উক্তিগুলির দার্শনিক গ্রাহ্যতা আমার বিচার্য্য নয়, আমার পক্ষে আপাতত এই যথেষ্ট যে এসব উক্তি বহুলোকের কাছে গ্রাহ্য, অনেক বিচক্ষণ, সংবেদনশীল, অভিজ্ঞ লোকের কাছে গ্রাহ্য। আমি শুধু এইটুকু লক্ষ্য করছি যে কার্লাইল যেখানে সাহিত্যের মূল্য বিচার করেছিলেন ভাবীয় অধ্যাত্মজীবনের কষ্টিপাথরে, মার্কস্ সেখানে বিচার করেছেন জড়পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। বিচারের মান পৃথক হওয়ার ফলে নিশ্চয় সমাজ ব্যবস্থায় তারতম্য হবে প্রচণ্ড কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের সীমিত বার্থের বিচারে দুই মতবাদে খুব প্রভেদ নেই, দুই মতবাদেই সাহিত্যবস্তুটির বাহিরে যাওয়া হয়েছে তার মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। বস্তুত, শুধু এই দুই মতবাদ নয়, আরো যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে (সেগুলির বর্ণনা এ-প্রবন্ধের এলাকার নয়), সেগুলিও সাহিত্যের বিচার করে সাহিত্যের বহিঃস্থিত ঘটনা বা অবস্থা বা আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে।

৩

যদি চ সাহিত্যবিচারে সাহিত্যাতিরিক্ত মাপকাঠির আমদানি হয়, তা হ'লেই কি সাহিত্যপাঠের ইতিহাসসম্মত পদ্ধতি বাতিল হ'য়ে যাবে? যেহেতু ইতিহাস তথ্যের মধ্যে ছাঁদ খোঁজে (যে ইতিহাস নেহাৎ তথ্যের নিরর্থক সমষ্টিমাত্র তা'র কথা বলছিনা); যেহেতু সাহিত্যের ইতিহাসও বিশেষ প্রত্যয়ে নির্ভরশীল হ'য়ে সাহিত্যের তথ্যাবলীর ব্যাখ্যা করে (অথবা ইতিহাসকার যদি তীক্ষ্ণ বিবেকের

অধিকারী হন তিনি হয়তো বলবেন যে প্রত্যয় আসে নয়, ওথাই আসে ; তিনি শুধু নিরাসক্ত ভাবে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন, সেই সংগ্রহের ফলেই অন্তর্নিহিত ঐক্যের ছাঁদ স্বতোজ্জ্বল হয়েছে) ; যেহেতু সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্যকর্মের মধ্যে মূলত শিল্পপ্রাণ খোঁজে না, খোঁজে জীবনচারিত্রিক অথবা ধর্মীয় অথবা সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য, real estimate ছেড়ে historical estimate-এ গুরুত্ব আরোপ করে, সে জন্য কি বলব যে সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক ? আমার বিচারে এমন কথা বলা সঙ্গত হবে না। আধুনিক সমালোচনার তিনটি চিহ্ন সর্বস্বীকৃত : (১) সমালোচনা আসলে মূল্যায়ন ; (২) মূল্যায়ন মানেই কোনো বিশ্বরিত, কোনো ভাবচিত্রী জ্ঞানের আলোকসম্পাতে মূল্য বিচার ; (৩) সমালোচকের সমূহ উদ্দেশ্য সমালোচনার মাধ্যমে বিশেষ ধরণের সদসৎ জ্ঞানের প্রচার। সাহিত্যের ইতিহাসও এক হিসাবে মূল্য নিরূপণ করে, গুণবিচার করে। লেখক ও লেখা শ্রেণীনিবদ্ধ হয়, প্রশস্ত গুণচিহ্নিত হয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখাটির লাভক্ষতি বিবেচিত হয়। অতএব সাহিত্যের ইতিহাস একপ্রকার সমালোচনা বৈ কি !

অন্য অর্থেও ইতিহাস সমালোচনার নিকট-প্রতিবেশী। সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যকর্মের পটভূমি ব্যাখ্যাত হয় আর তার ফলে সমালোচকের উপভোগ এবং মূল্যায়ন হয় তথ্যানুগ, সবিবেকী, মনস্ক্রিয়। শিল্পকর্মের জটিল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সমালোচনা শিথিল আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হতে পারে।* অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'অ্যাপ্রিসিয়েশন্', 'ইম্প্রেশনিষ্টিক্ ক্রিটিসিজ্‌ম্' নামে যে আপ্তবাক্যনির্ভর সাহিত্যালোচনা প্রচলিত ছিল তার অন্তঃসারশূন্যতা ইদানীংকার আলোচনায় তারসাম্য ফিরে পেয়েছে ইতিহাসের সহযোগিতায়। ইতিহাসজ্ঞানে সমালোচনার বলিষ্ঠতা।

৩

সাহিত্যের ইতিহাস একপ্রকার সমালোচনা এ কথা বলার সময় কথাটির সীমিতসিদ্ধতা স্মরণ রাখা দরকার। সৎ সমালোচনার শিল্পের মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার হয়। ইতিহাস মূল্যায়নশীল বটে কিন্তু ইতিহাসের মানদণ্ড মূলত (এমন কি গৌণত) শৈল্পিক নয়। ঐতিহ্যের ও পারিপার্শ্বিকের সন্ধানে

ইতিহাসবিৎ আর্টিক্যাই অর্থাৎ শিল্পবস্তু থেকে দূরে চলে যান। সাহিত্যপাঠে ছায়াকে কায়া ব'লে জ্ঞান করার অনেক ধরন আছে, উপরে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষভাগে তার কিছু আভাস দিয়েছি। ইতিহাস তো অন্তিম বিচারে সমালোচনার প্রকরণ মাত্র, অনেক প্রকরণের একটি মাত্র, কিন্তু ঐতিহাসিক পণ্ডিতীয়ানা এমনটি সমালোচকের চারিদিকে উর্ণনাভের এমন জাল বুনতে পারে যে শিল্পবস্তু তাঁর দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়, শিল্পবহির্ভূত অন্যান্য বিষয়েই তাঁর মনোযোগ আবদ্ধ থাকে। (এ-উক্তির সমর্থনে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। ইতালীয় অধ্যাপক মারিও প্রাজ্-এর 'দ রোমান্টিক অ্যাগনি' বইখানায় পশ্চিম ইওরোপীয় সাহিত্যের ও সংস্কৃতির কতকগুলি জটিলস্পর্শক, সাধারণের অলোচর ভাবনা ও আচরণ বিশ্লেষিত হয়েছে। এযাবৎ তাঁর বিশ্লেষণে কেউ ভুল দেখান নি, অতএব মেনে নেওয়া যায় যে তাঁর বর্ণিত ভাবনা ও আচরণগুলি ইতিহাস-সম্মত। ইতিহাসসম্মত হ'তে বাধা নেই কিন্তু এক্ষেত্রে অধ্যাপক প্রাজ্-এর দৃষ্টি বোপাটে হয়ে গেছে ইতিহাসের ধূসর আলোকে। কতকগুলি সদ্য-আবিষ্কৃত তথ্যের উন্মাদনায় তথ্যেরও অধিক যে শিল্পগৌরব তাই কথা ভুলে গেছেন। তাঁর তথ্যে ধারণা জন্মায় যে বোদ্‌লেয়র, স্যাইনবর্ণ, ম'পাসাঁ প্রভৃতি কবিরা নেহাৎই নিউরটিক অথবা রোগপীড়িত এবং অবৈধ অভ্যাসতাড়িত হতভাগ্য ছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যাবলী এইসব লেখকদের কবিশক্তির চিন্তনে আমাদের প্রবুদ্ধ করে না। কিন্তু যেহেতু কাব্যপাঠকের কাছে কাব্যই প্রথম ও প্রধান সত্য, ইতিহাস গৌণ, ইতিহাস বিচারসহায়ক ভৃত্য মাত্র, সেহেতু অধ্যাপক প্রাজ্-এর প্রমাণসঞ্চিত ইতিবৃত্তের চেয়ে বোদ্‌লেয়র ও স্যাইনবর্ণের কাব্য উজ্জ্বলতর ও মহত্তর।)

অতএব সাহিত্যের ইতিহাস সমালোচনারই মতো মূল্যায়নশীল হ'লেও তার মূল্যমান আলাদা, সুতরাং খুব সতর্ক বিচারে ইতিহাসকে সমালোচনার সমার্থ করা সঙ্গত হবে না বরং বলব সমালোচনার বহু পদ্ধতির মধ্যে একটিমাত্র পদ্ধতি ইতিহাসে।

বস্তুত এক জায়গায় (সমালোচনার গভীরতম ক্ষেত্রে) সমালোচনার ধর্ম ইতিহাসের ধর্ম থেকে নিতান্তই পৃথক। ইতিহাস বর্ণনা করে এককাল থেকে কালান্তরে গতির। ইতিহাসে ধ্রুব নক্ষত্রের স্থান নেই, নক্ষত্রেরা নিয়ত গতিবান। ইতিহাস স্থিতবিন্দু মানে না, নিবিকল্পের ধ্যানে প্রত্যয়ী নয়।

ইতিহাসে অচঞ্চল কোনো মানদণ্ড নেই যা' যুগ থেকে যুগে, অসংখ্য ঘটনার অরণ্যে নিষ্কম্প মূল্যায়নে প্রযুক্ত হবে। যেহেতু ইতিহাসদর্শনের প্রধান উপজীব্য পরিবর্তন, পরিবর্তন না থাকলে ইতিহাসও থাকে না', সে জন্য ইতিহাসের মূল্যমানও পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যমান একাধিক। পাঁচজন কবিকেই মহৎ বলবার কিন্তু আলাদা আলাদা কারণে, আলাদা আলাদা বাটখারায় ওজন ক'রে। ইতিহাসে মহত্ত্বের ধারণাও আপেক্ষিক। নিছক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যুগে প্রধান কবি, মোহিত মজুমদার নিজ যুগে দ্বিতীয় শ্রেণির কবি। অপরপক্ষে শৈল্পিক দৃষ্টিতে মোহিত মজুমদারে ও ঈশ্বর গুপ্তে আসমানজমিন ফারক।

ইতিহাস যদি পরিবর্তনশীল, তাহ'লে শিল্পের নিগূঢ় প্রাণরস অস্থির ঘূর্ণমান চক্রের কেন্দ্রস্থায়ী স্থিতবিন্দুতে। যেন ঘাবমান ক্ষিতি কাল রাশি রাশি তরঙ্গ নিয়ে পাশ দিয়ে চলেছে, আর স্থিরনেত্র মহাকাল পরম প্রত্যয়ের ধ্যানে সমাসীন।

এই যে শিল্পের মোটামুটি জাতিবিভাগ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঘটেছে, সেই দিক দিয়ে শিল্পচর্চা করে দেখার মানে হল শিল্পের সঙ্গে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে একেবারে বাইরে-বাইরে পরিচয়। আর-এক দিক দিয়ে পরিচয় —সে হল রসের দিক দিয়ে, সেখানে জাতিবিভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ইত্যাদি না হলেও কাজ চলে যায়। ...এই যে রসের প্রাধান্য এই নিয়ে জগতের তাবৎ শিল্প এবং এই নিয়ে যা শিল্প এবং যা শিল্প নয় তা যে সম্পূর্ণ আলাদা তাও প্রমাণিত হয় রসিকদের কাছে।

(অবনীন্দ্রনাথ : বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী, ১৮৬-৮৭) পৃঃ

শিল্প হল এক জিনিষ যা সর্বদেশে সর্বকালে সমান।

(" ১৬১ পৃঃ)

যেহেতু শিল্পের ধ্যানবস্তু পরম-অপরিবর্তনীয়, নির্বিকল্প, সে জন্য শিল্প-সমালোচনার প্রকরণের যত বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, তার চরম লক্ষ্য কি ধ্যানী-শিল্পের রসাস্বাদ, তার মূল্যমানও এই পরম-অপরিবর্তনীয় ধ্যানরসে অভিষিক্ত। সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সমালোচনার এখানেই চরম প্রভেদ। ইতিহাসের কিছু পদ্ধতি সমালোচনার গ্রাহ্য হতে পারে, ইতিহাস নিজেও হয়তো অংশত সমালোচনার মতোই মূল্যায়নশীল কিন্তু সাহিত্য-ইতিহাসের মূল্যমান আপেক্ষিক, অ-স্থিতকেন্দ্র, সাহিত্য-সমালোচনার মূল্যমান ধ্রুব, ধ্যানসাধ্য।

আত্মচরিত ও জীবনচরিত

অমিয় বাগচি

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখেছেন, আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করেন নি। তাঁর জীবনস্মৃতিও অসম্পূর্ণ, কবির সমগ্রজীবনের কাহিনী এর মধ্যে নেই। এই বিষয়ে তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: বাংলাদেশে জীবনস্মৃতি রচনা করা কতকটা নিরাপদ; একেবারে নরসেরি অটো-বায়োগ্রাফি, এমন কি, কোনো ব্যক্তিবিশেষের বায়োগ্রাফি পর্যন্ত সঠিক লিপিবদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব।...যতদূর মনে পড়ে, কবিকে এই বিষয়ে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তই প্রশ্ন করেছিলেন এবং তারই উত্তরে কবি তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন। ১৯২৯ সালে কোনো একদিন সন্ধ্যাবেলায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তাঁর বৈঠকখানায় বসে হীরেন্দ্রনাথ আমাকে এ-কথা বলেন।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অপরিণত এবং বহুলাংশে উপেক্ষিত বিভাগ বলে যদি কিছু থাকে, আমার মতে তা হোল আত্মচরিত এবং জীবনচরিত বিভাগ। বিপুলায়তন বাংলাসাহিত্যে এই বিভাগটির দৈন্য অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যা রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত হয়নি; তবু বলব রবীন্দ্রসাহিত্যে যদি কোনো বিষয়ের অনুশীলন কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত বা বঞ্চিত হয়ে থাকে তা হোল সাহিত্যের এই বিভাগটি। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শ এখানে অনুপস্থিত। কবি 'জীবনস্মৃতি' রচনা করেছেন, কিন্তু আত্মচরিত লেখেন নি। তাঁর 'চারিত্রপূজা' বা 'ভারতপথিক রামমোহন' কারো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা মাত্র। অথচ এই তিনজন মহাপুরুষের মধ্যে যে কোনো একজনের বিষয়ে তিনি একখানি পরিপূর্ণ জীবনচরিত রচনা করে যেতে পারতেন, অন্তত তাঁর কাছে অনেকের সেই প্রত্যাশাই ছিল। 'ভারত-পথিক রামমোহন' পাঠ করে এ-কথা আমার বহুবার মনে উদয় হয়েছে যে,

রবীন্দ্রনাথ যদি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত রচনা করে যেতেন, তাহলে আমরা দুটি জিনিস পেতাম ; এক, বাংলা সাহিত্যে একখানি ধ্রুপদী জীবনচরিত আর দ্বিতীয়ত জীবনচরিত রচনা করা বিষয়ে একটি 'মডেল' বা দৃষ্টান্ত। তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যের এই বিভাগটি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। শরৎচন্দ্রও না। এই তিনজন মহৎশিল্পী যদি আত্মচরিত বা জীবনচরিতের ক্ষেত্রে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতেন, উত্তরপুরুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে তা প্রেরণার স্থল হয়ে থাকত।

বাংলাসাহিত্যে এই বিভাগটির দৈন্য বোঝা যাবে যদি আমরা একবার বিশ্বসাহিত্যের প্রতি, বিশেষকরে ফরাসি, জর্মন ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আত্মচরিত ও জীবনচরিতের কী সমারোহপূর্ণ মিছিল সেখানে। য়ুরোপের প্রায় সকল দিকপাল সাহিত্যিক ও কবি হয় আত্মচরিত নতুবা জীবনচরিত রচনা দ্বারা তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এতখানি ভূমিকা করলাম শুধু এই কথাটা বলবার জন্য যে, দীর্ঘ কাল যাবৎ জীবনচরিত অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে আমার এই প্রত্যয় হয়েছে যে, প্রকৃত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ জীবনচরিত বা আত্মচরিত মানবমন গঠনের বিশেষ সহায়ক ; এর দ্বারা শুধু যে সাহিত্যেরই পরিপুষ্টি সাধিত হয় তা নয়, সমাজচেতনারও কিছু পরিপুষ্টি সাধিত হয়ে থাকে সেই সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আজো এই বিষয়ে অনেকের মনে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠেনি ; জীবনীসাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য খুব কম পাঠকই হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। মহৎ সাহিত্য, যাকে আমরা বলি সৃজনধর্মী সাহিত্য বা creative literature, মানবজীবনেরই অংশ। এতে প্রতিফলিত থাকে কালের অনুভূতি ও চিন্তা, যা যুগ হতে যুগান্তরে মানুষের মনকে নবনব সৃষ্টির পথে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। তাকেই বলি আমরা সার্থক আত্মচরিত বা জীবনচরিত যা মহৎ সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে আর চিত্তকে করে সরস।

ইংরেজি autobiography কথাটি আধুনিক কালের। কবি রবার্ট সাউদে (সেলসবেরি বিখ্যাত জীবনচরিতকার) ১৮১০ সালে সর্বপ্রথম অটোবায়োগ্রাফি

শব্দটি ব্যবহার করেন। তার আগে আত্মজীবনী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যথা, জার্নাল, লাইফ, মেমরস্, কনফেশনস্ এবং এই কথাগুলির পূর্বে 'আমার' বা ঐ রকম কোনো একটি শব্দ বসিয়ে দেওয়া হোত। এই ছিল সাউদে-পূর্ববর্তি সময়কার রীতি। ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে "Autobiography frequently reflects national character and, in so far as this is true, it can supply a rich source of materials for the understanding of diverse peoples." এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে যদি আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি গান্ধী বা তলস্তয়ের আত্মজীবনী। সেখানে তাঁরা নিজেদের কথা যতখানি অকপিত ভাবে বলেছেন, তার চেয়ে বহুলাংশে প্রকাশ করেছেন তাঁদের স্ব স্ব জীবনের national background বা জাতীয় পটভূমিকে। সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্মীয়তাবোধ শিক্ষা করতে প্রেরণা দেয়, পৃথিবীর সব মানুষ এক এই মহৎ চেতনালাভের প্রেরণা দেয় আত্মচরিত। গেটের আত্মজীবনী এর সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল।

লোকে আত্মচরিত লেখে কেন? এর উত্তর দিয়েছেন বার্নার্ড শ। তিনি বলেছেন: "There are three main motives for writing up one's life. There are, egoism, pedagogy and self-defence." অবশ্য সবাই যে এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে জীবনচরিত রচনা করেছেন, এমন কথা নয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল আর রুসেভ এর ব্যতিক্রম। এঁরা আত্মচরিত লিখেছেন প্রধানত অপরকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হোয়ে। তবে পৃথিবীতে অধিকাংশ আত্মচরিতের মূল কথাটা বোধ হয় আত্মরক্ষা বা self justification। তবে এখানে একটা কথা আছে। এ-কথা তাঁদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য যাঁদের জীবনের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যাঁদের অনুষ্ঠিত কার্যাবলী স্বভাবতঃ সবসময় সর্বজনীন প্রশংসার দাবী করতে পারে না।

সাধারণ পাঠকের মনে একটি ধারণা আছে যে আত্মচরিত মানেই সত্যের অকপিত প্রকাশ। কিন্তু সবাই তো আর রুসো নয়। মানুষ, তা সে যত বড়োই হোক, সব সময়ে সত্য কথা বলে না; আত্মপ্রবঞ্চনার সঙ্গে তার একটা প্রায় নিরপেক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এটা তার প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণ।

সজ্ঞানে সে যে মিথ্যা কথা বলে বা সত্য গোপন করে, এমন নয়, তবে এ-কথা ঠিক যে তার প্রবৃত্তিই হোল সব সময়েই সে নিজেকে জনসাধারণের সামনে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত করতে চায়। সত্য কথা বলবার সাহস অতি স্বল্প কয়েকটি প্রতিভাবানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যাঁরা তাঁদের জীবনের ego এবং motivation সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন।

মানুষ একদিনে কিছু নিজের সম্বন্ধে সচেতন হোতে ওঠেনি। তার নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতন হোতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগেছে। সভ্যতার বিপুল প্রবাহপথে মানুষের যে একটি স্বকীয় মূল্য আছে এই বোধটি যেদিন তার চেতনায় ও চিন্তায় প্রথম দেখা দিল, সেদিন থেকেই মানুষ তার জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহান্বিত হোল। আত্মচরিতের প্রকৃত সূত্রপাত আমরা এইখানে পাই। বিশ্বসাহিত্যের স্মরণীয় আত্মচরিত লেখকদের মধ্যে অন্যতম আলেকজান্ডার চুমার একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন : "Autobiography is the supreme verbal expression of the distinguishing mark of the modern man which is his intense individualism"—এই যে প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মচরিতে থাকবে এরই স্পষ্ট প্রতিফলন। আধুনিক মানুষের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্যই হোল এই intense individualism : পৃথিবীর বহুখ্যাত আত্মচরিতগুলির অধিকাংশেই এই গুণের দ্বারা চিহ্নিত।

আত্মচরিতে আমরা সাধারণত কি পাই? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বের কাহিনী; আত্মবিশ্লেষণ বা আত্ম-উদ্ঘাটন এবং আত্মবিচার এবং জীবনানুভূতি। শেষের দুটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোক ছিন্ন আত্মচরিত লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সেই সঙ্গে প্রয়োজন লেখকের নিজস্ব অনুভূতির। এই অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার জীবনরসে জারিত না হোলে কোনো আত্মচরিতই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। "A good biography is literature of a high order, in the sense of character delineation, structure, and mental catharsis" বার্নার্ড শ-র এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। ক্রোচে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, আত্মচরিতের মূল আবেদনটা লেখকের অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে ততটা নয়, যতটা তার

universality of human experience-এর মধ্যে। সময় ও স্থানের দূরত্বকে অতিক্রম করে এই মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব যেখানে তার গভীরতায় ও জটিলতায় সোচ্চার আত্মচরিতে থাকবে তারই একটি চিত্তস্পর্শী প্রতিফলন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। যাঁরা কর্মের দ্বারা দেশের ও জাতির ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়ে গেছেন তাঁরাই আত্মজীবনকথা লিখতে পারেন।

বিশ্বসাহিত্যে আজ পর্যন্ত আত্মচরিত রচনা করে যে কয়জন খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা : মার্কাস অরিলাস, সেন্ট অগাস্টিন, মার্টিন লুথার, বেনেভেনুতো সিলোনে, মন্তেন্, বেকন, ভলতেয়ার, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ডেভিড হিউম, রুশো, গিবন, কেরাসন, গোটে, চার্লস মরিস টেলেরাণ্ড, রবার্ট বার্নস, ওয়ার্ডসওয়র্থ, টমাস ডি কুইন্সি, হ্যারিয়েট মার্টিনো, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, আব্রাহাম লিঙ্কন, চার্লস ডারুইন, মাইকেল বুকানিন, অরিন শিলেম্যান, টমাস হেনরি হাক্সলি, লিও তলস্তয়, আনাতোল ফ্রাঁস্, আলেকজান্দার ডুমা, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ওয়াইল্ড, জর্জ বার্নার্ড শ, হ্যাভলক এলিস, এইচ. জি ওয়েলস, সমরসট মম্, আন্দ্রে জিদ্, হেলেন কেলার আর মরিস মেটারলেঙ্ক। আত্মচরিত সাহিত্যে এঁদের নাম কম-বেশি সকলের কাছেই পরিচিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মচরিত লেখক হিসাবে গোটে আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন। আর বৃহত্তম আত্মচরিত লেখক হিসাবে ডুমার খ্যাতি সর্বাধিক। ডুমার Mes Memoires বা My Memoirs নিঃসন্দেহে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সমালোচকরা সবাই এই গ্রন্থখানিকে একবাক্যে "The colossal work—perhaps the longest single on one man" বলে অভিহিত করেছেন। মূল ফরাসী ভাষায় এই বিপুলায়তন গ্রন্থখানি ত্রিশখণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার এই অনুপম সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ডুমা নিজেই বলেছেন : It is a dedication to the development of art in France during the first half of the nineteenth century...a gallery where each illustrious name takes on its living semblance. ...It is not merely my Memoirs that I am writing, but the Memoirs of all the great names I have known ; and having known all that has been great and illustrious in France, what

I write is the Memoirs of France," ঠিক এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খুব কম আত্মচরিতই লেখা হয়েছে।

আত্মচরিত রচনা সম্পর্কে এ যুগের সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষ বার্নার্ড শ স্বতঃ অভিমত পোষণ করবেন। তাঁকে তাঁর বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রকাশক আত্ম-চরিত লিখবার কথা অনেকবার বলেছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু কিছুতেই রাজী হন নি। ১৮৯৮ সাল তিনি কোনো একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্রে লিখেছিলেন : "All autobiographies are lies. I do not mean unconscious, unintentional lies. No man is bad enough to tell the truth about himself during his lifetime, involving, as it must, the truth about his family and his friends and colleagues. And no man is good enough to tell the truth to posterity in a document which he suppresses until there is nobody left alive to contradict him"[১]

দেখা যাচ্ছে, শ এখানে রুসোর বিপরীত কথা বলেছেন। রুসো বলে গিয়েছেন যে, পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হোতে না পারবে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হোতে না পারবে, সে যেন আত্মজীবনকথা লিখতে প্রবৃত্ত না হয়। তবু এ কথা ঠিক যে, এ তথ্য শ বলেছেন তাঁর মন থেকে, প্রত্যয় থেকে। এখানে তিনি বিদূষক নন, একজন পরম দ্বিতধী প্রাজ্ঞপুরুষ। তাঁর সুদীর্ঘতম জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধ এই সত্যকে তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে যদি তিনি কখনো সত্যকার আত্মজীবনী লিখতে চেষ্টা করেন তা হোল, "I should give mortal offence to the few relatives who would know that I was writing the truth ; and nobody else would believe me." এ ছাড়া শ আরো একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন "I am in further difficulty that I have not yet ascertained the truth about myself". এইখানে আত্মচরিত রচনা করা সম্পর্কে একটি মূল্যবান সঙ্কেত তিনি দিয়েছেন। নিজের জীবনের সত্য সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত কেউ সুনিশ্চিত না হতে পারেন ততদিন তাঁর পক্ষে একাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তিনি কেন আত্মচরিত লিখছেন না ?

১ Sixteen Self Sketches : G. B. S.

এই প্রশ্নের উত্তরে শ বলেছিলেন : "I am not at all interesting autobiographically...The best autobiographies are confessions ; but if a man is a deep writer all his works are confessions. One of the greatest men who ever attempted an autobiography was Goethe." তারপর ১৯৪৯ সালে যখন তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই Sixteen Self Sketches লিখলেন তার গোড়াতেই তিনি পাঠককে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন : "This volume do not present me from my point of view, of which I am necessarily as unconscious as I am of the taste of water because it is always in my mouth. These autobiographical fragments tell you mostly what has been overlooked or misunderstood." মুখ্যত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত হোলেও, বার্নার্ড শ যে একখানা উপভোগ্য আত্মচরিত আমাদের দিয়ে গেছেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটি প্রায় নিরাসক্ত, অথচ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অতি প্রবলভাবে সচেতন একটি প্রতিভার নিঃসঙ্কোচ ও অবারিত মনের পরিচয় আছে এই বইতে। শ তাঁর লেখার নাম দিয়েছেন : 'আত্মপ্রতিকৃতি' এবং এই প্রতিকৃতির প্রতিটি রেখার টান যে কত সুস্পষ্ট এবং নির্মম তা এর পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক আত্মচরিত লেখেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আত্মচরিত বাংলাভাষার অল্প কয়েকখানি সুখপাঠ্য আত্মচরিতের অন্যতম। এ একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। "অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাঁহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখশান্তি হরণ করিল, এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি আনিয়া দিল, এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন।"[২] ১৮১৭ থেকে ১৮৫৮, এই একচল্লিশ বছরের কাহিনী দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। "তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর"—তাঁর আত্মচরিতের ইহাই সর্বশেষ লাইন। এরপর তিনি আরো দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী একবার তাঁর জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইনি মহর্ষির আত্মচরিত সম্পাদনা করেন।

"আপনার জীবনে এর পরেও তো অনেক ঘটনা ছিল, সেগুলোর উল্লেখ করলেন না কেন।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের কথা তাহলে লিখতে হোত; সেটা আমার পক্ষে নানা কারণে সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরের করুণা লাভ আমার জীবনের মূল কথা—কেমন করে কী অবস্থায় সেই করুণা আমার জীবনে এলো—আমার আত্মচরিতের মধ্যে তাই বলবার চেষ্টা করেছি।"

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'—তাঁর জীবনের স্মৃতি মাত্র, জীবনের ইতিহাস নয়। কবি এ-কথা নিজেই বলেছেন: "এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র, ইহাকে জীবনের পূরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি।" সুতরাং কবি এই গ্রন্থে জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেন নি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে তিনি এই বই লেখেন নি—অনুরোধে লিখেছেন। কবি আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন: "যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়—কেননা তাঁহাদের জীবনটাই তাহাদের সর্বপ্রধান রচনা।" এইখানে আমরা আত্মচরিতের একটি সংজ্ঞা পাই। আত্মচরিত লেখার প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। কবি নিজেই বলেছেন যে তিনি নিজের জীবনী লিখতে কোনো দিন উৎসাহ বোধ করেন নি। কিন্তু অবশেষে অনুরোধ যখন এলো তখন দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখবার যেন সুযোগ পেলেন। কবি বলছেন, "নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র নিজের কাছে অপরাহ্ণের আলোকে ছবির মতো দেখা দেয়। অস্তাচল নানা ছবির মতো সেই আপন জীবনের ছবিও সাহিত্যের পটে আঁকা চলে।" রবীন্দ্রনাথ তাই-ই করেছেন। সাহিত্যের স্বর্ণপাত্রে তাঁর জীবনের স্মৃতিরাজিকে থরে থরে সাজিয়েছেন একটি বিশেষ সূত্র ধরে। "জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোনো শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র অর্থাৎ তাহা আমার লেখক-জীবনের ধারা।" পিতার আত্মচরিতের প্রধান সূত্র বৈরাগ্যদীপ্ত ঈশ্বরাভিমুখী জীবনের ধারা আর পুত্রের আত্মচরিতের প্রধান সূত্র তার কবি জীবনের ধারা।

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিত' ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বাদ দিলে বাংলা

সাহিত্যে প্রকৃত সাহিত্যগুণান্বিত আত্মজীবনীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, যতীন্দ্র কুমার ঘোষ—এই কয়জন ব্যক্তিরেকে উল্লেখযোগ্য আত্মচরিত আর কেউ লেখেন নি। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘতম আত্মচরিত। বিপিনচন্দ্রের 'সত্তর বৎসর' তাঁর অন্যতম রচনা, তবে দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি আত্মচরিত My Life and Times তাঁর জীবনের ও তাঁর যুগের একটি চমৎকার আলেখ্য। তেমনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর ইংরেজিতে লিখিত A Nation in Making ও Indian Struggle তাঁদের স্ব স্ব রাজনৈতিক কর্মজীবনের অতি সুন্দর ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে গান্ধী, নেহরু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিনজন সর্বভারতীয় নেতাও তাঁদের নিজ নিজ জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিত প্রথমে মূল গুজরাতি ও হিন্দীভাষায় রচিত হয়ে পরে অন্য কর্তৃক ইংরেজিভাষায় অনূদিত হয়। My Experiment with Truth বর্তমানকালের বহুলপঠিত আত্মচরিত, যেমন বহুলপঠিত নেহেরুর Autobiography। শেষোক্ত বইখানির খ্যাতি আন্তর্জাতিক বললেই চলে। যে যে গুণ থাকলে পরে আত্মচরিত সাহিত্য-পদবাচ্য হলে গণ্য হয়ে থাকে, গান্ধী ও নেহেরুর আত্মচরিত দুখানি সেই সেই গুণের দ্বারা বিশেষভাবেই চিহ্নিত, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। একটি পরাধীন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা এই দুই রাষ্ট্রনায়কের স্বস্ব জীবনের কাহিনীর পটভূমিকায় এমন সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যে তার অন্তর্নিহিত আবেদন স্থান, কাল ও পাত্রের নির্দিষ্ট সীমা অনায়াসেই অতিক্রম করে বর্তমানে একটা দুর্লভ সর্বজনীনতা লাভ করেছে। এই অসামান্য আত্মচরিত দু'খানির বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালি পাঠকের কাছে বই দু'খানি যথেষ্ট সমাদরও লাভ করেছে। নেহরুর আত্মচরিতের বাংলা অনুবাদে স্বনামখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সে তুলনায় গান্ধীর আত্মচরিতের বাংলা অনুবাদ উৎকৃষ্ট হয় নি।

তবু এখানে একটা কথার উল্লেখ করব। বাঙালী পাঠক গান্ধী ও নেহরুর আত্মচরিতের প্রতি যে অনুরাগ বা সমাদর দেখিয়েছে, দুঃখের বিষয়, সেই

অনুরাগ বা সমাদর তাদের কি বিপিনচন্দ্র, কি সুরেন্দ্রনাথ বা কি সুভাষচন্দ্রের আত্মচরিতের প্রতি প্রদর্শন করে নি। করে নি তার প্রমাণ, অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় এই তিনখানি বইয়ের একখানিরও বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই তিনজন রাজনৈতিক নেতার আত্মচরিত তিনখানি গান্ধী বা নেহরুর আত্মচরিতের তুলনায় কম তো নয়ই, বরং বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি এই পাঁচখানি গ্রন্থ বহুবার পাঠ করেছি। এর অনেক তুলনা করেছি এবং একজন নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখেছি। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, সুরেন্দ্রনাথের A Nation in Making ভারতবর্ষে প্রকাশিত আত্মচরিত-গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাষা এবং ভাবসম্পদে এ একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ—একটা যুগের ইতিহাসে এবং সেই যুগের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন এমন সুনিপুণভাবে আর কোনো গ্রন্থে প্রতিফলিত হয় নি। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতের নাম দিয়েছেন Indian Struggle—একটি পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামের এক বিশাল পটভূমিকায় বিধৃত তাঁর জীবনের কাহিনী আদৌ ব্যক্তিকেন্দ্রিক (নেহরু বা গান্ধীর আত্মচরিত অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক) নয়; বরং এ-কথা, প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই, বলা চলে যে সুরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দুজনেই তাঁদের স্ব স্ব আত্ম-চরিতে দেশ এবং জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এইখানেই বই দুখানির স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা। সুরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী গান্ধী বা নেহরুর আত্মজীবনীর সমতুল্য মর্যাদা এবং স্বীকৃতির দাবী রাখে। বাংলা ভাষায় এই বই দুখানির অনুবাদ কেন যে উপেক্ষিত হোল তা বোঝা যায় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মজীবনী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে দিল্লীর সাহিত্য আকাদমি থেকে প্রকাশিত হোতে চলেছে; অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। বাংলায় কি এমন সাহিত্যিক বা প্রকাশক নেই যাঁরা সুরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের আত্মচরিত অনুবাদ করতে ও প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন?

সম্প্রতি লক্ষ্য করছি স্মৃতিকথা লেখার একটি হিড়িক বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে এবং কোনো কোনো সাহিত্যিক তাঁদের স্মৃতিকথা লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। জনৈক সাংবাদিকও তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন; দুজন অভিনেতা তাঁদের জীবনস্মৃতি লিখেছেন। কোনো একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায়

সহযোগী সম্পাদকও বাদ যান নি—তিনিও একখানি স্মৃতিকথা জাতীয় বই প্রকাশ করেছেন। এই বইগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁদের এইসব স্মৃতিকথা লিখবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, সার্থকতাও নেই। এ প্রয়াস অনেক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে। আত্মজীবনী কেন লেখা উচিত এবং কার লেখা উচিত, এবিষয়ে এঁদের হয়ত সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। সাহিত্য অতখানি হাটে-মাঠে বা বাজারের পণ্য দ্রব্য নয়। আত্মকথা সুলভ নয়। মনের একটি কথা এঁদের মনে করিয়ে দিই। The Summing Up গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখছেন : "No one can tell the whole truth about himself." সার্থক আত্মচরিত বিশেষ জীবনানুভূতির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে—জীবনের যে অভিজ্ঞতা সাগর মন্থন করে এই দুর্লভ অনুভূতির সাক্ষাৎ মেলায়, তা এঁদের জীবনে কোথায়? সুতরাং এই তথাকথিত স্মৃতিকথাগুলি বৈঠকী আলাপ হোতে পারে, প্রকৃত স্মৃতিচারণ নয়। এদের মূল্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।

যথার্থ রসোত্তীর্ণ জীবনচরিতের সংখ্যাও বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নয়। তার একটি কারণ, খুব কম সাহিত্যিকই এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। কার্লাইল বা লিটন স্ট্রেচি, অথবা ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস বা শিয়ার্সনের মতো জীবন চরিতকার আমাদের দেশে কোথায়? সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ জীবনচরিত —এই সত্যটাই আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে উপলব্ধ হয় নি। এমার্সন বলেন, "One moment of a man's life is a fact so stupendous as to take the lustre out of all fiction." স্যর ওয়াল্টার স্কটের মতে "Biography is the most interesting of every species of composition ; আর একজন আধুনিক বিশেষজ্ঞ, গামালিয়েল ব্রাডফোর্ড মন্তব্য করেছেন : "Biography is one of the most fascinating of all pursuits, for by it we are taken out of our lives into another life which we find very much like our own." কার্লাইল আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন ; জীবনচরিত সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি কম বেশি সবাই জানেন। তিনি বলেছেন, "History is the essence of numerous biographies. If one wants to know the meaning of history let him look into the lives of great men." বস্তুত: তাঁর আগে জীবন-

চরিতকে এইভাবে অর্থাৎ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আর কেউ উপলব্ধি করেন নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবির অভিমত এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর মতে জীবনচরিত হোল "Personalised history" এবং জীবনচরিতকারের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হোল "to recover lives, to weigh souls, and to catch that will-o-the-wisp known as the human spirit." সুতরাং জীবনচরিত রচনা কাজটি মোটেই সহজ নয়।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাবলী, বা তার চরিত্রের গতি-প্রকৃতি—সাধারণতঃ জীবনচরিতে এইসব লিপিবদ্ধ হোয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনচরিত একান্তভাবেই তথ্যবহ—তথ্যের সমাবেশ ভিন্ন কোনো জীবনচরিতই রচিত হোতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র তথ্যের সমাবেশে কোনো সার্থক জীবনচরিত সৃষ্টি হোতে পারে না, যদি না তার মধ্যে আমরা পাই ব্যাখ্যা বা interpretation এবং তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সন্নিবেশ (arrangement) যদিও এই দুটি কাজ নিখুঁতভাবে হয়, তথাপি শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে interpretation-এর অভাবে লেখকের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয় নি, অর্থাৎ জীবন্ত জীবনচরিত তিনি রচনা করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে এমীল লুডউইগের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি তখন নেপোলিয়নের জীবনচরিত রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, নেপোলিয়নের জীবনচরিতের উপাদান তো প্রচুর, তবে তোমার এই বই লিখতে এত সময় লাগছে কেন? উত্তরে লুডউইগ বলেছিলেন, "উপাদানের অপ্রতুলতা নেই সত্য, তবে কি না "Behind every piece of biography is a special feeling about life, a special view of life and a special set of values." এখানেও সেই ব্যাখ্যার কথা আসছে।

একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে আমরা কী প্রত্যাশা করি? অর্থাৎ কী কী গুণ থাকলে পরে একটি উপন্যাসকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়? মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সেই গুণাবলি হোল suspense, plot logic, interpretation, belief; এবং total experience এর যে-কোনোর একটির অভাব ঘটলে, বিশেষ করে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অভাব ঘটলে পরে সে উপন্যাস নিক্ষই হোতে বাধ্য। জীবনচরিত সম্পর্কেও সেই একই কথা। Total experience কথাটি বলতে সোজা, কিন্তু জিনিসটি ধারণায় আনা

অত্যন্ত কঠিন। কোনো একটি চরিত্রের প্রতি পাঠকচিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করা এক জিনিস আর সেই চরিত্রের ভাবে পাঠককে ভাবিয়ে তোলা আরেক জিনিস। তেমন সার্থক সৃষ্টি উপন্যাসের জগতে হাজারে দু-চারটির বেশি মেলে কিনা সন্দেহ। সার্থক জীবনচরিত সম্পর্কেও সেই একই কথা। চেষ্টারটনের কথায় "when one reads a good biography one is supposed to simply live through everything which the biographer writes about his subject." ঠিক এই রকম effect পাঠকচিত্তে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই ক্ষমতাসম্পন্ন জীবনচরিতকার বলে অভিহিত হোতে পারেন। প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়লে পরে কোনো একটি পরিচিত বিষয় বা বহু-পঠিত বিষয় যে সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রতিভাত হোতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন লুডউইগ, দেখিয়েছেন স্ট্রেচি, দেখিয়েছেন সিগার্সন। নূতন করে সৃষ্টি করা সামান্য ক্ষমতার কাজ নয়, আবার সেই সৃষ্টিকে পাঠকের অনুভূতির মধ্যে, তার উপলব্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আরো সুকঠিন। এই সফলতার মানদণ্ডেই জীবনচরিত রচনার সফলতা বা ব্যর্থতার যাচাই হোয়ে থাকে। "To find the meaning of life"—জীবনের অর্থকে (এখানে বুঝতে হবে motivation) আবিষ্কার করা—এই দুঃসাধ্য কাজে সফলতা লাভ করেছেন পৃথিবীর খুব স্বল্পসংখ্যক জীবনচরিতকার। ঠিক এই নিরিখে যাচাই করলে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত জীবনচরিতকারের সংখ্যা নিতান্ত অনুল্লেখ্য বলতে হয়।

নরনারীর চরিত্রাখ্যান কোন্ পদ্ধতি অনুসারে লিখলে তা সমাজের মঙ্গল-জনক হোতে পারে, তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন লিড্‌নে সী তাঁর Principles of Biography নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। যিনি জীবনচরিতকার হোতে ইচ্ছা করেন তাঁর পক্ষে এই বইখানি ভালো করে পাঠ করা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা লিখে রাখার সাধ হয় কেন? উত্তরে লিড্‌নে সী বলছেন: "মানুষের চরিত্রের ও কীর্তির ধারা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে, উত্তরপুরুষকে নিজেদের ভাবে ভাবুক রাখবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস ও চরিতাখ্যান রচিত হোয়ে থাকে। পুরাতনকে সজীব রাখাই চরিতাখ্যানের মূলতত্ত্ব।" জীবনচরিত রচনার উপাদান কী? উত্তরে সী বলেছেন: "Character and exploit constitute biographic personality" অর্থাৎ চরিত্র এবং কীর্তি, এই দুটিই আখ্যানযোগ্য বিষয়। আরো বিশদভাবে বলা যেতে পারে যে, যে-

চরিত্রে বিশিষ্টতা নেই, যা সমাজের ওপর একটা ছাপ রেখে যেতে না পারে, তাহা আখ্যানযোগ্য নয়। যে পুরুষ কীর্তিমান নন, যার যশ স্থায়ী হবে না, তাঁর জীবনকথাও আখ্যানযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে এরিস্টটলের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন: "A career, which is serious, complete and of a certain magnitude, is a fit biographic theme." অর্থাৎ, যে জীবন প্রগাঢ় নয়, পূর্ণ নয়, ব্যাপক নয়, তার আখ্যানের সার্থকতা নেই। এরিস্টটলের magnitude' কথাটা নিয়ে লী অনেকখানি আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের প্রশংসার ছটা দেখে এবং সে ছটায় মুগ্ধ হোয়ে তার বিষয়ে লিখতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude বোঝা বড়ো কঠিন। এখানে তিনি মার্লবরো আর ওয়েলিংটনের তুলনা দিয়েছেন; বলেছেন, "বীরত্ব হিসাবে মার্লবরো ওয়েলিংটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু মার্লবরো তাঁর স্বজাতির কাছে অনেকটা বিস্মৃত, অথচ ইংরেজ মনে রেখেছে ওয়েলিংটনকে।" টেনিসন মার্লবরোর ওপর কবিতা লেখেন নি, লিখেছেন ওয়েলিংটনের ওপর। এর কারণ এই যে, ওয়েলিংটনের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude মার্লবরোর চেয়ে খুব বেশি। এই মহত্ত্ব বাদে কোনো জীবনচরিতই সার্থকভাবে বিন্যস্ত হোতে পারে না।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। জীবনচরিত ইতিহাস নয়; তথ্যভারাক্রান্ত জীবনী জীবনী পদবাচ্য নয়, তা ইতিহাসের অন্য একটি রূপ মাত্র। ইতিহাসে ও চরিতাখ্যানের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান তা বোঝাতে গিয়ে লী বলেছেন: "Bacon warns us that history sets forth the point of public business; while biography reveals the true and inward sources of the action, tells of private no less than of public conduct, and pays as much attention to the slender wires as to the great weights that hang from them." এর অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, ইতিহাসে আমরা পাই জাতিগত ঘটনার বা বিষয়ের বর্ণনা, আর জীবনচরিতে পাই ব্যক্তিগত জীবনের কথা। জীবনচরিত রচনা অতি দুরূহ কাজ; সত্য কথা বলার সাহস না থাকলে এবং যার বিষয়ে লিখতে হবে তার মনের বিস্তার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ভিন্ন কেউই সার্থক জীবনচরিত রচনা করতে পারেন না।

য়ুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম জীবনচরিতকারের মধ্যে একটি নাম আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি প্লুটার্ক যাঁকে 'The Prince of ancient biographers' বলা হোয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে সর্বকালের আদর্শ জীবনীকার প্লুটার্ক; তাঁর Life of Marcus Antonius, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনচরিতগুলির মধ্যে অন্যতম। ইংরেজি সাহিত্যের অতি বিখ্যাত জীবন-চরিতগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা স্যামুয়েল জনসন লিখিত রিচার্ড স্যাভেজ,—ইংরেজ কবি, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে যাঁর মৃত্যু হয়; বসওয়েলের লেখা জনসনের জীবন কথা; লকহার্টের লেখা স্যার ওয়াল্টার স্কটের জীবনকথা; মাদাম দ এপিনে-র 'জসো' সাউদের 'মেলসন' (নেলসনের প্রণয়িনী লেডি হ্যামিলটনকে অমর করে রেখেছেন সাউদে তাঁর এই বইতে।); টমাস মুরের 'বায়রণ' সিলভেস্টর 'শেলি' কার্লাইলের 'জনওয়েল' ও 'শিলার' ও 'জন স্টার্লিং' লিটন স্ট্রেচির 'দি এণ্ড অব জেনারেল গর্ডন', 'এলিজাবেথ য়্যাণ্ড এসেক্স্' প্রভৃতি; জীবনী সাহিত্যে রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক উনিই। ম্যাসনের 'মেমরায়স্ অব গ্রে' ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত। বসওয়েলের নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন ম্যাসন। জনসনের জীবনকথা লিখতে গিয়ে বসওয়েল ম্যাসনকেই অনুসরণ করেছিলেন। বসওয়েলের 'জনসন' স্যামুয়েল জনসনের জীবনের দিনপঞ্জী বিশেষ, তাই এখানে জনসনের জীবনের ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। ডেভিড ডায়াকস্ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন "Boswell, in fact was scarcely concerned with the interpretations of his subject. He is primarily concerned with recording Johnson and not with defining the central idea of his life—"এবং এই একটি মাত্র কারণে বসওয়েল সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ জীবনীকার বলে স্বীকৃতি পান নি। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য যেখানে একাধিক প্রতিভাবান জীবনচরিতকারের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ইংরেজি সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার প্রচলিত ধারার আমূল পরিবর্তন সূচিত হোল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। এই সময় থেকেই ওদেশের জীবনী সাহিত্যে pious memoralization-এর যুগ শেষ হয়ে আরম্ভ হোল মনোবিশ্লেষণমূলক জীবনচরিতের ধারা। বসওয়েলের যুগ শেষ হোয়ে আরম্ভ হোল ক্রাফ হ্যাবিসের যুগ: ঔপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও মনস্তত্ত্ববিদেরা যখন এগিয়ে এলেন এই ক্ষেত্রে, তখন থেকেই

ইংরেজি জীবনীসাহিত্যে একটা নবযুগের সূচনা দেখা দিল। এ যুগের খ্যাতনামা জীবনীকারদের মধ্যে যাঁদের গণ্য করা হয় তাঁরা হলেন এমিল লুডউইগ, আঁদ্রে মরোয়া, ব্র্যাডফোর্ড, শিরার্সন প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত রচনা করেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'রাজা রামমোহন রায়' একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে না, তথাপি সেই বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন তেমন বিস্তৃতভাবেই তাঁর পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তিকালে একাধিক লেখক এই আকরগ্রন্থখানিকে অবলম্বন করে রামমোহনের আরো কয়েকখানি জীবনচরিত রচনা করেছে। এঁদের মধ্যে আছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত জীবনী-রচনা করে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই কয়জনের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি, যথা যোগীন্দ্রনাথ বসু (মাইকেল), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), অজিত চক্রবর্তি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ), সৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায় (কেশবচন্দ্র), দেবকুমার রায় চৌধুরী (দ্বিজেন্দ্রলাল) নগেন্দ্র-নাথ সোম (মধুস্মৃতি), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বিজয়কৃষ্ণ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (বিবেকানন্দ), গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী (স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি), মোহিতলাল মজুমদার (মধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ প্রভৃতি), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-জীবনী) এবং বিনয় ঘোষ (বিদ্যাসাগর প্রভৃতি)। উপাধ্যায়ের 'কেশবচন্দ্র' বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘতম জীবনচরিত। এই তালিকায় আমরা আরো একজনের নাম উল্লেখ করতে পারি : তিনি ব্রহ্মবান্ধব দেবশর্মা। এঁর 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' জীবনীসাহিত্যে একখানি যথার্থ মননশীল গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। পৃথ্বিশ রায় ইংরেজিতে চিত্তরঞ্জনের একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছেন : বইখানির বাংলা অনুবাদ বাঞ্ছনীয়। বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজিতে আনন্দমোহন বসুর একখানি জীবনচরিত লিখেছিলেন, বইখানি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিও অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়েছে। বর্তমান তালিকা যে সম্পূর্ণ নয়, তা বলাই বাহুল্য। মন্মথনাথ বসু এক সময়ে অনেকগুলি জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। শিবনাথ

শাস্ত্রীকেও আমরা একজন জীবনচরিতকার হিসাবে গণ্য করতে পারি ; তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' একখানি আশ্চর্য এবং বাংলা সাহিত্য অদ্যাবধি অতুলনীয় গ্রন্থ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত শেষ বয়সে ইংরেজিতে তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত রচনা করে গিয়েছেন এবং আমার মতে গিরিজাশঙ্করের পর এটিই বিবেকানন্দের যথার্থ জীবনচরিত। চিন্তাশীল জীবনচরিতকার হিসাবে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর দাবী সর্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিতের অনুশীলন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আরম্ভ হয়েছে এবং পাঠকেরাও জীবনচরিত পাঠে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এইটাই আশার কথা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমসাময়িক সমাজ ও কাল

সুশীল রায়

বাদশাহী আমলের প্রভাব যখন সমাজের অঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি, এবং তার উপর নতুন শাসকের ইংরেজি প্রভাব সমাজকে যখন নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে ধরেছে এমনি এক সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম।

তাঁর জন্মের প্রায় অর্ধ শত বৎসর আগে বাংলার গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি, ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে গদ্য রচনা প্রকাশ ও প্রচার আরম্ভ হয়েছে, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪৯ সালে। তাঁর যখন জন্ম, তখন দেশে ইংরেজিয়ানার খুব অতি প্রবল।

ইংরেজরা এদেশে এসেছিলেন বণিক হয়ে, তাঁদের মানদণ্ড যে একদিন রাজদণ্ড রূপে দেখা দেবে, এ কথা এদেশের কোন মানুষ সেকালে কল্পনা করেন নি ; এমনকি স্বয়ং ইংরেজরাও হয়তো সে কথা জানতেন না। ঘটনাচক্রে রাজদণ্ড লাভ করলেন তাঁরা। রাজদণ্ড যখন সহসা এসে পড়ল, যখন রাজা হওয়া গেল তখন রাজ কর্তব্য যে পালন করতে হবে—এই সিদ্ধান্তে আসতে তাঁদের কিছু সময় নেয়।

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখানে করার আবশ্যকতা নেই। কেবল এই কথা বলা যেতে পারে যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানির সনদ পেলেন, এবং তারই ফলে তাঁদের কুঠিয়ালরা হয়ে উঠলেন এক-এক জন কলেক্টর। খাজনা আদায় করাই হল তাঁদের কাজ। যার কাছ থেকে খাজনা নেওয়া হয়, সেই প্রজাদের সুখ সুবিধার প্রতিও দৃষ্টি যে রাখতে হবে—এ দায়িত্বের কথাটা তাঁদের মাথায় এল না। রাজদণ্ড হাতে এসেছে বটে কিন্তু মনের মানদণ্ডটা তখনও বণিকই রয়ে গেছে। তা না হলে, যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে একটা মর্মান্তিক অধ্যায় হয়ে আছে, যার ফলে বাংলাদেশের তিন ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সেই বছরেও আদায়ী খাজনার পরিমাণ কম হয় নি। অর্থাৎ জীবিত যা মৃতপ্রায়,ও মানুষের কাছ থেকেও মৃতের দেয় করও আদায় করা হয়। এমন কাজ অবশ্যই রাজকীয় কাজ নয়।

কিন্তু সে অন্য কথা। অবশেষে রাজকীয় আসনে রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে তাঁরা বসলেন এই দেশে। এইবার তাঁরা প্রকৃতই রাজদণ্ড হাতে নিলেন। তাঁরা দেশের উন্নতির দিকেই মনোনিবেশ করলেন সন্তবত। এখানে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে দশ শালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে প্রবর্তিত হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার জন্যে রাজস্ব ঠিক মত আদায় হত না। জমিদারেরা নিজেদের সুখসুবিধার দিকেই কেবল মনোযোগী। তাঁদের মনোযোগ অন্যত্র ছিল না। এইসব বিষয়ে চিন্তা করেই সন্তবত জমিদারদের সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিশ খাজনা আদায়ের এই বন্দোবস্ত করলেন। জমিদারদের দেয় রাজস্ব এর দ্বারা নির্ধারিত হল পাকাপাকি ভাবে। এবং সেই সঙ্গেই এ নিয়মও প্রবর্তিত হল যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারি নীলামে উঠবে। এবং অচিরেই বহু জমিদারি নীলামে উঠতে আরম্ভ করল।

সমাজে ছিল দুটি শ্রেণী—জমিদার ও রায়ত। জমিদারি নীলামে উঠতে উঠতে আর একটি শ্রেণী—তৃতীয় শ্রেণী—ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। এই শ্রেণীর নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জমিদারও নয়, রায়ত নয়, এঁরা চাকরিজীবী। কোম্পানীর দপ্তর-মহলে এবং কুঠিয়ালদের কুঠিতে খাতা লেখার কাজে বহাল হতে লাগলেন এঁরা।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা দেশে এই নতুন সমাজের উৎপত্তি। এই মধ্যবিত্ত সমাজ যখন এদেশের মাটিতে ও জলে হাওয়ায় বেশ বেড়ে উঠেছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম সেই সময়ে—উনিশ শতকের মধ্য ভাগে। এই সময়ের একটা নাম দেওয়া যেতে পারে—ইঙ্গবঙ্গলাই কাল।

বাদশাহী আমলের ঘনিষ্ঠতা ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু তার অংশভূত তখনো দেশ থেকে অপসারিত হয় নি। তখনো মানুষের মনে বাদশাহী স্মৃতি বিরাজ করছে, আচারে-আচরণে বেশভূষায় ভাষায়-ভঙ্গিতে তখনো সেই আমলটি আছেই; তার উপর তখন আর একটি নবীন প্রভাব এসে আধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে সমাজ ও সংস্কৃতি—সে প্রভাব ইংরেজ প্রভাব।

তাঁর জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ-বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, "বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত

করিতেছে, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাকে ছিল চোগা চাপকান কাবা পাগড়ি, এখন হ্যাট কোট ওয়েস্টকোট এবং পেন্টুলন। ভাষায় পূর্বে ফারসী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী।"[১]

দুই রকম দেখার সুযোগ তাঁর ঘটেছে। মোগলাই সভ্যতা ও ইংরেজি সভ্যতার টাগ-অব-ওয়ার চলেছিল প্রবল ভাবেই। অবশেষে জয় হল ইংরেজি সভ্যতারই। এ একটা বিচিত্র কথা নয়, কেননা ইংরেজের হাতেই তখন রাজদণ্ড, তাদের জয়ের পথে সুতরাং কোনো বাধা নেই।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে ইংরেজি আমলের আরম্ভ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরেজরা এ-দেশে পাকাপাকি ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশে ইংরেজি শিক্ষার ও আচরণের ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ প্রথমে আকারে ক্ষুদ্র থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই তরঙ্গ কতটা উত্তাল হয়ে উঠেছিল তার নজির ইতিহাসে আছে।

ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলের উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি।

১৭৮৪ সালে শেরবোর্ন নামে সাহেব একটি স্কুল স্থাপন করেন, নিজের নাম অনুসারে তার নাম দেন শেরবোর্ন সেমিনারি। দ্বারকানাথ ঠাকুর এখানে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ বৎসরই (১৭৮৪) চিৎপুরে মহম্মদ রেজা খাঁর সুরম্য প্রাসাদের নিকট জনৈক সাহেব চিৎপুর বয়েজ বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৯১ সালে কলুটোলার রামময় দত্ত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—রামময় দত্ত স্কুল। আনুমানিক ঐ সময়েই রামনারায়ণ মিত্র নামে অতি-সামান্য ইংরেজি জানা উকিলের কেরানি জোড়াবাগানে এক স্কুল খোলেন। এখানে টমাস ডাইস্ (Thomas Dice)-এর স্পেলিং বুক পড়ানো হত।

১৮০০ সালে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়,—কাসিম নামক সাহেবের দ্বারা কলিকাতা একাডেমি; রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) এখানে প্রথম ইংরেজি ভাষা শেখেন—ইনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জন্ স্টেব্‌ল্ সাহেবের দেওয়ান রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র এবং মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র; অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হয়েও ইনি বিদ্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেন; হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭) বিষয়ে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

দ্বিতীয়, রিড সাহেবের স্কুল স্থাপিত হয় হাটখোলায়, কোম্পানি নিবাসী প্রখ্যাত শিবচন্দ্র দেব এখানে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তৃতীয়, পিট বিবির স্কুল, Mrs. Pitt's School for Young Ladies—প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্যে এই স্কুল স্থাপিত হয়, এবং এ-ধরনের স্কুল এই প্রথম।

এরপর ১৮১০ সালে ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব ধর্মতলায় এক স্কুল খোলেন। ধর্মতলা অ্যাকাডেমি বা ড্রামণ্ড অ্যাকাডেমি উভয় নামেই পরিচিত ছিল। ড্রামণ্ড সাহেব কুঁজো ছিলেন, এই জন্যে একে কুঁজো সাহেবের স্কুলও কেউ কেউ বলত। এই স্কুলে প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ প্রবর্তিত হয়। এই স্কুলটিকে চিরস্মরণীয় করেছেন একজন, তাঁর নাম ডিরোজিও (১৮০১-১৮৩১); এই স্কুলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন তিনি।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি নূতন কালের উদ্ভব হল। বাংলা দেশের সমাজে ও সংস্কৃতিতে এই কলেজের প্রভাব কম নয়। এবং এই প্রভাবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হয়তো একটি মানুষের, তিনি হলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিও।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন,' "ইংরেজি আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা 'সেকাল' এবং তাহার পরের কাল 'একাল'।"

প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকেই বঙ্গদেশে বরচরিত্রে বঙ্গভাষায় ও বঙ্গ সংস্কৃতিতে নূতন যুগের প্রবর্তন ঘটল।

১৮১৭ সাল এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এই বৎসরই জন্মগ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নূতন যুগের প্রথম আলোয় তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন। তাঁর পুত্রকন্যার মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য এই নূতন আলোর প্রভাবে যে মানুষ নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন, তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক নূতনত্বের সন্ধান তাঁর সন্তানেরা লাভ করে থাকবেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লাভ করেছেন। তিনিও নূতন আলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই জন্যেই বুঝি তাঁর চরিত্রেও অনেক নূতনত্বের সন্ধান লাভ করা গিয়েছে।

ডিরোজিও-চরিত্রের বিচার করা এখানে আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেবল এই কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অদ্যাবধি প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির চরিত্রের সম্যক্ বিচার এ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। এই কথা ভেবে

যে, মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে যার মৃত্যু ঘটেছে, সেই মানুষ কি করে একটি দেশের আচার আচরণে একটা উলট পালট ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এবং সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে যাঁর কথা বার বার উল্লেখ করা ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কোন পথ নেই।

ডিরোজিওর সংস্পর্শে এলেও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যেন বিপ্লব দেখা দিল। পুরাতন সংস্কার পরিহার করে নূতন পথে যাত্রা করার জন্যে ব্যগ্রতা দেখা দিল। অন্যান্য দিকে যেমন তাঁরা অগ্রসর হলেন তেমনি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে এবং সুরাপানেও তাঁরা আসক্ত হলেন।

ডিরোজিও লোকান্তরিত হলেন অকালে, কিন্তু তিনি নবযুবকের মনে যে বীজ উপ্ত করে গেলেন, তা ক্রমশ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত-পুষ্পিত হল এবং তাতে ফলও ফলল। হয়তো তার সব কয়টিই সুফল নয়।

ডিরোজিও গত হলেন, কিন্তু উত্তরকালকে প্রভাবান্বিত করার জন্যে রয়ে গেলেন তাঁর ছাত্রদল—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)। এঁরা সকলেই স্বনামধন্য। এঁদের প্রভাবে বঙ্গদেশের উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ বিশেষভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়।

আলোড়ন বা আন্দোলনের তাৎপর্য যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, তাঁরা নিজেদের বাক্তির বিসর্জন দিয়ে ঐ আন্দোলনের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেন। এরকম ঘটনা সে সময়েও ঘটে। তার দীর্ঘ বিবরণ রাজনারায়ণ বসু বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন[১]। সে সময়ে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হয়েছিল যে, মদ ও খানা খাওয়া আলোকপ্রাপ্ত মনের কাজ; এইজন্যে মদ পান ও গো মাংস আহারের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন। ব্যাপারটা ক্রমশ অনেকদূর গড়িয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসু একটি মজার গল্পের উল্লেখ করেছেন। —"একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালীবাবু আহার করিতে গিয়াছেলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীল (Veal) হ্যায়?' খানসামা উত্তর করিল, 'নাহি হ্যায় খোদাওন্দ'।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বীফষ্টিক হ্যায়?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি

নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অক্স্‌টং (Ox tongue) হ্যায়?' খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাফ্‌স্‌-ফুট-জেলি (Calf's Foot Jelly—বাছুরের খুর দ্রব করে প্রস্তুত খাদ্য) হ্যায়? খানসামা উত্তর করিল, 'ও ভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।' বাবু বলিলেন, 'গোরুকা কুচ্‌ হ্যায় নহি?' এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গো-মাংসপ্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে তো খানিকটা গোবর এনে দে-না।'

যখন সমাজে উন্মাদনা এইভাবে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মের সব কিছুই মন্দ—এইরূপ মনোভাব যখন দেশের যুবকদের মনে বদ্ধমূল, সেই এক বিভ্রান্তিকর সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম, এবং বাইরের এই আবহাওয়ার অন্তরালে ঠাকুর-বাড়ির ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হচ্ছে।

এ হল সমাজের এক দিক—পুরুষদের দিক। সমাজের অপর দিকের কথাও এখানে আলোচনীয়। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ আরম্ভ হয় কলেজ স্থাপনের আমল থেকেই, অথচ বিক্ষিপ্তভাবে এ ব্যাপারে সামান্য অগ্রসর হওয়া গেলেও প্রকৃতভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা নানা প্রতিকূলতার জন্য হয়ে ওঠে না, যেটুকু হয় তাও নাম মাত্র। স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জল্পনা-কল্পনা অবশ্য চলতে থাকে।

অবশেষে বীটন সাহেব কর্তৃক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে। বাংলাদেশের পক্ষে এ এক স্মরণীয় বৎসর। এই স্মরণীয় বৎসরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ আন্দোলন সমাজে চলেছে। রক্ষণশীলেরা মেয়েদের এই শিক্ষাদানের যোরতর বিরোধিতা করতে লাগলেন, এবং সমাজ সংস্কারকগণ শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী হোয়ে উঠলেন। এই দুই বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিশুকাল কেটেছে; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এর দ্বারা পিতার বা গুরুর, প্রগতিবাদী মনের পরিচয়ও তিনি লাভ করেন।

সে আমলের সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র কল্পনা করা আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যখন নারীদের শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব বলেই বিবেচিত হত।

নারীদের এই স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে কবি ঈশ্বরচন্দ্রও পদ্য করে লেখেন—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে,
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ;
আর কিছু দিন যাক রে ভাই, পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

সে আমলের কেউ আজ জীবিত নেই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর ভবিষ্যৎবাণী যে সফল হয়েছে তাঁরা তা দেখতে না পেলেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। অথচ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাজের যে কোনো ক্ষতি হয়েছে, মানা যায় না।

পরের একটি অধ্যায়ে যথাস্থানে আমরা দেখতে পাব যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনও প্রথম দিকে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল, অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের প্রভাব তাঁর উপর তখনও কাজ করছিল. এইজন্যে তিনি ব্যঙ্গ করে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটক লিখলেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যে সেই নাটকার স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকে ঘোড়ায় চাপিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরতে পারেন, তা কল্পনা করা যায় না।

কল্পনা করতে অনুধাবন করে এমনি অনেক নূতন কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন, এই জন্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নূতন, এবং অনুজ অনুজাদের নূতনদা। নিত্যই তাঁর মন নূতনের জন্যে ব্যাকুল হত, যা কেউ করেনি এমনি কাজ করার জন্যে লালায়িত ছিলেন তিনি। সেইজন্যে, মনে হয়, তিনি যোগ্য আখ্যাই লাভ করেছেন।

সংসারে তখন নূতন হাওয়া এসেছে। নবযুবকেরা নূতনের বীজ বপনের জন্যে সমাজের ভূমি কর্ষণ করে চলেছেন, সংস্কারপন্থীরা নূতন সমাজগঠনের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এমনি এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ হতে লাগলেন ঠাকুরবাড়ির এই নূতন দা।

চারদিকেই নূতনত্বের সাড়া পড়েছে। সমাজের আমূল সংস্কার সাধনের জন্যে রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সময় থেকেই বিভিন্ন কর্মোদ্যম চলেছে। ধর্মের নামে যেসব গ্লানি সমাজে বিরাজ করছিল সেসব দূর করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টায় কার্পণ্য ছিল না। রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়। তিনি লোকান্তরিত, কিন্তু তাঁর উত্তরসাধক-

হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বিরাজিত। তাঁর প্রভাবও বঙ্গসমাজে ও ঠাকুর পরিবারে বিশেষভাবে বর্তমান।

কিন্তু এখানে আমরা অন্য এক পুরুষসিংহের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) নিজের চরিত্রের বলে ও ব্যক্তিত্বের বলে তিনি বঙ্গসমাজের একজন বরেণ্য নেতারূপে গণ্য হয়েছেন। এই নির্ভীক পুরুষটির প্রতিভায় সে আমলের বঙ্গসমাজ প্রদীপ্ত। বিভিন্ন শুভকর্মের পথ ধরে তাঁর যাত্রা অব্যাহত গতিতে। বলা যায়, তদানীন্তন বঙ্গসমাজ এই পুরুষটির প্রবল আলোড়নে যেন জাগ্রত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

এই সময়ে (১৮৫৬) তিনি আর একটি কাজে নবীন উৎসাহে আত্মনিয়োগ করলেন। এ কাজটি হল বিধবা বিবাহ প্রচলন। যে সমাজে নারীর কোনো ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত নয়, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যে সমাজ উদাসীন, তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজমনে একটা প্রবল বাধা অবশ্যই, কিন্তু তার উপর তাদের দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা সমাজের চোখে ঘোরতর বিভীষিকা ব'লে মনে হয়েছিল। এই জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি হয় নি। প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডনের জন্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করলেন, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্যে এবং বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ চলল।

সমাজের আবহাওয়া তখন উত্তপ্ত। এই তপ্ত ভূমিতে মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন শিশু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এ গেল একটি দিক। এই সঙ্গেই আর-একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে ঘটনা হল সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে আখ্যাত করতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে তা খণ্ডন করার ইচ্ছে আমাদের নেই; কিন্তু এই ঘটনাকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে—এই ঘটনাটি হচ্ছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুত্থান।

প্রথমে কলকাতার উপকণ্ঠ ব্যারাকপুরে এর সূচনা, তার পরেই মীরাট থেকে এর ব্যাপক প্রসার। এবং অচিরেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সেই সময় এইরূপ জনরব উঠেছিল বলে জানা

যায় যে, বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতার দিকে আসছে, কলকাতার সমুদয় ইংরেজকে হত্যা করা ও সহর লুঠন করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য।

সে সময়ের কলকাতাবাসীর মনে এই জনরব কতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল অনুমান করা চলে। প্রতি গৃহে এই ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা চলেছিল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা এই ঘটনায় ও রটনায় যে শঙ্কিত হয়েছিল, তাও অনুমান করার অসুবিধা নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আট নয় বৎসর বয়স্ক বালক। একেবারে শিশু নন তাঁর মনেও এই বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি যে না পৌঁছেছে এমন নয়। বালককালের স্মৃতি উত্তরকালে নবীন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা আলোআঁধারে ঘেরা একটা রহস্যের মত প্রথমে প্রতীয়মান হয়, কালে তা স্পষ্ট দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-গঠনে এই ঘটনাটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতকের এই অংশটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমাজের ও সাহিত্যের দিক্‌করা বহু কাজ ও বিবিধ উদ্যম এই সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। বঙ্গসাহিত্যে গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি এই শতকের গোড়ার দিকে, সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর সাহিত্যের উন্নতিসাধন ঘটেছে বিভিন্ন নবপত্রিকার মাধ্যমে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে, তারপর মাসে দু-একবার বন্ধ হলেও গুপ্ত কবির উৎসাহ বন্ধ হয় না, তিনি পুনরায় তা প্রকাশ করেন। এবং অবশেষে গুপ্ত-কবি সেকালের তরুণ সাহিত্যিকদের স্নেহ কিলজকার অ্যাণ্ড গাইড রূপে অভিহিত হন। গুপ্তকবির শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্য-রূপ সরোবরে রাজহংসরূপে কেলী করার উপযোগী করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এদের নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এখানে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, এই পত্রিকাতে হাত মক্‌সো করার সুযোগ পেয়েই এঁরা বঙ্গসাহিত্যে দান করার জন্যে মুক্তহস্ত হতে পেরেছিলেন। এবং এঁদের সেই দান-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আমাদের আলোচ্য এই সময়ে—উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে। অর্থাৎ যে সময়ে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বালকত্ব অতিক্রম করে যৌবনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলার আছে। বাংলার নূতন গদ্য তাঁর হাতে পড়ে ইতিমধ্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল—এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে—বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবন চরিত, বোধোদয়, শকুন্তলা প্রভৃতি। এর দ্বারা বাংলার গদ্যও একটা বিশিষ্ট চেহারা ধারণ করেছে।

ক্ষেত্র এইভাবে প্রস্তুত হবার পর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিকের যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করি। তাঁরা হচ্ছেন গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কাব্যে মধুসূদন দত্ত। এবং সেই সঙ্গে, বা দু-এক বছর আগে, পাই প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' (১৮৬১)

বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিবেশও তখন নূতনত্ব লাভ করেছে, আবহাওয়াও তখন কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে উপযোগী।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বলেছেন," "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল।"

এই-যে প্রবল আন্দোলন, এর জিয়া মানুষের মনে বিশেষ চেতনা জাগ্রত করার কথা। এবং সে-মানুষ যদি কল্পনাপ্রবণ হয়, এবং কল্পনাকে কাজে লাগানোর মত কেজো মানুষ হয় তাহলে তো কথাই নেই। সমাজে যখন এই আন্দোলন উপস্থিত তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সেই আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠছেন। নিজ হাতে কাজ করার মত শক্তি তখন না হলেও, আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝবার বয়স হয়েছে। তখন তাঁর বয়স বারো।

বঙ্গসাহিত্যের কৃতি সন্তানেরা তখন তাঁদের সাধনা ও সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত,

নবচেতনায় তখন সকলে উদ্বুদ্ধ। মধুসূদন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নাটক প্রহসনে কাব্য-রচনা দ্বারা তিনি নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন—শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য (১৮৬০) পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬৪), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) একে একে প্রকাশিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন,[১] "মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী-কায়দায় ছাঁটা বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সিঁথি। চোখ দুটি বড় বড়, লোচন প্রতিভাদীপ্ত, চেহারা দোহারা, মুখশ্রী লাবণ্য-সমুজ্জ্বল। তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙা-ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙা গলায় সারদা বাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই।"

মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি থেকে যে স্পষ্ট চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন, তা ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হবার আগের। ১৮৬০ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন এক পত্রে[২] লেখেন—"I am so happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গ. I have finished the second and as soon as I can get a copy made, you shall have it…"

সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনাটি ১৮৬০-এর। ঐ সময় তাঁর বয়স এগারো। বালকের মনে ঐ তেজস্বী ও প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের প্রভাব কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, অনুমান করা যেতে পারে।

আর একটি প্রতিভা বঙ্কিম। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বছর দুইয়ের বড়, তিনি লিখছেন[৩], "দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয়

উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে লেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল।"

তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনেও ঐ রচনা যে বিস্ময় উদ্রেক করেছিল এ কথা বলা অসঙ্গীচীন সম্ভবত নয়। কেননা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগ, এই প্রতিভাধর গ্রন্থকারের রচনা তখন সে-বাড়ির বালকদের গোচরেও অবশ্যই এসেছিল।

সাহিত্যে যেমন নবচেতনা এসেছে, সেই সঙ্গে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। যদিও ১৮৭২ সালের পূর্বে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও এর পূর্ববর্তী কালে সখের নাট্যশালা ছিল এবং সেখানে বিশিষ্ট নাটক অভিনীত হত। এর মধ্যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক এখানে অভিনীত হয় (১৮৫৯)। এবং এই নাট্যশালার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্যে যে, এরই মাধ্যমে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

চারদিকের হাওয়াই অনুকূল। এই হাওয়ার মধ্যে বড় হতে হতে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের মনের বাসনা ও কামনা জাগ্রত হতে থাকে, এবং তিনি কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

চতুর্দিকে কর্মের যজ্ঞ প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, এই যজ্ঞের আহুতিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে ব্যাকুলতা জাগে কেবল কাজের মানুষেরই। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে আমরা কাজের মানুষরূপে জেনেছি, এইজন্যে এই যজ্ঞধূমে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে এই যজ্ঞাগ্নির উত্তাপে তিনি নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

১. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'
২. রাজনারায়ণ বসু : 'সেকাল আর একাল'
৩. শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'
৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ঘরোয়া', পরিশিষ্ট

অমিয় চক্রবর্তী

ঘরে-ফেরার দিন

সেখানে সে ভোর-লাগা আকণ্ঠ সবুজ ভরি গ্রামে
সম্পূর্ণ আপন তবু অচেনার বাঁকে
তৃপ্তি-নদী তীরে থাকে ;
বাংলার হাওয়ায় আগমনী
পুজোর আগেই শোনে। কালাংড়া সানাইয়ে তারি ধ্বনি—
আশ্বিনের চুলে তার সুরমালা সোনায় পরানো,
ভ্রূ-রেখায় নত চোখে লাবণ্য করানো,
কারুণ্যে কাজল দৃষ্টিমণি।
অচিন্ত্য অবনী পায়ে অস্তলীন
যে-মুহূর্তে তার কাছে আসি,
ঘরে-ফেরা দিন
দূর দূর কোটি স্তর
দূর দূরান্তর
অসংখ্যের দিন-সংঘে মিলায় দিগন্তে পরবাসী ;
মূর্তি তার অঙ্গ মেখে
পল্লীপথে বুকে জেগে
স্নেহের কম্পিত ছায়া পটে
গঙ্গার ঢেউয়ে আঁকা তটে
এ জন্মের শেষ চাওয়া ঢেউএ ঢেউএ নিয়ে চলে যায়,—
এক বেইনীর নীল সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায়॥

লণ্ডন, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চীনা অনুবাদ : জিৎ

শীতে না কাঁপলে
    রোদ-পোহানো কে বোঝে !
রোদে ফাটা মাটি
    মেঘের করুণা খোঁজে ।
ঘরে তাকে পেলে পথে কি কখনো ঘুরতাম !

বানে না ভাসালে
    কে ছোটে ভুলতে বাঁধ ?
আকালে কেঁদে-ই
    মরাই ভোলায় সাধ ।
সে ভালোবাসলে জিটের বনেদ-ই খুঁড়তাম ।

না পাওয়ার দাগা
দেখালো কিছু না চাইতে ।
চূড়ান্ত হার
জিৎ হ'ল উৎরাইতে !

দিলীপকুমার রায়

বিকাশ

শক্তির অঙ্কুর যদি বুনেছ অন্তরে দীপ্তিময়ী,—
কল তার পাবি যেন অঞ্জলিতে চরণে তোমার।
যত মুখাকাঙ্ক্ষা, মোহ, আস্বাদর বিলাস-প্রণালী
নিষ্কাশিয়া শুভ্র করো আমার এ-মলিন আধার।
কিছুনি চাই মা যদি—শুধু তব বন্দন-বর্তনে
নিশাশ্বিত হোক প্রাণে ছন্দ তার বসন্ত উচ্ছলি';
অশান্তির অবসানে আনন্দময়ীর পদার্পণে
কাঁটাবিব ফুল-অর্ঘ্য হবে মর্ম-মঞ্জুষা প্রোজ্জ্বলি'।
তুমি যবে আছ পাশে—কন্তরও মা হবে শুভঙ্কর;
তুমি যবে ধরো হাত—চ্যুতি হবে আশা-আরোহিনী,
তোমার স্মরণ-ধ্যানে উদ্ভাসিবে নির্লক্ষ্য অন্তর
অকৃতার্থ স্বার্থরতি-ছায়াম্লান জড়িমা-যামিনী।
অসাড়-স্পন্দন যদি হয় আজ বিরহ-কম্পন:
তারও প্রতি উচ্ছ্বাসে মা শুনিব তোমার পদার্পণ।

প্রতিষ্ঠা

উচ্ছলিবে সে-উল্লাসে কত গীতি কনক-কাকলী!
রঞ্জিবে মা হেমপ্রভা প্রীতি অঙ্ক-বিবর্ণ বাধায়!
অন্তরের ইন্দীবর মুঞ্জরিয়া করিবে বন্দনা
আরতি-নৈবেদ্য-ধূপ-শঙ্খ-গন্ধ-মঞ্জুলা-মালায়!
উৎসাহ-উৎসবে বিচ্ছুরিবে প্রতি পলে ধ্যানোদ্ভবা
অমেয়া আলোকময়!—অঙ্গ ঢেউয়ে তরঙ্গ-কল্লোল!
চির-নৈবন্দিনে হবে ছন্দোময়ী চির পুনর্নবা!
অকায়া মন্ত্রমূর্তিকা মা হবে তোরই বাঙ্ময়ী-হিল্লোল।

উত্তরসূরী

ধূলিকুঞ্জ অসমাপ্তি মণি-ধন্য হবে ও-পরশে ;
চিত্তপীঠে পূর্ণতার বিত্ত পাবে দীপ্ত অধিষ্ঠান ;
গ্লানি রিপু নির্বাসিত হবে গ্লানিহীন শুদ্ধিরসে ;
প্রেমের স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু হবে সূর্য্যসিন্ধু অনির্বাণ :
সে আদিত্য-নিত্যালোকে তোর করুণার রাজধানী
ঝলমল করিবে মা সুধা-অঙ্গীকার ধর শুনি' ।

পণ্ডিচেরি ২১. ১০. ৩৬

মণীশ ঘটক

আমি যেন প্রত্যহ প্রত্যূষ

অতীতে করিনা শ্রদ্ধা, ভবিষ্যৎ স্তব্ধ যবনিকা ।
রাত নেই দিন নেই, আমি যেন প্রত্যহ প্রত্যূষ ।
প্রতি মুহূর্তেই নবজন্ম লভি । নিশ্চিত মৃত্যুর
ভয়াল ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে মোর অন্ধ অহমিকা ।

ক্ষণপ্রভ পতঙ্গের মত আমি স্বয়ম্ভূ, প্রোজ্জ্বল ।
পশ্চাতে ফেলিয়া আসি অপরিচয়ের অন্ধকার,
অপ্রমেয় প্রাণশক্তি যাত্রা মোর করে যে দুর্বার,
স্বল্পায়ুর অভিশাপ নেত্রে আঁকে বহ্নির কজ্জল ।

ক্ষণস্থায়ী অগ্ন্যুৎসব ! তার পর বিলুপ্তির চিতা !
খ-খুপের মত ঊর্দ্ধে অসীমের করি পরিক্রমা,
উৎসবের ফুলঝুরি বর্ষি' পৃথ্বী করি শুভ্রতমা,
সহসা নিভিয়া আসি, লাস্যলীলা হয় অস্তমিতা ।

প্রত্যহের মহোৎসবে নিত্যযাত্রা নিয়তির লিখা,
অমিত প্রত্যয় বক্ষে, ললাটে মৃত্যুর জয়টিকা ॥

বিষ্ণু দে

প্রেমকে তৃতীয়কে

প্রেমের স্বতন্ত্র সত্তা, কে জানত, যে এমন যন্ত্রণা !
এ যন্ত্রণা কতকাল হবে বলো, প্রেয়সী, সইতে ?
মাথা পেতে নেব তুমি যা দেবে গঞ্জনা,
যদি না ইচ্ছাই হয় নাই এলে আমার অদ্বৈতে,
তৃতীয়কে করো তুমি পরিহার, ও উপরি বাঞ্ছনা

অসহনীয় যে সখী আমাদের কাব্যের যমকে :
উভয়েরই বন্ধু প্রেম আমাদের মাঝে কথা কইতে
থাকে কেন ত্রিনয়নে খেয়ালের নানান দমকে ?
মিলাও প্রেমকে প্রিয়া তোমার আমার এক দ্বৈতে,
কল্পঝঙ্কারে তাকে বলে আনো ঘনিষ্ঠ ধমকে ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সন্ধান

কোনো শুভ্রতাকে যেন চেয়েছিল মন।
পাহাড়-মেঘের রৌদ্রোজ্জ্বল আলিঙ্গন
মুগ্ধ করে গেছে কবে, তা-ই।
চোখের আলোতে যেন আলো করে পাই।
এ শুভ্রতা বিশাল আত্মার,
নক্ষত্রের গাঢ় অন্ধকার
জ্যোতির্ময় করে অনায়াসে।
তার নীরবতা নেমে আসে
জ্যোৎস্নার মতন
জীবনের সব আয়োজন
শুধু তাকে পাবে বলে বুঝি।
হৃদয়ের অন্ধকারে খুঁজি, তাকে খুঁজি॥

নিঃসময়ে

মেঘ, সন্ধ্যা আর আমি আকাশের নীচে।
দিনের সকল আলো মিছে
মনে হয়, মনে হয় সত্য অন্ধকার।
আমি যেন ভ্রূণে ফিরে গিয়েছি আবার
সময়ের দাগ মুছে ফেলে।
এ সময় নিঃসময়, তার কোলে এলে
জন্মমৃত্যু নেই।
আমি আকাশেই
একটি ধূসর রেখা, এই পৃথিবীর
ফুরিয়েছে লেনদেন, দূরে গেছে ভীড়॥

মুক্তি

আমার হৃদয়ে রাত্রি, অন্ধকারে তার
নক্ষত্রের আলোহীন দুঃসহ আঁধার,
তবু শুধু ভাবি,
আত্মার উজ্জ্বল তীব্র দাবী
একদিন আনবে প্রভাত।
এ কলঙ্কী হাত
সদ্যোজাত পবিত্র আবেগে
পৃথিবীর হাত নেবে বুঝি ভালোবেসে।
আমার হৃদয়ে রাত্রি কাঁপে
যেন সেই আত্মার উত্তাপে॥

স্মরণে

যখন হৃদয়ে জাগে মৃত দলে দলে :
মৃত ভালোবাসা, মৃত স্বপ্ন, মৃত কাল,
নিরর্থ কলরোল
মনে হয় জীবন জঞ্জাল।
রাত্রিময় মৃত্যু দেয় তারা,
দিনেও থাকে না আর শান্তির ইশারা,
হৃদয়ের কবরে কেবল
জল ঝরে, চোখ ফেটে জল।

ছেলে-ভুলানো ছড়ায় বিবাহ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

পারিবারিক জীবনের প্রধানতম বিষয়ই বিবাহ, বিবাহের ভিত্তিতেই পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নিরূপিত হইয়া থাকে ; সেইজন্য এই শ্রেণীর ছড়ায় যথো বিবাহ বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। নানা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ বাস্তব এবং রূপক চিত্রের সহায়তায় বিবাহ বিষয়টি নানাভাবে এই শ্রেণীর ছড়ায় বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুলিকেও যদি কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়, তবে ইহাদের প্রথম বিভাগটির নামকরণ করা যায়, অধিবাস। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সংগৃহিত এই ছড়াটির আরও কতকগুলি বিভিন্ন পাঠ আরও অনেকজন সংগ্রাহক বাংলার নানা অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এই সবগুলি পাঠই একটি শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইহাদের একত্র এই নামকরণ করিতে পারা যায় ; কারণ প্রত্যেকটি ছড়াতেই আজ অধিবাস এবং আগামীকল্য বিবাহের দিন ধার্য্য আছে শুনিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণীর ছড়ার যথো রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহিত ছড়া ছইটিই যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নহে, তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন পাঠ পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় ইহার প্রাচীনতম পাঠটি মধ্যযুগ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ সেই ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রাচীনত্বের লক্ষণ নির্দেশ করি,—

খুদু বলো খুদু বলো চাল পিটুলি খেয়ে।
আজ খুদুর অধিবাস কাল খুদুর বিয়ে।
খুদুকে নিয়ে গেলুম বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকের বাড়ি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ নাচেরে কাঁকাল বাঁকাইয়ে।
আলোচাল খেজে দেব টোপর তরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হোল কাট।
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট।

ছেলে-ভুলানো ছড়ায় বিবাহ

ত্রিবেণীর ঘাটেরে ঝুর্ ঝুর্ বালি।
সোনামুখে হোম লেগেছে তুলে ধর ডালি॥
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেবেছে।
হাতীর গলায় জোর ঘণ্টা বাজ্‌তে লেগেছে॥

—বর্ধমান

সকল দেশেরই ছড়ার জন্ম-পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মূলতঃ ছড়াগুলি প্রথম রচিত হইত ; তারপর ক্রমে নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর চরিত্রই পশুপক্ষীর চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই সূত্রেই এই ছড়াটির মধ্যে ঘুঘুর বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—তাহাই প্রাচীনত্বের দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত এই শ্রেণীর ছড়াগুলির দুইটির পাঠে তাহার পরিবর্তে একটিতে যে যমুনা ও আর একটিতে যে দুর্গা নামক বালিকার নাম পাওয়া যাইতেছে, (পরে দ্রষ্টব্য) তাহা পরবর্তী যোজনা মাত্র। 'ভিনকন্যা' শ্রেণীর ছড়াগুলির মধ্যেও এই কথাই প্রমাণিত হইবে। কারণ, পশুপক্ষীর আচরণই শিশুমনে কৌতূহল ও কৌতুকরসের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ বিবাহের ব্যাপারটি কন্যার পরিবারের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার নহে ; শিশুমনে স্বভাবতঃই তাহাতে বেদনার সঞ্চার হইয়া থাকে ; কারণ, ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের একজনকে পরের ঘরে চলিয়া যাইতে হয়, ছড়া আবৃত্তিকারিণী বালিকা সেই মুহূর্তে নিজে শ্বশুর গৃহে যাত্রা না করিলেও একদিন সে নিজেও যাত্রা করিবে, এই অপ্রিয় সম্ভাবনা সে ভুলিয়া থাকিতে চাহে। সেইজন্য নিজেদের একজনের নাম করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই এই ছড়া বলিতে পারে না। তাহার পরিবর্তে একটি পাখীর নাম তাহাতে জুড়িয়া দেয়, এই মনোভাবকে ইংরাজীতে euphemism বলা হয়, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহাই সমর্থিত। সেইজন্য দুর্গার পরিবর্তে এই ছড়ায় নায়িকা ঘুঘু হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই বিষয়ক যে ছড়াগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই নায়িকা ঘুঘু।

পূর্ব বাংলা প্রধানতঃ ঢাকা, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে ঘুঘুকে চুপী বলিয়া উল্লেখ করা হয় ; সেখানে ঘুঘু শব্দটি অপরিচিত। মৈমনসিং হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে সেইজন্যই ঘুঘুর পরিবর্তে চুপী শব্দটি শুনিতে

পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইবে যে, নামটি এখানে পল্লীর হইলেও আচরণটি একটি সদ্যবিবাহিতা বালিকার—

কড়িয়াডা কলকলয়া গাছের আগে বেইয়া।
চুপীটা মাথা কুটে চিনা ক্ষেতে বইয়া॥
আইজ চুপীর লেডালেডা কাইল চুপীর বিয়া।
চুপীরে যে লইয়া যাইবে ভেরন তলা দিয়া॥
ভেরনের ফুল ফুটাছে ডাল্লা ডাল্লা আইয়া।
চেপী ছেঁড়ী চাইয়া কান্দে লোরাবীর ঘরো যইয়া॥

—বৈষনসিং

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সংগ্রহে ঘুঘুর নামটি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং সেইস্থলে প্রত্যক্ষভাবেই একটি বালিকার নাম গৃহীত হইয়াছে। ছড়ার পরিবর্তনের ধারা যে কোনদিক দিয়া কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এখানে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে।
কাজিফুল কুড়তে গেলুম মালা
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম সীতারামের খেলা॥
নাচোতো সীতারাম কাঁকন বেজিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাট।
যেখায় তো জল নেই ত্রিপুনির ঘাট।
ত্রিপুনির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওর ফুল দিয়ে।
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুপুর বেলা॥

—রবীন্দ্রসংগ্রহ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে জীবনধর্মিতা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, ইহা যেন ছড়ার রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া উপন্যাসের রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥

ছেলে-ভুলানো ছড়ার বিবাহ

মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাঠি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে।
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজায়ে।
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজায়ে।
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের ধারে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন 'বাদীখাকী' বলে

—মলীন্দ্রসংগ্রহ

ইহাতে যে সুর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বেদনার সুর; ইহা নবপরিণয় শিশুর অর্থহীন আনন্দের সুর নহে। সুতরাং গঠনের দিক দিয়া ইহা ছড়া হইলেও বক্তব্য বিষয়টি ইহার স্বতন্ত্র—পারিবারিক জীবনের একটি নিতান্ত বেদনার চিত্র বাস্তবরস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বেদনার্ত হইলেও ইহা জীবনরসে সঞ্জীবিত। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ছড়াটির একান্ত বাস্তবধর্মিতাই ইহার ভিতর হইতে অপ্রত্যক্ষ সকল চিত্রকেই দূর করিয়া দিয়াছে, সেই সূত্রেই ঘুঘু ইহা হইতে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে একটি অশ্রুমুখী বালিকা আসিয়া ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, পারিবারিক জীবনাশ্রিত ছড়াগুলি ছড়া হইয়াও আরও বেশী কিছু। এই ছড়াগুলিই আগমনী বিজয়াগানের জননী। তারপর :

যমুনাবতী সরস্বতী কাইল যমুনার বিয়া,
যমুনারে লইয়া যাইব দিগ্‌নগর দিয়া।
দিগ্‌নগরের মাইয়াগুলো লাইতে লাগিছে,
চিকন্ চিকন্ চুলগুলো ঝাড়তে লাগিছে,
গলায় ভাগো সন্ধ্যামালা রক্ত ফুটিছে,
হাতে ভাগো আর (সেব) শাঁখা যাপ (সেব) করিছে।
পরনে ভাগো ডুইরা শাড়ী উড়তে লাগিছে,
কে দেখিছে, কে দেখিছে, দাদা দেখিছে,
দাদার হাতের বান্দু বন্দুক ছুইড়া মারিছে,
উহু দাদা, উহু দাদা বড্ড লাগিছে।

—ময়মনসিংহ

আজ ময়নার খেলাধূলা কাল ময়নার বিয়া,
ময়নারে যে লইয়া যাইব ঢোলক বাজাইয়া।
ময়না যাইব শ্বশুর বাড়ী সঙ্গে যাইবে কে ?
ঘরে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।

—ঢাকা

যমুনাই এখানে ময়না হইয়াছেন। আজ ময়নার অধিবাসের দিনটির উপর আগামী কল্য তাহার বিবাহের দিনের বেদনার ছায়াটি আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, ঐ কথাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে সঙ্গিনীহীন করিয়া—দিঙ্‌নগরের পথ দিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইবে। এমন কি সে যে চলিয়া যাইবে, তাহাও নহে—তাহাকে লইয়া যাইবে। এখানেই বালিকার অসহায়তার ভাবটি ফুটিয়া চিত্রটিকে আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই কথাটির বেদনা ভুলিবার জন্যই হোক কিংবা উপস্থিত অশ্রুধারা রোধ করিবার জন্যই হোক, পরবর্তী পদ কয়টির পরস্পর অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইহার সঙ্গে আনিয়া যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অসহায়ের সান্ত্বনা, অবাঞ্ছিত ঘটনাকে ভুলিয়া থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। ঢাকের বাদ্যে সানাইয়ের সুর ঢাকা পড়ে না ; বারবার বুক-ফাটা ক্রন্দন হাহাকার করিয়া উঠে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা কবিতার রূপান্তর সুস্পষ্ট। ক্রমশই ধীরে ধীরে কিন্তু একরূপ অনিবার্য্য ভাবেই নতুন সংকেত, নতুন ব্যঞ্জনার প্রতিফলন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অনুভব করা যায়। সহজেই বোধগম্য হয়তো নয়, কিন্তু ভাবনায় ও ভঙ্গিতে ক্রমশই নতুনতর এবং ভিন্নতর অভিব্যক্তির নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। পদবিন্যাসে সতর্কতা, চিত্রকল্পে নবত্ব এবং শব্দযোজনায় মোহ-প্রবণতা—বাংলা কবিতার এই লক্ষণগুলো অনায়াসেই চিনতে পারা যায়।

পনর বছর আগেও বাংলা কবিতায় একটা অস্থির ভাব ছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরের কয়েকটি বছর নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সমপ্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে অনিশ্চয়তার তীক্ষ্ণতা আত্মপ্রকাশ করে। তখন পর্য্যন্ত কবিদের পক্ষে যেন আত্মস্থ হবার, সার্থক গ্রহণ ও সার্থক বর্জনে সাফল্য লাভ করবার, সুযোগ ছিল না; যদিও এই সময়কার কবিতায় দেশপ্রেমের অভাব ছিল না, সমাজচিন্তার অভাব ছিল না; বরং বলা যায়, আন্তরিক উদ্যোগে আবেগনে, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিতে কোথাও আন্তরিকতার অনটন না থাকাই সম্ভব। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের দিকে যাত্রা বাংলা কবিতায় পরিবর্তনের কাল। স্পষ্টতই এই পরিবর্তনের একটি লক্ষণ, সমাজচেতনার অত্যধিক তীব্রতার হাত থেকে মুক্তি, অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আড়ালে নিষ্ক্রিয়তার হাতে শান্ত সমর্পণ। পঞ্চাশের প্রায় মাঝামাঝি থেকে আজ পর্য্যন্ত তরুণতর কবিদের কবিতায় এই শান্ত সমর্পণ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

কিন্তু কোনো কবিকেই, বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায়, নিছক দশকের পরিসরে চিহ্নিত করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। প্রতি দশকেই একজন সর্বগুণ-সম্পন্ন কবি আত্মপ্রকাশ করবেন কিংবা একদল নতুন কবি নতুন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরূপের প্রতিষ্ঠা করবেন এরকম প্রত্যাশাই বাতুলতা। একজন কবির সাধারণত অনেকটা বিস্তৃত সময় লেগে যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আবেগে, বেদনায়, ব্যর্থতায়, পুনর্জন্মের যন্ত্রণায় শক্তিমান কবিমাত্রেই শাণিত হন এবং দীর্ঘকালের চর্চায় ও অভিজ্ঞতায়

সচেতন শিল্পচিন্তার প্রবর্তনায় ধীরে ধীরে তাঁর কবি-স্বভাব ক্রমশ পরিণত উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এবং তখনই সম্ভব হয় এক একটি আশ্চর্য কবিতা, অভিজ্ঞতায় ও আবেদনে যা চিরস্থায়ী। সাধারণত একজন কবি যে যুগে কাব্যরচনা শুরু করেন সেই যুগ বা দশক দিয়েই তাকে চিহ্নিত করবার রেওয়াজ দেখা যায়। কিন্তু কে না জানে কবি যদি মোটামুটি দীর্ঘজীবী হন এবং বিবেকসম্মত ভাবে সক্রিয় থাকেন তাহলে দুই তিন এমন কি চার দশকের সুবিস্তৃত ব্যবধানের মধ্যেই কাব্যজীবনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায় কিংবা স্তরকে অতিক্রম করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তিরিশের কবি হয়েও জীবনানন্দ দাশ চল্লিশ এবং অংশত পঞ্চাশ দশকেরও অন্যতম প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি এবং তিন দশকের নিরবচ্ছিন্ন সাধারণ পটভূমিকায়ই সমপ্রভাবে তাঁর শিল্পচেতনা এবং কবিত্বশক্তি সার্থক।

প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতাসম্পন্ন কবিমাত্রেই সর্বদা কাব্যলব্ধ অভিজ্ঞতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হচ্ছেন; কোনো একটি বিশেষ সময়ে বা স্তরে সেই কবির কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র, কিন্তু সেইটেই কোন কবির একমাত্র পরিচয় বলে প্রচার করলে ভুল করা হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশের যুগে 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সুভাষের কাব্য-জীবনে সেটা একটি পর্যায় বা স্তর মাত্র। পরবর্তীকালে নতুন সুর পাওয়া গেল 'যিহিদের যুথ' কবিতায় এবং এই তো সেদিন পঞ্চাশের যুগে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' কবিতায় উচ্চারিত হলো নতুন ধ্বনি, প্রকাশ পেল নবতর ব্যঞ্জনা। সুভাষের সমগ্র কাব্য-জীবনের উপর উভয় দশকের প্রভাবই লক্ষ্যণীয়। তাই সুভাষকে মূলত চল্লিশ দশকের কবিরূপে চিহ্নিত করলেও তাঁর কাব্যসাধনার একটি বৃহৎ অংশ পঞ্চাশ-ষাট দশক পর্যন্ত বিস্তৃত।

গত দশ বছর ধরে বাংলা কবিতা যে পরিবর্তনের সূচনা করছে এখনকার দিনের কোনো বিশেষ দল বা কবিগোষ্ঠীর আচরণের মধ্যেই তার অঙ্কুর খুঁজতে যাওয়া হাস্যকর এবং যে ব্যক্তি আধুনিক কবিতার কোনো একটি ভঙ্গি বা বাকচাতুর্যকেই উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণ রূপে গ্রহণ করবেন তিনি নিঃসন্দেহেই ভ্রান্ত। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট কবিতা কি বস্তু যদিও সচরাচর তার ব্যাখ্যা অল্প কথায় সম্ভবপর নয় তথাপি যুগ-যুগান্তরিত কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই যে প্রকৃষ্ট

কবিতা সম্পর্কে একটি ধারণা সত্তরদশক লেকথা কোলরিজ তাঁর সমসাময়িক কালে ঘোষণা করলেও অদ্যাবধি সে-উক্তির গুরুত্ব ম্লান পায়নি। কবিতাকে একদা মিলটন অভিহিত করেছিলেন 'A flow of the soul' বলে'। ওয়ার্ডস্বার্থ তার যুগে বললেন : 'emotions recollected in tranquility : ভিক্টোরীয় যুগে আর্নল্ডের ভাষায় a criticism of life : কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কালে টি. এস এলিয়ট মন্তব্য করলেন : 'কবিতাকে শুধু দুর্ভোগের মধ্যেই পাওয়া যাবে না, পরন্তু কাব্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে একমাত্র দুর্ভোগের মধ্যে থেকেই।' "Poetry not only must be found only in suffering but can find its materials only in suffering." এলিয়ট আরো একটি কথা বললেন সেটিও উল্লেখ্য : কবিকে একই সঙ্গে কদর্যতা ও সৌন্দর্যের রূপকে উপলব্ধি করতে হবে, পঙ্কিলতা, ভয়াবহতা এবং উচ্ছলতা সবই তার দৃষ্টিপথে থাকা দরকার।' তাঁর প্রথম গদ্য সমালোচনা গ্রন্থ, The Sacred Wood-এ এক জায়গায় লিখছেন : "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things." তাই এলিয়টের কবিতায় সেই চিরাচরিত আবেগ নেই কাব্যপাঠক যে-ধরণের আবেগের অনুভবে দীর্ঘকালের কাব্যপাঠের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত এবং পাঠকও আন্তরিকভাবেই অনুভব করেন যে ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীটস্ কি টেনিসনকে আবেগের যে সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করে এসেছি এলিয়টের কাব্য-বিচারে তা একেবারেই অচল। কিন্তু আধুনিক কাব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এখানেই থেমে নেই। কেমব্রিজ বুক অব ইংলিশ ভার্স (মেজাজে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইয়েটস্-সম্পাদিত অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স-এর সঙ্গে পার্থক্য বিস্তর) সম্পাদনাকালে মাইকেল রবার্টস তাঁর সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় লিখলেন : "Poetry may be intended to amuse, or to ridicule, or to produce an effect which we feel to be more valuable than amusement and different from instruction; but primarily poetry is an exploration of the possibilities of language." অর্থাৎ, রবার্টসের বিবেচনায় ঝোঁকটা মূলত ভাষাগত অন্বেষণের।

উপরের দুটি অনুচ্ছেদে কবিতায় প্রকৃতি প্রসঙ্গে যাঁদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা

হলো তাঁরা সবাই প্রধানত কবি। সুতরাং কবিদের মধ্যে কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মতামতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা যে অনেক সময় দুরূহ ব্যাপার তার সন্নিবেশিত এই মন্তব্যগুলো থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে বোধ হয় সকল কবি-সমালোচকই একমত : কবি-মাত্রেই মানব-অভিজ্ঞতার লিপিকার এবং এই অভিজ্ঞতা সাধারণত বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে এবং একটি স্থিরীকৃত কাব্যদর্শনের পটভূমিকায় এই অলোকসামান্য অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর ক'রে তোলে।

২

আধুনিক বাংলা কবিতার গত দশ বছরের ইতিহাসে আশা করবার মতো, আনন্দিত হবার মতো অনেক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে এমন্তা হৃদয়ঙ্গম করবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সাম্প্রতিক কবিতার সীমাবদ্ধতাও কাব্যপাঠকের নজরে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও ক্রমপরিবর্তনশীল এই দশকের বাংলা কবিতায় জীবনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তরুণতর কবিদের উদ্যম ছাড়াও তিরিশের এবং চল্লিশের কয়েকজন কবিও এখন পর্যন্ত বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল। একদিকে অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র মতো প্রবীণ কবির নতুন রচনায় যেমন আকৃষ্ট হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই চল্লিশের যুগের কবিগোষ্টির কয়েকজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, রাম বসু এবং আরো কয়েকজন তাঁদের নব-নব রচনায় ঐশ্বর্যে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করছেন। পক্ষান্তরে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, শোভন সোম, মানস রায় চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো বেশ কিছু সংখ্যক অতি তরুণ কবি সমগ্রভাবে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রত্যক্ষবান ঐতিহ্যের পটভূমিকায় নিজেদের মেলাতে পেরেছেন বলতে পারা যায়। এই তরুণ কবিদের কেউই এখন পর্যন্ত কাব্যরচনার জগতে এমন কোনো সামগ্রিক একক সাফল্য অর্জন করেন নি অন্যদের তুলনায় যাকে উচ্চ পর্যায়ের বলা যেতে পারে। কিন্তু এঁরা সকলেই বিভিন্ন দিক থেকে কাব্য-অবয়বের পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট। কেউ বিষয়ে, কেউ ভঙ্গিতে, কেউ বা অন্তর্নিহিত দার্শনিক ব্যাখ্যায় নতুন কোনো বক্তব্য উপস্থিত করবার চেষ্টায় আছেন। সব চেয়ে

উল্লেখ্য দু'চার জন ছাড়া তরুণতর কবিদের প্রায় সকলেই ফিরে গিয়েছেন সেই ছন্দ-মিলের জগতে আধুনিক বাংলা কবিতার সব চেয়ে সমৃদ্ধ অংশ যেখানে উজ্জ্বল শোভায় ও বর্ণবহিমায় দ্যুতিমান। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে অরুণ মিত্র এবং সুকান্ত মুখোপাধ্যায় বোধ হয় ব্যতিক্রম। ছন্দে ও মিলে ঈর্ষাযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও গদ্যকাব্যের জগতেই এঁরা অন্তত সম্প্রতি নতুন পর্যায়ের কবি-কল্পনার যোগ্যতর অভিব্যক্তির গূঢ়তর অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত আছেন।

কিন্তু অন্যান্য কবিদের, বলতে গেলে, ছন্দ মিলের জগতেই পদচারণা অব্যাহত। বিষয়ে, বর্ণনায়, উপলব্ধিতে আধুনিক সমস্ত কবিতাই এক ধরণের নয়, কিন্তু কাব্যচেতনাকে সবাই ছন্দে মিলে লালন করছেন। এইদিক থেকে মনে হবে একালের কবিতা অন্তত অন্তঃসঞ্চার বাংলা কবিতার দীর্ঘকালের প্রবহমান ঐতিহ্যের অনুগামী হালফাসানের বায়ুতাড়িত বস্ত্রপিণ্ড মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গলা ফুলিয়ে আজগুবি হবার' সাধনায় আধুনিককালের কবিতার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত এ অভিযোগ আধুনিক কাব্য সম্পর্কে সমগ্র-ভাবে প্রযোজ্য নয়। গত দশকের বাংলা কবিতাও এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য।

গত কয়েক বছরের বাংলা কবিতার বক্তব্য এবং বহিরঙ্গ এই উভয় দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যনীয়। কাব্যরচনায় সর্বতোমুখী উদ্যোগের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং চতুর্দশপদী, গীতি কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, কাহিনীকাব্য, কাব্যনাট্য ইত্যাদি নানা বিষয়েই সাম্প্রতিককালের রচনায় আধুনিক কবির শিল্প-চাতুর্যের কিছু কিছু নমুনা উপস্থিত। এবং যে-পাঠকের মনিচ্ছা আন্তরিক সাম্প্রতিক কবিতায় পরিতৃপ্ত হবার মতো বস্তু তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, প্রায় সর্বদেশে সর্বকালেই পাঠকের শিক্ষা ও রুচির উপর কবিতার আবেদনের বিস্তৃতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে এলিয়ট কাব্যপাঠের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর বিবেচনায় কবিতা আলোচনার অর্থই হ'লো কাব্যপাঠকের অভিজ্ঞতার পরিসরকে

---

১. "The experience of poetry, as it develops in the conscious and mature person, is not merely the sum of the experiences of good poems. Education in poetry requires an organisation of these experiences."

T. S. Eliot : The Use of Poetry & The Use of Criticism.

বিকৃততর কথা এবং একমাত্র কাব্যরসাস্বাদনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভালো কবিতা এবং খারাপ কবিতার পার্থক্য নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব। 'At the first stage we find out what poetry is by reading it and enjoying some of what we read ; at a larger stage our perception of the resemblances and differences between what we read for the first time and what we have already enjoyed itself contributes to our enjoyment ; এবং একজন বিচক্ষণ সমালোচকের এই কথা গুলো মনে রেখেই সাম্প্রতিক কাব্যের আলোচনায় উৎসাহী হওয়া শোভন। কবিতা কী বস্তু তা নিরন্তর কবিতা-পাঠের মধ্য দিয়েই জানা যেতে পারে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ কবিতার গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে কাব্যপাঠকের মনে কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি সহজাত ধারণার সক্রিয়তা অপরিহার্য।

সাম্প্রতিককালের কবিতায় অন্তত দুটি লক্ষণ স্পষ্ট। এক ধরণের কবিতা সুস্থ জীবনবোধের অনুরাগী, জীবনাদর্শ সচেতন শিল্পপ্রত্যয়ে সমৃদ্ধ। কিন্তু আরো এক ধরণের কবিতাও রয়েছে যেক্ষেত্রে কাব্যকলার কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে ; শিল্পের সমগ্রতা যেক্ষেত্রে উপস্থিত কিনা সন্দেহ। এই উভয় শ্রেণীর কবিতাই এখনকার দিনের কাব্যপাঠকের চোখে পড়বে, একটু ব্যাপকভাবেই চোখে পড়া সম্ভব। একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট কবিকৃতির পক্ষে সুস্থ জীবনবোধের অনুসরণেই যথেষ্ট নয়, কাব্যকলার অন্যান্য দিকের অঙ্গীকারও অত্যাবশ্যক ; অন্যদিকে তেমনই একমাত্র শিল্পচাতুর্যই সৎকবিতার অবলম্বন ভেবে নিয়ে কোনো কবির পূর্ণাবয়ব শিল্পসৃষ্টির অধিকার অর্জন করলেন বলা যায় না। এ সম্পর্কে এমনকি আরো অগ্রসর হ'য়ে বলা যায়, এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে, কিন্তু তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেট'-এর রসাস্বাদনের জন্যে কাব্যপাঠককে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, সমগ্রভাবে এলিয়টের কবিকৃতির অনুধাবন কার্যে এই উভয় কাব্যগ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য। বাংলা কবিতায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' অনেক সময়ের ব্যবধানে রচিত এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, এই উভয় কাব্যগ্রন্থের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয়।

এখনকার কবিতায় অত্যাদৃত কাব্যচর্চার নিদর্শন অনেক। কিন্তু তারই

পাশাপাশি ক্রমপরিণতিশীল কবিমনের পরিচয়ও অনেকের রচনায় উপস্থিত। প্রসঙ্গের বিন্যাসে, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, রূপক ও চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্যে অনেক কবিতাই চিত্তগ্রাহী। অগ্রজ কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র প্রভৃতির কবিতা পরিণত বয়সের মানসিক দীপ্তির আলোকে উদ্ভাসিত এবং জীবনদর্শনের দিক থেকে গভীরতাসন্ধানী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক কবিতা যেমন একাকীত্বের বিষণ্ণতায় গভীর তেমনি অরুণ মিত্রের কবিতাও আর সেই পূর্ব যুগের তীব্রকণ্ঠ নয়, ভিন্নতর দিক থেকে তিনিও সম্প্রতি কবিতাকে হৃদয়ের স্থূল আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম ক'রে গভীরে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় সাম্প্রতিককালের চেষ্টাকৃত কারিগরি অনুপস্থিত। বরং বলতে পারা যায়, শব্দবিন্যাসের আপাতরম্যতাকে অতিক্রম ক'রে তাঁর কবিতায় নিরাভরণ বিষণ্ণ সুর কাব্যপাঠকের অন্তর চেতনাকে স্পর্শ করে।

তোমার মুখের ছবি ম্লান, তুমি নির্বাক এমন !
স্বপ্নে দেখি, কেঁদে ওঠে মন।
কোথায় তোমার সেই উজ্জ্বল আলাপ
সত্যি কি ঘষিয় হয়ে গেছ, বলো কার অভিশাপ।
সে কি শুধু প্রত্যাখ্যানে তুমি আর সেই তুমি নও।
কও, কথা কও
মনের অতলে যেন শুনি তার ধ্বনি,
বহ্নিশিখা রমণী
বলো, স্বপ্ন মিছে সব ভুল।
আমার বাগানে আজ প্রতীক্ষিত বসন্তের ফুল [

('আহ্বান')

এবং অন্যত্র অরুণ মিত্রের কবিতায় :

সূর্য-আঁকা দরজাটা হেলে পড়ে,
আমি নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হই।
তুলসীতলায় পিদিম সমুদ্রের হাওয়ায় নিবে আছে
রূপকথা জড়িয়ে লাউমাচার আঁধার
কলোলের কোন্ গহীনে নেমে গেছে।

এক কণ্ঠস্বরের আলো
এই উঠোন থেকে সরু পথ ধরে
আমাকে বহুদূরের বিস্তারে নিয়ে গিয়েছিল।
তখন সন্ধের দোকানবাজার মিটেছে,
লোকজন সওদা নামিয়ে প'ড়ে গেছে,
নানান্ বেসাতি এখানে ওখানে ছায়া হয়ে রইল,
আমি চললাম মোহনায়।
অবশেষে পথ ফুরোল আর আমি বিপুল জনতার
ধ্বনির ভিতরে চোখ বুজলাম।
এই আমার চেনা জায়গা, চেনা সময়,
শান্তির আশিসহাত নিয়ে আকাশ।
আমার মার আঁচলে কত তারা, কত তারা।

(নিশুত : অরুণ মিত্র)

উদ্ধৃত দুটো কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্পষ্ট। দুটি কবিতাই গভীরতাসন্ধানী; কিন্তু অলঙ্কারবাহুল্য বর্জনে সচেষ্ট। পংক্তিবিন্যাসে এমন একটি গভীর শুদ্ধাচারী আবেগ বিধৃত যা পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। মনে হবে, দু' দুটো যুদ্ধের ক্ষত ও আর্তনাদের পর বাংলা কবিতার পাঠকও যেন এই নির্মল, অন্তর্বেগবতী আবেগ সঞ্চারণের প্রতীক্ষায় ছিল এবং এই পরিশুদ্ধ আবেগের অনুরণনেই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি বৃহৎ অংশ এখন পর্যন্ত স্পন্দিত। অরুণ ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, সংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস রায় চৌধুরীর কবিতাবলী প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে, অন্য এক ধরণের কবিতায় কবির সমাজসত্তার সচেতনতা তীক্ষ্ণতরভাবে জিজ্ঞাসীল। খুব উচ্চকণ্ঠ না হয়েও এই ধরণের কবিতা যুগোপযোগী সমাজচিন্তায় সমৃদ্ধ এবং বৃহত্তর আবেদনে বিকীর্ণ; মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখের কবিতায় এই সমাজসচেতন আবেদনের ব্যাপকতা লক্ষ্যনীয়। যুগযন্ত্রণা কখনোই কাব্যের বিষয় হবে না এবং ব্যক্তির চৈতন্য বৃহত্তর সমাজচেতনার লীন হলে চলবে না, কবিসমাজ ও কাব্যপাঠকের একাংশের এই দাবী হাস্যকর। সম্ভবত যুদ্ধকালীন কবিতায় আপৎকালীন ক্ষতচিহ্নের

প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এখনকার দিনের কবিতায় তীব্র অন্তর্মুখীনতার বিস্তৃতি। কবিসত্তা ও সমাজসত্তার সার্থক সমীকরণে পঞ্চাশের যুগের অনেক কবিতাই তাৎপর্যময় এবং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গ ও উপকরণে বিশিষ্ট।

আমি মধ্যশতকের দুর্ভাগ্য প্রেমিক। যাকে চাই
যদিও বা পাই তাকে হলফনামার অস্বস্তি কেবল
মনে লেগে থাকে। শুধু তীব্র ক্লান্তি, স্নায়ুর লড়াই
দুঃস্বপ্নের হিজিবিজি। এখানে যে অমর মহল
মেলেনা এখনো। তাই প্রেম আজো অন্ধকারে-ডোবা
অন্যোন্যাক্ষরের লিপি : ভাবা তার অপঠিত, বোবা॥

('ভাবা তার বোবা' : মণীন্দ্র রায়)

এবং মুখের ভাষার অনুবর্তী এই কাব্যভাষায় সমকালীন জীবনবোধের দীপ্তি উন্মোচিত। সমাজ সত্তার এই পরিণত বিকাশ কাব্যরূপে লিখিত হয়েছে।

অথচ হাজার পাতা ঝ'রেও যেহেতু
থেকে যায় কয়েকটি মুকুল,
অন্নের মাটিতে তাই বারেবারে ফিরে আসে বীজ।
আমি তার কেন্দ্রে বসে দেখেছি কী করে
আলোকে সে মাথা তোলে, অন্ধকারে মূল।

(আগুন নিয়ে খেলা : মণীন্দ্র রায়)

এখন পৃথিবী লাল কংক্রীটে বৃষ্টি নিয়ে শরীরের রক্ত আর পুঁজ
ক্ষয়ের যন্ত্রণায় অর্ধেক উন্মাদ। তার নষ্ট সন্তানেরা
জননীর হাতে পাখি মেরে খুশি ছিটিয়ে আনন্দ
অনুভব করতে চায়! এখন আকাশ নদী গাছ পাখী ফুল ভয়ঙ্কর
নরকের মুখোমুখী অসহায় শতাব্দীর মত হৃৎপিণ্ডের পিপাসা
ঝুলাতে গলায় ফাঁস দিতে চায়, মৃত্যুর চাকার
নীচে পিষে যেতে চায়।

(মানুষের মুখ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বৃষ্টির জল তোমাকে অবিরল ধুইয়ে দিয়ে গেল
পৃথিবী কাঁদল না একটুও।

বৃষ্টির জল কোন চিহ্ন রাখল না
ছাই হল তোমার ননীর মতো শরীর ;
তোমার চোখের সামনে
মৃত্যুর শীতল চাদর তোমার পরিচিত মুখ
ঢেকে দিল। পৃথিবী কাঁদল না একটুও।

(কৃষ্ণ ধর)

খানিকটা ছায়ার মধ্যে গা ডুবিয়ে গাছের গোড়ায়
ঘুমিয়েছিলাম আমি।
ছাতি-কাটা ভীষণ তেষ্টায় জেগে দেখি
শিকড়ে কালচে ছোপ
বিকেলের স্বর্ণা ছিল নিকটেই। তার
পাড়ে বসে আঁজলা ভরে জল নিতে গিয়ে মনে হল
স্বর্ণাটা রক্তের আগাগোড়া
আকাশের কাছে চলে গেছে
কলসানো মোরোগ ফুল জলের কিনারে।

('আমার ক্ষতের মুখ' : রাম বসু)

সুতরাং যে-সব কবি বা কাব্যপাঠক মনে করেন আধুনিককাব্যে সমাজবোধের উপযোগিতা এখন আর তেমন নেই তাঁদের ধারণা সঙ্গত বলা যায় না। বরং বলা যেতে পারে অন্তর জীবনমুখিতার যথার্থ কাব্যরূপ বর্তমানে অধিক তাৎপর্য রক্ষা করে চলতে পেরেছে। ভাষাব্যবহারে, শব্দের সুচারু বিন্যাসে, চিত্রকল্পে শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। চল্লিশের অন্তত কয়েকজন কবির শিল্পোত্তীর্ণ সুস্থ মানসিকতার সাক্ষ্য পঞ্চাশের দশকে লিখিত তাঁদের কবিতাবলী সাম্প্রতিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অভিজ্ঞতার চিরন্তন উপস্থাপনে নিঃসংশয়ে চিত্তাকর্ষক।

অনায়াসে কেউ-কেউ আবিনের অঘ্রান আভায়
মর হতে পারে। তারা যদি
অটবহ হত, তবে যেত কের স্বর্গরাজ্যে ফিরে
অক্লেশে। কেননা তারা লোভ, মদ, ঘৃণা,
হিংসার উপরে উঠে হতে পারে রোদ্দুরের নদী।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমি তা পারি না।
যদিও যেহেতু আমি দেবব্রত নই, সুতরাং
দীর্ঘকাল আমি এই অন্ধকারে আছি।
মনুষ্যপ্রতিম কিন্তু বিকলাঙ্গ, অগণন মুণ্ডহীন মাছি
যেখানে রক্তের স্রোতে ডুবেছে তিমিরে।
মনে হয় ভুলে গিয়ে মুখ, নাম, পরিচিত বন্ধুদের নাম
আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে।

('তারার তিমিরে' : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এবং উদ্বেগের হাত থেকে, অন্ধকারে মুখ থেকে এ যুগের কবির যেন উদ্ধার নেই; কিংবা খুব সম্ভব অন্ধকারের, উদ্বেগের অধিকতর সমীপবর্তী হয়েই আলোর গোপন, নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে লালন করতে হবে। হুকে বাঁধা কিংবা আরোপিত আশাবাদে এখনকার কবি বোধ হয় উদ্বুদ্ধ নন; বরং কবি আর্ত, বিয়োগান্ত দুঃখের নায়ক এবং দুঃখে সুখে নবজন্মের চেতনায় উন্মুখ।

গত দশ বছরের বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য কি স্মরণীয় পংক্তির অভাব নেই। দীর্ঘ কবিতায় দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে, একালের কবিতায় বৈশিষ্ট্য দেখা না গেলেও অনেক পরিমিত পরিসরে লিখিত সার্থক ছোট-ছোট কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। তির্যক ব্যঞ্জনায়, মুহূর্তের স্মরণযোগ্য উপলব্ধিতে, ভাষা-বিন্যাসের মধ্যতায় এবং প্রকাশভঙ্গির বিচ্ছুরিত লীলায় একালের অনেক কবিতাই স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর। কবিতার বিষয়বস্তুর পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক কবিতা প্রাত্যহিক সংসারের মুখের ভাষা ও বিচিত্র ঘটনাবলীর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ভাষা বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক কবিতা নিপুণ কারিগরির সাক্ষ্য; স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় শব্দ-চয়নে, শব্দ-ঘণ্ডলীর সচেতন ব্যবহারে খুব ভেবে চিন্তে অগ্রসর হবার চেষ্টাই প্রবল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রধান অবলম্বন আবেগ এবং আবেগের কাব্যকলা-সম্মত মৃদু প্রকাশেই কবিতা সংহত। নিচের স্তবকগুলো উদাহরণত উল্লেখ্য :

এখানেও ছিল এক নদী চলচলে
সে নদী কখন এক ডুব দিয়ে
নেমে গেল পাতালে অতলে।

তাই তো এখানে বালি, বালিয়াড়ি, বালির পাহাড়
কোথায় জলের সাড়া !
হাওয়া শুধু করে হাহাকার,
বালির গভীরে নেই কল্পর ইশারা।

(দিনেশ দাস)

একবার আশ্বিনে আসি একবার ফাল্গুনে ফিরে যাই
আসি যাই আসি যাই মানুষের মনে না মেলায়
—একটা ছুরির মুখ বিঁধে আসে সমস্ত জীবনে
সমস্ত জীবন ভরে কৌটায় কৌটায় রক্ত কৌটায় কৌটায় রক্ত
একটা আলায় শুধু ঝি ঝি করে মন

(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

পিতামহ, আমি সেই স্তব্ধের নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি আর চেয়ে দেখছি রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটিও তারা আজ।
মনে হয় আমি এক অবোধ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়।

(নীহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

ভালোবাসা, নিঃশব্দ দু-পায়ে যাও জানালার পাশে, জানালা যেই খোলে
সহসা দু-চোখে কাঁপে কোন দৃশ্য কেন আর্ত ? অর্পিত বিষাদ !
উঠে দাঁড়াতেই ধ্বনি—ভালোবাসা, শোনো মুখ তোলো
আতঙ্কিত আমার দুচোখ দেখো, জ্যোৎস্নার পাহাড় স্তব্ধ
নির্নিমেষ সংহত সুন্দর
প্রেতের মতন হিংস্র কাছে আসে।

(আলোক সরকার)

যুবক নয়, প্রৌঢ়ও না। এমন একটা সময়
প্রেম যখন সতর্ক প্রহরী নয়
দুঃখ আর অভিভূত করেনা মনকে

পুতুল : বাঁকুড়া

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

যুবতীর শরীরে ফুল বা চন্দ্রের উপমা মনে পড়ে না,
তখনও আমরা অপাংক্তেয়। এ ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে।

(অরুণ ভট্টাচার্য)

স্বপ্নে নয়, শিরায় শোণিতে
এসো তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ;
এসো অন্ধ সঙ্কীর্ণ গলিতে
ক্ষুব্ধ বড়ো রাস্তার সংবাদ।

(অরুণকুমার সরকার)

মিছেই মানুষ বেতারে টেলিভিশনে সাংবাদিকের গোলটেবিল বৈঠকে
পরস্পরকে নিন্দা করার উজ্জ্বলতায় নিজের মুখ দেখতে চায় আলো
মিছেই মানুষ নিজের দেশের নিজের দলের গর্ব করে।
আসলে তার পায়ের নিচে কোথাও আর মাটির কোন চিহ্ন নেই
হিমালয়ের চূড়ায় ঊর্ধে নিশান হাতে ওঠার দেশ নেই
দু-ফুট জমি যেখে নিয়ে যেখানে উপনিবেশ গড়া যায়।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

যা কবিতা নয় তাকে বর্জন করতে হবে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক অধ্যায়ে এই বিশ্বাস ব্যাপক। ধর্ম, হিতোপদেশ, আশীর্বাদ, নৈতিক জীবনের পথে উন্নতির ক্ষেত্রে যা একপ্রকার অপরিহার্য কবিতায় যেন তার প্রবেশাধিকার কখনই সমুচিত। অবশ্য ভবিষ্যতের ওপর অটুট বিশ্বাস কিংবা নির্ভরতা রেখেও কিছু কবিতা লেখা হচ্ছে যা প্রগতীধর্মী ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত।

তিনি একটি শিশু তরু রোপন করেছিলেন
বাঁচিয়েছিলেন রোদের হাত থেকে
দিয়েছিলেন জল
পিতার মত পরম স্নেহ, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসা।
একশ' বছর পার হয়েছে তিনি এখন দেখি
দাঁড়িয়ে আছেন ছায়াশীতল বিশাল বনস্পতি
ক্লান্তিহর ব্যঞ্জন হাতে, ফুল ফলের প্রচুর সম্ভার
পিতার মত পরম স্নেহে, মাতার মত নিবিড় ভালোবাসায়।

(শোভন সোম)

কি বেশ দেখালে নিজে মেঘের আড়ালে ব'সে,
নিজে তো দেখলে না তুমি দুহৃদভাবের দোষে ;
শিরায় শিরায় দিলে টান—
চাদর দোলানো মেয়ে অভ্যাসজড়িত সুখী .
যদি কথা ব'লে উঠি যদি গান গেয়ে উঠি,
ক্ষমা করো, স্থির ভগবান ॥

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

এখনকার দিনেও বাংলা কবিতা রোমান্টিক। কিন্তু কেউ যেন উনিশ শতকী ইংরেজি কবিতার লক্ষণগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রোমান্টিকতার চারিত্রলক্ষণ আবিষ্কার করতে না যান ; এখনকার বাংলা কবিতা রোমান্টিক এই কারণে যে প্রসঙ্গে ও উপকরণে তার স্বাধীনতা সীমাহীন এবং সুরের দিকে, নতুন চিত্রকল্প রচনায় তার নতুন ক'রে পক্ষপাত। বন্ধুদের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: 'রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমণ্ডিত রচনা, যার কোনো-কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হ'লেও অনেক অংশই কবিতা নয়, কিন্তু বন্ধুদের কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও পদ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সুপক্ক ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত।' মনে হয় সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের অনেকেও এই দিক থেকেই রোমান্টিক হবার পক্ষপাতী। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে, সাম্প্রতিক কবিদের কোনো নৈতিক দায়িত্বপালনে আগ্রহ নেই। পরিচ্ছন্ন কবিতা লেখার আদর্শে সাম্প্রতিক কবি উদ্বুদ্ধ, এবং সম্ভবত সে-কারণেই প্রচলিত সর্বজনস্বীকৃত মূল্যগুলি সম্পর্কে কোনো-কোনো তরুণতর কবির সুতীব্র অনীহা। অন্ধকার কি অধঃপতন বিষয়ে সাম্প্রতিক কবিদের অনেকেই সামাজিক অর্থে চিন্তিত নন ; আধুনিক কবিতার যেসবের সমীপবর্তী হলেই যদিও কোনো কোনো কবিতায় এই শব্দগুলো স্বাভাবিকভাবে এসেছে তথাপি প্রয়োজনের বাইরেও অনুরূপ শব্দগুলির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়।

৩

চিত্রকল্প নির্মাণে, কোনো কোনো স্থলে উপমা ও প্রতীকের ব্যবহারে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য। এদিক থেকে কোনো সাম্প্রতিক

কবির সার্থকতা চূড়ান্ত স্বীকৃতির উপযোগী না হলেও এই চেষ্টা নতুন বলেই উল্লেখ্য। এমন সময় আসে যখন পুরাতন পদ্ধতিতে উপমা ও রূপকের ব্যবহার বর্জনীয় বিবেচিত হয় এবং নতুন নতুন শব্দ-উপাদানে উপমা-প্রতীকের ব্যঞ্জনার অনিবার্যতা দেখা যায়। এক্ষেত্রেও এলিয়ট দৃষ্টান্ত। 'When the evening is spread out against the sky/Like a patient etherised upon a table ; এই পংক্তি বিন্যাসে অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা অনুভব করেননি এমন কাব্য-পাঠক বিরল। বাংলা কবিতায়ও অনেক সময়, যেমন জীবনানন্দ দাশের কবিতায়, এই অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' কিংবা ঐ একই কবিতায় 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ;' ইত্যাদি পংক্তি চিত্রকল্পের অনন্যতায় সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত একথাও মনে হবে চিত্রকল্পের ব্যবহারে সাম্প্রতিক শক্তিমান কবিদের অনেকেই জীবনানন্দ দাশের শেষ বয়সের কবিতাবলীর কাছে অনেক পরিমাণেই ঋণী। সম্ভবত তিরিশের যুগের আর কোনো কবিই সাম্প্রতিক কবিসমাজকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। ঠাণ্ডা, অন্ধকার, অশ্বত্থ, কুয়াশা, রক্ত, নক্ষত্র, আগুন ইত্যাদি শব্দ জীবনানন্দের কবিতায় যে ব্যঞ্জনা এবং নতুনতর স্বাদ বহন করে এনেছে সাম্প্রতিক কবিদের উচ্ছ্বাসে ও আচরণে তার প্রতিধ্বনি অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়। এখনকার শীতাংশু, অরুণাংশুরা, সোকেন বোস, অনুপম ত্রিবেদী, সুবিনয় মুস্তাফীর উত্তর-পুরুষ এবং যে-কারণেই আমাদের স্মৃতিমন্থনের অন্যতম সহায়।

শব্দাবলীর সাহায্যে চিত্রকল্পের বিস্তার এবং বলা যেতে পারে চিত্রকল্প এক ধরণের শব্দ সংগঠিত ছবি যা আবেগ বা সংরাগে বিকীর্ণ। ইংরাজিতে বলা যাক 'a word-picture charged with emotion or passion.' চিত্রকল্প কবিতার একমাত্র গুণ না হলেও বিশিষ্ট একটি গুণ এবং কাব্য পাঠকের কাছে বিভিন্ন ধরণের চিত্রকল্পের আবেদন যেমন বিভিন্ন প্রকারের তেমনই একটি মাত্র চিত্রকল্প থেকেই কাব্য-পাঠক বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। সিসিল. ডে. লুইস তাঁর 'দি পোয়েটিক ইমেজ' বইটিতে এজরা পাউণ্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous works.' একটি সার্থক চিত্রকল্প নির্মাণ যে সর্বদা সোজা ব্যাপার নয় সে ইঙ্গিত পাউণ্ডের উক্তিতেও

প্রশ্ন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালেও এমন অনেক কবিতা নজরে পড়বে যেখানে চিত্রকল্পের বিন্দুমাত্র ছায়াও অনুসন্ধান করে উদ্ধার করা যাবে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ, যেসব কবিতা চিত্রকল্পবিবর্জিত অনেকসময় সে-কারণেই বর্ণহীন কিংবা বিস্বাদ। কিন্তু তারই পাশাপাশি রয়েছে এমন কিছু কিছু সার্থক ও সুগন্ধবহ কবিতা, উপমা এবং চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে যেগুলো পাঠক মনে গভীর রেখাপাত করে। নীচের স্তবকগুলোতে, যথা—

১. নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো।
নদীর মতো নিটোল, চোখের নাচে কালি। (কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়)
পলাশের শাড়ী পরে রাজেশ্বরী সন্ধ্যা
স্বর্ণচাপা আলোর ভেতর শেপল পাহাড়
হরিয়াল ময়নার ডাক, হরিণের দৃষ্টি, বর্ণার শব্দ হাতীর গন্ধ,
সিংভূম, তোমার কঠোর রূপসী শরীরের বাঁকে শিল্পীর সংযম
শেখর তোলা মযূরের মতো বেদের বনস্থলী। (শ্যাম বসু)
মনে হ'ল অন্ধকার, তারার শরীর নিয়ে,—
নদুপায়ে হরিণীর গতি—
আমার বিবর্ণ মুখে একটুকু সুবর্ণ আশা
ছুঁড়ে দিয়ে পালালো তখনি।
(রবি ঠাকুরের ছবি : অরুণ ভট্টাচার্য)

প্রত্যহ সকাল কাটে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা আহত রাত্রি ঘুম কাটে দাঁতে
বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে একাকীত্ব শোকে
কল্পিত বৃক্ষকে চায় স্মৃতির করাতে। (চিত্ত ঘোষ)
একা অন্ধকার ঘরে পৃথিবীর বুকে বড় দীর্ঘ লম্ব হয়
দুই চক্ষে রক্ত ঝরে, কীটগুলি হানাহানি করে পরস্পর
মগজ আঁচড়ায় আর দু চোখের মণি ছিঁড়ে খায়
রক্তে দৃষ্টি ঢেকে আসে তিরস্কার দীর্ণ কলকব্জায়।
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

সংসার শেয়ালে বন্ধ পাথরের দরজা খুলে যাবে এই চির প্রত্যাশায়
ঘুমহারা রাত্রি ছিল আমার দুপাশে, আমি শরীরের সব অধিকার

সরিয়ে নিয়েছি এই তারকা-অঙ্কিত পথ, অনাবৃত নিশ্চল সুদূর
যৌবনের জঙ্গল ঘুরে অদৃষ্ট ফোয়ারা পাই নিঃস্ব বুকে গন্ধ তারাতুর।

(মানস রায়চৌধুরী)

শান-বাধানো ফুটপাটে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর কাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-সঙ্গমকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে বেহুঁশ প'ড়ে আছে।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ও নদী, রহস্যময় নদী,
অন্ধকারে হারিয়ে যেয়ো না, একটু দাঁড়া ;
এই যে একটু-একটু আলো, এই যে ছায়া ঝিকে ঝিকে,
এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারকাটিকে।

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

হাওয়ার হাতে থাকুক তবে তালি
মেঘের ঝড়। ঝাঁপের ঝাঁপ। ঘুঘুর ঢেউ। কালি...
ঝড়ের ঝাঁপে আকাশ কাঁপে খালি
ডুব্‌লো শেষ সুদূর দেশ মেঘের সিঁড়িচূড়ো
ঝড়া লেগে বিপুল বেগে পাহাড় হ'লো গুঁড়ো
সর্বনেশে যাতন-জাগা ভাঙনে চুর চুর
ভুবন-ভাসা এ ভালো-লাগা ভালোলো একি সুর!

(বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর সুন্দর ছবি প্রস্ফুটিত বলতে পারা যায়। এখনকার কবিতায় প্রতীক কবিতার স্থাপনও উপেক্ষনীয় নয়। কোনো বিশেষ প্রতীকী আন্দোলনের অনুগামী না হয়েও এখনকার দিনের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রতীকী তাৎপর্যে বিন্যস্ত বলতে পারা যায়, যেমন নদী, বৃক্ষ, পিতামহ, দর্পণ, ঘর, অন্ধকার, জানালা, ঈশ্বর, চৌকাঠ, বিস্ত, অপ্রেম, ভগীরথ এবং অনুরূপ নানা শব্দসমষ্টি। কোনো সাম্প্রতিক কবিতাই আদ্যন্ত প্রতীকধর্মী নয়; কিন্তু শব্দের প্রতীকী ব্যবহার কবিতায় দৃষ্টি গোচর যোগ্য।

চার

কবিমাত্রেই স্বকালের পুতুল; স্বাভাবিক নিয়মেই একালের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ইতিহাস, জীবন ও স্বদেশ সম্পর্কে সৎকবির মানসচেতনা উন্মেষ। তার অন্তর্দৃষ্টির পূর্বগগনে নবারুণ আভা এবং পশ্চাৎ দিগন্তে বিলীয়মান কালের শেষদীপ্তি। মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানে বিবেকনির্ভর কবি উভয় তোরণের সঙ্গে নিজের কবিসত্তার নিবিড়তম যোগসূত্রটিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় থাকেন। ফলে, ঐতিহ্যনির্ভর অনেক সুন্দর কবিতা একালের কাব্যপাঠক উপহার পান। বিগতকালের ইতিহাস ও কাব্যকাহিনীর নানা ঘটনা নতুনতর তাৎপর্যে আধুনিক কবিতায় দীপ্যমান হবার সুযোগ পায়। আত্তিতে বিক্ষত, অপ্রেমের অন্ধকারে লাঞ্ছিত কবিহৃদয় প্রাচীন স্মৃতির ঐশ্বর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে একালের প্রতিকূল পরিবেশে ভিন্নতর মুক্তি ও উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হন। মনে হয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণেই এই ধরণের কবি-চেতনার ওপর নির্ভরশীল। নীচের স্তবকগুলো প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> মা, তোমার চোখে বিদ্যুৎ যদি জ্বলে,
> সেই আভা নিয়ে আকীর্ণ হবো তমিস্র নদীজলে।
> আমি তো দেখেছি সেই আভা নিয়ে বেহুলার খেয়া ভাসে,
> ভেঙেচুরে যায় মৃত্যুর পিঞ্জর,
> কালের কুটিল জলের বাসরে আমিও লখিন্দর
> বেহুলা আমার নিয়ে চলে আসো প্রদীপ্ত বিশ্বাসে।
>
> (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

কাকে তুমি চাও ? কোন্ মাকে তুমি ডাকো ? কার গহন অঞ্চলে
ফিরে যেতে চাও তুমি ? বলো,
কে তোমাকে জন্ম দিল প্রেমে ? সর্বনাশী
কোন্ মা তোমাকে দিল সাপ খেলাবার ভাঙা বাঁশী ?
* * * আজ দেখো সুদূর ছায়ায় ধরে মা
গভীর লণ্ঠন জেলে জাহাজের মতো আর্ত আলো ফেলে কিনা
তোমার নিহত শব খুঁজে খুঁজে, তোমাকে মা ডাকে নাকি,
ফিরে ডাকে প্রাচীন নিখিলে ? (শঙ্খ ঘোষ)

এবং জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে থেকে শুরু ক'রে মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, শিবশেখর সেন পর্যন্ত কবিরা বাংলা দেশ সম্পর্কিত কবিতায় যে স্বদেশ চেতনা-উদ্বুদ্ধ প্রয়াসগুলির সঞ্চার করেছেন উদ্ধৃত স্তবকগুলোতে তারই সমীপবর্তী অনুরণন সুস্পষ্ট। যুগসন্ধ্যার প্রকাশে, দেশপ্রেম, মানবতাবাদ এবং বিশ্ববোধের পটভূমিকায় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সুভাষিত পদাবলীর অসদ্ভাব নেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিভাষায় : 'শিল্প-সামগ্রীর উপাদান যদিও সনাতন ও সার্বজনীন সংসারেই আহরণীয় তবু সে অসাধারণ বিন্যাসে সেই চিরপরিচিত উপকরণসমূহ আমাদের বিস্ময় জাগায়, তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে' এ উক্তির তাৎপর্য সাম্প্রতিক কবিসমাজে স্বীকৃত। এ কালের সাম্প্রতিক কবিতায় কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো রাজনৈতিক যুক্তিবাদের স্থান সঙ্কুচিত এবং সম্ভবত তারই ফলে মানসিক উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার প্রাধান্য। ধূসর, আরোপিত আশাবাদে এখনকার কবি আর উদ্বুদ্ধ হন না ; চলেছে বিকৃততর অনুসন্ধান, সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে নতুনতর সম্ভাবনার। অনেক সময়ে পুঁথিগত বিদ্যার অনুপ্রেরণায় বিদেশী কাব্যাদর্শে বাঙালী কবিও অস্থির হয়ে থাকেন এবং বদলেয়র, ম্যালার্মে, ভ্যালেরি, এলিয়ট প্রমুখের কাব্যচেতনার অনুসরণে আত্মস্থ হতে গিয়ে অনুকরণ ও আত্মিকরণের পার্থক্য ভোলেন। কিন্তু, প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই সম্ভবত সৎকবির মানসিক তন্ত্রবাহ্যের পুনরুদ্ধার সমসাময়িক কালের স্বদেশ, স্বজাতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের উপকরণগুলির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এই বোধ যে ক্রমশই ফিরে আসছে এটা, আমার বিবেচনায়, শুভ লক্ষণ।

ময়মনসিংহ গীতিকায় চিত্রকল্প

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে মধ্যযুগীয় বাঙালী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটেছিল, এ তথ্য পুরনো। অন্যদিক থেকে ক্ষতিও খুব কম হয় নি। যদিও বাঙালী মেজাজ পুরাণ ও স্মৃতিসংহিতার স্থায়ী ক্রীতদাস হয়ে উঠতে চায় নি, তবু তাকে শেকল পরতে হয়েছিল। ফলে, সমাজ হল শ্রেণীবিন্যস্ত, মন সংস্কারে আবদ্ধ। সেই মন যখন শিল্পরচনায় উদ্যোগী তখনও আরেক বন্ধন—সংস্কৃত সাহিত্যের ও অলংকারশাস্ত্রের, তদ্বিহিত রীতি ও নীতির। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মুখ্যত লোকসাহিত্য থেকে জাত, তার বিকাশ সংস্কৃত রচনার সূর্যমুখী সাধনায়। যার ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্য—বিন্যাসের ও শব্দের দিক থেকে সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীনতায় পল্লবগ্রাহী, রূপকর্মের বিচারে দ্বিবচন, এবং জীবনঘনিষ্ঠতায় বহুলে গতানুগতিক প্রসাধিত। অবশ্য, সবটাই নয়। জীবনের স্পন্দন যেখানে, সেখানে সহজ স্বাভাবিকতায় কবির বক্তব্য উজ্জ্বল। কিন্তু উচ্চবিত্ত সাহিত্যের আসরে এই ঔজ্জ্বল্য সংখ্যালঘু; তাই পয়ার ত্রিপদীর একঘেঁয়ে সুরের পাশে পাশে যে কথার ছাপগুলি ফুটে উঠেছে, তারাও প্রায় সবাই একঘেঁয়েমিক, সনাতন, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ অবসন্ন। এইসব ছবি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত এবং যত্রতত্র ব্যবহৃত। একই চিত্রকল্প রাধার-চণ্ডীর-বেহুলার, এমনকি কালকেতু শ্রীমন্ত লাউসেনের রূপবর্ণনায় প্রয়োগ করা হয়েছে। মধ্যযুগের উচ্চবিত্ত বাংলা সাহিত্যের ছন্দের মতো ছবির এই দৈন্য বিস্ময়কর। কিন্তু অকারণ নয়।

অথচ, বাঙালীর নিজস্ব চিত্রাঙ্কনক্ষমতা যে ছিল, তার পরিচয় আছে আদি লিখিত-সাহিত্য চর্যাপদ-এ। এই স্বগত ক্ষমতা কিভাবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে এল, সংস্কৃত উপমাগুলি সেখানে অধিকার করল, তার কৌতূহলী পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সাহিত্যকর্মগুলি পর্যন্ত পরপর চোখ বুলিয়ে গেলে। ইসলামী সংস্কৃতির সান্নিধ্যে কিছু নতুন ছবি সঞ্চিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃতের সনাতন রীতির হাত থেকে মুক্তি ঘটে নি। দু-একজন কবি কিছু নতুন চিত্রকল্প গড়েছিলেন, হয় অবহেলায়, অথবা

নিবিকার অনুকরণে, তারাও ক্রত কৃত্রিম ও ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। পল্লবগ্রাহী বাংলা সাহিত্য যতটা আবর্তিত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম।

নগর থেকে বহুদূরে গ্রাম্য জনসমাজে সাহিত্যশাস্ত্রের বাঁধন যেমন শক্ত হ'তে পারে নি, তেমনি লোকসাহিত্যেও দৃঢ় হ'তে পারে নি অলংকারশাস্ত্রের বিধান। এখানে মুখ্যত শ্বাসাঘাতের আশ্রয়ে ছন্দের নানা কারুকাজ কানে বাজে ; তার চেয়েও বেশি চোখে পড়ে কথার ছবিগুলি—নতুন, সজীব বাস্তব ; শিল্পসুন্দরও কম নয়। উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যের বারংবার ব্যবহৃত 'রতিপতি...গজেন্দ্রগামিনী... খঞ্জননয়ন...কেশরী জিনিয়া মাজ...সচিত্র কাঁচলী...বিম্বাধর...দশনমুক্তা... ভ্রমর...শশিমুখ...' ইত্যাদি উপমার পাশে কতো সুন্দর ও সহজ ব্রতকথার... 'এনদী সেনদী একখানে বুধ ··সাতসমুদ্র যাতায় খেলে, কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে...ফুলের গন্ধতল পুকুরেতে ভাসে ··কালবোসেখী আগুন করে, কালবোসেখী রোদে পোড়ে, গঙ্গা গুহুগুহু আকাশে ছাই ; কিংবা ছড়ার : 'ওপারে তিল গাছটি তিল ঝুর ঝুর করে...নিশির কাপড়খানি খসিয়ে দেব জলের মধ্যে ছাকাজোকা, ফুল ফুটেছে চাকা চাকা' ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের অজস্র গান ও কথার মধ্যে এমনি অ-শাস্ত্রীয় চিত্রকল্প রাশি রাশি ছড়িয়ে আছে। সেগুলিকে সংগ্রহ করে আর এক নতুন অলংকারশাস্ত্র লেখা যায়।

এই ছড়ানো-ছিটানো ছবিদের আর এক পরিবেশে পাওয়া যায়, আরও সংহত সংযমে, যথার্থ চিত্রকল্পের স্বরূপে। ব্রতকথায়, ছড়ায় রূপকথায়, গানে যারা পাখির ঝাঁক, ছবির দীপপুঞ্জ, গীতিকায় তারা এক একটি মহাদেশতুল্য। অর্থাৎ, হঠাৎ অসংলগ্নভাবে এরা আসে নি, এসেছে সমগ্র কাব্যের একটি শরীরী প্রত্যঙ্গ হয়ে,গল্পের-চরিত্রের ভাবের যথামুখী অনুগমনে।

গীতিকাগুলির মুখ্য বিষয়—হৃদয়। ব্যক্তি ও সমাজের ঘন্দ্বাবর্তে ভালোবাসার ফুল ফুটেছে কবিতার চরণে-চরণে। প্রথার পথে নয়, রীতিসম্মত রীতিতে নয়, না ভাবে ভাষায়, না জীবনাচরণে ও মানসিকতায়। বৈষ্ণবের অলংকার শাস্ত্র-সম্মত প্রেমসূত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য মৌল। চিত্রকল্পেরও। আশ্চর্য এই, ছন্দের ক্ষেত্রে গীতিকার কবি নতুন বিচিত্র পথে পা ফেলেন নি অথচ কথার ছবির ক্ষেত্রে এঁরা স্ব-অধীন। অবশ্য, তার অনেকগুলিই বারংবার প্রয়োগে নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে। তবু মোনাকির আলোকের সংখ্যাই অনেক বেশি।

শব্দালংকার ধ্বনিনির্ভর, চিত্রালংকার সচিত্র। তবু একের মাঝে আরের

আভাস দুর্লভদর্শন বা দুর্লভশ্রবণ নয়। অনুপ্রাস একটি শব্দালংকার, তবু সে ছবিও তৈরি করতে পারে। তেমনি গীতিকার চিত্রকল্পগুলি কেবলমাত্র কথার ছবি নয়, কথার গানও, পদাতিক ধ্বনি-ব্যঞ্জনার প্রায় প্রত্যেকটি চিত্রকল্প উজ্জ্বল। এবং শেষ ও এই ছবিগুলি চারপাশের বস্তুজগতের ঘনিষ্ঠ, বাইরের জগৎকেই কবি মনোজগতের নাগরিক-অধিকার দিয়েছেন, তারপর তাকে করেছেন সাহিত্যের স্থৈয়িক অধিবাসী। প্রকৃতির রূপ, মানুষের রূপ ও স্বরূপ বর্ণনায় তো বটেই, ভালোবাসার অপরূপ স্বাদও পরিবেশন করেছেন মাটির পেয়ালা।

নগরের মতো গ্রামেও ঋতু আসা-যাওয়া করে, সূর্য-চন্দ্র স্থানবদল করে, দিন-রাত্রির ফুল গেঁথে গেঁথে সময় মালা তৈরি করে, মালাবদল করে। আশে-পাশের জানাচেনা বস্তু ও বিষয়ই গীতিকার প্রকৃতি বর্ণনার উপকরণ। যথা :

ভোর : আজল কাজল মেঘ আকাশের গায়।
পূর্বদিকে লাল সুরুজ উঁকি দিয়া চায়॥

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত : ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্দীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥

গভীর রাত : আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আসমানে জ্বলে তারা।

ছবিগুলির পাশে কান পাতলে পদে-পদে শব্দের নূপুরধ্বনি মনকে দুলিয়ে দেয়। এই যুগল আবেদনের অনিবার্য ক্ষমতা আছে বর্ষার কবিতায়। বৈষ্ণব বর্ষার অনেক রূপ, অনেক গান (রবীন্দ্রনাথেও) :

আর এখানে : মেঘে ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলি পানি।
বা গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে ঝিল্‌কি ঠাঙা পড়ে॥

[ঝিল্‌কি ঠাঙা = বজ্র বিদ্যুৎ]

নদীর চেহারাও সব সময়ে এক নয়। কখনও উদাসীন শান্ত, কখনও বা অশান্ত উচ্ছল। অনেকটি নারীর রূপের মতো—কখনও তরা যৌবনে টলমল, কখনও বা সুধীরা প্রজ্ঞাপারমিতা। গীতিকায় নদীর বিভিন্ন রূপ সচিত্রিত।

শান্ত নদী : নিদি রাইতে বাহিয়া তারা যায় তরীখানি।
পাল টাঙ্গাইয়া চলে তের বাঁক পানি॥

পাহাড় ভেঙে নদী ছুটে চলে সাগরের পানে ছলে-ছলে, তাটিয়াল গানের মতো :

পাহাড় খাইক্যা তাইট্যাল নদী সাগর বইয়া যায়।

ভরাট বর্ষার নদীর আছাড়িপিছাড়ি :

বিষম নদীর ঢেউয়ে অলহুতলহু পানি।

বা ঢেউয়ে করে নাইতাবাইড়ি কাছাড় তাইঙ্গা পড়ে।

অলহুতলহু-এ শুধু ছবি তো নয়, জলের শব্দও কানে ভেসে আসে।

মানুষ আর প্রকৃতি, পৃথিবীর বুকে লালিত যেন দুই যমজ সহোদর। একের উত্তাপে অপরের উজ্জ্বলতা, একের পরিতাপে অপরের যন্ত্রণা :

স্বর্গের কান্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা।

উপরে আকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা॥

আকাশে দেবতা কান্দে স্বর্গের কান্দনে।

তাটিয়ালে কান্দে নদী না বহে উজান॥

চন্দ্রাবতী ঘাটে এসে দেখেন, জলের ওপর প্রিয়তম জয়ানন্দের নিষ্প্রাণ দেহ, মনে হল : ঢেউয়ের উপর ভাসে পূর্ণ মাসীর চান।

গীতিকার কবি মানুষকে দেখেছেন সুচোখ ভ'রে, তাকে জেনেছেন সমস্ত অন্তর দিয়ে, তার ভালোমন্দ এঁকেছেন, শাস্ত্রের কাছ থেকে ধার-করা রঙে-রেখায় নয়, সহজ স্বাভাবিক উপমা সহযোগে :

আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কান্ধা সোনা অঙ্গে।

তাহার কাছে সুজন বান্ধা জোনি যেমন জলে॥

একটি কুষ্ঠিনীর চরিত্র, কতো সরস অথচ কতো সত্য :

গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়ালিনী।

যৌবনে আছিল যেন সবার কলা-চিনি॥.....

যৌবনেতে চাক যেমন আছিলাম আমি।

দিনরাত কানের কাছে মাছির ভনভনি।

এখন বয়স গেছে নদী তাটিয়াল।

এর পাশেই নায়িকার রূপ বর্ণনা, ভিন্নতর মেজাজ। বৈষ্ণব পদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অনেক নায়িকার এরকম ছবি আমরা দেখেছি। লোককবির মন ভিন্ন ধারার বাসিন্দা, তাঁর আঁকা রঙে-রেখায় লক্ষকোটি বিদ্যুতের ঝলকানি :

কিশোরী বয়ঃসন্ধিতে :

ঘুরা না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি।

তারে দেখ্যা পাড়ার লোকে করে কানাকানি॥

কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি।
দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি॥

কলি ফোটে দিনে দিনে, তারপর একদিন কলি ফুল হয়ে জেগে উঠল, কাঁচা সোনার নবম দেহে এল নবেলী যৌবন :

পাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চলচলবন্নি :
ভাদ্র মাসের চান্দি যেমন দেখায় গাঙের জল।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলো॥
নদীর ঘাটে গেলে কন্যা জলে নদীর পানি।

নদী আর নারী, নারী আর নদী। এতেও কবি খুশি নন, তুলনাকে আরও প্রসারিত করেন সুন্দর শিল্পের উল্লাসে। নতুন 'সোনাপী যৌবন' কন্যার ; কিন্তু কন্যা আজও একাকিনী, মনের বিজন পথে দ্বিতীয় কোন পথিকের পদধ্বনি বেজে ওঠে নি। এ-একাকিত্ব কেমন ?—যেন সঙ্গীবিহীন একটি নির্জন পান্সী, একটি একলা সোনার তরী, না গান, না গায়ক :

এমন সোনার পান্সী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিবে ঠাঁই॥
ফুলে ভরা মধু কন্যা চির একেশ্বরী।

কিন্তু নদীই তো তামাম দুনিয়া নয়, তার দুপাশে আছে মাটির দেশ। তার ওপর দিয়ে যখন কন্যা হাঁটে, তখন ঊদ্বিন্নযৌবনা কন্যাকে মনে হয় নবধনুকুলিতা ঊদ্বিদ, ঊদ্বিদই তো ঊদ্বিন্নযৌবনা :

কাকুনি গুপারি গাছ বারে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে॥

এবং ভালবাসা। এ ভালোবাসা কুটিল নয়, সরল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ; অলংকার শাস্ত্রের অধীন নয়, হৃদয়ের বিনীত দাসানুদাস ; দেহকে অস্বীকার করেনা, তবু মনই দেহের সম্রাট ; বেপরোয়া প্রথাবিরোধী, কিন্তু বিভ্রান্ত অবদমিত নয়। এখানে পূর্বরাগ জীবনসংগ্রামকে বাদ দিয়ে নয়, মিলন বৃন্দাবনী সারঙ্গে নয়, দাম্পত্য নয় আদিরস বা হাস্যরসের ফুলঝুরি। প্রতি পদক্ষেপে তার লড়াই, মানসিক যুক্ত-সমুক্ত, আগুনের ফুলকি। কূল আর নদীসংসার নয়, ঘরে ও পথে হৃদয়ের জীবনঘনিষ্ঠ পদচারণা।

ময়মনসিংহ গীতিকার চিত্রকল্প

প্রথম আলাপে ছন্দকলহে ; নায়ক যেন বেদেয়নী, নায়িকার যেন 'পানে বান্ধা ছিয়া' ; শেষে দুইই গলে যায়, ফুলে ওঠে ভরা নদীর মতো একটি সংলাপ :

নায়িকা : লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুব্যা মর ॥
কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ, আমি ডুইব্যা মরি ॥

পূর্বরাগ থেকে, মন দেওয়া-নেওয়ার পালা পেরিয়ে এক নিঃসংশয় বিশ্বাসে স্থিতি। এখন একের সান্নিধ্যে অপরের উল্লাস ; একের বিরহে আরের উন্মাদনা —উদাস হয়ে ভাবা, মনের আকাশে কল্পনার মেঘ জমানো, পরস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতি। অসীম ভালোবাসা যখন সীমা ছাড়ায়, গুরুজনের মনে সন্দেহ জাগে, সন্দেহ মুখর হয় প্রশ্নে :

আউলা কাললা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা।
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা ॥
আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখাছি কলি ॥

কাল যে ছিল মুড়া কলি, আজ সে প্রগল্‌ভা ফুটন্ত ফুল। পরিচিত একটি উপমাকে কী অদ্ভুত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, একটি বাক্যে ভালোবাসার সমগ্র কাব্য লেখা হয়ে গেছে। সূর্যের একবার বিশ্ব-প্রদক্ষিণের অবকাশে অন্তরে ফুটিল মোর সোনার কমল। পরিচিত উপমা এখানে নতুন অর্থবহ।

বৈষ্ণব পদের রাধা—নায়িকা, প্রেমের মোমের পুতুল ; বাস্তবের সামান্যতম তাপেও মুহূর্তে গলে যায়। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী উমা, স্ত্রী, সতীত্বের দাম্ভিক্যের প্রতিমা ; কল্পনার সামান্যতম আঁচেও জলে যায়। গীতিকার নারী-চরিত্র একাধারে প্রেমিকা-নায়িকা ও সতী-স্ত্রী। এরা ভালোবাসার জন্যে পথে নামে, পথ শেষ হলে ঘর বাঁধে। অভিসার করে, অভিমানেও যায় ; বাস্তবের বাধায় জ্বলে ওঠে লড়াইয়ের আগুনে, কল্পনার ছোঁয়ায় বিগলিত হয় ফুলের সৌরভের মতো। এদের স্বপ্নও সত্যে ভালোবাসা, আর ভালোবাসায় এতোটুকু ব্যবধান নেই। ভালোবাসা যদি হয় সোনা পাখি, সংসার তার রূপোর খাঁচা।

তাই যে নায়িকা একদা প্রেমের আল্পনায় সচিত্র, তাকেই দেখি দাম্পত্যের আলাপে সমান সবাক। প্রয়োজন হলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে স্ফুরিত আধার :

আমার সোয়ামি যেন পর্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামি যেন রণদৌড়ের ঘোড়া॥
আমার সোয়ামি যেন আশমানের চূড়া।
নিরবিধির সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা।

বিরহের ছবি অভিনব : চক্ষে ঘুরে মাকড়সা আঙ্গায় লাগিয়া। শতধারার চোখের জল যেন একটি মাকড়সা, যে মাকড়সা কুৎসিত বীভৎস চতুর অপহারক। প্রিয়-বিরহে সমস্ত জীবন, প্রতি মুহূর্তই এখন যেন মাকড়সার জালে, তার কবলে : একটু-একটু করে রস শুষে নিচ্ছে, তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারছে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ছনিয়ার যতো ব্যথা আর বেদনা, যন্ত্রণা আর অন্ধকার : বেচারার পথ নেই, পথ নেই : মাকড়সা তো কেবল চোখের জলে নয়, চোখে নয়, সমস্ত শরীরে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি, এই মুহূর্তে, কেমন যেন সাংকেতে শরীরী সাদৃশ্যটুকুই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু একালে ঐ শারীরিক সাদৃশ্যের মানসিক ভাবে দ্যোতিত হয়ে উঠতে বাধা ঘটছে না কোথাও। একই শব্দ যখন বিভিন্ন অর্থে বারে বারে স্নান করে ওঠে, তখনই তো সে ব্রহ্মস্বরূপ, ব্যঞ্জনায় ধ্বনিতে, সরসতায় সুন্দর, গভীরতম উজ্জ্বলতম।

এক দুই তিন করে বছরের পর বছর কেটে গেল, খড় এল না। সাপের বিষের চেয়েও বেশি জ্বালা বিরহে। দিনে-রাতে শুকিয়ে যেতে থাকে লীলা—যে ছিল সুন্দর, সে অসুন্দরের যাত্রী ; যে ছিল প্রাণের প্রতিমূর্ত আজ সে, মৃত্যুর পুতুল। বৈপরীত্যটির ছবি একে-একে প্রদান করেছেন রূপদক্ষ চিত্রকরে :

গঙ্গার তরঙ্গ লীলায় দীঘল কেশপাশ।
যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁজ॥
সাতুড়িয়ার তারা যেমন লীলায় দুটি আঁখি।
কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি॥
অধরযুগল লীলায় সুন্দরবরণ।
বৈশাখ হইল আসি কাজল যেমন।
প্রথম যৌবন কন্যা কমনীয় লতা।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা॥

মরণ বসি আসি নয়নের কোণে ॥
বৈকালের রাঙ্গা রঙ্গ মেঘেতে লুকায়।

উচ্চবিত্ত সাহিত্যে ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে একটি উদাসিকতা বরাবরই বিদ্যমান। লোকসাহিত্যের ভাষা শব্দের বিচারে অনেক বেশি ধনী, তার নির্বাচন জাতি-কুল-শীলগত নয়, শিল্পগত। ফার্সী-আরবী শব্দের প্রাচুর্য গীতিকার অন্যতম সম্পদ। তাতে কবিতার অগৌরব হয় নি, বরং জল বেড়েছে অনেকখানি। লালোর বিরহ, আর মদিনার বিচ্ছেদ-বেদনায় তাই একই সুর :

পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল রহিলা একেলা ॥
লক্ষ্মী না আসন মাসে বাওয়ার লাওয়া মারি।
ধরম মোর আনে ধান আমি ধান পাড়ি ॥

[বাওয়া = হৈমন্তী ধান ; লাওয়া মারি = ছুত কাজ সারা]

মদিনার মৃত্যুতে দেওয়ান কেঁদে কেঁদে মাটি ভেজায় :

বুকের কালিমা মোর কেবা লইল কাটি ॥
জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তারা।
আমার কাছেতে আইল রাইতের আন্ধারা ॥
ধরিয়া শুকাইয়া যায় পাখর আইল পানী।
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরানি ॥

গীতিকার নারী জোরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারে : প্রয়োজন হলে, তেমনি জোরের সঙ্গে প্রাণ দিতেও পারে। স্বামীর কল্যাণ কামনায় মদুয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পে তাঁজা নৌকা ভাসিয়ে দিলে এক নিঃসঙ্গ দুপুরে, যামিনী সে একা স্বামী স্বজন তীরে দাঁড়িয়ে ফিরতে অনুরোধ করছেন, মদুয়া ভেসে চলেছে। মৃত্যুর মোহনায়, তাজা নৌকার জল উঠছে ছলকে ছলকে। একদিকে কাতর অনুনয়, অন্যদিকে নিষ্ঠুর শপথ, মাঝখানে তাসমান নৌকা ডুবছে একটু একটু ক'রে। পরিস্থিতির ও সংলাপের বর্ণনায় মাঝে মাঝে একই পংক্তি কবি বারবার ব্যবহার করেছেন এমন শিল্পদক্ষতায়, নৌকার একটু একটু ক'রে ডুবন্ত ছবি চলচ্চিত্রের মতো ভেসে ওঠে চোখের সামনে, দুঃখ ঘিরে ধরে ধীরে ধীরে :

উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাহিয়া।
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক তাজা নাও।

বিদায় দেও মা জননী ঘরি তোমায় পাও ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক তাজা নাও।
অভাগীরে রাইখা তুমি আপন ঘরে যাও ॥
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর যা কত দূর।
ডুইবা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর ॥

একটু একটু ক'রে ডুবছিল যে নৌকা জলে ভারি হয়ে হয়ে, একদমকে তলিয়ে গেল কোন অদৃশ্য অতলে মুহূর্তের নিমেষে।

পুবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও ॥

সমস্ত গীতিটাই এক মনপবনের নাও, যে সোনার তরীতে জেগে চলে এক বিচিত্র জীবন, বিবিধ মানস, সুন্দর কন্যা আর আকাশ বাতাস পৃথিবী। এ নাও আজও আমাদের সামনে। এখনও ডোবেনি।

আজকের সাহিত্য অনেক সংস্কারমুক্ত, তবু, আমাদের জীবনে তো বটেই, মনে ও শিল্পেও অনেক কৃত্রিমতাও জমে উঠেছে, পুরনো অনেক সংস্কারকে জেনে বা না জেনে লালন করে চলেছি এখনও। মধ্যযুগের মাধ্যাকর্ষণ এই আধুনিক যুগেও নিতান্ত কম নয়। এই মধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি দিতে যারা পারে, লোকসাহিত্য তাদের অন্যতম। ভাব ভাষা এবং চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলা কবিতা অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে, যদি লোকায়ত মানসিক চেতনা, তাবাগত ঔদার্য এবং স্বাভাবিক শব্দ-চিত্রগুলির অনুশীলন নিয়মিত হয়। বলা বাহুল্য, যথাযথ গ্রহণ অনন্তর প্রয়াস ও অনন্তর প্রতিফলনা; এগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রসাধন অন্তে শুরুণ কবিতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনাড়ম্বর এবং জটিল উভয়বিধ চিত্রকল্পের গতানুগতিক আবর্ত থেকে মুক্তি পাবে বাংলা কবিতা, জীবনবোধে স্পন্দিত হয়ে উঠবে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তাই এখন একবার লোকসাহিত্যের সীমানাহীন উপসাগরে অবগাহন করে এলে কেমন হয়? বিশেষত যখন, গ্রাম ও শহরের দুস্তর উন্নাসিক ব্যবধান সত্ত্বেও, লোককবির কণ্ঠে কাব্যশেষে উচ্চারিত হয়েছে কবিতার কেন্দ্রবিন্দুর ক্ষুদ্রতম অথচ প্রবলতম মন্ত্রটি :

স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কাজল নয়ান চন্দ্রু গায়।
নিজের অন্তরের দুঃখু পরকে বুঝান দায় ॥

"রিল্কের" আর একটি কবিতা[১]

ভগবানের উপর কবির ভয়ানক দরদ, তাই তাঁকে ডেকে কবি জিজ্ঞাসা করছেন :

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe ?
ভগবান, কি করবে তুমি,
আমি যদি মরে যাই ?
আমি হলাম তোমার কলস,
আমি যদি ভেঙ্গে যাই !
আমি তোমার পানীয়
আমি যদি নষ্ট হয়ে যাই !
আমি তোমার পোষাক, তোমার পেশা,
আমার সঙ্গে তোমার অর্থও তুমি হারাবে।
আমার পরে তোমার ঘরও কিছু থাকবে না,
যেখানে দুখের কথা কাছে এসে তোমায় আশ্বস্ত করবে।
আর তোমার শ্রান্ত পা থেকে খসেও পড়বে
তোমার মখমলের পাদুকা—আমি ও ত তাই।

তোমার সর্ব্বাঙ্গের আচ্ছাদনটি খসে পড়বে,
আর তোমার যে দৃষ্টিকে আমি আমার উষ্ণ গণ্ডের উপর,
কোমল উপাধানের মত করে, ধরে রেখেছি
তা ফিরে আসবে, খুঁজবে আমাকে ঘুরে ফিরে—
আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পড়বে গিয়ে কোন পরদেশী পাথরের কোলে।
কি করবে তুমি ভগবান ? আমার বড় দুঃখ

[১] লেখকের "কবির্মনীষী" গ্রন্থে "রিল্কের দুটি কবিতা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Was wirst du tun, Gott ? ich bin bange

অহরহ কথা আমরা একদিন রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনেছি—তাঁর তুমি-আমি সংবাদ অতি পরিচিত[১] :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়
কিম্বা
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।
যার মর্মগত অর্থ হ'ল
মানুষের অহঙ্কার পটে
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প.....

তবে রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ভঙ্গি হ'ল শালীন শোভন তত্ত্বগর্ভ—প্রাচ্য সুলভ—আর পাশ্চাত্য কবির হ'ল যাকে বলা যায় আবরণহীন home-thrust (আঘাতে ঘা—ভগবানের দিক দিয়ে)।

যা হোক উভয়ত্রই ফুটে উঠেছে আধুনিক মানুষের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ একটা আকৃতি। সৃষ্টিরই মধ্যে স্রষ্টার সার্থকতা, মানুষেরই মধ্যে ভগবানের মধ্যে ভগবানের—ভগবান যদি থাকেন—চরম প্রকাশ হয়েছে বা হতে পারে। প্রাচীন যুগের সাধু সন্তরা, বিদগ্ধজনেরা সত্যকে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্‌কে—দেখেছিলেন, পেয়েছিলেন জগতের বাহিরে মৃত্যুর ওপারেই স্বর্গলোক। আধুনিক চেতনায় এ সিদ্ধান্ত আর স্বতঃসিদ্ধ নয়। তাঁদের লক্ষ্য এই এখানে Here and now—অতীন্দ্রিয় আত্মায় বা পরমাত্মায় নয়, এই ইন্দ্রিয়গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে এই মাটির ভাণ্ডেই সব সার্থকতা।

সৃষ্টি হ'ল ঈশ্বরের প্রকাশ, রূপ নিয়ে সুন্দর হয়ে বিশ্বাতীত প্রকট হয়েছেন বিশ্বে, পার্থিব ভুবনে। এই মানুষী মরদেহে অদেহী চিন্ময় ধরা দিয়েছেন কান্ত

[১] লেখকের "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে "রবীন্দ্রনাথে 'তুমি ও আমি'" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কোমল, নিবিড়তর নিকটতর মধুরতর হয়ে। এ হ'ল ভারতীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও আকৃতি।

কিন্তু আধুনিকেরা অনেকখানি ইউরোপীয় ভাবে ভাবান্বিত—বলতে সুরু করলেন: সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টা নস্যাৎ, মানুষ ছাড়া ভগবানও নস্যাৎ। বলা যেতে পারে এ হল প্রাচীন কালের মনের প্রতিক্রিয়া, যা বলত: স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি নস্যাৎ, ভগবান ছাড়া মানুষ নস্যাৎ। আমরা জানি বৈষ্ণবেরা ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড় করে থাকেন, বলা হয়, ভক্তের জন্য ভগবান কেঁদে বেড়ান এ কথাও বলা চলতে পারে, একটু রঙ চড়িয়ে কবি আরো একটু অতিশয়োক্তি বলেছেন, নিজেকে সকল সৃষ্টির সঙ্গে, সকল মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে, যে ভগবান মানুষের অন্তরে ভূতের মত ঘুরে বেড়ান।

বিষ্ণুর হ'ল অভিমানের কথা, সুন্দর এই ভুবনের উপর, এই মাটির দেহের উপর, এখানকার তুচ্ছ সব উপচারের উপর আসক্তি, অনুরাগের কথা। এর মধ্যে এই সব নিয়ে ভগবান যদি মূর্ত না হয়ে থাকেন, তবে আর যাই হোন, তাঁকে মনো বৈ সঃ বলতে পারি না।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

এ্যালেন জিনস্‌বার্গ

HOWL

William Carlos William's Introduction

When he was younger, and I was younger, I used to know Allen Ginsberg, a young poet living in Paterson, New Jersey, where he, son of a well-known poet, had been born and grew up. He was physically slight of build and mentally much disturbed by the life which he had encountered about him during those first years after the first world war as it was exhibited to him in and about New York City. He was always on the point of 'going away', where it did not seem to matter; he

disturbed me, I never thought he'd live to grow up and write a book of poems. His ability to survive, travel, and go on writing astonishes me. That he has gone on developing and perfecting his art is no less amazing to me.

Now he turns up fifteen or twenty years later with a arresting poem. Literally he has, from all the evidence, been through hell. On the way he met a man named Carl Solomon with whom he shared among the teeth and excrement of this life something that cannot be described but in the words he has used to describe it. It is a howl of defeat. Not defeat at all, for he has gone through defeat as if it were an ordinary experience, a trivial experience. Everyone in this life is defeated but a man, if he be a man, is not defeated.

It is the poet, Allen Ginsberg, who has gone, in his own body, through the horrifying experiences described from life in these pages. The wonder of the thing is not that he has survived but that he, from the very depths, has found a fellow whom he can love, a love he celebrates without looking aside in these poems Say what you will, he proves to us, in spite of most debasing experiences that life can offer a man, the spirit of love survives to ennoble our lives if we have the wit and the courage and the faith—and the art | to persist.

It is the belief in the art of poetry that has gone hand in hand with this man into his Golgotha, from that charnel house; similar in every way, to that of the Jews in the past war. But this is in our own country, our own fondest purlieus. We are blind and live our blind lives out in blindness. Poets are damned but they are not blind, they see with the eyes of the angels. This poet sees through and all around the horrors he partakes of in the very intimate details of his poem. He avoids nothing but experiences it to the hilt. He contains it. Claims it as his own—and, we believe, laughs at and has the time and affrontery to love a fellow of his choice and record that love in a well-made poem.

Hold up the edges of your gowns, Ladies, we are going through hell.

দেখেছি উন্মাদ হল', দেখেছি চুরমার হল'
আমার যুগের শ্রেষ্ঠ মন, এ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা,
ক্ষুধার্ত উলঙ্গ লাল চোখ মন দেহ নিয়ে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে যারা রাত্রিভোরে আবছা আলোয়
ঘুরে গেল নিগ্রোদের ছোট অলিগলি
জ্যাজ খোঁজা মন মাখা কোন' এক হরোয়ের খোঁজে,

দেবদূতী ক্ষণবাদী আত্মার প্রদীপে তেল ভ'রে
খোঁজে যারা পুরাতন স্বর্গ সাথে যোগ
তারাতরা বিছানটা রাত্রির মেশিনে,

ছেঁড়াজামা হরিদ্রতা গালেবসা চোখবসা মুখে
মহারাজনগরীর এক থেকে অন্য চূড়ায়
ভাসা ভাসা কনকনে ঠাণ্ডা ঘরের
অলৌকিক অন্ধকারে বিড়ির ধোঁয়ায়
ধ্যান করে আধুনিক সংগীত জ্যাজ্ এর,

মাথার ওপরে চলা 'ই-এল্'[১] ট্রামের ঝাঁকায়
টুপীহীন খালি মাথায় স্বর্গ মুখ চেয়ে
দেখে যারা মহম্মদী দীপ্ত দেবদূত
খুঁড়িয়ে হোঁচট খায় ঝরনে পড়া ঘাসে,

ঠাণ্ডা অলস্ত চোখে পাড়ি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়
মায়াবী ব্রেক্ এর মায়া, আরকান্সাস্[২]
ছড়ালো হাতে যারা বিরোগের জাল
যুদ্ধবিদ্ধ পণ্ডিতের নস্তিতরা ঘরে,

বিদ্যালয় ঘোর থেকে গলা ধাক্কা লাথি খেয়ে যায়
ছাপালো উৎকট নয় বিশ্রী পাগলামি
জলতরা অশ্লীলতা মড়ার খুলির গর্ত নিয়ে,

ইজের গেঞ্জী' পরে দাড়ি মুখে শীতে বাঁকা দেহে
পুড়িয়ে টাকার নোট ঘরের ছোট্ট ডাস্টবিনে
ওভের উলঙ্গ শব্দ শোনে যারা দেয়ালের গায়,

লায়েডোর* মাক দিয়ে নিউইয়র্কের পথে দিয়ে
কোমরে গাঁতার থলি বেঁধেছিল ব'লে
ঘুঁসি খেল', লাথি খেল তলপেটে, তলপেট নীচে,

রঙীন হোটেল ঘরে আগুনের শিখা মুখে পুরে
চায়নেটাইন তেল খেল যারা "স্বর্গ-গলি"* কোনে
ঘরে গেল বেঁকে গেল দেহ যাতে পাপ ক্ষয় ক'রে
স্বপ্ন দিয়ে গাঁজা দিয়ে কাম দিয়ে ভীতি স্বপ্ন দিয়ে,

মনের তুলনাহীন কল্পমান অন্ধকার মাঝে
মেঘ আর বিদ্যুতের অসংখ্য ঝলকে
হঠাৎ প্যাটারসনে* কানাডার জলে
মধ্যবর্তী সময়ের গতিহীন অলস আকাশ,

আফিমের* পুরু ধোঁয়া, কবরের পাশে জাগা রাত
মাতলামি খোলা হাতে, সূর্য চাঁদ গাছের ফাঁপুনি
হল্লোড় ব্রুকলিন* মাঝে কনকনে শীতের সকালে
ক্যানেস্তারা টিন আর ভাঙা ভাঙা গলায় আওয়াজ,

মাটীর নীচের ট্রেনে বেন্‌জেড্রিন্ নিদ্রাকাতরকে
চুর হ'য়ে সংখ্যাহীন যাত্রা করে যারা
ব্যাটারী* স্টেশন থেকে পুণাময়* ব্রুকস্‌'*এর পাড়ে
ঘুম ভাঙে আকস্মিক চাকা আর শিশুর আওয়াজে
ছাই হয় মুখ আর গুঁড়ো হয় অনাগত মাথা
নেভে বুদ্ধি-উজ্জ্বলতা চিড়িয়াখানার কালো বিষণ্ণ ছায়ায়,

যারা বসে সারারাত 'বিক্‌কোর্ডে'* সামুদ্রিক নীলচে আলোয়
বাসি মদ গন্ধভরা 'কুদাসীর'* জনহীন দুপুরের 'বার'এ
বার থেকে বেলভিউ,* বেলভিউ থেকে বাদুঘরে,
বাদুঘর থেকে সোজা ব্রুকলিন ব্রীজের* উপরে,

বিজিত সেনানী তারা রেটোরিক যুক্তিতর্কবাদী
নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল পাকানো সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে
এস্পায়ার[১৫] জানলা থেকে, এম্পায়ার সৌধ থেকে ঠাসে,
গলা ছেড়ে, চুপিচুপি বমি করে ঘটনা ও স্মৃতি
হাসপাতালের পক্ক, দুষ্ক আর কবরখানায়,
সমস্ত বিবেক বুদ্ধি বমি হয়ে সাতদিন সাতরাত্রি ব'য়ে
অনন্ত উজ্জ্বল চোখে, সিনাগগী যাসে যেন ছুটলাখ পায়ে.
জেন্ নিউ জার্সি থেকে উবে গেল কর্পূরের মত
পিছে ফেলে কাপসা ছবি অশ্লীলতা তারা
মোংরা আটলান্টিক্ সিটি[১৬] থেকে কেনা,
প্রাচ্যদেশী গ্রাম আর তাজেরাপ্রী ছেড়াগুঁড়ো চীনদেশী ধরাবাধা নিয়ে
ঠাণ্ডা নিউ আর্ক[১৭]এর ঝনঝনে আসবাবী ঘরে
দুঃখ কষ্ট পেল' যারা গাদা গাদা রাবিশ লয়াতে,
মাঝরাতে ঘুরে ঘুরে হেল রোড ইয়ার্ড এর মাঝে
কোথা যাবে এই ভেবে গেল তারা চ'লে গেল তারা
শুধু ছদর কোন' একটাও না ফেলে পেছনে,
সিগারেট জেলে ঠোঁটে মাথাধরা ভীষণ আওয়াজে
ট্রেনে ব'সে তুষারের ঠাণ্ডা পথ কেটে
চ'লে গেল' জনহীন কৃষিক্ষেত্র গোলাবাড়ী দিকে
ঠাকুরদাদার মত সাদা আর বুড়ো এক হাতে,
প্রচুর পড়ল' তারা জুলবিন্ধ সেউজন, গো,
স্টিনাস, টেলিপ্যাথী, ইথদির গুপ্ত যন্ত্রাবলী,
কেননা পায়ের নীচে ক্যানসস্[১৮] সহরে
সারা বিশ্ব কেঁপেছিল সাধারণ সাহজিক ভাবে,
ইডাহোর[১৯] রাস্তা মাঝে সরু সরু অলিগলি ঘুরে
খোঁজে যারা দেবদূতী লাল ইণ্ডিয়ান
কল্পনাপ্রবন লাল দেবদূতী ইণ্ডিয়ান যারা,
যখন হার্লিউয়োর[২০] অলৌকিক উল্লাস-আলোয়
জ্বলে ওঠে, নিজেদের ভাবে তারা উন্মাদ পাগল,

লাফ দিয়ে জলে ভেজা লিমোসিন গাড়ীর ভেতরে
পাশে ব'সে চীনেম্যান ওকলাহোমার [১০]
ঘুরল' শীতের রাতে বৃষ্টি ভেজা নগরীর পথ,

খালি পেটে একা একা হুইটম্যানের [১১] এ দ্বারে ও দ্বারে
খুঁজে কোন, খুঁজে যৌন জ্যাজ্ এর সংগীত,
না পেয়ে উত্তর কোন আশাহীন বহু তর্ক ক'রে
মেধাবী স্প্যানিশ সাথে আমেরিকা চিরন্তন কথা
পাড়ি দিল শেষ রাত্রে অন্ধকার আফ্রিকার দিকে,

নিরুদ্দেশ হল' যারা মেক্সিকোর আগ্নেয় গিরিতে
পিছে ফেলে লাভা আর পরিত্যক্ত সোমাক্সের ছায়া
কবিতার ছাই তরা চিকাগো-উনুনে,

পশ্চিমের উপকূলে কেভারেল বুরোর অফিসে
আবির্ভূত হল' যারা লাড়ি মুখে লম্বা স্যাক্ট পরে
বিরাট প্রশান্ত চোখে কামরাঙ্গা বাদামী চামড়ায়
অযোধ্য প্রচার পত্র দুই হাতে বিলি ক'রে ফেরে,

ধনতন্ত্রবাদ-গাঁজা-ওয়ারেন প্রতিবাদে যারা
পোড়ালো হাতের ছাল নিজেদের সিগ্রেট আগুনে,

বিলিয়ে প্রচারপত্র সাম্যবাদী ইনিয়ন মার্চ [১২]
কেঁদে কেঁদে খোলে জামা কাপড় যখন
লস্ আলামস [১৩] থেকে বিশ্বকাটা সাইরেন ধ্বনি
বিশ্রী আর্তনাদ ক'রে খাটী পরে শোয়ায় তাদের
ষ্ট্যাটন দ্বীপের [১৪] কেরী, ওয়াল [১৫] ও শোর পাশাপাশি,

ঝিকিরে ঝিকিরে কেঁদে সাদা সাদা ব্যারাম আগারে
চুরমার হল' যারা কম্পমান উলঙ্গ শরীরে
অন্ত নগ্ন কংকালের যন্ত্রের সমুখে,

কাফকে সোয়েন্দা কাঁধ হেসে কুটি পুলিশের ভ্যানে
বহু, বালমেহনের নিজ বন্ধু ভ্রান্ত অপরাধে,

সহর সুড়ঙ্গ পথে হাঁটু গেড়ে দীর্ঘস্বরে কেঁদে
টান খেয়ে ধাক্কা খেয়ে ছাদ থেকে পড়ে গেল যারা
কাঁধেন্দ্রিয় পাণ্ডুলিপি দোলাতে দোলাতে,

মোটর সাইকেল হাতে ধাক্কা মারে পেছনে তাদের
যে আশায় খুলে দিয়ে নিতম্বের পরিচ্ছদ সব
কাটালো আকাশ তারা গলা কাটা হাসির আওয়াজে,

উড়লো আকাশ শূন্যে কিংবা তারা গুড়ালো নাবিক,
মানুষিক দেবদূত, অতলান্তিক কায়েবীর প্রেম,

সকালে দুপুরে রক্তে পাবলিক পার্কের ঘাসে
গোলাপ বাগানে আর শব ভর্তি কবরখানায়
বিলোল' অমনি তারা বীজরাশি যাকে পেল' তাকে,

হাত দিয়ে মুখ চেপে খিল্ খিল্ হাসির বদলে
অন্ত্রবস্ত্র হেঁচকি তুলে কাঁদে যারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
টার্কিশ স্নানাগারে পার্টিশান পর্দার পেছনে
যখন স্বর্গাভকেশী শুভ্রদেহী নীলচোখ নারী,
নগ্ন দেবদূত আসে আগুনের তলোয়ার হাতে
তাদের উলঙ্গ দেহ ফুটো ক'রে দিতে,

নিয়তির ঝগড়াটে তিন বৃদ্ধা মুখরার কাছে
হারোল' প্রেমিক ছেলে-বন্ধুদের যারা
এক বৃদ্ধা ঝগড়াটে এক চোখা টাকা,
অন্ধবৃদ্ধা এক চোখা গর্ভে চোখ মারে,
শেষ বৃদ্ধা এক চোখা ঠ্যাং তুলে ব'সে
শিল্পী আর মেধাবীর তাঁতভরা সোনা সুতো কাটে কাঁচি দিয়ে,

ভীষণ উল্লাস আর জলজলে অভুক্ত ক্ষুধায়
বীয়ার বোতল এক, বাতি, প্রিয়া, সিগ্রেটের সাথে
সংগম সমাপ্ত হ'লে পড়ে' গিয়ে ঠাণ্ডা খাট থেকে
হামাগুড়ি দিয়ে মেঝে দালান ছাড়িয়ে
দেয়ালে ঠোকর খেয়ে মাথা ঠুকে জ্ঞান হারা

দর্শন শেষ' যে তারা নারীদেহী চরম রূপের
পাশে রেখে চেতনার শেষ "রশ্মি রেখা," [১৮]

সূর্যাস্তের লালরঙে লক্ষ কাঁপা যুবতী-ইংগিত
ক'রে দিয়ে মুক্ত যারা সূর্যোদয় পরে
লাল চোখে ভ্রূপাতে কৃষি ক্ষেত্রে নগ্ন দেহ নাড়ে
সূর্য আলো হাতছানি মুক্ত ক'রে দিতে

চুরি ক'রে গাড়ী যারা কোলোরাডো [১৭] বেসামালী ঘুরে
ডেনভার [১৮] শহরের আমার এ কবিতার ছদ্মবেশী নায়কের দল
অসংখ্য যুবতী সাথে অতীতের সংগমের স্মৃতি
পোড়া বাড়ী সিনেমায় ঝিড়কির ঘাস আর খড়ের গাদায়
পাহাড়ী গুহায়, কিংবা বেডরুমে ক্ষীনদেহী পরিচারিকায়
সাথে রাখা পাশে কোন' নির্জন গলিতে
পেট্রল ষ্টেশনে আর বাগানের ঝাপুকায় ঝুপে
দেহ আর কাপড়ের কামপূর্ণ চাপা চাপা শ্বাস,

হারিয়ে নিশ্চিহ্ন নোংরা বড় বড় চলচ্চিত্র গৃহে
সরে গেল স্বপ্নে যারা, ভেংগে গেল ঘুম
ভিতরে বুকেতে গড়া ম্যানহাটনের [১৯] ছোট ঘরে,
যেখানে নির্দয় 'তোকে' [২০] খার্ড এ্যভিনিউ [২১]
বাস করে তীব্র ঘৃনা তীব্র ভয় নিয়ে,
কুড়িয়ে নিজের দেহ বীভৎস এ আবহাওয়া থেকে
আহাড় হোঁচট খেয়ে গেল তারা বেকার অফিসে.

ক্ষুতোক্তি রক্ত নিয়ে সারা রাত হেঁটে হেঁটে যারা
ক্ষুধার্তা চাদর মোড়া আহাজের ডেকে
দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে খোলে যদি পূর্ব নদীপাড়ে
উক্ত বাষ্প আফিসের ধোঁয়াভরা ঘরের দুয়ারে,

আত্মহত্যা মহাকাব্য সৃষ্টি করে হাডসন্ ঘাড়াই কিনারে
সমরকালীন চাঁদ নীলরশ্মি শ্রাবনের নীচে
বিস্মৃতির সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে তারা লয়েল যুকুটে,

কল্পনায় ঘুড়ি ওড়ে সেজ করা মাংস খেয়ে বাইরী নদীর
কর্দমাক্ত তলদেশী কাঁকড়ার খোলা যারা করল হজম,
জগন্ত সংগীত আর পেঁয়াজের ঠেলাগাড়ী ঠেলে
কেঁদে গেল নগরীর রাজপথে উপকথা শুনে,
অন্ধকার বাজে বসে ঘাস কেলে ব্রীজের তলায়
সেতার গড়তে যারা উঠে গেল চিলের কোঠায়,
বস্ত্রাক্রান্ত আকাশের নীচে যারা অগ্নিশিখা মাখে
ঘর্মতপ্ত বইঠানো পীত-লৌহ-কোড়া ভরা ঘরে
হারমেনে ঝড় তুলবার কেসে গেল ঘুক্ ঘুকে কাশি,
লিখলো যা লাহাহাত হিজিবিজি উচ্চঘরে নাচানাচি ক'রে
দিনের হলদে আলো রূপান্তর করে সেটা নিরর্থক শ্লোকে,
পচা জল হুদপিণ্ড বায়ুকোষ ঠ্যাং লেজ রেঁধে
স্বপ্ন যারা দেখেছিল পাকসজি রকো সবুজিমা,
মাংসভর্তি কদাকার বড় বড় লহরীর তলায়
ঝাঁপিয়ে পড়ল যারা একটিমাত্র ডিমের আশায়,
সময়ের বহির্যানী অনন্তের নাম পাশে ভোট চিহ্ন এঁকে
হাতঘড়ি টাঁকঘড়ি ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে ছুঁড়ে
যাদের মাথার পরে পরবর্তী বছর দশেক
এলার্ম ঘড়ির রাশি পড়েছিল প্রতিদিন প্রতিরাত ধরে,
হুহুতর কর্ত্রী কেটে তিনবার বার বার অসফলভাবে
চেষ্টা ছেড়ে বাধ্য হ'ল দোকান খোলার
প্রাচীন মুক্তাপা বস্ত্র বেচে রোজ যারা
কেঁদেছিল নিজেদের বরস বাড়ায়,
ম্যাডিসন এভিন্যুর সীসাভারী পন্ত বিস্ফোরনে
লৌহ সৈন্য ফ্যাশানের ঘর্ ঘর্ ইস্পাতী আওয়াজে
বিজ্ঞাপক পরীদের নাইট্রোগ্লিসারিন্ কাটা উলঙ্গ চিৎকারে
প্রবন্ধক বুদ্ধিমান যন্ত্র সম্পাদকের সরমে ধোঁয়ায়
পুড়লো জলন্ত যারা ধবধবে ফ্যানেল কাপড়ে
কিংবা চাপা পড়ে গেল পরম ব্রহ্মের মস্ত চ্যাপ্টির তলায়,

উত্তরসূরী

ক্রুকলিন ব্রীজ থেকে, সত্য ঘটনা এটা, ঝাঁপ দিয়ে যারা
হেঁটে গেল হতভাগা অবিদিত বিস্মৃতের দল
চীনে পাড়া ছোল গলি** লরীদের প্রখর আলোয়
সেল' নাকো শুধু মাত্র এক পোঁটা অমনি বীয়ার,

ঘরের জানলা ধারে গান গেয়ে নিরাশায় যারা
উপপথ জানলা থেকে ঝাঁপ মেল নোংরা পাশোক্'এ
লাফালো নিগ্রোর ঘাড়ে কেঁদে ঘুরে সারা রাজপথ
খালি পায়ে নেচে নেচে ভাঙা মদ গেলাসের 'পরে
গুঁড়িয়ে জার্মান জ্যাজ গ্রামাফোন রেকর্ড ত্রিশের
ইঞ্জিনের কানফাটা শিস্ আর কানেতরা শোককরা নিচে
হুঁচ পান ক'রে শেষে মর্মভেদী আর্তনাদ ক'রে
বমিতে ভাসালো তারা রক্তে লাল পাইখানা ঘর,

অতীতের প্রশ্ন যাত্রা দিয়ে যারা গড়াতে গড়াতে
যাত্রা করে একে অন্ত জীবনে দেখার
বন্দীশালা নির্জনতা, তপ্ত রুশ-ভূমি আগরন
অথবা বার্মিংহামে** জ্যাজ-অবতার,

যাহাতর ঘন্টা ধ'রে এক হতে অন্ত প্রান্ত ঘুরে
পাড়ী ক'রে খোঁজ করে পেয়েছি কি আমি
পেয়েছ কি তুমি কিংবা পেয়েছে কি সে
অনন্তের কোন খোঁজ কোন এক দিব্যদৃষ্টি মাঝে,

যারা গেল ডেনভারে মরে গেল ডেনভারে শুধু বারবার
ফিরে এল ডেনভারে রাত জেগে ডেনভারে বৃথা অপেক্ষায়
চিন্তা আর একাকীর নিয়ে যারা ডেনভার ঘুরে পরিশেষে
ছেড়ে গেল ডেনভার একেবারে সময়-সন্ধানে
এখন ডেনভার ফাঁকা একা তার নায়ক হারিয়ে,

আশাহীন নির্জাগৃহে হাঁটু গেড়ে ব'সে ব'সে যারা
একে অন্ত জীবনের বন্ধ-আলো মুক্তির প্রার্থনা
করে যাতে আত্মাদুল আলোকিত হয় এক ক্ষণ,

চায় ক'রে নিতে কোন আধ্যাত্মিক অভ্যাসের এক
যারা গেল মেক্সিকোয় অবসর নিয়ে
কিংবা রকি-মাউন্টেন-এ তে কোমল গৌরবে,
হাইডার্ভে নার্সিসাস, তাহিতায়ে হেসে,
দক্ষিণ প্রশান্ত[১] থেকে কালো কালো ট্রেনে,
সমাধি বা ঘাসফুল ঘাসে উড়ন্তনে,

কয়েদখানায় বসে মন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে
স্বর্গকেশী অসম্ভব অপরাধী অপেক্ষায় যারা
বাস্তবের মোহমন্ত্র বুকে নিয়ে বিষণ্ণ বেলায়
গান গেল[২] মিষ্টি সুরে আলকাত্রেজে[৩],

রেডিও বিজ্ঞপ্তে যারা সম্মোহন অভিযোগ এনে
দাবী করে বেতারের স্বপ্নতা বিচার
দাঁড়ায় বিচার শেষে ফাঁসিকাঠে খোলা বুকে মেলে
দেহে মনে অসুস্থতা নিজেদের দুটো হাত নিয়ে,

আলুদম ছুঁড়ে দিয়ে দাঙ্গাবাজী বক্তাদের দেহে
কামিয়ে মাথার চুল, অনর্গলভাবে
আত্মহত্যা-কথা ব'লে ভাঁড়ের ভাষায়
দাবী করে লোবোটমি অবিলম্বে যারা
প্রীনাইট সিঁড়ি ভেঙে পাগলা গারদে,

পরিবর্তে পেল যারা ইনসুলিন, ইলেক্ট্রিসিটি,
হাইড্রোথেরাপী আর সাইকোথেরাপী,
মেট্রাসল, সিংপং বৃত্তীয় থেরাপী
আর কালো অন্ধকারের জমাট শূন্যতা,

৩০পাগলামি পাড়ে খাড়া সিংপং প্রতীক টেবিল
বেরসিক প্রতিবাদে উল্টে দিয়ে যারা
অনেক বছর পরে ফিরে এলো টাক মাথা নিয়ে
কারা আঙুল রক্ত পরচুলা প'রে
উন্মাদ প্রহরী যেন পূর্বদেশী উন্মাদ নগরে,

"একলাও গ্রে হৌন ভার্থবাসীদের পুণ্য দেশে
গর্ভস্থ ভ্রূণের মত আবৃত দালানে,
আত্মা প্রতিধ্বনি সাথে মারামারি ক'রে
প্রাগৈতিহাসিক প্রেমহারা পাথরের
মধ্যরাত্রে গড়াগড়ি জনহীন বেদির উপর,
জীবনের স্বপ্ন যেন ভীতিপ্রদ দুঃস্বপ্ন জীবন
শরীর পাথর হয় ভারী যেন চাঁদের মতন,
মা'র—পরিশেষে, ভাড়াটে জানলা থেকে ছুঁড়ে
কাল্পনিক শেষ ইট, শেষ দরজা ভেঙে
বন্ধ ক'রে দিল এঁটে চারটের সময়,
কথা শেষে টেলিফোন শেষবার দেয়ালে ঝুলিয়ে,
আসবাবী শেষ ঘর থেকে খালি আসবাব মনের
ছোট ঘরে মোচড়ানো তারে বাঁধা হলদে গোলাপ
কাগজের ফুল তবু সেটা মাত্র কল্পনার ফুল
ফাঁকা সব এক টুকরো আপাদের মতিভ্রম ছাড়া:—
তুমি নিরাপদ নও যদি, আমিও তো নিরাপদ নই,
এখন সত্যই তুমি খাও হাবুডুবু
সময়ের সর্বগ্রাসী মাংসের ঝোলে—
আর যারা, এইজন্য, ছুটে গেল আত্মার ঘরকে
অভিভূত কিমিয়ার আকস্মিক ঝলকানি খেয়ে
উপবৃত্ত মাপঘর কম্পমান সমতল ক্ষেত
নামের তালিকা ফর্দ শরীরের অপরসাধনে,
সময় ও স্থান মাঝে পেতে দিয়ে শারীরিক ফাঁদ
ছ চক্ষুর ছায়া মাঝে ধরে যারা আত্মা দেহমুক্ত
নাচিয়ে মৌলিক ক্রিয়া বিশেষ-চেতনা
সত্য শিব সুন্দরের শিহরন সাথে,
আবার নূতন রূপে সৃষ্টি ক'রে বাক্যের রচনা
মেপে নিয়ে মানুষের দীন ক্লান্ত ভাষা
দাঁড়িয়ে তোমার সামনে বাকাহীন লজ্জানত মুখে

প্রত্যাখ্যাত তবু আত্মা দেহ থেকে ছিঁড়ে
সম্মতি জানায় চিত্ত ছন্দ নয় মাথে,
দেবদূতী তরবারে পরাজিত সময়ের কাছে
তবুও এখন তারা এখানেই ব'লে চ'লে যায়
যা বলা হয়ত যেত দুত্যাপারে অন্ত সময়
আধার ফিরলো যারা ভূতুড়ে জ্যাজ্‌এর সাজ পরিধান ক'রে
পুনর্জন্ম নিয়ে যাও-সোনালী-ছায়ায়
নয়নমনা আমেরিকা প্রেমকারা সানাই-এ ফুঁ দিয়ে
কাঁপিয়ে সমগ্র দেশ নগরীর অস্থির বেতারে
"এলি এলি লামা লামা সাবাক্তানি"*** সুরে
জীবনের কবিতার গোটা প্রাণ নিজ দেহ থেকে
ছিঁড়ে হয় কুচি কুচি, খাওয়া যাবে হাজার বছর।

দুই

এ্যালুমিনিয়াম সিমেন্টে গড়া কে এই সিংহীদুতি নারী
খুলি গুঁড়ো ক'রে খেল দুই হাতে তাদের বুদ্ধি ও কল্পনা ?
মোলক* ! মরলা ! নিষ্কৃতি। বিশ্রী। জঞ্জালময় না-পাওয়া টাকা !
শিশু সিঁড়ি পাশে ! বাগানে বৃদ্ধ। বালকেরা কাঁদে সৈন্যদলে !
মোলক্ ! নিষ্ঠুর। কড়া বিচারক ! পাগলের ভূত-স্বপ্ন তারী !
অবোধগম্য বন্দীগৃহ ! দুখ-কংগ্রেস আত্মাহীনা !
মোলক্। শীতক যোদ্ধা ! যুদ্ধের পাথর ! সৌধ বিচার যার।
যেদিনে তৈরী মন ! দেহ যার রক্ত শুধুই সচল টাকা !
নরখাদী ডায়নামো যার বুক ! আঙুল দশটা বাহিনী সেনা।
হাজার অন্ধ জানলার চোখ ! কান ঘোরাতরা কবরখানা !
মোলক্ ! যাহার কলকারখানা চেঁচিয়ে স্বপ্নে ফুরালো যাতে !
আকাশচুম্বী বড় রাস্তায় দাঁড়ায় অশেষ জোহোভা যেন।
ধোঁয়া মেঘ আর আকাশচারের মুকুট নগরী মাথার পরে !
মোলক্। যাহার প্রেম সীমাহীন তেল ও পাথর ! আত্মা শুধু
তাড়াতাড়া নোট, ইলেকট্রিসিটি ! দারিদ্র্য উপদেবতা প্রেত।

উত্তরসূরী

মোলক্! যাহার নিয়তি লিপিবিহীন হাইড্রোজেনের মেঘ।
যন যায় নাম সেই মোলকেতে আমি বসি একা সংজ্ঞাহীন।
যেখানে স্বপ্নে দেখি দেবদূত! যোগী ও পাগলা মোলকে আমি।
মোলক্! যে বহু বৎসর আগে ঢুকেছে আমার আত্মা খুঁড়ে!
মোলক্! যাহাতে আমি যেন এক দেহহীন খাঁটি চেতনা শুধু!
মোলক্! মোলক্! যে ভরে তাড়ালো আমার প্রকৃত দুর্ধাবেশ!
যাকে ত্যাগ করি। ঘুম ভাঙে যাতে। আকাশ নিংড়ে আলোক নামে।
মোলক্! মোলক্! যান্ত্রিক যাড়ী। অদৃশ্য সব সহস্রতলী!
হাড় কোষাগার। অন্ধ নগরী! আসুরিক শ্রম শিল্প সারি!
ভূতে পাওয়া দেশ। পাগলা গারদ! এনাইট্ বীচ! ঘৃণা বোমা!
শিরদাঁড়া তারা ভাঙলো। তুলতে মোলক্ দেবকে স্বর্গাসনে!
গাছ ও রেডিও ফুটপাথওলা নগরী উঠলো স্বর্গোপরে!
প্রতি মুহূর্তে যে স্বর্গ ঢাকে আমাদের তার মায়াবী জালে!
শুভ অশুভের লক্ষণ! মায়া! হর্ষ। ঘটনা অলৌকিক!
স্বপ্ন! ভক্তি! দীপালি। ধর্ম! উপলক্ষ দর্শনের!
এ সংবেদনশীল সমস্ত দাঁতের গোধূর ডুবলো নদে!
মাটীর মাধ্যাকর্ষণ গুঁড়ো! ক্রুশবিদ্ধরা প্লাবনে ভাসে।
উচ্চচিন্তা! মহান ধর্ম! জীবন কলসী নিরাশাভরা!
দশ বছরের আত্মহত্যা। পাথর চেঁচানি আকাশ ফাটা।
সময় পাথর চুরমার মন! উন্মাদ যুগ! নূতন প্রেম!
প্রকৃত পুণ্য হাসি নদীজলে! দেখে নিল তারা দেখলো সব।
বন্ধ চক্ষু! ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি! করল বিদায় গ্রহন তারা!
আকাশচুম্বী উঁচু ছাদ থেকে লাফ দিল তারা নিশ্চিন্তি মনে!
দুহাত ভর্তি সোনা সোনা ফুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাতাস কেটে
ডুবলো নদীর অতল গর্ভে। পড়লো নগরী রাস্তা পরে।

তিন

কার্ল সলোমন! তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে তুমি যে আমার থেকেও খুব বেশী উন্মাদ

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে তুমি যে অনুভব করো অদ্ভুত অনুভূতি
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে কারো যে আমার মা'য়ের আত্মা অনুক্ষণ
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে তুমি যে হত্যা করেছে বারোটা সেক্রেটারী
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে তুমি যে হেসে কুটি কুটি এই অদৃশ্য বলে
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে আমরা লেখকেরা লিখি একটি সূত্র লিখে
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে বেতারে ঘোষিত তোমার অবস্থা গুরুতর
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে পুলির দারোয়ান হেসে চেতনার লোকাগুলো
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে চা-পান করো উটকার আইবুড়োদের ক্লাবে
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে লোহার লোহাকে গা এঁটে ক'রে ওঠে।
অতলস্পর্শী গভীরতা-গড়া টেবিল পরে
প্রকৃত সত্য পিংপং খেলা হেরে যাও বারে বার
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে বিরাট ঢাকে ভাড়ি মেরে ক'রে ওঠে চিৎকার
তলহীন মানব আত্মা অমর সে যে
অন্তত মরণ কেন হয় তার কারাগারে পাগলার
তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারে
যেখানে তোমার আত্মা হঠাৎ খেয়ে পলাশ শব্দ
অতলস্পর্শে জল-সন্তান তীর্থ থেকে
খুঁজেও পাবে না কোনদিন আর শরীরে ফেরার পথ

উত্তরসূরী

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে তোমার ডাক্তারদের ডেকেছ পাগল ব'লে
ইতালী সমাজতন্ত্রবাদীর সুসুপ্ত বিপ্লবে
স্বপ্ন দেখেছ স্বদেশী ক্যাসিষ্ট গোলগোথা মরা হাড়ে

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে কাটাবে লং আয়ল্যাণ্ডের স্বর্গ দুষ্কাক ক'রে
পুনর্জন্ম দেবে যে আবার যীশুর ভ্যাক্ত দেহে
পৃথিবী মাটীর নীচে সুগভীর স্বর্গীয় গোড় থেকে

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে তোমার পঁচিশ হাজার উন্মাদ কমরেড
একসাথে গায় দিন শেষ হ'লে উচ্চ সুরে
শেষ ইাজার শেষ কর লাইন ইন্টারন্যাশনাল

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে আমরা শেষের তলায় যুক্তরাষ্ট্র ঠোঁটে
চুমু খাই আর দুহাত জড়াই নরম দেহে
যে দেহ কাঁদিতে সারারাত কাঁপে ঘুম আসে না কো চোখে

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
যেখানে আমরা জেগে উঠি যেন ইলেকট্রিকের শকে
ঘুম গুঁড়ো হয় নিজের আত্মা-বিমান রবে
দেবদূতী বোমা ফেলে দেয় তারা বাড়ীর ছাদের পরে,
হাসপাতালের সারা দেহ ঘিরে দীপালি জ্বলে
কল্পনাগড়া হাজার দেওয়াল হয়ে যায় চুরমার
রোগা দেহ নিয়ে 'লিবিয়ন' ছোটে দরজা খুলে
হে বিজয়ী তোলো ইজের সেলী সবাই স্বাধীন আজ

তুমি আর আমি দুজনে আমরা পাগলাগারদে
আমার স্বপ্নে কেন্দ্রা জানা গারে দেখি তুমি হেঁটে যাও
সারা আমেরিকা সাগর যাত্রা পাড়ির শেষে
পশ্চিমী রাতে আমার দুয়ারে এলে'জলভরা চোখে।

FOOTNOTE TO HOWL

পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য!
পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য! পুণ্য!

পুণ্য পৃথিবী! পুণ্য আত্মা। দেহের চর্ম পুণ্য!
নাসিকা পুণ্য। জিহ্বা। হাত নিতম্ব পুণ্য!

পুণ্য সবই! পুণ্য সবাই। সর্বস্থান পুণ্য!
দিনের জন্ম অনন্তে। প্রতি লোক দেবদূত পুণ্য।

পুণ্য দেহের মতই শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দূত পুণ্য!
পুণ্য পাগল মতই তোমার আমার আত্মা পুণ্য!

পুণ্য মুদ্রলিপি ও কাব্য। কণ্ঠস্বর পুণ্য!
পুণ্য সর্ব শ্রোতৃবর্গ! হর্ষোল্লাস পুণ্য!

পুণ্য পিটার! পুণ্য এলেন **! আর সলোমন পুণ্য!
বারোম ক্যানিডি হাঙ্ক কেরোয়াক আর লুসিয়েন ** পুণ্য!

অজ্ঞাত বেটা পুণ্য! ভিখারী দীন দরিদ্র পুণ্য।
পুণ্য কুশ্রী মস্তকধরী। আমার জননী পুণ্য!

উন্মাদ কারাগারে! ক্যানসাসে ঠাকুর্দাদীক্ষ পুণ্য!
পুণ্য শানাই আর্তনাভরা! স্বরের লহরী পুণ্য!

জ্যাজ সংগীত গাঁজা আসক্ত হতভাড়ারা পুণ্য!
পুণ্য শান্তি! পুণ্য রাবিশ! তবলা ঢোলক পুণ্য!

পুণ্য সৌধ আকাশচুম্বী। নিভৃত রাস্তা পুণ্য!
লক্ষ লক্ষ মস্তকভরা রেস্তরাঁ কাফে পুণ্য!
রাজপথ নীচে মস্তকময় অশ্রুর নদী পুণ্য!
জগন্নাথ ও মধ্যবিত্ত-ভেড়ার বাচ্চা পুণ্য।

বিদ্রোহী মেষপালক রাখাল মত্ত পাগল পুণ্য।
'লসেজেলেসই লসেজেলেস' মন্ত্র যাদের পুণ্য।

সানফ্রানসিস্কো ও পিওত্রা প্যারিস সিটিস্ মতো পুণ্য!
মিউ ইয়র্ক ও তাঞ্জিয়ার্স ও ইস্তানবুল পুণ্য।

উত্তরসূরী

দিনে অনন্ত অনন্তে দিন পুঞ্জের ঘড়ি পুণ্য !
সার্বজাতিক পঞ্চম আয়তন চতুর্থ পুণ্য।
স্বর্গীয় দূত মোলকুএ সাগর মরু রেলরোড পুণ্য !
ক্ষমা ও মুক্তি। দান উদারতা। দয়া বিশ্বাস পুণ্য।
আমরা ! স্নেহরা ! মহানুভবতা ! দুখ যন্ত্রণা পুণ্য !
অতি প্রাকৃত অতি উজ্জ্বল দয়া আত্মার পুণ্য !

সান্‌ফ্রানসিস্‌কো
১৯৫৫-৫৬

Glossary on HOWL

Specially written for this translation :
by Prof. Thorne Shipley.

El— This is short of Elevetor, i. e. elevated trains (like the tube trains) which used to run all through New York City, and hide the streets ; hence, a cover for all life, crime, love birth and death ; a sort of black cloud, almost invariably a symbol of dirt and evil in American literature. Also noise.

Arkansas—This is generally considered a poor, ignorant and ugly state. It is in the South, and so has an aura of opression about it, but this may not be so here. However, Arkansas—Blake does set up a possibly interesting contrast.

৩. Laredo—A border city between U. S. A. and Mexico, notorious for a great many years for gambling, fights, branding, and like.

Paradise Alley—This the "street" along which one seems to be walking under the influence of some drug ; hence, it is fictive, ephemeral and pathological.

Paterson—This the city outside of New York City in which Ginsberg was born and grew up. For most New York intellectuals, at least, the city has an air of lasciviousness and of ugly—not beautiful—poverty about it. It has burlesque shows and the like which New York did not have, and supplies N.Y. with a great deal of labor. It is also known to be surrounded by very ugly country, and has the connotation of a community which didn't quite make the grade, with a populus who tried for the big city and failed. This is true about almost all the cities in Jersy near to N. Y.

Peyote—This is a drug, first discovered in use by the American Indians. It is a plant which, I believe, is smoked like opium. It is one of the least harmful of all the so-called drugs and dopes. It is not habit-forming and the addict never committs an act of violence or other affronts under its influence.

Brooklyn—This is one of the five boroughs of New York City (the others : Bronx, Manhattan, Queens and Richmond) Thus, it is about 1/5 of the city. It has, however, a special reputation of the utmost linguistic slovenliness. Now it has become, in part, a region of slums and crime. Its history is very complex, but suffice it to say that because it was populated by people of many different nationalities and religions, it is a terribly heterogeneous region, and I think, at least considering the people in N. Y. C. of European nationality, represents the peak of dynamic struggling between various cultures. The rate of cultural change here is faster and the changes more marked than N. Y. C. . It is not impossible that Ginsberg intends some inclusive reference to this.

Battery—This is—or was—a little park at the foot of Manhatten (which is an island, of course) and so

borders on the bay. Its name comes from the fact that it was once a fort. I think that here, its only significance is that it is at one end of the borough.

holy—This is one of key words to the understanding of the philosophy of the beat. Ginsberg uses it mercilessly in "Footnote To Howl", and so do the others of his school elsewhere. They deal, as we must remember, with a very peculiarly American response to the dominant concepts of a moneytheistic society in which the value of a detergent or a tooth-brush is most unequivocally equated with that of a magnificent work of art, the common denominator, so to speak, being the mass acceptance. The characteristic reaction of the beat, in this sense, is not to associate with the rat-race of the acquisitive society, but to dissociate. The beat is always on the look-out for the phoney deceit, such as the Ad-man, who is the most authentic expression of this affluent society. When the beat dissociates, he does so wholesale; cutting himself away from the society is only the beginning the culmination of which takes the fullest expression in his own creative act—the search for an ecstatic moment whether in narcotic drugs, sex, jazz, or mystic experience—and in his unambiguous attitude to, or rather his colossal contempt for academicism in the arts. Hence his heroes are : Charlie Parker (Bird), Dylan Thomas, Wilhelm Reich, Hemmingway, D. H. Lawrence, Henry Miller, James Dean, Huddie Lead better, Bix, Buddy Bolden; disinherited but self-fulfilling, condemned but ecstatic, dissociated but intransigent artists. In revolting against the values of a society which is acquisitive, affluent and money-theistic his reverence for poverty, his detachment from material grandeur and his olympian non-covetousness have taken the forms of almost an oriental magnitude.

Indeed, his stupendous insouciance to the indigenous values of a culture, basically material, can provide a sociologist engaged in Motivational Research with a first class material for an inquiry into the nature of human dissociation and dissent. His quest for quintessential and direct-experience-in-itself makes any form of religious experience utterly inconsistent with the slick and push-button religion of a highly competetive, fast-selling and status-seeking society where the Admen for the organised religion speak of Jesus Christ as the "First Great Salesman" of the world Thus, the word 'holy', in this context, has a tremendous satirical impact which hits you clean between the eyes.

Bronx—This is at the other end of Manhattan, hence, the ride is long.

Bickford's—Famous chain of cafeterias in N.Y.C.; the best comparison is with London's Lyon's or A.B.C.

Fugazzi's—A private drinking-club.

Bellevue—Big public psychiatric hospital in N.Y.C.

Brooklyn Bridge—One of five bridges which connect Manhattan with Brooklyn . it is important to note that this was the favorite item to "sell" (i. e. swindle) to greenhorn tourists ; and, also, a favorite place from which to jump off to commit suicide. People have even jumped off for publicity sake to see if they could survive. Thus, the reference here is pretty obvious.

Empire State—This is the tallest building in N. Y. C. having 108 stories. One always hears jokes about "jumping off the Empire State" or "jump off..."

Atlantic City—This is a sea side resort in New Jersey known for its attractions to N. Y. business men and their conventions. It is an impossibly ugly place—prostitutes, call girls, dirty picture cards, gamblings etc., etc.

Newark—Again, a city just outside of N. Y. C. larger than Paterson. This city supplies several hundreds of thousands of manual workers and white collar labor to N. Y. C.

[Perhaps it will be apposite, at this stage of the Glossary, to make it perfectly clear that the references to all the places mentioned above and the ones to follow next are not full of private symbols and meanings for the poet and his friends. Ginsberg's friend Jack Kerouac in his novel "On The Road" presents a comprehensive picture of the attitudes and complexities of the Beat Generation. One of the most characteristic activities of these young people is to travel, mostly hitchhiking, across the face of America, from one end to the other, determined to pursue experience to its furthest ranges. For them places are means whereby they can track down their own unsubstantiality and measure their own nature in an ever-changing milieu. Their exploration,—if that is the word though the Beat Man would prefer 'dig',—symbolises that of the self—an all-pervasive self that is exhausting all its resources trying to get closer to the experience which, in turn, must undergo destruction and replacement by the immediate and intense contact with the shifting scene ; and scene may be loaded with emotion, but it is, after all, apparently sedentary ; and the Beat Man, in spite of his perpetual celerity and motion, is back to where he started from, though he is always 'on the move'. This conceptual profundity gets the full treatment from Ginsberg, who with a beautiful variation of mood, emotion and memory howls the poetic imageries with an unforgetable lucidity. He is in complete command of his medium here, and his artistic mastery is absolutely brilliant. The words seem to leap off the pages ; you can almost touch them.]

Kansas & Idaho—Two mid-western states.

Baltimore—A fairly big southern port.

Chinaman of Oklahoma—a flash millionaire.

Houston—The capital of Texas.

Union Square—New York City's equivalent to Hyde Park Corner in London where all the radical open air speeches used to be made. This differs from Hyde Park Corner in that many of the head quarters of the radical parties were on or near to the Square. Now the speeches are illegal.

Los Alamos—The major atomic bomb research station in New Mexico.

Wall—This is the Wall Street of N. Y. C. where all the great banking concerns and the stock exchanges are.

Staten Island—This is another name for the borough of N.Y.C. called Richmond. It lies between Manhattan Island and the Ocean, and has the reputation, for the New Yorkers, of a lark vacation spot—to scoot over for a few hours by Ferry. The ferry is the only pleasant ride, by boat, to and from Manhattan. Also, it was the cheapest ride in the city, until just a few years ago.

২৬. gyzym—This is not a word. It is simply Ginsberg's own way of expressing the inexpressible last instant before the loss of consciousness. It is a state of mind which only an unpronouncible word-symbol can express.

Colorado—A far-western state.

Denver—The capital city of Colorado. This is a sort of stop-off point—coming from East to West—because it is the last city before the Rocky Mountains.

Manhattan—This is the major Borough of N. Y. C.—and is usually meant when people say N. Y. C. without specifying any particular section.

Tokay—This is a Hungarian wine.

Third Avenue—A long boulevard in N. Y. C., known for its elevated train, poverty, foreigners etc. Now the train is gone, and it is becoming a swank neighborhood.

Harlem—The negro ghetto of New York City.

Chinatown soup alleys—One always goes to Chinatown (a large oriental community in N.Y.C.) to have soup—it is so good. And the streets are all narrow alleyways.

Passaic—This is, indeed, a filthy river running through New Jersey.

Birmingham—This is a city in Alabama. The Birmingham jail figures widely in American folklore.

Alcatraz—This is the most severe Federal prison on an island off San Francisco, where only the most wretched people or some political prisoners are sent. By these latter I mean some conscientious objecters.

Southern Pacific—A great train line Eastern U. S. A. to California on the southern route.

Catatonia—A stage of manic-depressive insanity, wherein the patient in great distress becomes rigid and immobile—completely afraid to move at all. Patients are known to stay like this for many months at a time.

Rockland & Greystone—Major N. Y. state hospitals for the mentally ill.

Long Island—A big island just and beyond Queens (N. Y. borough) which is a mixture of wealthy resort homes and mass produced communities.

eli eli lamma lamma sabacthani—"Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, Lama sabacthani ?

that is to say, My God, My God, why hast thou forsaken me ?"

—St. Matthew, XXVII.

Moloch—Canaanite idol to whom human sacrifice was made.

Allen—Allen Ginsberg. He writes this of himself : "...High school in Paterson till 17, Columbia College, merchant marine, Texas and Denver, copyboy, Times Square, amigos in jail, dishwashing, book reviews, Mexico City, market research, satori in Harlem, Yucatan and Chiapas 1954, West Coast 3 years. Later Arctic Sea trip, Tangier, Venice, Amsterdam, Paris, read at Oxford, Harvard, Columbia, Chicago, quit, wrote KADDISH 1959, made tape to leave behind & fade in Orient a while. Carl Solomon, to whom HOWL is addressed, is an intuitive Bronx dadaist and prose-poet."

Solomon, Lucien, Kerouac, Huncke, Burroughs, Cassidy. They are all his friends.

[HOWL was published in 1956 when Ginsberg was 30. Its publication received an unusual and widespread publicity as, subsequent to publication, it was confiscated by U. S. Customs and San Francisco police, and its sale was banned on the grounds that the work was "lewd and obscene". After a long and intense court trial at which outstanding literary critics, a series of poets and prominent writers convinced the court that far from being obscene, it was one of the most profound comments on human experience. Judge Clayton W. Horn, declaring HOWL to be not obscene, wrote in his decision : "Life is not encased in one formula whereby everyone acts the same or conforms to a particular pattern. No two persons think alike. We are all made from

the same mould, but in different patterns. Would there be any freedom of press or speech if one must reduce his vocabulary to vapid innocuous euphemism? An author should be real in treating his subject and be allowed to express his thoughts and ideas in his own words."]

(আমার ছিন্দ আমেরিকান বন্ধু ডক্টর ধর্ম বিপ্লবে ও তাঁর স্ত্রী শিপ্রার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল। তাঁদের সাহায্য না পেলে এ অনুবাদ কখনই সম্ভব হ'ত না।)

অনুবাদ : মিহিরকুমার গুপ্ত

জাপানী কবিতা

বজ্রের শব্দ যদি হয়
মেঘে আকাশ আঁধার করে বৃষ্টি যদি পড়ে
তাহলেও তুমি থাকবে আমার পাশে
যদি মেঘ না ডাকে
বৃষ্টিও পড়ে, তুমি যদি বল
তোমার পাশেই আমি থাকব।

(হিটোমারো সঙ্কলন : অষ্টম শতাব্দী)

বলেছিলে, তুমি আমাকে
ভুলবেনা—সেগুলি শুধু কথাই
যা এখনও রয়েছে
তা হল আকাশের সেই ভরা চাঁদ
সেদিনকার রাতের মত
যা আজও উঠেছে আকাশে।

(ফুজিওয়ারা নো আরি : ১১৫৫-১২১৩ শতাব্দী)

অনুবাদ : দিলীপ দত্ত

জর্মন কবিতা : বারটোল্ট ব্রেখ্‌ট

Erster Psalm : প্রথম পুজার গান।

রাত্রিতে এই কালো জমির স্ফীত অবয়ব কী ভয়াবহ !
পৃথিবী ঘিরে রয়েছে মেঘমণ্ডলী, তারা পৃথিবীরই। মেঘের ওপারে কিছু নেই।

পাথুরে জমির ওপর সঙ্গীহীন গাছটির নিশ্চয় এই বোধ আছে যে সবই ব্যর্থ। সে এখন পর্যন্ত অন্য কোন গাছ দেখে নি। আর কোন গাছ নেই।

রাত্রিতে যখন কোন নক্ষত্র একা একা ডুবে যায়, আমি সর্বদাই ভাবি, আমাদের কোন কিছু লক্ষ না করাই ভাল।

৫. উক্ত বাতাস ক্যাথলিকের সঙ্গে যুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

৬. আমি ভীষণ নিঃসঙ্গভাবে এগিয়ে এলাম। আমার কোন ধৈর্য নেই। ঈশ্বরবিশ্বাসী আমাদের দ্বন্দ্ব ভ্রাতা পৃথিবী সম্বন্ধে বলল : এতে কিছুই আসে যায় না।

আমরা এক নক্ষত্রলোক থেকে অপর ছায়াপথে দারুণ দ্রুতবেগে ধাবিত হই। পৃথিবীতে অতলান্ত শান্তি ছেয়ে থাকে। আমার হৃদয় প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া সব ঠিকই থাকে।

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen

: সকালের জানালায় প্রথম তাকান

সকালের জানালায় প্রথম তাকান
সেই বারবার খুঁজে পাওয়া পুরনো বই
জুলায়ের উচ্ছ্বাস, ঋতুবদল
খবরের কাগজ
হুহুঙ্কার
বিদ্রোহী শাওয়ার, সন্তরণ

উত্তরসূরী

প্রাচীন সঙ্গীত
পরিপাটি আরামের জুতো
নতুন সঙ্গীত
লেখা,
রোপণ, ভ্রমণ
গান
বন্ধুবৎসল হওয়া।

Boser Morgen : রাগী সকাল

শহরের পরিচিত সৌন্দর্যের সেই শাখা বিপুল গাছটি
আজ বৃদ্ধ শয়তান এক। আর নেই
বাসন-ভোবান পানা পুকুর, অস্পৃশ্য।
আর লম্বা লম্বা কাশফুল ঢাকা লাল ঘাস খুন
গর্ভবতী, মূল্যহীন।
কেন ?
গতকাল রাত্রে স্বপ্নে আমাকে আঙুল
উঁচিয়ে দেখাল যেন আমি কুষ্ঠরোগী।
আর আঙুলটা নষ্ট হল,
ভাঙল।'
অজ্ঞান তিমিরে আমি অপরাধ সচেতন হয়ে
কেঁদে উঠলাম।

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ : অসিত দত্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন যে কবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জানাশোনা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং যাঁরা তাঁদের বাড়ীতে থাকতেন বা প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন তাঁদের pencil sketch আঁকতেন। শুনেছি খেয়াল বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে তিনি যে সব পেন্সিল স্কেচ করেছেন তার সংখ্যা প্রায় ২৫০০/৩০০০। তিনি কোন রঙীন ছবি এঁকেছেন কিনা জানিনা, অন্তত আমি দেখিনি। এই বিপুল পরিমাণ স্কেচের অনেকটাই এখন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির আয়ত্তে এসেছে। এর থেকে মাঝে মাঝে তাঁরা কিছু কিছু স্কেচের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ফলে জনসাধারণ এগুলি দেখার সুযোগ পায়। আমি শুনেছি যে গত বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁরা এক প্রদর্শনীতে এই স্কেচগুলির কয়েকটা জনসাধারণের গোচরে আনেন। ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসের শেষে অবনীন্দ্র-পরিষদ নবপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দোতালার হলে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কুড়িটি পেন্সিল স্কেচ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পেন্সিল স্কেচ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে তা অবনীন্দ্র-পরিষদের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে যে কুড়িটি স্কেচ দেখান হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে লেখা। আমি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি কর্তৃক গত বছরে অনুষ্ঠিত স্কেচের প্রদর্শনী দেখিনি। এই স্কেচগুলি দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কনরীতির যে সব বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে সেগুলি হচ্ছে :

(১) সবগুলি স্কেচই শুধু মুখ (মাথা থেকে গলা পর্যন্ত) দেখান হয়েছে

(২) সব স্কেচই মুখের বাঁদিকটা দেখান হয়েছে। কাউকেই ডানদিক থেকে বা সামনা সামনি (অর্থাৎ frontal view) দেখান হয়নি।

(৩) মোট কুড়িটি ছবির মধ্যে একটি বাদে ১৯টি ছবি দেখলে একথা মনে

হয় যে স্কেচগুলি খুবই তাড়াতাড়ি আঁকা। বোধ হয় দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এক একটি স্কেচ শেষ (?) করা হয়েছিল।

(৪) (ক) এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে অনেক স্কেচই এত তাড়াতাড়ি আঁকা যে স্কেচগুলি সম্পূর্ণ হল কিনা চিত্রকর তাও দেখেননি ; যেমন শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি—শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঁ চোখ ভালো করে আঁকা হয়নি। আর তারকনাথ পালিতের বাঁ গালের দাড়ির মাঝের arcটাও। এরকম আরো আছে।

(খ) তিনি কয়েকজন বন্ধুর ছবি একাধিকবার এঁকেছেন—যেমন লোকেন পালিতের। তাঁর একটা ছবি দেখি ১৮৮৮ সালে, পরেরটা স্যার তারক পালিতের সঙ্গে ১৮৯১ সালে আঁকা। দুটো ছবিই যদিও একই ব্যক্তির তবুও স্কেচ থেকে তারা যে একই লোক তা চেনা যায় না। তিনবছরে লোকেন পালিতের দাড়ি হয়েছে দেখা যায়, তবে তাতে একজনের মুখ একেবারে বদলে যায় না।

এরকম আরও আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের দু-তিন বছর অন্তর অঙ্কিত স্কেচগুলি। এতেও facial semblance কম।

এই স্কেচগুলি দেখলে বোঝা যায় যে অবসর বিনোদনের একটা খেলা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সব স্কেচ এঁকেছেন। মনে হয় যে তাঁর হাতের কাছে drawing কাগজ ও পেনসিল সর্বদাই মজুত থাকত এবং যখনই কাউকে স্কেচ করার তাঁর ইচ্ছে হোত তখনই তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর মুখের বাঁধিকটা স্কেচ করতেন। খুব সম্ভব এই অঙ্কনরীতি তিনি কোন অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে শেখেননি বলে (এবিষয়ে ভুল হলে কোন ওয়াকিবহাল পাঠক জানালে কৃতজ্ঞ হব) তিনি নিজের চেষ্টায় মানুষের মুখের বাঁধিকটা শুধু আঁকতে শিখেছিলেন। তিনি বোধ হয় বন্ধুদের জন্যে এগুলি মাঝে মাঝে এঁকে তাঁদের দেখাতেন, হয়ত কখনও ভাবেননি যে এগুলি জনসাধারণকে দেখান হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে একটি কাগজের দুপিঠেই স্কেচ আছে (সম্ভবতঃ সে সময়ে হাতের কাছে বাড়তি drawing paper ছিলনা)।

একথা সকলই জানেন যে ভাল ছবি আঁকতে গেলে সুষ্ঠু কল্পনার সঙ্গে ভাল অঙ্কনরীতিও জানা দরকার এবং পরিশ্রমের সঙ্গে তাকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচগুলি দেখলে মনে হয় যে অধিকাংশ স্কেচ আঁকার সময় তিনি এই পরিশ্রম করতে চাইতেন না ; অন্তকথায় এগুলিকে

hobby হিসেবেই দেখেছিলেন, এগুলিকে শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে চাননি। কাজেই যদিও তাড়াতাড়ি আঁকা স্কেচগুলি উচ্চতম শিল্পের মর্যাদা কতটা পাবে জানি না, কিন্তু সে যুগের ঠাকুরবাড়ীবাসী ও সেখানে আসা যাওয়া করতেন এমন বহু লোকের portrait হিসাবে এদের documentary মূল্য যথেষ্ট। এ স্কেচগুলি দেখলেই "জীবনস্মৃতি" ও রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যান্য জানাশোনা চরিত্রগুলি যেন চোখের সামনে ভেসে বিস্মৃত এক যুগকে তুলে ধরে।

ওপরে কুড়িটি স্কেচের মধ্যে উনিশটির উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু একটি বাদ আছে—সেটি লীলা দেবীর—যত্ন সহকারে করা একটি competent ও অপূর্ব ড্রয়িং। এটি শুধুমাত্র স্কেচ নয়—একটি উঁচুদরের ড্রয়িং। অন্যান্য স্কেচের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য হল এই যে সেগুলিতে অঙ্কিত মানুষের character বা ব্যক্তিত্ব ততটা প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এতে হয়েছে যা portrait ড্রয়িং-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই ড্রয়িংএ কোথাও অযত্ন নেই, বা তাড়াতাড়ি শেষ করার কোন চিহ্ন নেই। সবটাই বেশ যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে করা। লীলা দেবীর চুল, সিল্কের কুরে, তাঁর খোঁপা আঁকতে পেন্সিলের contrasting স্ট্রোকগুলি খুব ভেবেচিন্তে হিসেব করে দিতে হয়েছে, যেমন দেখি সম্প্রতি প্রকাশিত "ছিন্নপত্রাবলী"তে ইন্দিরা দেবীর খোঁপায় বেলায়। লীলা দেবীর ড্রয়িং-এর কম্পোজিসনও খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ লীলা দেবীর কপোল, চিবুক ও কাপড়ের সমমুখী (echoing) ও বিপরীতমুখী রেখাগুলির উল্লেখ করা যায়। এখানে তাঁর (লীলাদেবীর) ব্যক্তিত্বও পরিস্ফুট। এইটি ও উপরে উল্লিখিত ইন্দিরা দেবীর ড্রয়িং দেখলে মনে হয় যে ইচ্ছে করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চদরের ড্রয়িং আঁকতে পারতেন এবং অবনীন্দ্র-পরিষদ যদি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কাজের নমুনা (সংখ্যায় তা যত কমই হোক) জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন তবে আমরা একজন ভারতীয় শিল্পীর আঁকা কয়েকটি উৎকৃষ্ট ড্রয়িং দেখার সুযোগ পেতাম। আশা করি, ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিটি এবিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। কেননা, ২৫০০।৩০০০ স্কেচের মধ্যে ভালগুলি বেছে নেওয়া নিশ্চয়ই কিছুটা সময় এবং ধৈর্যসাপেক্ষ।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

কবিতাবলী

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভাত্র

ভাত্র, তুমি যে মাস, তোমাকে নিয়ে
ভালো কথা বলে না কেউ।
তবুও তো টই-টম্বুর
জলা জোবা পুকুর বিল নদী
তোমার কেরায়
একবার নিয়ে এসো আমাদের ঘরে।
ভাত্রে
জানো এক কেরোসিনের বাতি
কোনো দিন শোনায় না প্রভাতী
তার আঙুলের রক্ত রক্ত-রেখা
সব শূন্য ভরে দেয়। একা
থাকবার স্বাদ।
রক্ত আর স্বেদ ঝরে। বিস্বাদ
হলেও তবু, তুমি ভাত্রে, তোমাকে জানাই
দ্বিধ-ভাত বিবাহ-বাসর আর শ্মশানের খাট ধরে তাই
বাজে তো বাজতে দাও সেই এক স্বরহীন রূপহীন
কথায় সানাই॥

গোপাল ভৌমিক

নিজের বন্ধু

মাটিটা নিকটে বড়, আকাশ সুদূর
বলেই কি সে আমাকে বারবার টেনে
ছবি আঁকা শিখিয়ে ও গানে দিয়ে সুর
প্রযোচিত করে যোগ নিতে তাকে চেনে।

হয়েছি গগনচারী। গ্রহে গ্রহে ফিরে
এসেছি যখন নেমে ধরার ধূলিতে,
হতাশায় ক্লীব মন কালো সে তিমিরে
দেখে সুর নেই, নেই কালিও তুলিতে।

অতএব সময়ের সীমা ভুলে তার
আদিম কামনাগুলি যদি মাথা নাড়ে,
যদি সে মাটিতে মাথা খোঁড়ে বারবার
পারবে কি ফিরে যেতে দুঃস্বপ্নের পারে?

পারলে হয়তো খুশি হত সে জীবনে
কিছু তারা আলোহীন হলেও গগনে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সুদেষ্ণার জন্মদিন

এইমাত্র পার্টি শেষ হ'লো। প্রত্যাবর্তনের মুখে
সুসজ্জিত সকলেই একবার ঠোঁটে হাসি এনে
বললো: 'তাহলে। ভারী ভালো লাগলো এবার এই
জন্মোৎসব।' কেউ কেউ আড়চোখে ঈষৎ কৌতুকে
দেখলো সুদেষ্ণা আর পুষ্ট দেহটাকে

কী ক'রে অমন মুগ্ধ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে
এবং কী ক'রে তার প্রৌঢ় স্বামী হরিবিষ্ণু রায়
সামাজিক ভব্যতায় বিজ্ঞাপিত ম্লান অভিনয়ে
অত্যন্ত নটের মতো অকৃত্রিম দাক্ষিণ্য ছড়ায়।

কেউই এখন নেই। ঘর শুদ্ধ, শান্ত অন্ধকারে
প্রাণ তার নিষিদ্ধিত আলোগুলো নিভলো যখন
এবং কাজের শেষে ঝি-চাকরেরা ফিরে গেল
যে-যার নির্দিষ্ট ঘরে। অন্ধকারে অলিন্দের ধারে
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো সুদেষ্ণা তখন
দাঁড়িয়েছে। হরিবিষ্ণু অন্যদিকে ঘরের শয্যায়
ফিরে গেছে; প্রৌঢ় বয়সের ঘুম চোখের পাতায়।

সুদেষ্ণা এখনো তার জন্মদিন প্রতিপালনের
হুর্ভেদ্য নিগড়ে বন্দী; হরিবিষ্ণু নিজেই উদ্যোগী
এবং যুবতী পত্নী সুন্দরী ও সুযোজিত ছলে
কোন্ না প্রৌঢ়ের মনে জাগে শান্ত বিদ্যুৎবিলাস!
সুদেষ্ণা সাতাশ আর হরিবিষ্ণু সপ্ততি পঞ্চাশ
তবু যেন জন্মদিন দাম্পত্যের মার্জিত আশ্বাস।

সুদেষ্ণা দাঁড়ালো এসে অন্ধকার বারান্দায়
একমুঠো জ্যোৎস্নার মতো। জন্মদিন তার
নির্জনে জাগিয়ে তোলে অন্য স্মৃতি। দেখা যায়
অদূরে বাগানে নীচে গাছে-গাছে ফুল
ফুটে আছে; হঠাৎ হাওয়ার তীব্রতায়
মুঠিমুঠি গন্ধ ছাড়ে সোনাপ কি বালতী বকুল।
সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে থাকে, তার মনে প্রাণে
তখন স্মৃতির ঢেউ, প্রেমার্তের সেই শান্ত মুখ
মনে পড়ে—যে প্রেমার্ত তাকে বহুবার
বলেছিল: 'তুমি ছাড়া আর কেউ জীবনে আমার
সত্য নয়, তুমিই আমার সত্যবার।'

সুদেষ্ণা এখনো ভাবে : প্রেমাংশুর এই ছিন্নতার
কী দরকার ছিল ? কুমারীর যুবতী শরীরে
যা কিছু গোপনলভ্য এবং লিপ্সিত
অন্তরঙ্গ সুষমায় তার সাড়া পেয়েও কখন
প্রেমাংশু তলিয়ে গেল, পায়লো না আর
প্রেমিকের মতো দীপ্ত, মহীয়ান হতে।
ভেসে গেলো প্রলোভনে সময়ের স্রোতে
উচ্চ খেতাবের মোহে ধনী শ্বশুরের পাত্র হতে।

সুদেষ্ণার জন্মদিন তাদাত্ম্যের স্মৃতি তর্পণের সেই দিন
যেদিন ঘৃণায় তার শুষ্ক হয় প্রেমিকের ঋণ।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সোনালি গম্বুজ

বাড়ির সমতল থেকে অনেক সিঁড়ি ভেঙে, প্রকাণ্ড
একটা জলস্তম্ভের মতো দেউলটা উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে ;
তার মধ্যদেহের শীর্ণতাকে ঢেকে ক্রমবিস্তারে কী যেন
সব লতাপাতা ফুলের উচ্ছ্বাসে। সোনালি মিনারে দুটি চোখ—
প্রজাপতির হাজারো ক্যামেরার চোখের মতো মায়াবী।

আনমিত চোখ দুটি যেন অপার করুণায় দেখছে আমাদের, দেখছে
আমাদের আকাঙ্ক্ষা—অক্ষমতা—অতৃপ্তি—লালসা—নির্বেদ !
দেউলটার পশ্চাৎপটের আকাশটা কী প্রাণময় উজ্জ্বল নীল !
সামনে তরাই-এর অরণ্যের প্রতিভাস। আমাদের পায়ের তলায়
লক্ষ পায়ে মাড়ানো ঘাস। দূরে দূরন্ত সমুদ্রের একটানা সোস্তানি।

দিনে দেউলটায় গা বেয়ে ঝরে নানা রঙের রোদের ঝর্ণা,
রাত্রে উন্মুখ আকাশটা সব কটি নক্ষত্রের রোশনাই জ্বেলে

উত্তরসূরী

বিস্ফারিত চোখে ওকে তাকে। আকাশের চোখ যদি থাকতো
আমাদের। কিন্তু এ-সবই প্রায় অর্থহীন হয়ে যেতে বসেছে।
কী একটা অচেনা অসুখের অজানা ভয়ে বিভ্রান্ত আমাদের মন।

সমতল থেকে অনেক সিঁড়ি ভেঙে রহস্যময় নিঃসঙ্গ
মেউলটার খুব কাছে এগিয়ে গেলে স্পষ্ট দেখা যায় ওর
ক্ষীণ কটি বেষ্টনীকে ঘিরে লতাপাতাফুলের চিত্রলেখা নয়,
অগণিত উন্মত্ত উন্মত্তপ্রায় মানুষের স্রোত। কতো ঝড় খেয়েছে
মেউলটা, আর ঐ লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত মানুষের মিছিল!

অনেক দূরে সরে এসে মেউলটার দিকে তাকালে শুধু সোনালি
পদ্মফুলটা দেখা যায় আর প্রজাপতির ডানায়ে ক্যামেরার চোখ দুটি।
মেউলটা যেন পটে আঁকা মোনালিসার ছবি। সহসা এক সময়
মনে হবে সত্যিই অনেক দূরে সরে গেছে সোনালি মিনারটা,
হয়তো আমাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। অবশ্য আর
কোনোদিনই ওকে ছুঁতে পারবো না। না, আর কোনোদিনই না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুয়াশার অনুভবগুলি : আদিকালের কবিতা

এক : পত্রপাতার শিশির
পত্রপাতার শিশির দেলে
পত্রপাতার শিশির। তার চেয়েও শীতল মেয়ে
তোমার বুকে উপোসী গাল রাখা।
কিন্তু যখন মাস ঘুরবে
তিরিশ দিনে মাস। তোমার চুমায় অঙ্ক পোড়ে।
সইবে কী আর এক বিছানায় থাকা?

দুই : পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে
পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আরেক পাহাড়
আকাশের চেয়ে উঁচু ;
তিনি সে পাহাড়ে থাকেন ব'লেই শুনেছি
দিদিমার চেয়ে বুড়ো।
দিদিমা যেদিন পৃথিবী ছেড়ে গেলেন,
সে পাহাড় থেকে নেমে
তিনি নাকি বহু পথ হেঁটে, সারারাত
শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন।
তাঁর সঙ্গেই দিদিমা স্বর্গে গেলেন ॥

তিন : অন্ধকার বিছানার শুয়ে
মনে হয় না এখুনি তুমি ঘুমিয়ে আছো, তবু
তোমার ঘর অন্ধকার দেখে এলাম।
বন্ধ দুয়ার খোলা দেখো, তেমন উৎসাহ
আমার যদি থাকতো আজ
আমি যদি আগের মতই যুবক হ'তাম
জেনে আসতাম, তুমি কেমন আছ ?
কিন্তু এখন সারা মাথাই সাদা আমার ; যদিও আজ
সমস্ত রাত্তে ঘুমুতে পারবো না ॥

তোর বুকের মধ্যখানে

ঈশ্বরের দয়া কাঁপছে ; ঊর্ধে অধে : যেদিকে তাকাই
গানের অনন্ত আলো, আলো তোর বুকের ভেতর।
শিশুর মতন আমি জেগে উঠছি, গান শুনছি, আলো
চেতনায় নিদ্রি ; আর সারা অঙ্গ আধারো ঈশ্বর।
সারা অঙ্গ মন্ত্র হ'য়ে ; তোর বুকের মধ্যখানে আমি
দেখতে পাচ্ছি নবজন্ম, শুনতে পাচ্ছি শিবের নিঃশ্বাস।
কোথাও সধবা নাচছে, জেগে উঠছে মৃত সখিস্বর,
চন্দন নিমের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস।

উত্তরসূরী

ঈশ্বরের দয়া কাঁপছে ; তোর বুকের মধ্যখানে আমি
চোখ রেখে গাল রেখে ঠোঁট রেখে একটি জীবন
মেরুশাবকের মতো হ'য়ে যাবো। কিশোর বিশ্বকে
দেখবো আমি, জানবো বেহুলাকে, দুই করুণার স্তন
অনুভব ক'রবো আমি গঙ্গা নামছে, ঝুলে তার
শাখা নাড়ছে বোধি বৃক্ষ ; মিলে যাচ্ছে এপার ওপার।

বিংশ শতাব্দী : উত্তরখণ্ড

সব দৃশ্য বদলে গেছে, সব মুখ এখন শোনিতে
ডুবে গেছে, চাপচাপ রক্ত আজ ট্রেনে বাসে ট্রামে ;
খণ্ডখণ্ড ক'রে কাটা কুমারীর বিবর্ণ শরীর
ট্রাকে রেখে জাতি তার হাসতে হাসতে ইষ্টিশনে নামে·
যেন অন্য আগন্তুক। সেটমাখা রুমাল হাত ফিরে
পাশের পকেট থেকে, কপালের স্বেদ মুছে তাকায়
পরিচ্ছন্ন বাথরুমে সৌম্য যুবা ; রাত্রির নির্জনে
কৌটাকৌটা রক্ত ঝরে পাইপ বেয়ে অন্ধ নর্দমায়।

সব মন বদলে গেছে ; বঙ্কিমের, রবি ঠাকুরের
শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মত আজকের পৃথিবী
আমার অমল নয়। মাটিহীন বিংশশতাব্দীর
মানুষ ভয়ঙ্কর স্বপ্নে ডুবছে, বিপর্যস্ত নীবি
ভোরের নারীর জন্য ভয়াবহ পরিকল্পনায়
হাতগুলি থরোথরো কাঁপছে। আজ নদীতীরে একা
অন্নপূর্ণা মুনি কিংবা মরণে কোমল দেবদাস
প্রেতাত্মার মত লাগবে মুখোমুখী হয় যদি দেখা।

সব সৃষ্টি ব'দলে গেছে ; ভালো-মন্দ পছন্দ বিচার,
ঈশপের নীতিকথা, বুদ্ধের প্রশান্ত বরাভয়
ক্রুশবিদ্ধ যিশু আজ অবান্তর, বেহুলার নাচ
দেখতে দেখতে পথেঘাটে মনে আর জাগে না বিস্ময়

রাত্রির মানুষদের। যতদূর তাকানো সম্ভব
শুধু ঈর্ষা; ষড়যন্ত্র নিষ্ঠিলিন রক্ত আজ পুঁজ;
আনবিক ঠাণ্ডাযুদ্ধ; পাশবিক কখোপকথন।
আর কোনো দৃশ্য নেই একফোঁটা মাটির সমুদ্রে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

পংকজ

কি কথা সে বলে গেল, কোথায় হারালো ?
বাঁশী-ধ্বনি ধীরে ধীরে,
নদীতট তীরে
বিস্মৃতির বলয়িত ম্লানরেখা কি করে ছড়ালো
ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর সুরে
স্মরণের ঢেউ থেকে ঝরে ঝরে
একেবারে প্রসারিত চেতনার রক্তে মিশে হতে
কোথায় মিলালো দিতে দিকে ?

কি যে বলো,—পৃথিবীতে হারায় না কিছু :
আজ যা চোখের বাইরে, বিস্মৃতির পারে
কাল সেখানে দেখো তারি পিছু পিছু
হয়তো নতুনরূপে রোশনাই তার
জমাবে আসর কিবা খুলবে বাহার !
যে কথা হারালো বলে খেদ,
যে সুর মিলালো বলে এই আক্ষেপ—
হয়তো বা এতদিন পরে রেখেছে সে খোঁজ,
বিস্মৃতি ও বেদনার পংক-ভূমে
হয়তো সে ফুটিয়েছে অমল পংকজ।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দাঁড়িয়ে ছিলাম

তাড়িত মনের তালে দাঁড়িয়ে ছিলাম।
অসহ ক্লান্তিতে নুয়ে পিঠমাড়
মুচড়ির নিশ্বাসপবনে—আর্দ্র ঘাম।

ঘরের ভিতর থেকে অবিশ্রাম
চুড়ির ঝঙ্কারধ্বনি
যেন শৈলনিঃসৃত ঝর্ণার।
স্বৈতকণ্ঠের মিষ্ট কুঞ্জিত ঝঙ্কার।
তখন কলাট-রেখে অপরাহ্ণ রোদ্দুরের লাল।

নিরুপায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।
মহুয়া ফুলের গন্ধে উন্মন শরীর
নেশায় মাতাল
অন্যদিকে দুটি মন স্পর্শকাতর
দুলছে দুরন্তিক্ষমা খুশির চূড়ায়।

এবং নৈরাশ্যে শুদ্ধতায়
ক্লান্তমুখ আমি ;
প্রাক্-সন্ধ্যাকাল
রিক্ত শূন্যতায় ঢাকা ;—শুধু বিলম্বিত মূর্ছনায়
করুণ-রণিত ইমনজাল।
হতবাক্ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বৈদিক প্রার্থনা

আপোমার্জন

বহুক-পিঠ ভূগোলে তীর-কলা
গঙ্গোত্রী আমার মঙ্গল
গাঙের এ-সমতলেও ঢেলে
সাগর-সঙ্গমে অনর্গল ॥
মাটির চাপ সবলে ফেড়ে ফুলে
যে-মঙ্গল গূঢ় আবিষ্কার
গাছের ফুলে, ফলের রসে তার
কী সুন্দর সহজ সঞ্চার ॥
মলিন মেঘ যেমে স্বয়ং-স্নানে
শোষিত হয়, যাখন উজ্জ্বল।
সকল মলিনতাকে ধুয়ে ফেলে
জীবন হোক তেমনি নির্মল ॥

প্রাণায়াম

আকাশের নাভি ভোরে লাল, বুক দুপুরে নীল,
ললাট গোধূলি বেলায় শান্ত হৃদের ঝিল ॥
তেমনি আকাশ আমি তিন রঙে গড়ামি
লাল থেকে নীলে এবং ধূসরে অন্ত্য মিল ॥

আমিই আকাশ, ভোরে নাভি ঘুলে লাল ব্রহ্মার জ্যোতি,
আর উদয়ের সূর্যের তেজে স্বয়ং সরস্বতী ॥
আমিই আকাশ, দুপুরে হৃদয়ে নীল বিষ্ণুর রঙ,
আর সূর্যের বলমল তেজে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং ।
আমিই আকাশ, সাঁঝের ললাটে ধূসর শিবের জ্যোতি,
সূর্যের চালচিত্ররেখায় শ্রীদুর্গা ভগবতী ॥

উত্তরসূরী

গায়ত্রী

তিন অক্ষরে অউম্, অউম্, ও
নাভি-বুক-শিরে ভূর্ভুবঃস্বঃ দেহাধিপতি পরম।
সেই উজ্জ্বল অমৃতভুবন আমি এ অঙ্গে করেছি ধারণ
আমার সকল কর্ম, চিন্তা শুধু তাঁর অনুলোম।

অনিল চক্রবর্তী

আমাকে ছুঁয়ে

আমাকে ছুঁয়ে জন্ম দিয়ে আমাকে ভালবাস না।
সূর্য ঘরে আগুন আছে, তীব্রতর অগ্নিআলোয়;
তারই স্বাদু প্রেমের তাপে তপ্ত বালুর কামনা।
আমাকে তুমি ছুঁয়েছ অবহেলায়।

ক্ষণ মোহের মৃত্যুশেষে দীর্ঘ অনুশোচনা
রৌদ্রমাখা বৃষ্টি যেন অভ্যাসের ক্লেদাক্ত।
লিপ্ত প্রাণের গুহায় হাসে মিথ্যা অস্তি-রচনা;
আমাকে তুমি ছুঁয়েছ হেলাখেলায়।

অরুণকুমার সরকার

উপর থেকে নিচে

দেখছি কী আশ্চর্য চেষ্টা। যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে কেন, উঠছে আবার—
যদিও সূর্যটা কবে ইজের পরেছে টানটান,
কমছে পলঘর্ষ শীতরাত্র খাঁজে ও সর্দানে
এবং বুকের মাংস যেন ভ্রষ্ট বালিকা ঠকেছে।

সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটা তবু শুধু নির্মম গাছটার।
কিন্তু সে উঠবেই উঠবে। যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে শেষ, উঠছে আবার।
গরগর করছে রাগে, ফুঁসছে যেন পদাহত সাপ
কখনো চিৎকার ছাড়ছে যন্ত্রণায় ইঁচড়িয়ে কেঁদিয়ে।

ভাবছি মনস্তাপে বসে এখানে সে পৌঁছবে যখন
কী পাবে? একমাথা শাদা চুল ছাড়া আর কী শিরোপা?

লোকনাথ ভট্টাচার্য

অভিমানী সূর্যাস্তকে

দিন যদি থাকে কোনো আর কিছুই না ঘটার, আর ঘণ্টা না বাজার, আর পথিক না চলার :

যদি দিন থাকে অন্ধকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার তার প্রথম প্রভাতে, নামহীন নিরাবরণ শুচিতার শূন্যতায় :

যদি থাকে দিন তোমাকে সম্পূর্ণ ক'রে হারানোর, অন্তরের অন্ত খনির অন্তরতম গুহা হ'তে, মৃত্যুর ওপারে মৃত্যুতে, অবশেষের নিমিষের আগেক জীবনে আসলে হয়তো :

এত কেন কথা তবে আজ এই গ্রামে, গোধূলিতে? আর বাঁশি, বেদনা, তুমি?

তাই থাক। ওসবের আর নয়। ভালো এই হল, আমি খুশী তাকেই আপাতত বুঝে, চেয়ে, পেয়ে, ও না পেয়ে।

এ-কথাটা শোনাও তুমি দেবী, প্রেম আমার, স্বপ্ন আমার, কারণ সীমা আমার, যে-তুমি আমি আমার, ঐ অভিমানী সূর্যাস্তকে। সারাদিন চেঁচিয়ে গান গেয়ে আমার গলা ভেঙে গেছে।

বলার, না-বলার ঊর্ধ্বে মুহূর্ত আজ, যে-মুহূর্ত চিরকালের ও যা কালকেও আসবে। আমাদের খেলাঘর।

চিত্ত ঘোষ

হৃদয়শব্দ

পায়ের পুরানো ছাপ ধোয় না এখন
টলটলে জলের কৌটা।
শীতল সময়ভূমি এখন নিকটে।
মরুতার কাটলের কাছে
গলার গভীর স্বর যাবে।

রাত্রি সব অন্ধকার মেলে দেয় মাঠে।
সাঁতরায় জোনাকী, পাখী
বলয়ে সময়চিহ্ন আলে।
স্মৃতিশব্দ শোনো, নির্জনতা
গভীর হৃদয় শব্দ শোনো।
তোমার অক্ষয় শব্দ শোনো।

তারাপুঞ্জ রাখো নীলিমায় :
বৃক্ষমূলে জল দাও, নারী।
মুখ রাখো চোখের বেয়ালে।

ধ্বনিতরঙ্গিত বায়ু—
বৃক্ষসারি চলে।
বৃষ্টির প্লাবিত প্রান্তে ভাসে
প্রিয়চিহ্ন, ভালের পালব।

পায়ের পুরোনো ছাপ মুছে
অক্ষয় শব্দের দিকে যাই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাক্ষী বট

আমি সাক্ষী। চারজন কুমার আ
ফিরবে, কথা দিয়েছিল।
অশ্বারোহী চারজন কুমার।
রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালের
পুত্র বলেছিল, তারা ফিরে আসবে এই চৌমাথায়।
কবে কথা দিয়েছিল তারা ?
আমারই আশ্রয়ে তারা সারারাত্রি কাটিয়ে সেদিন
চারজনে চারপথে চলে গিয়েছিল।

চারজন কুমার ফিরে এসেছে অনেককাল।
এখানে আসেনি তারা।
এখন তারাই রাজা-সদাগর-মন্ত্রী আর নগরকোটাল।
চমকিয়ে সমস্ত রাজধানী
চারজনে এখন শুধু উদয়াস্ত রাজার নাকাড়া।

আমি বৃদ্ধ বট, আমি জানি।

অরুণ ভট্টাচার্য

ভয়ঙ্কর ভাবনা

এক দুই তিন চার গুণতে গুণতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম।
আরক্ত আকাশ, চোখে ক্ষমা নেই রুদ্র ভয়ংকর
আমার সামনে সব এপাশে ওপাশে
বাড়ী ছাদ সিঁড়ি মিলে প্রচণ্ড দুলছে।

উত্তরসূরী

এক দুই তিন চার গুণতে গুণতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম।
নামছি। নামছি যেন পাতালের কোন জাদুঘর
ডাকছে আমাকে। স্থির অপলক চোখে
রাস্তার বা জানালার দূরে কার্নিশের গায়ে
মনে হচ্ছে সব কিছু রহস্যের চিরন্তন পুঁথি।

আমি আর উঠবনা, নামবোনা কখনো আবার।
যেমন আছি হে একলা স্বাদুবৎ নিশ্চিন্ত দুপুরে,
রেলিঙে ভর দিয়ে কাক ডাকবে সবে যখন দুপুর
শিশুপাঠ্য গল্পে যাবো আকাশ, কি পাতালের ঘরে।

শামসুর রাহমান

আত্মপ্রতিকৃতি

আমিতো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাদশাহ—
তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে রাজা, কেন
দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ঢুলঢুলি
বাজিয়ে শোনাবো কথা, নাচাবো বানর ফুটপাতে?
কেন তবে হরবোলা সেজে সারাক্ষণ হাটেমাঠে
বাহবা কুড়াবো কিবা স্টেজে খালি কালো রুমালের
সেরো খুলে দেখাবো জীবন্ত খরগোস দর্শকের
সকৌতুক ভিড়ে? কেন মুখে রঙ মেখে হবো সঙ?

না, তারা জানেনা কেউ আমার একান্ত পরিচয়:
আমি কে? কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে?
কেন যাই চিত্র প্রদর্শনী, বারে, বইয়ের দোকানে,
তর্কের তুফান তুলি বুদ্ধিজীবি বন্ধুর ভেরায়?
না, তারা জানেনা কেউ।

অথচ নিঃসঙ্গ বারান্দায়
সন্ধ্যা, এতেস্যার মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা, সার্কাসের
আহত ক্লাউন আর প্রাচীরের অতন্দ্র বিড়াল,
কলোনির জীবনঘর্ষিত ঐকতান, অশ্লীল
তারাবেঁধা কাঁচুলি, গলির অন্ধ বেহালাবাদক,
ব্লাকের সুস্থির মাছ, সেঁজার আলেপ জানে কতো
সহজে আমাকে, জানে কবরের চুর্বিনীত ফুল।

মায়ের চোখে

আমার খোকন গাঢ় দুপুরে ঘুমাতো, ঘুমোবার
করতো তান আমার বালিশে, বুকে আর
'গল্প বলো···কড়ির পাহাড়, শঙ্খমালা' বলতো শ্রীমের দুপুরে
কাঁচা আম, কতো জলহরি হাতে, জাহাজের বাঁশি বাজাতো নকল সুরে।
ওর চশমা চোখে টুপি প'রে দেখা দিতো অন্য সঙ
আমার হেঁসেলে, পাল টুকটুকে, কচিমুখে বুজরুকি চলঃ
মাটিতে লুটাতো হেসে আর যারা দেখতো পাঁচজন
বলতো, কী-যে কাণ্ড করে একরত্তি তোমার খোকন।

এখন সে স্কুলের, প্রশস্ত কপাল, নামমাত্র পাৎলা চুল
পাকেনা মাথায় টাক, শ্লেট হাতে বারনা ইস্কুল।
আজ দেখি স্বাস্থ্যান্বেষী সে-ও ছড়ি হাতে
পার্কে কিম্বা নদীতীরে (যদি কমে বাড়তি মেদ, বাড়ে
খিদেটুকু) ঘরে ফেরে দিঁড়ি হাতড়িয়ে অন্ধকারে।
বেড়েছে রক্তের চাপ, রাগ মেপে ঠিকঠাক ঘুমহীন রাতে
কেবলি ওষুধ খায়, ডেন্টিস্টের কাছে যায় যখন-তখন
আমার খোকন!

রাম বসু

আসরের পরের আসর

গান শেষ হল। আসর নিস্তব্ধ। আমি ফিরে যাবো।
যে আলোর বৃত্ত কিছুক্ষণ উজ্জ্বলতা দিয়েছিল
তা যেন বিগত গন্ধ। সব ছবি মুছে একাকার।
তৃষ্ণার বিকৃত ঘুম জল আছে ভেবে উদ্ভাসিত
আপনাকে মেলে দিল হাওয়ার অকূলে, আর বুড়ি
ধকলের কূট চালে হো হো করে হেসেই অস্থির।

এই সব স্পন্দন আমাকে আদৌ বিহ্বল করে নি।
বুড়ির শঠতা যদি একবার চকমকি হয়
এই গন্ধক-অরণ্য আগুনের শয্যা হয় যদি
সমস্ত বুখোস পুড়ে যায়—তবে আমি একরাশ
করোটির মধ্য দিয়ে ঠিক যাবো দুধের কিনারে।

বিষ অমৃত হল না। সব সুখ চিত্রিত মুখোস।
পৃথিবীর উর্বরতা প্রাচুর্যে বিকারে প্রহেলিকা।
বিকৃত ঢালের মত যে চাঁদ টানানো ছিল কোনে
তা নেই। পাহাড় আত্মসমর্পিত দগ্ধ সেনাপতি।
কুরুক্ষেত্র রথচক্র গ্রাস করলে মেদিনী, হয়ত
কর্ণ এমন নির্বাক হয়েছিল। কিন্তু আমাদের
কবচ কুণ্ডল নেই। আমরাই আমাদের উত্তরণ।

বহুদূরে হরিণীর জন্য ডেকে উঠল হরিণ
যে দুধ শুকিয়ে ছিল তা চকিতে গাঢ় মমতায়
চুমা দিল আমার বিস্মিত মুখে।—কোথাও যাবো না।

আমার ভিতরে মর্মরিত কোলাহল মৃত বাঁজ
শুকনো গাছ মরা পাখি সব হৈ চৈ করে জেগে উঠে
এক সম্পূর্ণ নিসর্গ হতে চায়। রুক্ষ বুনো ঘোড়া
পা দুটো উঁচিয়ে ডাকে। হৃদয় রোদ্দুরে কাঁচা সোনা।

কিন্তু আমি এই সব সাজাতে পারি না একপটে
যথাযথ অনিবার্য করে, তারা কিছু কখনও হল না।
নিটোল বলয় গড়ে উঠতে গিয়ে ভেঙে ভেঙে যায়।

নিজেকে রচনা করা কী দুঃসাধ্য, কী দুঃসাধ্য হওয়া।

কাজল শাহাবুদ্দীন

একজন

সংসারে প্রচুর অর্থ বল আর পাণ্ডিত্য অগাধ
একান্তে চেয়েছে সেই পরিমিত একজন লোক
কাপড়ে চোপড়ে যার সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক
প্রত্যহ ছড়ায় কোনো দীপ্যমান জগতের সাধ।
জানে সে জীবন মানে উচ্ছৃঙ্খল বাসনারা নয়
অস্থির আবেগ থেকে জন্মবে না প্রজ্ঞাবান শিখা
পৃথিবীটা তার কাছে নয় এক বিমুগ্ধ প্রেমিকা—
কেননা বাস্তব তাকে বুঝি দেয় সকল সময়।

•

প্রজ্ঞার সিঁড়িতে তার নিত্য তাই ফেলে ফেলে চ'লে
একদা প্রাপ্তির সব পেলো এই একজন লোক
চেয়েছে যে বুদ্ধি থেকে জন্ম নিক প্রেম প্রীতি শোক—
দীপ্তি পেলো তার মুখ অর্থ বল জ্ঞানের কল্লোলে।
কেবল দুর্ভাগ্য তার মৃত্যু যবে নিল তাকে ডেকে
জানালো না জন্ম তার ছিল এক অস্থিরতা থেকে।

কৃষ্ণ ধর

তোমার বসন্ত

বসন্তে কোটাই ফুল, কথা দিচ্ছি এই ফুল
তুলে তোমাকে এক গুচ্ছ দেবো চুলে।
দিয়ো। কিন্তু বিহ্বলতা এনোনা কখনো চোখে
তার চেয়ে স্বপ্ন দেখো, কে জাগাল চৈত্রদিনে
কে জাগাল আকস্মিকতায়।

আমি কি বসন্ত হ'বো তোমার বসন্ত
স্পর্শ নিয়ে দোলাবো কি তোমার যৌবন
নতুন সৃষ্টির মতো ঘনচ্ছায়া তোমার শরীর
আমাকে জড়াতে চায়, আমি কিন্তু
বিপদের মতো তখন লুকোবো মুখ
দুঃখিত হয়েনো অকল্পতী।

তোমার বক্ষের স্বর্গ করতলে দিয়েছে
উত্তাপ, চাই না চাই না আমি, ওই দু'টি
বিস্মিত আপেল কোনো চিত্রশিল্পীকে দিয়ো
অনাবৃত উপহার সে আঁকবে আশ্চর্য তুলিতে।

আমি হ'বো বিমুগ্ধ দর্শক।

বটকৃষ্ণ দাস

নরকবাসের ডায়েরী

ঈশ্বরের মুখ দেখবো ব'লে আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দেহে
একশত্ কাদায় জলে পূতিগন্ধ পচকুণ্ডে ঠাঁয় জেগে আছি।

চারদিকে বীভৎস দৃশ্য। উল্লুকের মুখ, মেয়ো কুকুরীর যোনি—
অস্তিকায় অস্থিকুণ্ডে শুয়োরের দগ্ধ মাংস গোরুর চোয়াল

কবিতাবলী

উলঙ্গ প্রেমিক বেশ্যা দেশসেবী কবি মহাপুরুষ কেরানী
শিক্ষক দালাল চোর পুরোহিত ব্যবসায়ী জুয়াড়ী গুণ্ডার
উল্লোল উৎসব ভিড় ঠেলাঠেলি হট্টগোল অট্টহাসি আর
অন্ধকার অন্ধকার আয়োজন অতলান্ত তীব্র অন্ধকার।

রোমশ ময়কুটে রাত্রি মাঝে মাঝে খচ্চরের মতো মাথা নেড়ে
নিজের আনন্দে দীর্ঘ তীব্র দাঁত আমূল কেলিয়ে হেসে ওঠে।

আজন্ম নরকবাসে ঈশ্বরের মুখ দেখবো ব'লে জেগে আছি;
বন্ধুবান্ধবের স্মৃতি অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলে নেভে—
চারিদিকে দুর্গন্ধ ক্লেদ বিষ্ঠা বমি ভ্যাপসা হাওয়া পচকুণ্ড কীট
দু-একটি নক্ষত্র শাঁকচুন্নীর চোখের মতো ঝপঝপ করে
মাথার উপরে; সামনে স্বল্পালোকে উদ্ভাসিত দৃশ্যের ভিতরে
হত্যা রক্ত বলাৎকার ঠেলাঠেলি হট্টগোল বেলেল্লা হুল্লোড়।

হঠাৎ ঢং ঢং ঘণ্টা। চেয়ে দেখি: অন্ধ ঘেরো গাধার উপর
আমার ঈশ্বর আসে একরাশ নড়বড়ে হাড় আর খড়।

আলোক সরকার

দ্বিতীয় উচ্চারণ

আমার ইচ্ছা মাঠের মধ্যে কখনো রাখিনি
অন্ধকারের নিঃস্ব অবিবেচনায়।
সকালবেলায় বাগান সবুজ পাতায় রঙিন ফুলের
প্রতিবাদী বিস্ময়।
সমস্ত দিন বাগান বন্ধুতায়।

এবং রক্ত অথবা শ্রাবণ মুহূর্ত এলোচুলের—
কতোদিন আমি ভালো নেই।

উত্তরসূরী

প্রাণের বাড়িতে স্থির যাবো সেই আশ্রয়ের অন্বয়
সহজ চাইবো ? বিবেচনা, তুমি পাখির ওড়াকে জানবেই
আনন্দ নীল সংঘাত সঙ্গতি।

অথচ রাত্রি দীপ্ত বিজয়ী স্বাভাবিক পরিণতি
মনে হলো। কালো শাসনের অন্বেষতা।
তোমাকে তো আমি ভালোইবেসেছি দ্বিতীয় উচ্চারণ
সকল প্রেমিকা সকলের এক-ই প্রথা।
নদীর তীরের বালির ভিতর আকণ্ঠ নিমগন
প্রার্থিত স্রোত শাশ্বত ব্যবধান।

সুনীলকুমার নন্দী

ফাল্গুন যেতে না যেতে

কাল বৈশাখীর শঙ্কা যা করেছি তার চতুর্গুণ
ফাল্গুন যেতে না যেতে অতর্কিত ঘরন বাতাসে
অত্যাচার...ভাঙে বৃক্ষ পুষ্পিত কানন
উল্টে পাল্টে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সাজাতে...
সম্ভোগ বিলাসে...ভাঙে ঘরের তৈজসপত্র...ঘরে
অতি সংগোপনে রাখা মায়াবী মুকুর খান্ খান্,—
যার বক্ষে উদ্ভাসিত সমুদ্রনীলিমা :
রাত্রির নিভৃত অন্তর্ভাবনায় সুদূর
বিকালে আশ্রিত হয় সমুজ্জ্বল রৌদ্রের নাবিক—
সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ আবিষ্কারে সজ্জিত আয়াস
ফেলে রেখে পাড়ি দেয় বিশাল তরল...
সন্ধানে অজ্ঞাত দ্বীপ...দ্বীপের কঙ্কাকে।

এ এক নিতান্ত গল্প হবে এই শতাব্দীর অন্তিম প্রহরে
পুষ্পের সুরভিত আলো আলাতে একদা হতো এর সূত্রপাত।

হেনা হালদার

চক্রাবর্ত

নানা কণ্ঠে ঐক্যতান। তবু কাঁদে একাকী তন্বুরা
পটদীপ রাগে, আর দূরান্তিক চিত্রপটখানি
উন্মোচিত করে' জ্বলে স্মৃতিদীপ : সংরাগের সুরা
হৃদয়কে ফের সাধে।

অতঃপর সমস্ত বাগান-ই
বিকল্পে শ্মশান হয়। স্বর্ণচূড়া-মেঘের প্রাসাদ
ভেঙে ভেঙে মুছে যায় : প্রতীক্ষার বিহান-সায়রে
প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে বাংময় স্থপতিনাথ
কাতর ক্রন্দনে ডোবে। বুক জুড়ে অভিযোগ জমে।

এবং পৃথিবী ঘোরে মেরুদণ্ডে : গোলাপে-কণ্টকে
মাখামাখি করে দিয়ে উদ্বিগ্নের চর্বিতচর্বণে
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রেম-ক্লান্তি চক্রাবর্তে মূঢ় মন ঠকে :
ফিরে ফিরে পরিক্রমা অভ্যাসের নিত্য রোমন্থনে ॥

ষটকৃষ্ণ দে

উমাবতী

আর কতদিন, আর কতোকাল আমার সকাল এমনি
তোমার ঘুমের স্বপ্নে ছড়ানো বিকিমিকি ছড়া কুড়িয়ে
এলোমেলো দিন গল্পের থেকে বেছে-বেছে তার প্রেম নি'
ভেবে, শেষকালে, যা নিলেম সে তো প্রেম না, শুধু বুকি এ।

আর কতোদূর, আর-ও কতোদূর দুপুর বেলায় রৌদ্রে
তোমার পায়ের নমিত নূপুর শোনার জন্য, কন্যা

যেতে হবে, বলো ; শেষে কী আমায় তোমার 'কী নির্বোধ রে
এ ভাবে কী মেলে ইপ্সিত ?'—এই প্রাপ্য, তোমার মন না ?

আমি দিয়ে গেছি কতো উম্মেল বিকেল শাঁখের কবিতা,
কতো না ঢেলেছি অঢেল প্রতিভা, যদি-বা তোমার লজ্জা
সন্ধ্যায় প্রেম নিশিগন্ধায় শুভ্র সুরভি-শোভিতা
হ'য়ে ওঠে। জ্বু, হলো কী ? হ'ল না। ব্যর্থ তবে মহৎ যা।

তা হলে তুমি কী, তুমি-ও কি সেই দলে,
চোখে যার জলে ছলায় নিমন্ত্রণ,—
অথই সাগর, দ্বীপ নেই,—নৌ-মন
ভাসে অসহায়, একাকী উথাল জলে।

তুমি কী-ও সেই মেঘের আড়াল থেকে
আঁচল উড়িয়ে যায়। যায় হাতে ডেকে,
সে সব অচিন পরী হ'য়ে, ডেকে, শেষে
হঠাৎ উধাও হয়ে যাও মেঘে, হেসে !

কখনো মুখে মেঘ কখনো চন্দ্রমা
তোমাকে, উমাবতী, করেছে মনোরমা
এখন ফাগুনের গানের গুঞ্জন
আমার অজ্ঞতা, বোঝে সে কোনজন
তোমার, উমাবতী, ঠিক সে মন কী, তা—
কখনো শ্বেত, কভু পলাশে অংকিতা

আমার শান্তি, আমার ঘর
ভেঙেছে তোমার চোখের ঝড়।
আমি বেদুইন নিঃস্ব, হায়
পূর্ণ তোমার বিম্ব হায়
তোমার আকাশ রামধনুর
সপ্তছটায় রঙমধুর !
হৃদয় আমার বৈশাখীর
তৃষ্ণার্তক, নেই তো নীড় !

দাও এক ফোঁটা কটিকজল,
তৃষ্ণা আমার নয় অতল।

দেবে না? তবে আমার বক্ষস, হে মন, মিছে
চলেছো কেন অলীক সেই মরীচিকার পিছে!
তোমার দেশে তুষার আছে, তুহিনা-মেঘ মেয়ে
দু ফোটা তার পৃথিবী পারে সবুজে দিতে ছেয়ে!
যদি তোমার চোখের হাসি ভোরের আলোয় ফোটে,
যদি তোমার প্রসন্নতা ফুলের বুকে লোটে,
তারি খানিক আমায় দিও, এটুকু প্রার্থনা,
জানবো আমি ভালোবাসা কখনো ব্যর্থ না!

লোভন লোম

বাঁচার মত বাঁচলাম না, মরার মত মরলাম না

বাঁচার মত বাঁচলাম না, জানলাম না বেঁচে থাকার মানে
মরার মত মরলাম না, মরে গেলাম চলন্ত শবদেহ
যেন বধির শিলালিপির অমরতার দাবি
বুকের ভিতর বয়ে বয়েও, শেষে কিছুই হলাম না।

বাসনা কোন্ ঘুরে বেড়ায় যেমন প্রেতাত্মা.....
পরিণতির স্পর্শ নেই অবয়ব দিনান্তে.....
ধুলো মাখায় জড়িয়ে থাকা দিনের পর দিন.....
বলতে আমি পারলাম না, আত্মানং অনুক্ষম্ জাতম্ আত্মনঃ।

যে দিকে চোখ ফেরাই, ধূসর বিয়োগান্ত বিধুর
যে মঞ্চে পা রাখতে যাই সকল পট ধূসর
সকল ছবি নশ্বরের ভীষণ মহিমা।
অন্ধকারের জঠরে কেহ ফিরতেও চাইনা
সঙ্গী একা চিরকালের অমেয় যন্ত্রণা—

ফুলের গাঁক মিলিয়ে যায়, নতুন ফুলের বাস
পুতি গন্ধ বাতাসে খুঁজি,—নতুন বাসনা
আমায় ঘিরে ঘুরে বেড়ায়, চেনা কণ্ঠে কেঁদে বেড়ায়
অতৃপ্তি-প্রেতাত্মা।

কোথাও আদি অন্ত নেই, জড়েও গূঢ় নিহিত গতি
দু হাতে কিছু রাখতে পারিনা.....

বাঁচার মত বাঁচলাম না, মরার মত মরলাম না
আমি একটা চলন্ত শবদেহ
চিতার আগুন অঙ্গে চলে তবুও ছাই হচ্ছি না
অস্তিত্বের এমন নৃশংসতা।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

শুকতারা আমার মা

ভোরের মাঠে জন্ম নিলাম—
শুকতারা আমার মা,
কালপুরুষ সখী।
ফর্সার জল আমার স্নান
অরুণোদয় হাওয়া আমার আনন্দ
সমুদ্রের অন্ধকার সান্ত্বনা।

পৃথিবী নির্জন দোলনা
সূর্যের রশ্মি-বন্ধনে।
আলো অন্ধকারের অঞ্জনে
আন্দোলিত আমি।
সমস্ত প্রবাল দ্বীপ আমার খেলনা
নদী আমার আত্ম ন। ঢেউ আমার মুক্তি।

আজ এই বসন্ত-রাত্রির বিহ্বল তটে
নির্জন নৌকার মত নেমে এল চাঁদ
অনেক দুঃখের কেনা পায় হয়ে ঘরে
রামধনুর দ্বীপে যাবো আমি।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কবিতা, বিরল ছায়া

তিনে শূন্য

আজ আমি কেউ নই
ভিজে গাছ বর্ষার দুপুর, মন কেমন পাখির
বুকের ওপর দুলছে...খাঁচারে কি সুখী আন্দোলনে
মাংসের বাদামী-রং মেটে কাটা পুতিলের মত
ছুঁড়ে দিলে পিছলে সরে যায় ..
পায়ে হেঁটে রোদ্দুর যেখানে
পুরনো জায়গায় পড়ে...অসম্ভব রূপসী করুণা,
তবু ভাস্তে কে ডুবুরি জল কেটে অসমসাহসী
নীচে নেমে যেতে পারে...আমি নামবো না,
আমার বয়স আজ তিরিশ পেরোলো।...

শেষবার হাসি

সাধারণ হাসি হেসে চলে যাবো জানবো না মনে—
একদিন চারজন বন্ধু হাসবো বলে গাড়ি ভাড়া করে
ছুটেছি অনেক দূর—রমণীয় কেন যে বেদনা—
গৃহশিক্ষকের সেই অবান্তর আদা কিংবা যাওয়া...
কে তৃষিত বসে আছে, তৃষ্ণা কোন মাঠে দিগন্তরে
ধুলো-পায়ে-লয় কার ঘরে যায় হিসেব রাখে না।
রেললাইনে কাটা পড়লো সে কে বলবে, শূন্য যেন টানে

যেমন মধ্যাহ্নে শুধু ঘুর্ণি উঠছে, ধুলো উড়ছে, টুকরো টুকরো পাতা,
বিকেলে শুনবো না মোটে, বটবৃক্ষ পেরিয়ে ওধারে
একবার দুবার হাসবো যতক্ষণ দেখা যাবে নদী।

বিজয়ভট্টাচার্য

পাহাড়তলীর মাঠে বাঁধানো পুকুরে ছিপ-ফেলা
সময় ধৈর্যের নামে কাতরোক্তি করবে না হাওয়া,
ওপাশের ছোট ঘরে কার যন্ত্রণায় লিপি, রেখা...
বিস্মৃত পাখির ডাক অগোচর স্বপ্নের নিকটে।
চিরদিন সিঁড়ি ভাঙছে কালো-লাল ম্লান সিঁদুরেরা
সুদূর বর্ষার গন্ধ অনাবৃত মাতাল বসন্তে—
ছিপের ওপারে জ্বলছে কেরোসিন-ডিবা একখানি
জলের ভেতর ঐ যাই-যাই মৎস্যের শাবক,
নিজেকে এড়িয়ে যাওয়া কোনকালে সহজ ছিল না,
জলের গভীরে আছে সেই প্রতীক্ষার হাতছানি।...

অঞ্জনকুমার সিকদার

মীরার জন্য

মীরাকে বললাম, "মীরা, সঙ্গীহীন যে-নির্জনতায়
জীবনের আদুর পল্লব শুষ্ক ঘরে পড়ছে খসে'
কালের শয্যায়,—যার, এই বুঝি হারায় হারায়,—
এই ভেবে মূর্ছা আসে ; একদিন শীত এসে পশে
সঙ্গীর উত্তাপহারা একাবাসী কক্ষের কোণায় ;
আদুর সর্পিল সিঁড়ি নিয়ে যায় অন্তহীন ক্ষয়ে
ক্রমাগত, দিনের প্রত্যেক ক্ষণে, রাত্রির নিদ্রায়,
জীবনের জিজ্ঞাসায় আদিম যা অস্তিম রহস্যে ;

তখন তাকেই নাও, তারই হাতে রক্তের মুখর
অঙ্গীকার ন্যস্ত করে পার হও অন্ধ এ অর্ণবে
প্রেমের মধুরপক্ষে ; এই মরু বালুকাপ্রখর,
পৃথিবীর ঘৃণ্যতায় ক্ষুব্ধ যেদিন উত্তীর্ণ হবে
যুগলযাত্রায়, সেদিন এ বিশ্ব শুধু দুজনের ঘর ;
সেদিন উমার তপ সিদ্ধি পাবে কুমারসম্ভবে।"

মানস রায়চৌধুরী

প্রত্যাবর্তন

ক্রমশঃ পৃথ্বতা থেকে ডানাভাঙা বিমানের ঘোরে
তোমার উঠোনে নেমে আসি, লাগে সাহসিক বিস্ফোট-চুম্বন
শিউলির নক্ষত্রালে—সব তৃষ্ণা ফিরে পায় যেন প্রস্রবন।
ছিলাম প্রচ্ছন্ন দূরে এতকাল অশ্রুতটে প্লাবিত আদরে
কেন যে হঠাৎ খুঁজি অভিমানী ঘৃণার চরণ।
কখনো ভাবিনি এই পরিণাম, ফিরে আসা মৃত্যুপণ করে
মাধুরী কোথায় ছিলো সারাদিন নিশান উড়িয়ে নীলাম্বরে
কেন এই মৃত্তিকার প্রথানুগ টান, এই শিরার ভিতরে অনশ্বরে
পতনের মূঢ় লোভ, কেন-বা সর্বস্ব পাওয়া তিক্ত পরাজয়ে।

জানি এ শরৎ বেলা জন্ম পাবে নির্বাচন হেমন্ত বিষাদে
অলো ক্ষীণ। চতুর্দিক ঠোঁট চাপে এখনো অক্ষত আর্তনাদে
একদা আসার কথা ছিলো, আছে এখনো বিপুল রাত্রি ভরে
অগনন জোনাকির উন্মোচিত পথরেখা, অথচ ভিতরে
সরলরেখার ছায় স্মৃতি নেই—ওরা যায় তির্যক ক্রমণে.
আমি ঠিক ফিরে আসি ভারশূন্য, শিউলিবিকীর্ণ ওই তোমার বিজনে।
কিছুতে তোমার হাত ছোঁওয়া যায় না, যদি না অস্তিমে
বিসর্জনের রক্ত জেগে থাকে—অধিকার কাকে ডাক দিলে।

ঋতুর উদ্বিগ্ন ছায়া ঘুরে যায় বাণিজ্য বায়ুর সততায়
অদিগন্ত বাগানে তবু কই লক্ষ সফলতা কোমলে সবুজ—
হঠাৎ দুপুরবেলা বাধা ভুলে ছুটে যাই, পেয়েছি কি খুঁজে
মধুরের দীপ্ত পাখা গাছের আড়ালে রক্ত, স্তম্ভিত আভায়।

বড় বেশি প্রতীক্ষায় স্থির রাখো। কোনোদিন আমার জাহাজে
শিকল ছেঁড়ার হর্ষ, নোঙর তোলায় অধিকার
দিলেনা। ভাবি এ মাঝিমাল্লাদের কেবলই বন্দরে
আগুন নেভানো যদি চিরপরিণতি হয় তবে কেন কাজে
নাবিকত্ব করেছিলে, আয়োজন বৃথা, বারেবারে—
জলে ডুবে যাবো তবু দেবোনা সাঁতার ?

অপরিচয়ের ক্ষত পাও, যাই—এখনই আমার সুবাতাস
লেগেছে বুকের পালে, পরিচয় অতিরিক্ত রৌদ্রতাপ চায়।
ওসব দেবোনা, ছাড়ো মমতার জীর্ণ অভিপ্রায়
কেন যে কেবলই কিছু বিনিময়ে দিতে হয়, কেন যে বিশ্বাস……
ফেরা চলে যেতে চাই সাঁকোর কিনারা দিয়ে, অপরিচয়ের
ছায়ায় নিপুণ কাঁপে অসম্ভব ম্লান চাঁদ, আলো, কেন আলো—?
ঘুমের বিন্দুতে যদি প্রতিমান ফুটে ওঠে ভেবোনা জয়ের
উচ্চস্ত কেতন পেলে—যদি পাও—রক্তমাখা উপেক্ষা বারালো।

দৃষ্টির কার্নিস থেকে যতটুকু দৃশ্য আসে, সেইটুকু শেষ।
শেষই বলিবা কেন, ঘৃণা, হিংসা, প্রারম্ভিক প্রবল উৎসাহে
ঝরা এলে বৃথা ভাবো অন্ধকার সমুদ্রে, পাহাড়ে
উদ্‌ভ্রান্ত জাহাজ তোলে অন্তর্কাতর শব্দ, ত্রস্ত 'এস্-ও-এস্'।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একটি সনেট

খাদের কিনারে শুয়ে, সারাদেহে মারাত্মক ক্ষত।
এখানে কিন্নরকণ্ঠী নদী নাকি একদা বইত—
সেই খাদে দেখ আজ নরকের সাবলীল পথ.
তার ধারে শুয়ে আমি কলুষ অসুখে জর্জরিত।
সঙ্গী শুধু একটা গাছ, পাতা নেই, আঁকাবাঁকা ডাল ;
মস্থণ দিগন্ত বেয়ে সন্ধ্যার রোমশ অন্ধকার
ধমনীতে শিকার-মন্ত্র। রাত্রি শুধু প্রতীক্ষার কাল—
হত্যার, মৃত্যুর কিংবা লয় খোলে নরকের দ্বার।

অচেনা নিস্বন শুনি : বহুদূরে, অতিশয় ক্ষীণ,
ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়। কৌতূহল ওঠে কণ্ঠতীরে।
তবে কি আগত লয় ? শোধ হবে এ-জন্মের ঋণ ?
এতদিনে এল ডাক প্রস্তাবিত নির্বাণ-মন্দিরে ?

সহসা কিন্নর-কণ্ঠ জাগে যেন খাদের অতলে :
গান গেয়ে ও কে আসে ! পূর্বতন্দ্রী সোনার ফসলে।

•

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

অরণ্যের অন্ধকারে আলো

তীরন্দাজ পুত্র তার বৃক্ষের সংসারে আগন্তুক
ছেলেখেলা করে। এবং কম্পিত আলোতে আলোকিত
যেটুকু মুখের রেখা, এসবই সূর্য আর বৃক্ষ
সম্মিলিত আরণ্যিক প্রতিভা,—বিশ্বাসে রমণীয়।

উত্তরসূরী

এ বনে সে বনে ঘোরে। দৃষ্টি তার গাছে গাছে, যাতে
শিশুহারা বিকেলের সাথে। রশ্মি তার তীব্র ধনি
সাপের নাচনে যেন মত্ত হিংস্র ওস্তাদ শিকারী।
সুখে থাক, সুখে থাক অরণ্যের আদর্শ প্রতিভা।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

বাঙলা পদাবলী

চরম সংশয়ে কণ্টকিত হয়ে প্রতিটি প্রহর।
নেশাখোর চোখ বুঁজে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা……
বানানো সুখের মত কিছু খড়কুটো তৈরী করে।
প্রতিদিন দারুণ দৈন্যকে সঙ্গী করে বেঁচে আছি,
মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি।

ওদের প্রণয়ে ঘেন্না শুধু বাক্যবাগিশ পণ্ডিত,
শুধু দেখি চতুর্দিকে সাপের প্রণয়;
শ্রীরাধার অঙ্গে অঙ্গে ওরা বিষ ছড়ায় কৌতুকে।

বাঙলা, তোমাকে আমরা কিছুতেই বাঁচতে দেব না;
জোয়ান, তোমাকে আমরা বারবার পুড়িয়ে পুড়িয়ে
অযাবস্যা শ্মশানে নাচব;
সতী তুমি যুগে যুগে দেহত্যাগ করো পৃথিবীতে,
পৃথিবী পাষাণ হবে অন্তত সোনিতে।

ভুলে গেছি আমরা বেঁচে ছিলাম যে কবে;
মনেও পড়ে না তার আমার কি জননীর মুখ
কবেকার ইতিহাস কলিলের অন্ধকার যুগ।

বাঙলা, তোমাকে ওরা পুতে ফেলবে বাঁশবনে পরার চড়ায়।
বাঙলা, তোমাকে ওরা ভুলে দেবে পশুর উল্লাসে।

আমরা বেশ নিশ্চিন্ত রয়েছি মনে দুচোখ বুঁজিয়ে,
নরম শয্যায় শাদা প্রণয়ীর কোমল বাহুতে;

এখনো বানানো সুখে চোখবুজে গাজাখোর কিছু খড়কুটো তৈরী করে
…পুত্রার্থে ক্রিয়তে

চরম সংশয়ে কণ্টকিত কাঁপি প্রহরে প্রহরে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নোয়ার নৌকা

নৌকায় বাতি জ্বলে, আকাশে নক্ষত্রদীপজ্বলে
যাত্রার প্রস্তুত রাত্রি উৎসর্গের বিচলিত বিস্ময় মতন
কেঁপে কেঁপে ওঠে এক উনিশশো বাষট্টি বৃদ্ধ নদীর স্রোতের অধিকারে
এসেছে দূরের যাত্রী নাবিকের প্রবল চীৎকারে
নিঃসঙ্গতা বড়ো বেশী, বড়ো ক্লান্ত কোলাহল জননী মাটির সব মৌলিক মেশিনে,
বুঝি তাই জলের প্রবাস আজ সান্ত্বনার মনে হ'লো। খর্জুরবীথির
দিগন্ত এখনো খোলা যদি জানা যায় স্পষ্ট সমাপ্তি কোথায়।

নৌকায় বাতি জ্বলে, দিকনির্ণয়ের সংকটে সূর্যের শেষ
পরিশ্রম নিতে গেছে; কেননা বয়স
ক্রমে অবলুপ্তি ভালবাসে, চায় অস্তিত্বহীনতা।
কারিক সংস্থান জানে এমন অভিজ্ঞ ধাত্রী যে কোনো মানুষ
প্রতিটি স্তরের জ্ঞান, নীলিমালিকারী সব উদ্‌গ্রীব খিলানে
আছে প্রেম প্রতিরোধহীন, স্পর্শে, ক্ষোভে, যে কোন ঘিরায়; আছে।
আজ শতাব্দীর রক্তে অপ্রেমের বেসাতি বন্যায়
সমস্ত আলেখ্য ভাসে, চুম্বনের প্রসিদ্ধ যৌবন জেগে যায় বোলে, শেষ
অসহিষ্ণু অন্ধকারে ঘুমের নিকটতম নোয়ার নৌকায়

মানুষ এখন এসে একাকী বসেছে। কোনো অন্য সঙ্গী নেই
কিংবা খড়, মর্তের সবুজ ঘাস। শুধু জল খু খু জল, জলের ক্ষুধায়
ধ্রুবতারাহীন নৌকা উৎসর্গের বিচলিত বিন্দুর মতন
দিগন্তের সব রেখা মানবিক লণ্ঠনের আলোতে মেলায়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

দুটি চতুর্দশপদী

কি ভাগ্য যে ভুলি নাই। অথচ বাতাস
এমন বয়েছে যাতে জীর্ণ পাতাগুলি
উড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ; মমতাবলত
রয়ে গেছে মেহে তাপে বৃক্ষের ছবিতে।
চকিতে বিদ্যুৎ লেগে আজো বর্ষরাশি
হঠাৎ বিকট পোড়ে, ধ্যানরত মেঘ
কেটে যায় ; কার মুখ তবু দেখা যেয়,
তারে চিনি, তারে কোনক্রমে ভুলি নাই।

দুঃখরাশি কাছে রাখি, এসব অন্ধার
নক্ষত্রের থেকে ভাল জলে ওঠে, যত
জোনাকির মত ভাসে বিরহ শোণিতে।
এসব গহন জ্যোৎস্না তীব্রতম জ্যোতি
ছড়ায় বিস্তৃত বুকে পঞ্জরে গভীরে।
কি ভাগ্য যে ভুলি নাই, ভুলি নাই আজো।

বকুল, তোমাকে ঠিক মনে আছে, সায়াহ্ন বেলায়
জ্যোৎস্না কোটায় আগে গোধূলির গহন নিবিলে
আমরা খেলেছি একা, মানুষেরা ছিল পৃথিবীতে
নিজেদের কাছে, বাতাসেরা ছিল বনপথে,
ফুলগুলি ফুটেছিল একাকিনী আপন কোটায়।
ডাকেনি কেহই ; শুধু অতি তীব্র ডেকেছি তোমাকে

তুমি অতি মৃদু সাড়া প্রতিস্বরে দিয়েছিলে সুখে…
সন্ধ্যা সমাগমে যেন এইসব দেখেছিল শুধু।

মানুষেরা আজো সব নিজেদের কাজে, বাতাসেরা
আছে বনপথে, শুধু সেই ম্লান গভীর বুকুল
এল না কাননতলে। চলে গেছে কেমন বাতাসে।
কাকে দোষ দেবে তুমি, সূর্য যায়, চন্দ্র যায় ডুবে,
হায় নিশি। তারাগুলি ডুবে যায় অখিল সাগরে—
এ সবের স্মৃতি নেই, মানুষের এই দুঃখ বেশি!

শিবশম্ভু পাল

স্মৃতিভ্রষ্ট

আমি সব ভুলে গেছি। গতকাল, তার আগে আরও ঢের আগে
গতকাল বেঁচে ছিল অলস মন্থর জলজীড়ামত্ত আমার গহনে
এখন কোথায় তারা। সর্বাঙ্গ বিবশ করে প্রচণ্ড আঘাত।

কে তুমি দিনার থেকে ছুঁড়ে দিলে পাতালের কঠিন কর্কশে
কে তুমি ওখানে হানছ গগনবিদীর্ণ ঝড়ে, কত উঁচু ওই
আকাশ : হায়রে আমি কবে যে ধারণ করেছিলাম তাহাদের।

আমি রত্নাকর নই, স্মৃতির ভিক্ষুক হয়ে দুহাত বাড়িয়ে
তোমার দুয়ারে আসব, তুমি বলবে, কী আমার নাম
আমার অস্থির বুকে দান করবে সেই নীল অমূল্য মুহূর্ত।

যেন মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে কক্ষময়ে, আঁধারে আঁধারে।
আমি সব ভুলে যাচ্ছি : অবসন্ন শুধু মৃত বিছানার ঘুম :
বিবশ আহত শুধু বহে চলি যতদিন যতরাত পারি।

কেবল বিচার কর, মানুষেরা চিরকাল স্মরিত যাদের
চন্দ্রলোকযাত্রী হতে ভালোবাসে, জানো তুমি জন্ম থেকে তার।
যাক্‌গে, করুণা দাও; বলো, কী আমার নাম, কোথায় সঙ্গিনী?

দিব্যেন্দু পালিত

৩'টি কবিতা

হাত

মুচড়ে দিতে ইচ্ছে করে দেখলে ওই সাদা হাতখানি।

আঙুল আঙুল নয় : গান জাগে অলীক হৃদয়ে—
প্রীতিবদ্ধ পরস্পর, আরকে জেগানো যেন, স্থির হ'য়ে আছে একপাশে ;
অস্থিহীন, সমুজ্জ্বল ; স্নিগ্ধতম প্রবের পুতুল !

যেন স্পর্শমাত্র বুকে সর্বনাশ কেঁদে উঠবে ভীষণ চীৎকারে।
কেন এত শুভ্র হবে হাতখানি, স্নেহের গড়ন ?
প্রতিভার প্রয়সাধ্য, সরলতা তার চেয়ে বেশীদূর যাবে ?

বিরল যা-কিছু সব দেখলে বড় ভয় হয় আজ।

দুঃখ

আরো বেশি দুঃখ দিতে পারো—
আরো বেশি অন্ধকার, ঘরে
যখন আঙুল ডুবে যায়
স্মৃতিহীন প্রহরে প্রহরে
যাকে ভালোবাসি, তার মুখ—
যেন তার ভীষণ অসুখ।

যেন তার ভীষণ অসুখ—
রক্ত স'রে যায় ক্রমে ক্রমে,
স্নেহ স'রে ওঠে, সারা বুক
ভ'রে যায় হিংসার রোষে।
যেন তবু তাকো তাকে ঘিরে,
যন্ত্রণা অনেক ; তবু দিও।

যন্ত্রণা অনেক ; তবু দিও—
বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্মৃতি ;
ক্রমণের অধিক স্বকীয়
জ্যামিতিক মুখের আকৃতি
আমার অক্ষম দুই হাতে,
দীর্ঘতম আকাঙ্ক্ষার রাতে।

দীর্ঘতম আকাঙ্ক্ষার রাতে—
বাহুমূল সমুচিত হ'লে ;
অপ্রেমের আঘাতে আঘাতে
যখন সমূহ প্রেম জ'লে
ওঠে, যেন মনে হয় আছি :
মৌলিক তোমার কাছাকাছি।

তারাপদ রায়

অপ্রাকৃত কবিতা

"অনেকদিন আমি এই শ্মশানে রয়েছি,
কে আমায় পিণ্ড দেবে,
কার পুণ্যে মুক্ত আমি হব অবশেষে ?'... হিহি শীতে
নির্মম জ্যোৎস্নায় মেশা কুয়াশায় পৌষের রাত্রিতে
প্রেতের করুণ কণ্ঠ, 'কেউ মুক্তি দেবে ?'

মৃত শবযাত্রীরা ব্যাজারে শরীর ঢেকে নিয়ে
নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হলো আগুনের কাছাকাছি ঘেঁষে—
কি দেখবে ? 'কি দেখবো, কি জানি ?'...ভেবে একবারো মুখ তুলে
তাকালো না। কে তাকাবে প্রেতের নয়নে,
কঙ্কালের অক্ষির বর্তুলে।
অমন সাহসী কেহ সেখানে ছিল না।

উত্তরসূরী

(ম্লান পরপারে, কাঁটাবনসার কোলের ভিতরে
ক্ষুধার্ত শিকারী চাঁদ নেমে গেলো খদ্যোতের খোঁজে
চতুর্দিকে মুখরিত শৃগালের আর্ত প্রতিবাদ)
অনাথ প্রার্থনা ক্ষীণ জ্যোৎস্নাহীন আসন্ন আঁধারে :
'চিতাভস্ম, শব গন্ধ বড় দীর্ঘকাল
এই খানে শুকচরে পড়ে আছি বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল।'

কয়োটিতে কোনো ইচ্ছা, কোনো বাঞ্ছা গলিত হৃদয়ে
নিরাশ করুণ এক প্রেতকণ্ঠ হিমাক্ত হাওয়ায়,
'মধু বায়ু, মধু সিন্ধু, বিবসনরজনী মধুময়
তোমরা কে নেবে বলো, কে তর্পন করবে আমার ?'

বাঁশ, ঘড়ি, ভাঙা কলসী—শবযাত্রকের ফিরে যায় ;
পড়ে থাকে বিশাল শ্মশান ভরা শীত, অন্ধকার ॥

আশিস সান্যাল

প্রত্যয়

একবার নিভে যাবো, অন্যবার জ্বলে উঠবো ভীষণ আঁধারে,
তবু হে কৃতঘ্ন দুঃখ, এই মালা তোমাকে দেবো না,
যে আমে প্রতিষ্ঠা করে, শুধুমাত্র তাকেই পরাবো
করে যাবো দাবদাহে, তবু স্তব্ধ কোথাও হবো না।

হানো তীব্র কশাঘাত হে কুটিল বৈরী প্রতিবেশী,
নক্ষত্রের রক্ত মেখে তোল তবে শেষ হাহাকার ;
মানুষ কি রমনীয় হবে কোনোদিন ? নিজস্ব কুটীরে
অতিথিরা ফুঁয়ে যাবে সেইদিন অস্তিত্ব আমার

ভুলে থাকবো উজ্জ্বলতা অন্ধকারে সমস্ত নিখিলে।
যেহেতু তোমার দাবী অসহায় সমগ্র বিধানে ;
নিঃশব্দে ঘোষিত মৃত্যু, সঞ্চারিত ব্যাপক গভীরে,
সময়ের নির্মমতা থামবে না কোনোদিন দীর্ঘ ব্যবধানে।

যতোকাল বেঁচে থাকবো নির্বাচিত আলো অন্ধকারে,
আনমনে রচিত অর্ঘ্য আমি আর তোমাকে দেবো না ;
যে আছে প্রতিষ্ঠ ঘরে, শুধুমাত্র তাকেই পরাবো
ক্ষয়ে যাবো দাবদাহে, তবু স্তব্ধ কোথাও হবো না।

শান্তি লাহিড়ী

পোস্টারে নটীর মুখ

অ্যাসফল্টে তোমার ছায়া—
মরণ তোমার মুখ নির্জন রজনী মন একক শহরে,
অ্যাসফল্টে তোমার মুখ নাচবে সারারাত।

ভেজি মিথ্যার মত, কিংবা নির্ভেজাল সত্য
—সমস্ত, শাওনঘন দুরায়ত নির্মম একাকী।

কেউনা, তোমার মত কেউনা। কখনো দেখিনি
শরীরে কি রক্ত, রং, কিংবা মাংস। কিবা
অপরূপ রূপ! দৃষ্টি, মেঘা চাঁদ, নিরুনের আলো
অথবা সমস্ত রাত ব্ল্যাক আউট—ছেঁড়া তার—আলো জ্বলবেনা।

নীরব পাথর, কেউ নেই।
কোন পাগলের প্রেম, ভিক্ষুনী নারীর বুকে মুখ ঢুবা,
আর,
অ্যাসফল্টে তোমার ছায়া হাসছে, কাঁদছে সারারাত জেগে।

অনিরুদ্ধ কর

শিল্প

চিরবিদায়ের বাঁশি বেজে উঠলে প্রত্যেকে ছুঁতে
যা কিছু সঞ্চিত ছিল কৃপণের মত চেয়ে থাকে,
ক্ষিপ্রহাতে বিস্তারিত আদিগন্ত কোমল ছায়ায়
সব আস্বাদিত স্মৃতি দোলে নত চন্দ্রিম পল্লবে।
এখন যাব না, দূরে না যাওয়াই ভাল, অন্ধকার
ছুঁয়ে এলে ম্লান বকুলের গন্ধ অতদূরে যদি
না যায়, না পৌঁছতেও পারে, বরং এখানেই থাকি।

দূর অতিদূর দূরান্তের থেকে তখন বিশাল
অনাহত ভেসে আসে ক্লান্ত রাখালের বাঁশি—
তোকে বহুমূল্য বিদায়ের মুহূর্ত দেখাব বলে
সমস্তই নিয়ে যাব, এমন কি এ শূন্যতা অবধি :
যারা আসে ফিরে যায়, যারা কাছে আসে না, ফেরে না।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

অকুণ্ঠিত পথ কাব্য

অকুণ্ঠিত পথ কাব্য। পদক্ষেপে পদ্মের মৃণাল
অজস্র পুষ্পের ঘ্রাণ। বাগানের পুরানো পল্লব
প্রাক্তন প্রান্তরে নিত্য ঝরে যায়। শুধু বিস্মরণ
অলক্ষিতে সৃষ্টি করে প্রতি ঋক্ষে নূতন ঘটনা।

পুরানো বয়সগুলি পরবাসী। বিপন্ন প্রতীকে
জমে পড়ে মধ্যরাত্রি তবু ওঠে চতুর প্রলাপ
বহুবিধ প্রতিশ্রুতি। উদ্যানের অন্ধকার গাঢ়।
বর্ণহীন প্রেমে শুধু নতমুখী বিষাদের স্বাদ।

আমি দ্বিধা করি পরবাসী হতে। সংশয়ের তীর
দীর্ঘতম দূরে থাক। পবনাক্ত সময়ের ম্লান
তরঙ্গিত চতুর্দিকে। পরিচিত মুখের সৈকত
সিক্ত অশ্রু মুছে নেয় অন্তর্ধান আলোর বিস্ময়ে।

পুরানো পল্লব নিত্য ঝরে যায় প্রাক্তন প্রান্তরে।
অকুণ্ঠিত পথ কাদা! প্রতিধ্বনি বিনিদ্র মর্মরে॥

পরিমল চক্রবর্তী

আশ্বিনের চিঠি

অমলা, আবার আমি কবিতা লিখছি দক্ষিণের
বারান্দার ধারে বসে। আশ্বিনের সোনালী রোদ্দুর
কী-আশ্চর্য স্নেহভরে আমার প্রশান্ত চোখেমুখে
স্বপ্নের জড়োয়া ছবি এঁকে দিচ্ছে। এক আবেশের
প্রাণের সুদূরপ্রান্ত স্পর্শকারী লোকায়ত সুর
মন্দাক্রান্তা ছন্দে ছন্দে বেজে যাচ্ছে এই সাদা বুকে।

(অমলা, এখন তুমি কোন্‌খানে আছো? কী করছো?
কার সাথে গল্প করে মধুর দুপুর কেটে যায়
এখন তোমার?) রাত্রে, যখন তারার ফুলে-ফুলে
নীলাকাশ ভরে যায়, তখন কী চেতনার কূলে
এখনো আমার স্মৃতি ঢেউ হয়ে ভেসে আসে? হায়,
আজো কী আগের মতো আমার কবিতা তুমি পড়ছো।

অমলা, হৃদয়ে জ্বেলে অতীতের ম্লান রোশনাই
এখনো তোমায় স্মৃতি পিছু ডাকে—যতোদূর যাই॥

মৃণাল দত্ত

নৈসর্গিক

সময়ের নিরুচ্চার বাঁকে। পার হয়ে গেল বিষণ্ণ যুবক।
দুপায়ে নিঃশব্দ হেঁটে নিঃসঙ্গ প্রান্তরে
নির্ভয়ে দাঁড়ালো। অনস্ফুট নিঃসংলাপ স্বগত মন্তরে,
নিষ্পলক চেয়ে থেকে, ক্রমে তুললো সূর্যস্নান বৃক্ষের কুহক।

প্রতিটি দিনের বন্ধ দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে
তুচ্ছ সঞ্চয়ের লোভে যন্ত্রণাকাতর
হৃদয় নিশ্চিত জেনেছে, আসলে বাসনার ঘর
কিছুই রাখেনা পূর্ণ সময়ের বিনত সঙ্কেতে।

একথা জেনেই, সদ্য অনুভূত এই চিন্তার সন্ধানে
নিভৃত সহজে সমুৎসুক
যুবক দিনান্তস্নান স্রোতের উজানে
নুয়ে পড়ে চেয়ে চেয়ে দেখল তার স্বরচিত নিয়তির মুখ।

'আমিই রক্তের লাল পাপ ঐ স্রোতের সলিলে
ভাসিয়ে দিয়েছি।' বলে কোন উচ্চারণে
উদ্যম আহত মনে তাকালো চৌদিকে : পশ্চিমের নীলে
উন্মুখ গোধূলি, বুকের আড়াল নদী বিস্তৃত নির্জনে।

হা, কতোকাল তার মায় কথা মনেই পড়েনি
ভাবতে গিয়ে কান্নায় চাপুকে
নিঃশেষে চিহ্নের ক্ষত শুষ্ট হোল বুকে।
সারা বনস্থলী শুনলো স্তব্ধ কান পেতে ; একটা গ্লান পাতাও
পড়েনি

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ঝড়বৃষ্টি এবং রোদ্দুরের গল্প

হে অস্থির বুধক তাখো, অথও মুক্তি প্রবাহিত
কী নির্মল মুক্ত হাওয়া চতুর্দিকে, কি ঘর বাহির
তাখো কি প্রদীপ্ত রাত্রি উজ্জ্বল অথচ শান্ত স্থির সমাহিত,
দূরে ঘণ্টাধ্বনি শুনছি পরিশুদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরের।

বিষণ্ণ বিকেল ছিল : কার রক্তে পশ্চিমের পট
রোষাক্তিত ; ইতস্তত কানাকানি অফিসে দোকানে ঘরে, মনে মনে :
—'একটা বিকেল গেল, আহা কি সুন্দর দিন এতটুকু হাওয়াও কল্লোল,
সন্দেহে লক্ষ জনে ট্রামে বাসে, পথে পথে, গৃহে ফিরে গৃহিণীরও শোক :
কানাকানি গাছে ফুলে পাতঙ্গেও, 'আহা যদি ঝড়
এবং একটু হাওয়া কিছু বৃষ্টি এক পশলা জল হত যদি',—
—এই বলে ভুলে ছিল শহরের যত লক্ষ ধূসর মানুষ।

তারপর বৃষ্টি এলো। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় ঝড় আলুথালু শহরের বেশ
সিক্ত দেহ, কলুষকণ্ঠ আকাশের আশ্চর্য ঈশার
গুঞ্জনে মুখর ছিলে, কেঁপে উঠলো ভালহৌসীর লক্ষ নরনারী,
শঙ্কায় অধীর হলো ; সংজ্ঞাহীন বিরুদ্ধ বাতাস :
'ঘরে ফিরতে কতক্ষণ,'—চিন্তায় চঞ্চল হলে অতঃপর ক্ষণিকের ঝড়
শুদ্ধ হয়, জেগে ওঠে সমস্ত হৃদয় জুড়ে ব্যস্ততার অন্ত আকাশ

পরবর্তী মুহূর্তের মুক্ত হাওয়া চতুর্দিকে, কি ঘর বাহির
সব ঝড় থেমে গেলে উড়ে গেলে সব ঝরা পাতা
কান পাতলে শোনা যাবে ঘণ্টাধ্বনি বৌদ্ধ মন্দিরের
অস্থিরতা শুদ্ধ হলে সব হাওয়ার আশ্চর্য মমতা ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মোহন তরণী

ভালান : শৈশব স্মরণ (অংশ)

অমল শৈশব, অমেয় শান্তির পারাবার
তোমার করতলে বিপুল শান্তির আয়োজন
আমার ক্লান্তির আমার ভগ্নাতুর ভাবনায়
কোথায় শেষ, বলো ! কোথায় সুন্দর মায়াবন ?

স্মৃতির তারে নত বেদনা গুনগুনিয়ে ঘুমতী
অথবা বৃদ্ধের ত্রিকাল চিহ্নিত অবয়ব
মৃত্যুময় এই জগতে করি যার আরতি
সে কোন্ দেবতার মহান পদযুগ অভিনব ?

মাতৃহীন এই নষ্টপ্রজার অনলস
আত্মসন্ধানে তোমার প্রিয়তম ভাবনা
হয়তো বহুবিধ রক্তভরা স্পর্শকলস
আমার সুন্দর বেদনায় তার কাছে যাবো না ?

বিশাল শৈশব বেদনা প্রাঙ্গন দেবতার
খেলার সাথিগণ বেদনা দেবদূত মায়াময়
আমার স্মৃতি চায় সে ছবি স্নেহভরে রচনায়
সকলই শৈশব তোমায় মনে হয় অপচয় ।

অথচ কী অসীম কামনা কী অসীম অভিলাষ
প্রতিটি ফলকের শিকড়ে সোনালির শিশুবন
রোপন করে যাই সেচন করে প্রেম বাষ্পোশ্বাস
কিন্তু বৃথা ! প্রেত শোষণ করে জল অকারণ ।

তুমি হে বিস্মৃতি। তোমাকে ঘিরে যতো ভাবনা।
আমার ভালোবাসা পীড়িত কেন তব শাসনে ?
আমি কি তব প্রেম ক্ষণিক সুরে কণ্ঠ পাবোনা ?
বাঁচাও ভুলবন হে প্রিয়, অনুরাগ সেচনে।

আমাকে ঘিরে রয় বয়সী ভাবনার প্রেতদল
মরণ-চিহ্নিত সকল তৃষ্ণার পদপাত
আত্মহননের চেয়ে কি বাঞ্ছিত ছায়াতল ?
এমন অভিশাপ যাবে না চলে জানি অচিরাৎ।

দুজনে মুখোমুখি, অথচ বহুদূর ব্যবধান
শাণিত দন্তের খড়্গ রেখে সঙ্গোপনে
ধূর্ত চাটুকার জানাই ভালোবাসা সুমহান
সাজিয়ে পদাবলী মধুর শব্দের চয়নে।

বিশাল মানুষের আমরা আত্মীয় নহি আর
নিঃস্ব পিশাচের আলিঙ্গনে পাই সুখভাগ
কে আর স্পর্শের বিরহে কাঁদে বলো দেবতার
ক্লিষ্ট আত্মার সমুখে নেই প্রিয় অনুরাগ।

কোথায় শৈলব পরম সুন্দর বনতল
আমাকে বলে দাও কোথায় ওটরেখা সীমাহীন
চতুর্দিক জুড়ে বয়সী ভাবনার প্রেতদল
জড়িয়ে নাগপাশে জানায় তার কাছে কত ঋণ।

ছিন্নবসনের আড়ালে প্রেত করে হাহতাশ
কোটায় আগে হায়, মাটিতে ঝরে যায় গোপনে
জীর্ণ দেহভার জীবিতে মরণের ক্রীতদাস
সময় বহে যায় অকলা বৃক্ষের রোপণে।

তৃপ্ত তমসার দিকেই ক্রমাগত অভিলাষ
কখন মুছে যাই বিশাল সৃষ্টির বিবরে

উত্তরসূরী

এখন রেখাছান সমাপ্তির হাতে কামনার
নিয়তি হায়, বলো মোহন শৈশব, কে ধরে ?

নিদ্রাতুর স্নায়ুপুঞ্জ ভুলে যায় আমি আর
আমার চেতনার বিবিধ উৎসের ধারাপথ।
হারুরে যৌবন, মোহন কৈশোরে ফিরিবার
দুর্বার অভিলাষ, ফেরে না সম্মুখগামী রথ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আত্মহননের পূর্বে

(আতিক সাহিড়ী, দেবেশ রায় ও সুরজিৎ বসু-কে)

চারজন
একই কথা বলি
একই যৌন-প্রহারেতে রাত্রি-দিন জলি
বন্ধ দরজার কাছে হাঁকি বারবার :
হে পত্না, হে ঘ্রাতিশীর্ণ প্রমত্তা আমার
প্রবাহে প্রবাহে ভাঙো মৃত্যুহীন তৃষ্ণার পাহাড়।

চারটি যুবক
চারজন ভূতপূর্ব এবং অধুনা
চারজন নিহত যুবক,
সামনে নিষ্ঠুর কাল ও পেছনে কালের রাখাল
আমরা তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
এবং জেনেছি
অন্ততঃ নতুন কিছু নেই। আমরা যুগে পৌঁছে গেছি।

অবশ্য একদা
হর্ষ কম্প স্বেদ বা পুলকে

নাগকেশরের মত কদমের মত রোমাঞ্চিত
হয়েছি। প্রবল ঝড়ে সিংহের কেশরে ফুলে ফুলে
সমুদ্রে পাহাড়ে বনে মত্ততার মাদলে মাদলে
বাদলের ঘোলে ঘোলে আকাশে পাতালে ঝিমিঝিমি
জহ্নুতনয়ার মত আলোয় পিংগল বুকে সাপ
হয়ে খেলেছিল তবু জোয়ারের খোলা তলোয়ার।

পরে একদিন
ঐকতানে ছিঁড়ে যেতে যাযাবরাতে ত্রস্ত ঘুম ভেঙে
চারজন অকস্মাৎ একসংগে বলে উঠলাম :
কোথায় কোথায় তুমি ছাতিশীর্ষ প্রমত্ত আমার !

বলতে বলতে দাবা দেহ কি বিক্ষোভ আকুলি-বিকুলি
শিরা উপশিরা তীব্র বিষে নীল, অসহ্য টনটনি
কোষে কোষে। আমরা কাঁপতে কাঁপতে বললাম :
এ মুহূর্তে তীব্র স্রোতে চূর্ণ কর তুষার পাহাড়,
দেখছনা সমস্ত রাত নগ্ন শিরে অজস্র শিশির
নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবী
এর নীচে আমরা চারজন
বন্ধ দরজার সামনে ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ হয়ে
হিমার্ত রক্তিম নগ্ন শূন্য পদে দাঁড়িয়ে রয়েছি ?
অতএব আমাদের ফেলে
যেও না যেও না পন্থা। বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ালে
সমস্ত হারিয়ে যাবে কীর্তিনাশা ক্লান্তির আড়ালে।

প্রথমে সুতীব্র ভেঙে জলে জলে দুলতে দুলতে আলোর ইথার
প্রচলিত অযোঘ নিয়মে
নিভে এল।
ভেঙে চুরে মুছে দিল অনায়াসে ঢেউয়েরা কান্নার,
সব কথা-যৌথাদ্রি গুণগুণ প্রেমের ছকে :
আমি কি হারিয়ে যাবো সন্ধ্যার বিলীন এই মসৃণ আলোকে ?

উত্তরসূরী

কুয়োর তলায় তিনটে মেয়ে খেলতে খেলতে উঠে গেল
কৈশোর যৌবন প্রজ্ঞা। চারজন নিহত যুবক
বুকের সূচরীতে রেখে প্রতিদিন অলস বিকেলে
এইখানি জড়ো হয়ে কোনদিন বলবেনা আর,
কে আছো কোথায়, ভাঙো চূর্ণ কর মৃত্যুর পাষাড়,

যেহেতু কেনেছি
অন্তত নতুন কিছু নেই। আমরা দৃশ্য পৌঁছে গেছি।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

অপরাহ্নের ভাস্ক

আলোর তরঙ্গ থেকে ফিরে আসে অন্ধকার মুখ
অপরাহ্ন বেলা,
সন্তাপে, অসহ্য সুখে, নিরুদ্বিগ্ন রৌদ্রের শরীর
গোধূলির আমন্ত্রণ সবিনয়ে করে অবহেলা।

সহজ বিক্ষিপ্ত ভাবে তরঙ্গিত তোমার চিবুক
ভেসে যায় কালিন্দীর জলে,
তীরবর্তী দৃশ্য জল খরস্রোত কণ্ঠস্বর চক্ষু করতল
হেসে ওঠে নয়নাভিরাম কৌতূহলে।

আলোর তরঙ্গ থেকে হৈমন্তিক শস্যের প্রাঙ্গনে
ফিরে আসে অন্ধকার : বন্ধু সঙ্গী একান্ত সুহৃদ,
যেহেতু প্রতিটি দৃশ্যে প্রতিবিম্ব স্বয়ং সম্মুখে
আমি কি সম্রাট, প্রার্থী, বিদূষক, কিংবা নাতিবিম্ব।

সুশান্ত বসু

পুরনো ছবি

আখো, আমার অনেকদিনের পুরনো সেই ছবি
ব্যর্থ, অন্ধকারে কেমন মৃত, করুণ জলে—
কেমন জলে।
এখন ভীষণ আগুন জ্বলছে, চতুর্দিকে ভীষণ কালো
স্তব্ধ অন্ধকার
তবু আমার পুরনো সেই ছবিটি আর কেমন তীব্র
উজ্জ্বল সেই বেয়াল জোড়া আলো এবং আলো
রক্তে কেন প্রতিশ্রুত আলোর ছন্দ তীব্র বেজেছিল
এখন জীর্ণ শীর্ণ পেরোই প্রতিদিনের শীর্ণ পারাপার
দেওয়াল জুড়ে তবু আমার
অনেকদিনের পুরনো সেই ছবি,
ভালোবাসা অচেনা এক গন্ধ হয়ে গেছে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

লোহিতসাগরে সন্ধ্যা

একদিকে এশিয়ার, অন্যদিকে আফ্রিকার দুই
উপকূল রেখা দেখতে দেখতে জাহাজটা
মোচার খোলার মত দুলছিল ;
তখন অন্ধকার।

কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঐ উড়ুক্কু মাছটার
সূর্যভোজী পৃথিবীর একচুমুক দেখবে বলে
জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে
আবার সে তলিয়ে গেলে জলে

উত্তরসূরী

একটি গ্রামের কথা মনে পড়ে। একটি
গৃহের কথা মনে পড়ে, টিনের চাল
আর মাটির দেয়ালে, একটি তুলসীবন।
এক ঝাঁক উলুধ্বনি। প্রদীপের শিখায়
ঝাঁপা একটি আনত মুখ।
আহা, ঐ উচ্ছ্বল মাহেন্দ্র কোনদিন
সেই সন্ধ্যার কথা জানলনা।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কোথায় কর্ণার জলে...

কোথায় কর্ণার জলে বৈকালিক রক্তমেঘ আলো
যন্ত্রণাকে কৃষ্ণচূড়া ফুল ক'রে সযত্নে ভাসালো :
আমার নির্জন ঘাটে এবং তা ভেসে ভেসে আসে
আমি তাই তুলে নিয়ে ঘরে যাই রাত্রির বাতাসে।

কতকাল প্রতীক্ষার দেবতার নিগূঢ় আজ্ঞায়
স্থির বসে আছি আমি —অনুভবে কত আন্দোলন
দেখেছি ধূসর পাখী—কত ছায়া কত রৌদ্রালোক—
হাত তুলে নেব যেই—কে করেছে নিষ্ঠুর শাসন !

সময় হয়নি বুঝি ! পরিদৃশ্য বস্তুর বাহিরে
নির্মম গোপনশক্তি নিয়মিত আমার প্রহরী
বড় দীর্ঘ মনে হয় ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার আয়ু
কবে ফিরে যাব কের পরিচিত সমাজের তীরে।

অবশেষে বুকে নিয়ে কত শত গাঢ় অভিজ্ঞতা
যন্ত্রণার কৃষ্ণচূড়া—যায়া আলে স্মৃতির তীব্রতা—
ঘরে ফিরে যাই আমি—যেতে যেন ইচ্ছা নেই আর—
কেন জানি মনে হয়—প্রয়োজন শাস্ত সবাকার।

Camus-র উচ্চারণ প্রসঙ্গে

Camus নামের উচ্চারণ নিয়ে আরও আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কারণ বিষয়টা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং আমি আমার প্রথম পত্রে যা বলেছিলাম তা এখনো আমার কথা। তবু আলোচনা করছি দুটি কারণে। প্রথমত, যে-সব পাঠক ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁরা এই বিতর্কে নিশ্চয় কিছু বিভ্রান্ত হয়েছেন, সেই বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, আমার মূল বক্তব্যকে শ্রীদিগিন্দ্রকুমার গুপ্ত ভিন্নরূপ দিয়েছেন, ফলে আমি যা বলিনি সেটাই আমার বক্তব্য ব'লে তাঁর পত্রে প্রকাশ পেয়েছে; এ জন্যে আমার কথা আর একবার বলা প্রয়োজন।

বিতর্কের মূল বিষয় ছিল বাংলায় কি ভাবে Camus নামটি লেখা উচিত। নামের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি নিয়েই মতান্তর সৃষ্টি হয়। প্রাসঙ্গিক আর একটি প্রশ্ন ছিল ঐ নামের অন্তের s ফরাসীতে উচ্চারিত হয় কি না।

মূল বিষয়টি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

ফরাসী ভাষায় কয়েকটি স্বরধ্বনি আছে যা বাংলা ভাষায় নেই। ইংরিজী ভাষাতেও তারা অবর্তমান। একক ভাবে উচ্চারিত স্বরবর্ণ u-এর ধ্বনি তাদের অন্যতম। বলা যেতে পারে, এটা 'ই'-ধ্বনি এবং 'উ'-ধ্বনির মাঝামাঝি (এখানে আমি শুধু ধ্বনিরূপের কথাই বলছি, ধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার কথা নয়)। যে ভাবে এই ফরাসী স্বরধ্বনি উৎপন্ন হয় তা বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমরা যখন 'ই' উচ্চারণ করি তখন আমাদের জিবের সম্মুখ অংশ তালুর দিকে ওঠে এবং ঠোঁট দুটো বিস্তৃত হ'য়ে অল্প ফাঁক হয়, তবে তারা সামনে এগোয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যখন 'উ' উচ্চারণ করি তখন জিবের সম্মুখ অংশ তালুর দিকে ওঠে না, কিন্তু ঠোঁট দুটো গোল হ'য়ে সামনে এগিয়ে যায়। ফরাসী u উচ্চারণে ঐ দুই ধ্বনির দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়: জিবের সম্মুখ অংশ তালুর দিকে ওঠে এবং সেই সঙ্গে ঠোঁট দুটো গোল হ'য়ে সামনে এগোয়। সহজ ক'রে বলা চলে, আমরা যদি বলি 'ই' এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটো গোল ক'রে সামনে বাড়িয়ে দিই, তাহলে ফরাসী u ধ্বনি পাই। এখানে উল্লেখ্য যে, এটি বিশুদ্ধ ধ্বনি। দুই ধ্বনির দুটি বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটে, কিন্তু দুটি ধ্বনির

সংযোগ নয়। অর্থাৎ মিশ্রিত 'ইউ' নয়। এক চোটেই এই u ধ্বনি উৎপন্ন করতে হয় এবং সমগ্র স্থিতিকালে একই রকম রাখতে হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাংলার মতো 'ই' এবং 'উ' ধ্বনি ফরাসীতেও আছে। প্রথমটি উৎপন্ন হয় একক i দ্বারা, কখনো কখনো y দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি ('উ' ধ্বনি) সর্বদা উৎপন্ন হয় ou, এই স্বরবর্ণ-সংযোগ দ্বারা।

Camus নামের দ্বিতীয়াংশে ঐ u ধ্বনি আছে। কি ভাবে তাকে বাংলায় লেখা যাবে সেই ছিল প্রশ্ন। যে-ধ্বনি আমাদের ভাষায় নেই তাকে আমাদের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শ্রীগুপ্তের নির্দেশ ছিল 'মু' লিখতে হবে। আমি তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল এই যে শুধু 'উ'-কার দিলে অন্য ধ্বনি বোঝা যায় ব'লে য-ফলা দিয়ে লেখা সঙ্গত, তাতে সঠিক উচ্চারণ প্রকাশ না পেলেও অন্তত বোঝা যায় যে, তা 'উ' ধ্বনি নয়। আমি এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তা উদ্ধৃত করছি: "ফরাসী u-ধ্বনি বাংলা ভাষায় নেই। ইংরাজীতেও না। সেটা শুধু কানে শুনিয়েই বোঝানো সম্ভব, অক্ষর দ্বারা নয়। ঠিক উচ্চারণ কি তা জেনেই যাঁরা 'কাম্যু' লেখেন, তাঁরা য-ফলাটা দেন 'উ'-কারের ধ্বনি থেকে একটা পার্থক্য করার জন্যে, সঠিক উচ্চারণ দেখানোর জন্যে নয়।" এর মানে কি এই যে, আমার মতে 'য'-এর উপর জোর দিয়ে উচ্চারণে তার স্থিতি দেখানোর জন্যে য-ফলা দেওয়া দরকার এবং য-ফলা দিলে সঠিক উচ্চারণ প্রকাশ পায়? অথচ শ্রীগুপ্ত সেটাই আমার বক্তব্য ব'লে দাঁড় করিয়ে ফরাসী ভাষায় স্বরঘাত (accent) বিষয়ে ইংরেজ সম্পাদকদের অভিমত জানতে চান। ফরাসী ভাষার স্বরঘাতের প্রশ্নটি কিঞ্চিৎ জটিল। সেই কারণে তা কৌতূহলোদ্দীপক বটে, কিন্তু বাংলা অক্ষরে বানান লেখার প্রসঙ্গে তা আলোচ্য ছিল না। কোনো ভাষার স্বরঘাত কি বানানে প্রকাশ পায়, না প্রকাশ করা যায়? বস্তুত স্বরঘাতের কোনো কথাই আমি তুলি নি। ইংরেজ সম্পাদকদের এটাও শ্রীগুপ্তের জানান উচিত ছিল যে, তিনি বাংলা অক্ষরে ফরাসী ou ধ্বনিকে দীর্ঘ ক'রে লেখার পক্ষপাতী। আমি আবার বলব, "কাম্যু" লিখলে আদৌ কোনো উন্নতি হয় না, বরং আরও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কারণ তার দ্বারা ফরাসী ভাষার পৃথক একটি ধ্বনি প্রকাশ করা হয় এবং যে ধ্বনি এ শব্দে হ্রস্ব তাকে দীর্ঘ ক'রে উপস্থিত করা হয়। স্বরঘাত এবং স্বরদৈর্ঘ্য এক বস্তু নয়।

Fouche-র বই থেকে u সম্পর্কে ফরাসী ছত্র কয়টি শ্রীগুপ্ত কেন উদ্ধৃত করেছেন বুঝলাম না। ওতে গ্রন্থকার স্বরবর্ণ u-এর নিজস্ব বিশেষ ধ্বনির কথা বলেছেন। প্রধানত ঐ ধ্বনির জন্যেই তো আমি শ্রীগুপ্তের বানানের নির্দেশে আপত্তি করেছিলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল Camus শব্দের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি নিয়ে। ওটি উচ্চারিত হয় কিনা। আমি মনে করি হয় না। দক্ষিণ ফ্রান্সে সাধারণ ভাবে সকলে s উচ্চারণ করেন, এই ঘোষণা মেনে নিতে আমার দ্বিধা ছিল। এই বিশ্বাস আমার ছিল যে শিক্ষিত ফরাসীরা, অন্তত Camus-র সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন শিক্ষিত ফরাসীরা s উচ্চারণ করেন না। আর এও আমি অবগত ছিলাম যে, Camus পরিবারে s উচ্চারণ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে আমি 'খাদা' অর্থে ব্যবহৃত সাধারণ ফরাসী শব্দ Camus-র উল্লেখ করে বলি যে এ শব্দটির s উচ্চারিত হয় না। শ্রীগুপ্ত তাঁর উক্তির সমর্থনে দক্ষিণ ফ্রান্স বাসিনী এক মহিলার পত্র উদ্ধৃত করেছেন। পত্র-লেখিকা বলেছেন যে, দক্ষিণ ফ্রান্সে s সচরাচর উচ্চারণ করা হয়। এ সম্পর্কে শুধু এই বলা যেতে পারে যে, s যাঁরা উচ্চারণ করেন তাঁরা ঠিক করেন না এবং অন্যদের তা শেখানও ঠিক নয়। ওটা যে ভুল তা লেখিকাও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন (অবশ্য তাঁর মতে Parisian dialect অনুসারে।) কিন্তু আমি খুব বিস্মিত হই তাঁর পত্রের শেষাংশে এই কথা পড়ে যে সাধারণ camus (খাদা) শব্দের s অক্ষরটিও উচ্চারিত হয়। এটা স্পষ্টতই ভুল। কারণ প্রত্যেক প্রামাণ্য ফরাসী অভিধান পরিষ্কার ব'লে দেয় যে, এই শব্দের s উচ্চারণে উহ্য। তবু এই মতান্তর সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের জন্যে আমি দিল্লীস্থিত ফরাসী দৌত্যবিভাগের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টার কাছে পত্র লিখি, গত মাই মে। প্রথমেই আমার বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে ভিন্ন মতের উল্লেখ করি এবং এ বিষয়ে তাঁকে আলোকপাত করতে অনুরোধ করি; উত্তর অবিলম্বেই আসে। আমাদের এই পত্রালাপ ফরাসী ভাষায় ব'লে মূল উদ্ধৃত ক'রে পাঠকদের বিরক্তি ঘটাতে চাই না। তাঁর অভিমতটুকু বাংলায় দিচ্ছি। তিনি লেখেন: "এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, camus-র শেষের s উচ্চারিত হয় না, তা সে বিখ্যাত লেখকের নামই হোক বা খাঁদা নাক বাচক বিশেষণই হোক।.....এও সত্যি যে দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকদের প্রবণতা আছে শব্দের সব অক্ষর, বিশেষত অন্ত্যের অক্ষরগুলো

উচ্চারণ করবার। কিন্তু তাঁদের অতিমত যত আবেগের সঙ্গেই তাঁরা সমর্থন করুন না কেন, এটা বলতেই হবে যে, তাঁরা ভ্রান্ত।"

Camus এবং Don Juan সম্পর্কে আমার দুই বক্তব্যের মধ্যে শ্রীগুপ্ত অসামঞ্জস্য দেখেছেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে তো সামঞ্জস্যই দেখা উচিত। কারণ তাঁর মতে দুই ক্ষেত্রেই আমি ভুল উচ্চারণ সমর্থন করেছি। আমিও কিন্তু একটা সামঞ্জস্যের কথাই মনে রেখেছিলাম। আমার মতে বিদেশী নাম বা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে সাধারণ ভাবে এতটা উৎকণ্ঠিত না হওয়াই ভালো। সব ভাষা জানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এবং কোনো ভাষা জানা থাকলেও তার সব উচ্চারণ অন্য ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। Camus-কে 'কামু' লিখতে নিষেধ ক'রে 'কাম্যু' লিখতে বললে অযথা ভ্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় এবং Don Juan-কে 'ডন হুয়ান' লিখলে অযথা নতুনত্ব করা হয়। এটাই আমি জানাতে চেয়েছি।

'কেয়াস' উচ্চারণ আমিও কখনো শুনিনি। নিছক ধাঁচ হিসেবেই কথাটা লিখেছিলাম। ওটা এক আনুষঙ্গিক মন্তব্য মাত্র। প্রচলন সিদ্ধতা বলতে আমি বাংলায় যে উচ্চারণ প্রচলিত তার কথাই বোঝাতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে শ্রীগুপ্ত উচ্চারণের ক্রমপরিবর্তনশীলতা উল্লেখ করেছেন। শুধু উচ্চারণ কেন, বানানেরও তো পরিবর্তন হয়। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে অনিত্যভাব কি শেষ আছে? যুক্তি হিসেবে ও প্রশ্ন এখানে পরিহার করাই সমীচীন।

যাঁরা এখানে Don Juan এবং Don Quixote-কে এ ভাবৎ প্রচলিত ইংরিজী পদ্ধতিতে উচ্চারণ করেন, তাঁদের প্রতি আধুনিক 'ইংরাজী শিক্ষিত মহলে'র অবজ্ঞার কথা শ্রীগুপ্ত জানিয়েছেন। আমরা সকলেই অবগত আছি যে সমাজে এক শ্রেণীর মনীষীরা থাকেন যাঁরা শব্দের উচ্চারণে অথবা কাঁটা চামচ ধারণে অথবা পোষাক পরিধানে হালে ফ্যাশনের পরিচয় না পেলে বড় ক্ষুব্ধ বোধ করেন। কিন্তু তাঁদের থেকে ভদ্রলোকদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

অরুণ মিত্র

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ৮, ভারদ্বাজ লেন ও শ্রীবৃন্দাবন প্রেস, ১৮৮১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র | ১৩৮৯

প্রবন্ধ

লোকনাথ ভট্টাচার্য আধুনিকের যে-স্বপ্ন পল ভালেরির ১৮৫। হরজিৎ দাশগুপ্ত : তত্ত্বসেতু ১৮৪। শিবনারায়ণ রায় : ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলন, একটি পত্রিকার বিশিষ্ট ভূমিকা ২০০।

কবিতাবলী

অরুণ ভট্টাচার্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিহিরকুমার গুপ্ত অসিত ভট্টাচার্য অসিত দত্ত প্রকৃতি ভট্টাচার্য স্বদেশরঞ্জন দত্ত অমলশঙ্কর দাশগুপ্ত অধিতাভ দাশগুপ্ত বিজয়কুমার দত্ত পরিমল চক্রবর্তী শান্তি লাহিড়ী বিনোদ বেরা অনন্ত দাশ মৃণাল দত্ত বাসুদেব মুখোপাধ্যায় মাহবুব তালুকদার বিমলেন্দু বসুমদার সাগর চক্রবর্তী বাসুদেব সেন রবীন্দ্র গুহ বাসবী দত্ত সুবোধ আচার্য ২০১-২২১

সমালোচনা সাহিত্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কমলকান্তি ভট্টাচার্য বিনয়গোপাল রায় শান্তি লাহিড়ী

বিদেশী কবিতা

পল ভেরলেন : অর্ণব সেন। শঙ্কা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়। এল. এড্‌লার : ভাস্কর দাশগুপ্ত। উইলিয়ম এম্পসন : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ইব্‌ন আর-রুমী : আবদুস্ সাত্তার। ২৩০-২৩৪

আলোচনা

Camus-এর উচ্চারণ প্রসঙ্গে। প্রণব মিত্র

স্বদেশ সংস্কৃতি স্বাধীনতা ক্রোড়পত্র

অদ্রি চক্রবর্তী তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র গুপ্ত সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ কর ২৪৬-২৬৩।

সম্পাদকীয়

অতীতের এক প্রত্যুষে সভায় সমবেত কলাবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে আলোচনায় রাজকুমারের বিবাহপ্রসঙ্গ। বৈদিকরা উচ্চারণ করলেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল অশ্বারূঢ় রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু ।' ধর্ম ও অগ্নিসাক্ষী নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। ক্ষিপ্তদের নিদ্রার মতো স্তব্ধ রণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলময় উচ্চারণ কর, এখন আর লগ্ন পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে মৃতের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরাঙ্গনার হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের প্রমত্ত সুরে মেশে চিতার লেলিহান হুঁশ চিতায় আগুন…

এই জনের অনেক কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সভ্যতার পরিচয়। ষোড়শযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক — দেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি ষোড়শে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও ঐতিহ্যের সন্ধান আপনি পাবেন।

ভারত জানলগ ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

©DC-SIDA SEN

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৯

জাগ্রতের যে-স্বপ্ন পল ভালেরির

লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটি জায়গায় : "হে অনুরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও !" অন্যত্র : "শুধু যেন এইমাত্র চাওয়ার থাকে দেবতাদের কাছ হ'তে, যা উপযুক্ত মর-হৃদয়ের। তাঁদের চয়নের দিকে চেয়ে জানতে হবে ঠিক কোনটি নিয়তি আমাদের। মন আমার, হোস্‌নে হোস্‌নে শাশ্বত জীবনে অভিলাষী, শুধু নিঃশেষে শেষ ক'রে কাজে লাগা সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে।"

প্রথমটি পল ভালেরির নিজেরই উক্তি, দ্বিতীয়টি উদ্ধৃতি একটি অনামধন্য গ্রীক লেখকের রচনা হ'তে। তাঁর একটি ফটোগ্রাফের নীচে প্রথম উক্তিটিকে ছেপে ভালেরির এক প্রকাশক বেশ একটি কৌতূহলোজ্জ্বল ও সোৎসাহময় আবেগের সৃষ্টি করেছেন। উক্তিটি যেন সেই তাঁর নিজের ছবিটিরই একটি সার্থক শিরোনামা। ছবি তাঁর, তাই নিশ্চয়ই সেটি তাঁর অন্তত অনুরূপ, তবু ছবিটির বিষয় যে-ব্যক্তিটি, সে পূর্ণতর তার নিজের থেকেও—যেন বক্তব্যটি এই। একথা সত্য ও প্রযোজ্য হ'তে পারে নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে এক সাধারণ ভাবে, হয়তো একটু আধ্যাত্মিক অর্থে। প্রত্যেকেই তার যে-যার চেষ্টা-সাধনা-আলস্য-অর্থহীনতার মধ্য দিয়ে সারা জীবন হয়তো বহন করতে পারে অন্তরে অন্তরে ও তার নিজের সম্পূর্ণ অজানে যা এইসব চেষ্টা সাধনা ইত্যাদির অবার্থ-ভাবে অতীত—অন্তর্লোকের কোন এক উদ্ভাসিত গূঢ় কোণে যে পরিপূর্ণতার আসনে সে জন্ম হতেই আসীন, কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত জীবনে সে তার সাধনার

অবিমিশ্র অভাবে পৌঁছাতে পারল না ও সেই পৌঁছাতে না পারার সত্য ও গ্লানিটিকে না অনুভব ক'রেই জীবনের শেষ সূর্যাস্তটিকে আলিঙ্গন করতে সে উদ্যত হল একদিন।

একথা তাই প্রযোজ্য হ'তে নিশ্চয়ই পারে ভালেরিরও ক্ষেত্রে—যেমন আমার ক্ষেত্রে, তোমার ক্ষেত্রে, যাকে আজো চিনি না তার ক্ষেত্রে, যাকে কোন দিন চিনব না তারও ক্ষেত্রে। একথা প্রযোজ্য ভালেরির ক্ষেত্রে আরো একটু বিশদ ও বিশেষভাবে। প্রথমেই বলা ভালো, সম্ভবে পৌঁছোতে না পারার সেই আশীর্বাদী অজ্ঞানতায় একদিন জীবনের শেষ সূর্যাস্তকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হওয়ার যে প্রশ্নটি, তা ভালেরির বিশেষ ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। উঠতে পারলে অভাবের অনুভব-জনিত এমন একটি উক্তি তিনি করতেই পারতেন না। এই সঙ্গে ভালেরির সম্বন্ধে কথা তাই, একেবারে গোড়াতেই, পৌঁছোতে পারার সাধনার, ও পৌঁছোতে না পারার অনির্বাণ চেতনার। কথা তাই, যেমন সাধনার, তেমনি অভাবের চেতনার, কথা জ্ঞানের ও আগরণের, ও এক জাগ্রত অভিনিবেশের।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা আবার এমন নতুন কি? যুগে যুগে কি এইভাবে অনেকেই জাগেন নি না পাওয়ার চেতনায় ও তাই পাওয়ার সাধনায়? ভালেরির নিজেরই দেশে তাঁর মাত্র কিছু আগেই আসেন নি কি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো—যে বোদলেয়ারকে র‍্যাঁবো কবিদের মধ্যে প্রথম "দ্রষ্টা" বলে নমস্কার জানিয়েছেন, যে র‍্যাঁবো যেমন নিজেকে তেমনি পরবর্তী কবিদের করতে চেয়েছেন "দ্রষ্টা", চেয়েছেন কবিতাকে কবির সজাগ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করতে, ও বলেছেন কবির এই নতুন পাওয়া সজাগ দৃষ্টিশক্তির কল্যাণেই সম্ভাবনার সূচনা আছে বিশ্ব কবিতার আগামী অধ্যায়ের?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—যুগে যুগে জাগরণের চেতনা যত মনীষীরা এনেছেন, ভালেরির মাত্র কিছু আগেই তাঁর নিজেরই দেশে এসেছেন বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো। তবে জাগ্রতের যে স্বর ভালেরি শুনেছেন, তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র—এমন কি বোদলেয়ার র‍্যাঁবোরও যে ঈপ্সিত সত্য, তা হতেও ভালেরির প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট সন্দেহাতীতভাবে। এই দুই ধরণের সমদেশিক ও প্রায় সমকালীন প্রচারিত সত্যের মধ্যে মূল বা সত্যগত তেমন কোনো বিভেদ হয়তো তত্তটা নেই, বরং পরবর্তীটি অনিবার্যভাবে এসেছে পূর্বেরই সূত্র ধ'রে, কিন্তু

বিভেদটি যেখানে প্রকটভাবে বর্তমান, তা এই দুই বিভিন্ন পক্ষের দুটি সাধনার আংশিকের মধ্যে।

"হে অনুরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও"—এই প্রথম উক্তিটির আলোচনায় একটু পরেই আবার আসছি। দ্বিতীয়টি, যেটি উদ্ধৃতি গ্রীক লেখকের রচনা হ'তে, পাওয়া যায় তালেরির নিজের হাতে লেখা গ্রীক অক্ষরে, তাঁরই কৃত একটি চিত্রাঙ্কনের উপর। চিত্রটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি উদাহরণ হিসেবে তাঁর প্রখ্যাত কবিতায়—"সমাধিভূমি সিন্ধু-তীরে।" তবে কবিতাটির নামের এই বাংলা অনুবাদ আমার খুব মনঃপূত নয়। মূল ফরাসীতে যে-ভাবে তা ব্যক্ত, তাতে এক অর্থে সমাধিভূমি যেমন সিন্ধুতীরে হ'তে পারে তেমনি অন্য এক গভীর অর্থে সেটিকে বোঝানো যেতে পারে সৈন্ধবও বলে। এবং এটি, তালেরিকে নিয়ে যত প্রশ্ন বা সমস্যা উঠতে পারে, তার মাত্র একটি। ভাষাগত কাঠামোটি তালেরিতে এত মৌলিক যে তিনি অনুবাদে প্রায় ধরাই পড়েন না। তাই দেখতে পাই, বিদেশী ভাষায় এই মহাকবির অনুবাদ এত সামান্য হয়েছে, এবং—যা নিয়ে টি. এস. এলিয়টও খেদ করেছেন—তিনি এমন অন্যায় ও এত সামান্যভাবে বিদিত জগতের কাছে। অযোগ্যতা নয় তাঁর প্রতি বৃহৎ জগতের এই আংশিক অবহেলার কারণ। কিন্তু এ আবার আর এক প্রশ্ন, ও যার আলোচনা এখানে হবে অবান্তর।

ফিরে আসা যাক ঐ দুটি উক্তি উদ্ধৃতিতে। এ-দুটিকে এই নিবন্ধের গোড়াতেই রেখে আমার যাত্রা সুরু করার কারণ এই যে উক্ত উদ্ধৃতি দুটির মধ্যেই বিধৃত রয়েছে তালেরির সাধনার শেষ বক্তব্যটি, যেমন ক'রে বীজের মধ্যে বিধৃত থাকে গাছ, সিন্ধুর মধ্যে সমুদ্র। যদি বললাম বীজের মধ্যে গাছ বা সিন্ধুর মধ্যে সমুদ্র তো বলা বাহুল্য তা আয়তনের প্রসঙ্গে নয়, তাদের আত্মার একতার প্রসঙ্গে। সেই অর্থে, গোড়ার ঐ উক্তি-উদ্ধৃতি দুটিতে তালেরির সাধনার আত্মাটি ধরা আছে। প্রথমটি যদি মন্দির হয়, দ্বিতীয়টি মন্দিরে পৌঁছোনোর পথ।

কেন? কী ক'রে? সেই প্রশ্নেই আসছি। কিন্তু তার আগে তালেরির নাম করা মাত্রই এটুকুও মনে না ক'রে পারছি না, যেমন এক বিচিত্র নৈকট্য তাঁর সঙ্গে আজ আমাদের, অন্যদিকে তেমনি আমাদের কাল হ'তে এক অভাবনীয় দূরত্বজনিত আবছা দৃষ্টির আলোয় যেন মণ্ডিত তাঁর স্মৃতি ও মহিমা।

১৯৩৫-এর ২০শে জুলাই ভালেরি যখন মারা যান, তৎকালীন ত গোল সরকার তাঁর শবযাত্রাকে যেন জাতীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান—ঠিক তার কিছু আগেই নাৎসী-দের হাত হ'তে পারীর পুনরুদ্ধার তিনি দেখে যেতে পারেন। আজ সেই ত গোল আবার ফিরে এসেছেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রের কর্তা হ'য়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এক আত্মঘাতী ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনের মধ্যে ফ্রান্সের ইতিহাসকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গেছেন। কিন্তু ত গোল সেই একই, ও পারার পুনরুদ্ধার যেন মাত্র সেদিনকার ঘটনা। ভালেরি ছিলেন, এই কিছুদিন আগেও—আমাদের সঙ্গে তাঁর এই নৈকট্যটি সত্য। নৈকট্যটি শুধু কয়লেণ্ডারের নয়, নৈকট্য কালের এক গভীরতর অর্থেরও। এবং সেই নৈকট্যটিই—যা কালধর্মের—মূল্যবান। যে-দুটি মহাযুদ্ধ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধটিকে একটি বিশেষ নাম দিয়েছে, মানুষের চিরাচরিত চিন্তার ধারাটিকেই যেন পালটে দিয়েছে, যেন প্রাকযুদ্ধের মানুষ যুদ্ধোত্তরের বংশধরকে চিনতে পারছে না, যেন যুদ্ধোত্তর প্রাকযুদ্ধকে বলছে আমরা এক লোকবাসী নই—সেই দুটি মহাযুদ্ধই দেখে গেছেন পল ভালেরি; দ্বিতীয়টি যদিও জীবনের সায়ংকালে, প্রথমটিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন মধ্যাহ্নেই। এক দিক দিয়ে, একই লোকের অধিবাসী তিনি ও আমরা।

তবু যেন কত দূরে। কাব্য তাঁকে ছেড়ে এগিয়েছে অনেক দূর—এগোনোর অর্থ এখানে আগে যাওয়া নয়, আরো দূর চলে যাওয়া। ভালেরির বক্তব্যের অনেক খুঁটিনাটির ধ্বনি ইতিমধ্যেই ক্ষীণ—তাঁর শিল্প তেমন ছিল না ঢেউ, কারণ তাঁর ধারা যে ঋজু, বিধুর বন্ধুর পথ একলা চলার তাঁর। শুধু তাঁর কাব্য ও বক্তব্য একদিন বাইরের জগৎটাকে যেভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল, আজ যেন আর পারে না সেভাবে। আজ যেন অন্যত্র রয়েছে আমন্ত্রণ নাড়া খাওয়ার বা নাড়া দেওয়ার। এবং সেটাই স্বাভাবিক—যে-খেলাঘরে ছেলে-বেলায় আমি খেলেছি, আমার ছেলে হয়তো সেখানে খেলতে চাইবে না, হয়তো সে চাইবে না সেই একই পুতুল, সেই একই প্রেম।

এ ছাড়াও ভালেরি ও আমাদের মধ্যে দূরত্বটি সত্য অন্যভাবেও। আমার মনে হয়, ভালেরির কৃচ্ছ্রসাধনার বৈশিষ্ট্যটিই এমন যে তার সকল পরিচিতকে, সকল পরিচয়কে, ইচ্ছা ক'রে নিজ হ'তে বহুদূরে রাখতে চেয়েছে এক নির্মম নির্ভীক আন্তরিকতার সঙ্গে। সে ভাবে দেখলে, তাঁর দূরত্বটি শুধু আজকেরই

সত্তা নয় আমাদের এই প্রসঙ্গে। সে দূরত্ব তাঁর সত্তা কাল ও পাত্র নির্বিশেষে। এখানে আমার যা প্রচেষ্টা, তা তাঁর সেই কৃচ্ছ্রসাধনার স্বরূপটি দেখার। আমাদের সঙ্গে তাঁর যে-অনিবার্য দূরত্ব, যে-দূরত্ব নিশ্চয়ই শুধু কালগতই নয়, এক হিসাবে সেই দূরত্ব এখানে হয়তো আশীর্বাদ—হয়তো তা তাঁকে দেখতে সাহায্য করবে। খুব কাছে—অন্তরের কাছে যা চাক্ষুষ দৃষ্টির অতি অল্প ব্যবধানে—থাকলে ভাল ক'রে দেখা যায়, না দ্রষ্টব্যের দেহ, না তার আত্মা। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে শিল্প না পাওয়ার যে-অযোগ্যতা তা ভালেরির, বরং সে অযোগ্যতা তাঁদেরই যারা হ'তে পারল না শিল্প। অবশ্য শিল্প না হ'য়েও যা না হ'তে পেরেও নমস্কার করা চলে, ও তা-ই করছি। আর স্বরূপ দেখতে চাওয়া, তা-ই তো নমস্কারের রাজপথ।

প্রথমে বলেছি এক নিজেরই অনুরূপ অখণ্ড যা নিজের থেকেও পূর্ণতর, তার কথা। জানি না অন্য কেউ ভালেরিকে এভাবে আগে দেখতে চেয়েছেন কি না, তবে আমার মনে হয় ঐ উক্তিটির মধ্যে ভালেরির যে প্রচ্ছন্ন বক্তব্যটি, তা হচ্ছে যে সত্তা আমার ও যার অনুরূপ জ্যোতি আমার চোখে-মুখে দেহে, আমার বহিঃপ্রকৃতি যার অনুরূপ, তার পূর্ণতার অভাব আমার যাচ্ঞায়, চিন্তায়, প্রয়াসে। তাকে তার পূর্ণতায় সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করাতেই আমার সিদ্ধি, ও তা-ই আমার একমাত্র গন্তব্য। এবং যেহেতু তা আমার নিজেরই অন্তর্লীন পূর্ণতা, যদিও আমার বহিঃপ্রকাশে আজ তার অক্ষয় অভাব, তা আমার সম্ভাবনার সীমার বাইরে নয়। তা-ই প্রশ্ন, সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিঃশেষে শেষ করে কাজে লাগানোর। যদি না পৌঁলাম, নাই বা পেলাম শাশ্বত জীবনে অধিকার—আসলে হয়তো শাশ্বত কোনো জীবনই নেই, যদি সে-জীবনকে চাইতেই হয় অনন্তকে। পরম মুক্তি তাই, ভালেরির মতে, নিহিত আছে সম্ভাবনার ক্ষেত্রতেই—শুধু তাকে বীর সাধনায় ও অজিত বিজ্ঞানে জয় ক'রে নিতে হবে। তাই অনুরূপের বিষয়ে ভালেরির নিজের যে উক্তিটি ও গ্রীক লেখকের রচনা হ'তে তাঁর চিত্রাঙ্কনের উপর যুক্তিত যে উদ্ধৃতিটি, তারা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত।

আমার মনে হয়, ঐ অনুরূপের প্রসঙ্গটিকে আমি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি, তার সাড়া মেলে ভালেরির কবিতায় ও অন্যান্য গদ্যরচনায়। একটি দুটির সরল বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া যাক। প্রথমই মনে আসছে একটি বিশিষ্ট কবিতা, ভালেরির স্বাভাবিক শুদ্ধ বুদ্ধি ও শৃঙ্খলার সাধনার ঐশ্বর্যদ্যুতি

অনুবাদ—কিন্তু আমি এখানে অনুবাদ করছি গদ্যাকারে, অতি সাধারণভাবে, শুধু তার অন্তর্নিহিত মূল ভাবটিকে দেখাতে চেয়ে। কবিতাটি ছোট, ও তার নাম "পদক্ষেপ"। বলছেন তাঁদের :

ধীরে, ধীরে, যে-একটির পর
একটি তোমার পা ফেলা,
তারা শিশু আমার নিঃশব্দের ;
মৃদু, তুহিনশীতল গতি তাদের
আমার যে-শয্যা সতর্ক জাগরণের,
তার দিকে।

যে-দেহ পূত, যে-ছায়া ঐশী,
কী সুখস্পর্শ তাদের, ঐ
তোমার সংযমী পদক্ষেপের !
দেখি।.....যত শক্তি
শুধু ছিল মাত্র কল্পনায়, অনুধ্যানে,
ঐ নগ্ন পা দুটির রূপ ধ'রে
এল তারা কাছে, হ'ল
আমার।

সেই যে-অধিবাসী আমার চিন্তায়,
দিতে যদি চাও তাকে
শুধু একটি চুম্বনের,
যদি প্রস্তুত হও, ঐ দুটি উন্মত
ঠোঁটে তোমার, তাকে শান্ত করতে,

আদরের ঐ জিয়াটুকুতে ক'রো না
ত্বরা, মধুর সে-চেষ্টা যা'
একই সঙ্গে হওয়ার ও না-হওয়ার,
কারণ তোমারই প্রতীক্ষা
আমার বাঁচার, আর কী বলো।

আশ্রমের যে-স্বপ্ন পল তালেরির

তো সেই আমার হৃদয়
যদি সে নয় তোমারই পদক্ষেপ ?

এখানে, বলা বাহুল্য, কবি ও কবিতা একাত্ম। আমার হৃদয় তোমারই পদক্ষেপ। কিন্তু কেন মুক, তুহিনশীতল সত্তি সেই পদক্ষেপের ? কারণ এখানে একটি আবছা ইংগিত আছে যান্ত্রিক, যখন প্রেরণা এসেছে প্রেমিকার রূপ ধ'রে লুকিয়ে লুকিয়ে। সে যেন এসে ধীরে ধীরে থাকা দিচ্ছে কবির অন্তরদ্বারে। কিন্তু সংযমী কবির প্রেরণাও আসে সংযত পা ফেলে—তবু তা' সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রেরণাকে গ্রহণ করতে চান না তাঁকে চুম্বন করতে। তাঁর চিন্তায় যে-অধিবাসী, সে তিনি নিজেই—তাঁর হ'তেও সেই পূর্ণতর ও যার অনুরূপ তিনি, ও যাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করাতেই তিনি অর্জন করবেন সার্থকতা। কিন্তু প্রেরণার দানকে মুহূর্তে-মুহূর্তে গ্রহণ ক'রে নিতে তিনি প্রস্তুত নন, যদিও তিনি মানেন যে যত শক্তি তিনি পেতে চেয়েছেন তা' এসে তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরা দেয় ঐ দুটি নগ্ন পায়ের ছন্দ ধ'রেই। তাই যদিও প্রেমিকা প্রেরণার একটির পর একটি পা ফেলা যেন শিশু তাঁরই নিঃশব্দের, তাঁর যে শয্যাটি সেটি সতর্ক জাগরণের। তাই প্রেমিকার চুম্বনকে ফিরিয়ে দেওয়ার যে-না-হওয়ার স্বাদ, তার মধ্যেও রয়েছে কবির হওয়ার চেতনা। বক্তব্য যা' প্রথম এখানে, তা' হচ্ছে শৃঙ্খলার কথা কবিতায়, একমাত্র যে-শৃঙ্খলার রীতিকে মেনেই কবির পক্ষে সম্পূর্ণ আশ্রম চিত্তে লেখা চলতে পারে, প্রকাশ করতে সেই নিহিত পূর্ণতরকে, যার অনুরূপ কবি নিজেই ও না চেষ্টা ক'রেই। তাই প্রথম সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিঃশেষে সেব ক'রে কাজে লাগানোর, প্রথম শৃঙ্খলায়, প্রথম আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও প্রয়াসের, প্রথম আশ্রম হওয়ার ও জাগরণের।

অবশ্য এখানে এও বলা উচিত, কবি তাঁর কবিতায় সম্বন্ধে যা' প্রতিপাদ্য ব'লে প্রমাণ করতে চান অজস্র, তাকে সরাসরি তাঁর কবিতার মধ্যে সন্দেহাতীত-ভাবে প্রতিভাত ব'লে দেখানোর প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যে একটি গূঢ় বিপদের সম্ভাবনা সবক্ষেত্রেই থাকতে পারে। যাদার্থের, যিনি তালেরির পূজাপাদ গুরুদেব, ক্ষেত্রে তো এইরকম প্রয়াস একেবারেই ফলপ্রসূ হয়নি। দর্শন ও কবিতা ঠিক এক বস্তু নয়—তাদের পরস্পরের মধ্যে অজস্র মিল হয়তো থাকতে পারে, একই কবি হ'তে পারেন দার্শনিকও, ও সমস্ত যথার্থ কবিই দার্শনিক, এমন মতবাদও শোনা গেছে, এবং এই ধরনের মতবাদের মধ্যে সত্য যে নেই

তাও নয়—শুধু কবির ও দার্শনিকের প্রকাশধর্মী পথ বিভিন্ন। এখানে আমারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ভালেরির কবিতা ও কাব্যদর্শনকে একেবারে একাত্ম ব'লে প্রমাণ করার। তবে হয়তো একটু চেষ্টা করলে যে-স্থির সরলরেখার মতো গতিটি তাঁর দর্শনে উদ্ভাসিত দেখা যায়, তাকে একটু উনিশ-বিশ এদিক-ওদিকের এখানে-ওখানে অতি সূক্ষ্মভাবে বক্র অবস্থায় ধরা যেতে পারে তাঁর কবিতাতেও। এবং উপরি-উক্ত কবিতায় প্রেমিকা প্রেরণার প্রসঙ্গে এইটুকুও আমার মনে হয় যে যেহেতু মালার্মে-ভালেরি প্রমুখ কবিদের চিরাচরিত প্রেরণা সম্পর্কে অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত, যখন এই সমস্ত কবি তাঁদের নিজের নিজের প্রেরণার কথা বলেছেন তাঁদের কবিতায় বা অন্যত্র, তখন সেই প্রেরণাকে বুঝতে হবে একটি অতি বিশেষ অর্থে। সে-প্রেরণাও তখন আসে কবির স্বোপার্জিত সংযমের বলবর্তী হ'য়ে।

এই প্রসঙ্গে মনে আসছে ভালেরির আরো একটি কবিতা, এবং এখানেও প্রশ্ন পদক্ষেপের। কবিতাটি হ'ল "প্রভাত", ও তার প্রথম স্তবকটির সহজ বাংলা অনুবাদ দিচ্ছি। অনুবাদ যথাযথ, কেবল মূলের ধ্বনিটি, ও তা অনেকখানি ভালেরির ক্ষেত্রে, ধরার চেষ্টা এখানে নেই।

যে-বিভ্রম মৃদু বিষণ্ণতায়
আমার জোগাত ঘুম,
ঐ পালায় যে-মুহূর্তে
গোলাপী আভায় সূর্য
জাগে।
মনে মনে আমিও এগোই
বিস্তার ক'রে পাখনা প্রভায়ের :
সেই প্রথম উচ্চারণ মন্ত্রের।
বাসু হ'তে বেরোতে না
বেরোতেই কী চমৎকার
ফেলছি আমি পা,
যে-পদক্ষেপ
আমারই জাগ্রত মুক্তির।

"পদক্ষেপ" কবিতাটিতে যে-প্রেরণা প্রেমিকা, যার মুক, তুহিনশীতল পা

খেলা যাতে, এখানে সে আরো স্পষ্ট ক'রে—হয়তো "প্রভাতের" জন্যেই, হয়তো ঘুমের রাত্রির শেষে সূর্যের সোনালী আভায় আবার জেগে ওঠারই কারণে—সোজাসুজি রূপ নিয়েছে কবির প্রত্যয়ের। এখন পা ফেলছি আমি আমার শক্তিতেই, সম্পূর্ণ সজাগ হ'য়ে, নিজেকে নিজের বশ ক'রে, এবং কী চমৎকার সেই পা ফেলা—একথা বলতেই মুখর কবি। আমার মনে হয়, এ-দুটি কবিতার মধ্যে পার্থক্যটি শুধু আপাত, ও এখানে রাত্রি-প্রভাত জনিত দুটি বিভিন্ন মনের অবস্থার প্রসঙ্গ অবান্তর। আসলে প্রথম কবিতাটিতে যাকে কবি প্রেরণা হিসাবে দেখেছেন, দ্বিতীয়টিতে তা-ই দাঁড়িয়েছে প্রত্যয় হ'য়ে।

কিন্তু কবিতায় যে-বক্তব্য স্পষ্ট নয়—এবং যেখানে সে স্পষ্ট নয় ব'লেই কবিতার মাহাত্ম্য—সে-বক্তব্য অতি পরিষ্কার তাঁর গদ্যে। কাব্য প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এক প্রবন্ধে বলেছেন ভালেরি : "সত্যকারের কবির যে বৈশিষ্ট্যটি সত্যকারের, সেটি হচ্ছে যে সেই কবির ক্ষেত্রে স্বপ্নের অবস্থাটি অতি ভিন্ন। তার মধ্যে আমি যা' দেখতে পাই, তা' শুধু স্বেচ্ছাকৃত অনুশীলন, চিন্তার আশ্চর্য ক্ষমতা নমনীয় হওয়ার, চিত্তের সম্মতি অতি তীব্র ও অনবদ্য যন্ত্রণা সহ্য করার, ও আত্মত্যাগের অবিশ্রান্ত জয়। যে চায় তার স্বপ্নকে লিখতে, তাকে হতেই হবে অপরিমেয়ভাবে জাগ্রত। যদি তুমি চাও ঠিক ঠিক ভাবে অনুকরণ করতে সেই অবাস্তব অদ্ভুত অবস্থার খুঁটিনাটি, নিজের প্রতি সেই বিশ্বাসহীনতাগুলি কিছুক্ষণ আগের তোমার দুর্বল নিদ্রায়; যদি চাও তুমি তোমার গভীরতার অনুসরণ করতে চিত্তের সেই ভাবুক পতনটি, যেন সে হারানো করা যাতা ধূসর স্মৃতির অস্পষ্ট অসীমতায়, তবে ভেবো না অতি সহজেই তা' সম্ভব হবে। সেই প্রচেষ্টায় তোমার সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে তখনই যখন তোমার একাগ্রতা হবে প্রাণপণের। মহৎ সৃষ্টির যে বিস্ময়, তা সম্ভব হেন পরিশ্রমেই। যেই বলের যথাযথতা, যেই বলের রীতি, তুমি আবাহন জানালে স্বপ্নের বিপরীতকে। যে রচনায় পাবে সেই যথাযথতা ও রীতি, বুঝবে তার লেখককে সহ্য করতে হয়েছে কত না যন্ত্রণা, নষ্ট করতে হয়েছে কত না মুহূর্ত, যাতে তার চিন্তার চিরজীব ভঙ্গুরতায় বিক্ষুব্ধ না হয় তার লেখা। সব চিন্তাই, যত মনোহরই হোক না তারা বা হোক অন্য রকমের, তারা সবাই ছায়ার মত—এবং এখানে ছায়ারাই আগে আসে শরীরীদের চেয়ে। এ আগুন নিয়ে খেলা, কখনো কখনো নয় অনেকেই, যে খেলা চিত্তের স্বাভাবিক গতিশীলতা হ'তে ধ'রে রাখতে

চায় ভাবের ক্ষণিকের যে স্থিতি ও স্বচ্ছতা, যে খেলা চায় ভাবের একটুখানি কল্পনাকে স্থায়ী করতে। যা' কেবলি চলে যাচ্ছে বদলে বদলে, তাকে সে ধ'রে করিয়ে ধরতে চায়। এবং যতই পলাতক ও অস্থিরচিত্ত হবে শিকারের বস্তুটি, ততই দরকার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার, যাতে সেই শিকারের কেবলি পলাতক ভঙ্গীটি ধরা পড়তে পারে এক চিরস্থায়ী বর্তমানে।"

একটু দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃতিটি প্রয়োজন, ও তা দেখায় পরিষ্কার ক'রে ভালেরির মতে সম্ভবের সীমাটি বিস্তৃত হ'তে পারে কতদূর এবং সেই সম্ভবের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে চাষ করার প্রয়োজনীয়তা কেন ও কোথায় এবং এও স্পষ্ট এই উদ্ধৃতিতে, ভালেরির কাছে কোনটি সেই "পূর্ণতর", যার অপূর্ব অনুরূপ তিনি স্বয়ং, এবং যাকে অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য তাঁর কবিতায়। সম্ভবের ক্ষেত্রটির চাষ হ'য়ে দাঁড়ায় শেষ অর্থে নিজেরই অন্তরের অতলান্ত গভীরতার চাষ। কারণ সেই গভীরতার অন্তরেই রয়েছে পূর্ণ বুদ্ধি ও চিন্তার স্থায়ী শুদ্ধ জ্যোতিতে। বহির্জগতের যত অস্বাস্থ্য প্রলেপ পড়ছে তার ওপর ক্রমাগতই, তাদের আক্রান্ত বুদ্ধির রশ্মিতে রিক্ত ক'রে দিতে হবে একটি স্থায়ীর চেতনা, কারণ তারা সম্পর্কযুক্ত অন্তরের পূর্ণের সঙ্গে। ভালেরির বক্তব্যের এ ব্যাখ্যা আগে কেউ দিয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এমন একটি ব্যাখ্যা হবে সমীচীন।

কী অর্থ তাঁর কবিতায়, এ নিয়ে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। ভালেরি স্বয়ংও দুয়েকটি কথা বলেছেন এই সম্বন্ধে। এক জায়গায় বলছেন: "আমার কবিতায় সে-ই অর্থ, যে-অর্থ তুমি তাকে দেবে। যে অর্থটি আমি তাকে দিতে চাই, সেটি আমার নিজেরই, ও তার সত্যাসত্য গ্রহণ করতে আমি বাধ্য করব না কাউকে। যারা ভাবে যে প্রত্যেক কবিতারই আছে একটি মাত্র অর্থ, যে-একমাত্র অর্থটিই সত্য, যথার্থ ও যা দেওয়া তার কবির, তাদের ভুলটি সাংঘাতিক, ও কোনো কবিতা সম্বন্ধে এই রকম ভাবতে চাওয়া সমগ্র কবিতার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই যায়। এইরকম ভুলের একটি ফল দেখতে পাই সেই উদ্ভট অথচ পণ্ডিতী প্রয়াসের সূচনায় যা কবিতাকে লিখতে চায় গদ্যে। এবং এমন চাওয়ার অর্থই হ'ল এই যে কবিতার সম্বন্ধে চরম সাংঘাতিক ভুল না ক'রে পারবে না এই মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি যেন বলতে চায় যে কবিতার আত্মাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ করা যেতে পারে, ও সেই টুকরো টুকরোর মধ্যে কবিতা বিশ্লিষ্ট হ'য়ে বাঁচতে পারে। যেন গদ্যের যে সারবস্তুটি, সেটিই

একটি অপ্রাকৃত ও আকস্মিক ফল হ'ল কবিতা—এমনই বিশ্বাস করতে চায় ঐ ধরণের মনোবৃত্তি। কিন্তু কবিতা যে বেঁচে আছে শুধু তাঁদেরই জন্যে, যারা এমন একটি প্রয়াসকে অসম্ভব ও গোড়া হ'তেই ব্যর্থ ব'লে জানে; ও এমন একটি প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হওয়া কবিতার পক্ষে হবে একটি অসাধ্যতা, তাও যারা জানে। অন্য যারা, তারা কবিতার বোদ্ধা ব'লে নিজেদের জাহির করে ও কবিতাকে দিতে চায় এমন একটি ভাষা ও প্রকাশ যা আর যাই হোক, কাব্যিক নয়।"

এখানে আমার নিশ্চয়ই মনে হয় না যে যাকে আমরা এই তারতে উপনিষদের যুগ হ'তে গদ্য-কবিতা ব'লে চিনতে শিখেছি ও সে গদ্য-কবিতার অতি উৎকৃষ্ট রূপ নানাভাবে নানা দেশের প্রকাশধর্মী প্রয়াসে দেখেছি যুগে যুগে ও বিশেষত সম্প্রতিকালের সাহিত্যে, ও যার বদৌলতে অমরত্ব অর্জন করেছে তাঁরাই দেশের কয়েকজন স্বনামধন্য পূর্বসূরি (বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো বিশেষ ক'রে), সেই গদ্য-কবিতার প্রতি ভালেরির কোনো বলবার মত বিরুদ্ধতা কখনো ছিল। হয়তো যার বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তা' কবিতার গদ্যধর্মতা। একমাত্র ছন্দ, ধ্বনি বা মিলের আলিঙ্গনেই কবিতার আত্মা ধরা পড়তে পারে, এমন প্রতিপাদ্য আমি মনে করি না তাঁর ছিল। অবশ্য সারা জীবন তিনি কবিতা লিখেছেন ছন্দে, চিরাচরিত রীতির অনুযায়ী হ'য়েই—চিরাচরিতকে নমস্কার করার জন্যে নয়, চিরাচরিত রীতিতে না লেখা হ'লে কবিতা হয় না, এমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়, কিন্তু অন্য একটি কারণে। এবং সেই কারণটি জড়িত তাঁর সাধনার ধারার সঙ্গে। ছন্দ কবিকে দেয় একটি বন্ধন ও তাঁকে বাঁধে একটি শৃঙ্খলায়, যে বাহ্যিক ও নিতান্ত আকারগত শৃঙ্খলাটি গভীরের অন্য এক অন্তর্গত শৃঙ্খলাকে কবিতায় ধ'রে রাখতে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটা কতকটা এইরকমের। একটি কঠিন, কঠোর ও নির্মম যে ছন্দপ্রণালী, তার দাবী কবির উপর অনেক। প্রথমেই তো সে কবিকে এমন একটি প্রকাশ দিতে চায় যা প্রাকৃত ভাষার বিরুদ্ধে, ও যার সঙ্গে দৈনন্দিনের ও সাধারণের জগতে আমরা পরিচিত নই। সে এমন এক ধরণের ভাষা যা প্রকাশ, যাকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিতে স্বভাবতই একটু বাধ বাধ ঠেকে; তা' যেন বাজা দেয় অন্তরে, বলে, ভাখো, আমি এসেছি। যে-ভাষার সঙ্গে পরিচয় হাতে-নাতের ও যা কার্যকরী মুহূর্তে মুহূর্তে, তা, কখনো নিজেকে

জাহির করেনা ঐভাবে। তাকে মন গ্রহণ ও ব্যবহার করে কোন প্রশ্ন না ক'রেই। কিন্তু এই যে-ভাষা হৃদয়ের, এ আমাদের কাছে বিদেশী, আমাদের সাধারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছার সে কান দেয় না। এবং তার মাঝামাঝি এই যে তাকে মনে হয় আধপাগলার মত, কারণ যে-অর্থে বাহ্যিক জগতের অন্য সব অর্থপূর্ণ, সে-অর্থে তাকে খুবই ঠেকতে পারে অর্থহীন ব'লে। ও শুধু আধপাগলার মতই সে নয়, সে জাগায় আমাদের এক ধরণের বিদ্রোহের ভাবে। এই জাগরিত করার ক্ষমতাটি যদি তার না থাকত তো সে হ'ত ব্যর্থ, এমন কি উদ্ভট। তার দুঃসহ দাবীকে একবার যদি কেউ স্বীকার করে নিতে পারে, তখন সেই মানুষের বা কবির পক্ষে আর সম্ভব হবে না যা' খুশী বলা বা যা' খুশী করা। তখন সেই মানুষ বা কবি তার প্রকাশধর্মী অভিনিবেশ যাই বলতে চাক না কেন, তার আগে তাকে দেখতে হবে যে সেই বক্তব্যটিকে হৃদয়ে শুধু গভীরভাবে ধারণ বা অনুধাবন করলেই চলবেনা, তার নেশায় শুধু মত্ত হলেই চলবে না, এক মায়াময় ও মায়াবী মুহূর্তের দান হিসাবে তাকে গ্রহণ করে তার একটি এলোমেলো প্রকাশ দিয়েই চলবে না ক্ষান্ত হওয়া। কারণ তা-ই করেই যদি ক্ষান্ত হয় সেই মানুষ বা কবি, সে শুধু করল তবে দর্পণের কাজ: যা' সে পেল বাহির থেকে, তাকে আবার বাহিরেই উজাড় ক'রে দিল। তা' যেন হবে বহুজন জনিত ঝঙ্কার, তাতে মহিমা নেই। আর সেই মায়াময় ও মায়াবী মুহূর্তে যা' সে পেল, তা' তো ইতিমধ্যেই তারই অজ্ঞাতে ও তার জাগ্রত চেতনার পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সমাপ্ত রূপে এসে ধরা দিয়েছে তার মনে। তাকে একটি উল্টো পাক দিয়ে বাইরে আবার উদ্গার করাতে নিজের সে যেটুকু দিল, যদি কিছুই দিল নিজের, তা' শুধু এক নিছক শারীরিক পরিশ্রমের সস্তা কৌশলকলা। অবশ্য তালেরি বলছেন, চিন্তা ও ক্রিয়ার যে-অনির্বচনীয় অভেদ, তা' পাওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরেরই সত্তায়। অর্থাৎ সে-ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই, যা' অনির্বচনীয়ভাবে চিন্তা ও ক্রিয়াকে এক স্বতঃপূর্ত অভিন্নতার অর্থ দিতে পারে। কিন্তু আমরা তো ঈশ্বর নই, আমাদের তাই পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করতে হবে; সে-পরিশ্রম নিছক শারীরিক নয়, কেবল মাংসপেশীরই নয়, সে-পরিশ্রম মানসিক, এমন কি আত্মিকও। আমাদের তাই প্রথমে জানতে হবে, অত্যন্ত ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার পথে, যে চিন্তা ও ক্রিয়া দুটি ভিন্ন জিনিষ। আমাদের যাত্রা করতে হবে এমন কোন কোন শব্দকে যা হয়তো মিলবে না অভিধানেই এবং কোথাও

কোথাও আমাদের মরিয়া হয়ে খুঁজতে হবে ভাষা ও চিন্তার কোন নিছক কারুনিক সংযোগ বা সমন্বয়। আমরা নিজেদের জিইয়ে রাখব নিজেদের নিহিত ক্ষমতায়, কখনো এক ক'রে মেলাতে চেষ্টা ক'রে শব্দ ও তার অর্থ, কখনো বা স্বপ্নময় সূর্যালোকের মধ্যেই আপন ইচ্ছার শক্তিতে সৃজন ক'রে দুঃস্বপ্নের করাল রূপটিই—যে-রূপ দিতে গিয়ে হিমসিম খায় স্বপ্নদর্শন, কারণ সে প্রাণপণে শুধু বৃথাই অর্থপূর্ণতায় মেলাতে চায় দুটি স্বপ্নচারীর ছায়াকে : একটি ছায়া নিজেরই, অন্যটি তার স্বপ্নের। ভালেরির নিজের কথায় : "আমাদের তাই আবেগদীপ্ত হ'য়ে অপেক্ষা করতে হবে, যেন ক্ষমতা থাকে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করার, ঠিক সেই সহজতার সঙ্গে যেমন করে মানুষ বদলাতে পারে হাতের অস্ত্র। ও, আমাদের তাই চাইতেও হবে, চাওয়া, চাওয়া, আরো চাওয়া……। আবার, অতিরিক্ত যেন না চেয়ে বসতে হয়, তাও দেখতে হবে।"

এক কথায় তাই, এ-সাধনা স্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ করার। স্বপ্নচারীর অবশ্যায় নয়, খেয়াল-খুশীর স্বপ্নহীন নিরর্থকতায় নয়, আপনার সৃজন-শক্তির অধিকারটি আপনার মুঠোর মধ্যে দৃঢ় ক'রে ধরে বিশ্বকে রূপ দেওয়া, আগে তার ভিতরটা দীপ্ত ক'রে শুদ্ধ বুদ্ধি ও চিন্তার তীব্র আলোকে। কথা তাই আসে শৃঙ্খলায় এবং সাধনাও হয়ে দাঁড়ায় শুধু শৃঙ্খলারই, আত্মসংযমের, কারণ একমাত্র সেই শৃঙ্খলায় যথার্থ সাধনাতেই পাওয়া যাবে অলৌকিক, ও তাই অপ্রাকৃত, ক্ষমতা। কী লিখছি তা' আর বড় হবে না ; বড় হবে কেমন ক'রে লিখছি তা'। ভালেরির এই সাধনার স্বরূপটি আরো ভালো ক'রে বুঝতে গেলে জানতে হবে তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে এই সাধনার ক্রমবিকাশ ঘটে।

পল ভালেরি যখন জীবিত ও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতায়, তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন তাঁর সেই স্বেচ্ছাকৃত ও সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট পরিশ্রমের ক্ষমতার কথা। কাজেই অজানা ছিল না যে কবি শয্যা ছাড়তেন ভোরেরও বহু আগে, নিজেই তৈরী করতেন তাঁর কফি, ও অবিলম্বে লিখতে বসতেন। টেবিলের আশে পাশে থাকত কয়েকটি অনিবার্য সঙ্গী, বই ও কাগজ, ও যাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন তাঁর কবিতার কারখানা। অথচ তিনি এমন কিছু বেশি লিখে যান নি, একটি গ্রন্থেই হয়তে পারে তাঁর সমস্ত কবিতার সঙ্কলন, যার সবই তাঁর অনুষ্ঠায়ী

চিন্তার পরিশ্রমের ফল। নিজের ইচ্ছায় ও নিজের ইচ্ছাশক্তিতে লিখেছেন তিনি, ও লিখেছেন স্বভাবতই কম : তাঁর সেই ক্ষুদ্র আয়তনের রচনা হয়তো হয়নি দিকদিগন্ত প্রসারী, কিন্তু তা' তার অন্তর্লীন গুণের মাহাত্ম্যে ও কারুকার্যে হ'তে চেয়েছে একেবারে পরম পূর্ণতাকে।

এই অতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তির পরিশ্রমের সফলতাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার জন্যেই যেন তিনি তাঁর নিজের অর্জিত গৌরবকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন স্বচ্ছ চিত্তের এই প্রাপ্তির ব্যায়ামের উদাহরণ হিসাবে। প্রেরণার থানকে দূর হ'তে নমস্কার ক'রে তিনি অস্বীকার করেছেন। খুশীমত, আপন ইচ্ছার সময়ে, রচনা করেছেন মহান সৃষ্টি, অনুসরণ করে একটি অব্যর্থ রীতির গতিকে। প্রেরণার দাস যে-কবি ও কবিতা, ও তথাকথিত গীতি-কাব্য যা', তার বিরুদ্ধে বহু অবকাশে জোর গলায় বলতে গিয়ে তাঁর মহামূল্য সময়ের অনেকখানি নষ্টও করেছেন। আনন্দে। প্রেরণার দাস যেন এক ধরণের পৌত্তলিক, ও সেই পৌত্তলিকতা তাঁহার চেষ্টায় শক্তি ও সময় নষ্ট করা যেন কর্তব্যের অঙ্গ—ভেবেছিলেন তাই। প্রেরণার জাত যে-কবিতা উজ্জ্বল ও উদ্ভাস, তার সম্বন্ধে তাঁর বলার ছিল না একটি প্রশংসাসূচক বাণীও।

অবশ্য এখানে একটু ছোট কথা আছে। তিনি কি নিজেই তাঁর কাব্যিক প্রয়াসে সর্বত্র প্রেরণার হাত হ'তে মুক্তি পেয়েছেন, না সেই রকমের কোনো মুক্তি অন্তরে অন্তরে চেয়েছেন? পরবর্তী সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, কবিতা সম্ভব নয় প্রেরণার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে, এবং একথা সমানই সত্য ভালেরির ক্ষেত্রেও। নইলে তিনি শুধুই হতেন এক মহান ছান্দসিক, শব্দ দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করায় এক আশ্চর্য যাদুকর, তিনি হতেন শুধু বুদ্ধিদীপ্ত ও বুদ্ধির পথের এক গবেষক মাত্র, ও বড় জোর বৈজ্ঞানিকও। কিন্তু তার বেশি নয়। তিনি হতেন না যথার্থ কবি, এবং তাঁর সেই স্বেচ্ছাকৃত ও স্বতস্ফূর্ত কবিতা লেখার ক্রিয়াটি তাঁর কাছে হত নিতান্তই একটি সৌখ ব্যাপার। আমার মনে হয়, প্রেরণার বিরুদ্ধে এত অজস্র সাফাই গাওয়ায় ভালেরি নিজেকে নিজেই ও তাঁর অলক্ষ্যে বেশ একটি মধুর ও অভিনব ছলনা ক'রে গেছেন সর্বত্র। আসলে হয়তো প্রেরণা তাঁর কবিতায় নিয়েছে এক সর্বব্যাপী রূপ, সে-ই প্রধান নটী তাঁর নাটকের। কিন্তু সে প্রেরণাকে তিনি সাধনায় বশগত করতে পেরেছিলেন, তাঁকে যখন-তখন আনতে পারার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সে যেন এক সঞ্জীবনী

সুরার বোতল, যাকে তিনি রাখতেন হাতের কাছে, ও তা' হতে পান করতে পারতেন যখন খুশী। এ-ক্ষমতা এক অর্থে ততটা বিজ্ঞানের নয়, যতটা ইন্দ্রজালের। জ্ঞান বা বিজ্ঞান ও আর্টের দুটি বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর মধ্যে ভালেরি হয়তো বাঁধতে পেরেছিলেন একটি সুষম ও পূর্ণ সামঞ্জস্যের সেতু। ও যেন এও বলতে চায় যে আর্ট যদি পৌঁছোতে চায় সম্পূর্ণতায় মন্দিরে, তাকে সহায়তা নেতেই হবে বিজ্ঞানের বিকাশশীল চেতনা হ'তে, এবং একই যুক্তির সূত্র ধ'রে তেমনই জ্ঞান বা বিজ্ঞানও নিশ্চয়ই পৌঁছোবে না তার ইষ্ট গন্তব্যে যদি সে কখনো কখনো আর্টের চিহ্নিত পথটি না নেয়। তাঁর সহজাত কবির প্রকৃতি ও পরের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও এমন কি এক ধরণের গাণিতিক নির্ভুলতার প্রতি অমিত প্রেম, এই দুইয়ের আশ্চর্য ও সার্থক সমন্বয়েই ভালেরির চিন্তাধারার নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই এক বন্ধুকে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "জানো তো, এই ১৯১৭-তেও এখনো পর্যন্ত আমি কী জানীর বিবেচনার সঙ্গে এগিয়েছি। ১৮৯২-তেই ঠিক ধরতে পেরেছিলাম পথ, বিশেষ ক'রে সেই পথটি যেটি হবে আমারই।"

ভালেরির জীবন বর্ণনার খানিকটা সার্থকতা এখানে থাকতে পারে ভেবে শুধু তাঁর জীবনের মূল কয়েকটি ঘটনা দিচ্ছি। সেই ঘটনাগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে তাঁর মানসিক ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট। জন্ম ১৮৭১ এর ৩০শে অক্টোবর ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় একটি ছোট সহরে, ও এই জন্মের সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁর সর্ববিখ্যাত কবিতার অন্যদিকে ১৯৪৫-এর ২০শে জুলাই তাঁর মৃত্যুর একটি গভীর সম্বন্ধ। জন্ম থেকেও জন্মস্থানেরই যাহাত্ম্য বেশি। শৈশবের এই ভূমধ্যসাগরের স্মৃতি গাঁথা ছিল তাঁর মনে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবনকালেই তিনি এত মনোমগ্ন হয়েছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ স্থান পেতে পারত প্যারীর পাঁতেঅঁ-তে, যেখানে ফ্রান্সের বহু মনীষী চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ আছেন। কিন্তু ভালেরির বাসনা ছিল অন্য রকম। তিনি সমাধিস্থ হ'তে চান তাঁর জন্মভূমিতেই, সেই ভূমধ্যসাগরীয় তীরে, অথবা সেই "সিন্ধু-তীরের সমাধিভূমিতে।" তিনি সবচেয়ে পরিচিত "সিন্ধুতীরের সমাধিভূমির" কবি হিসেবেই, ও সেই কবিতায় বলছেন এক জায়গায়:

ঐ উচ্চে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন নিশ্চলতায়,
নিমগ্ন নিজেরি চিন্তায় নিজেই,
ও নিজেকে উপযোগী করে আনে নিজের ;
পূর্ণতায় একটি শিরে, একটি সম্পূর্ণ
বৃন্তটি,
আমি তোমাতে গোপন পরিবর্তন।

এমন আবেগ তার সেই জন্মভূমির সমুদ্রতীর নিয়ে। কবিতাটি যখন প্রকাশ হয়, তালেরি বলেন : "এটি বোধ হয় আমার সেই একটিমাত্র কবিতা যাতে আমি আমার নিজের জীবনের কিছুটা দিয়েছি।" যে ভাবে লেখা হয় কবিতাটি, তাও আশ্চর্য। প্রথম নাকি মনে আসে শুধু নামটি। "তারপর, সঙ্গে সঙ্গেই", বলেছেন তালেরি, "এল একটির পর একটি পঙক্তি গড় গড় ক'রে, যেমন ক'রে কল খুলে দিলে জল পড়তেই থাকে, অনেকটা তেমনি। এল ধীরে ধীরে বিষয়-বস্তুও। এক নিঃশ্বাসের বিরতির জন্য পায় প্রথম অক্ষরটি, যেটি কবিতার নাম।" জন্মভূমির সেই সমুদ্রতীরের প্রতি প্রেম ও তার স্মৃতি কী গাঢ় ছিল আজীবন, তার মধ্যে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত তার এই অনবদ্য কবিতা।

শৈশব কাটিয়ে আরম্ভ হ'ল পড়াশুনা ও শেষে আইন পড়া। ইতিমধ্যে আরম্ভ কবিতা লেখারও। তবে গোড়ার দিকের সেই সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে তৎকালীন প্রতীকবাদেরই নিঃসন্দেহ ছাপ। ছাপ পূর্বসূরি পারনাসদেরও। মূল যাঁদের প্রভাব তখন তালেরির উপর, তাঁরা বোদলেয়ার ও ভেরলেন। তবু তাঁর তখনকালের কবিতাতেও যেন "একটি আগুন চিহ্নিত ও ভিন্ন।" ইতি-মধ্যেই যেন শুরু আত্ম-বিশ্লেষণের, কথা কবির আগ্রহ বিবেকের। তাঁর তখনি জানতে চাওয়া : "আমি কি আছি, না ছিলাম? আমি কি ঘুমিয়ে, না জেগে?" এই প্রাথমিক মানসিক অস্থিরতা পরে রূপ নেবে বিশিষ্ট পরিণতির তাঁর কাব্যিক বিশুদ্ধ গবেষণায়।

১৮৯০-এ পরিচয় পারীবাসী পিয়ের লুই-এর সঙ্গে, ও এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। লুই নিজেই সাহিত্যিক, ও সম্পাদক একটি পত্রিকার, যাতে তখন লিখছেন মালার্মে। মালার্মের নাম এই প্রথম শুনলেন তালেরি, ও পরে ধীরে ধীরে লুই-এর মাধ্যমতায় মালার্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত। এই পরিচয়ে তালেরির জীবনের মোড়টাই যেন পালটে গেল। আরম্ভ শৃঙ্খলার সাধনার।

একই সঙ্গে, মালার্মের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ই, পরিচয় আঁদ্রে জিদেরও সঙ্গে, ও এই পরিচয় পরে ধীরে ধীরে পরিণত হবে আজীবন বন্ধুত্বে।

এখন, মালার্মের আশীর্বাদে, ভালেরি পেলেন নতুন জীবন। অভিনব সাধনার পথে যাত্রা সুরু, লেখা নতুন ক'রে। এই সময়ে একই সঙ্গে বেশ একটু লৌকিক দর্শন অধ্যয়নের প্রতি। ১৮৯৫ ও ১৮৯৬-এ প্রকাশ দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধের—তাদের প্রথমটি হ'ল ইতালীয় মহর্ষি মনীষী লেওনার্দো ও তিকিয় রীতির ভূমিকা প্রসঙ্গে। ও তিকিয় মনো পেলেন ভালেরি এক যথার্থ গুরু—শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের যে মহান ও সার্থক সমন্বয় এই ঋষিতে, তা ভালেরিকে উদ্বুদ্ধ করে সারাজীবন ধ'রে।

১৮৯৭-এ ফরাসী সরকারের সমর বিভাগে প্রবেশার্থী হ'য়ে পরীক্ষা দেওয়া, ও পরে আগামী তিন বছরের জন্যে সেই সরকারী চাকরীতে কালযাপন। তার পরে নিমগ্ন হওয়া গাণিতিক অধ্যয়নে—লেখা প্রায় বন্ধ, প্রকাশ বন্ধ একেবারে। ভাগ্যক্রমে আঁদ্রে জিদ এলেন এই সময় একটি অনুরোধ নিয়ে। তিনি প্রকাশ করার ভার নিতে চান ভালেরির যৌবনে লেখা কবিতাগুলির। কবি যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেই সম্মতি দিলেন। ও ভাবলেন, গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে গোটা পঞ্চাশেক পঙক্তির একটি নতুন কবিতাও ঢুকিয়ে দেওয়া যাক। নতুন কবিতাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রথম গ্রন্থে যায়নি, কারণ কবিতাটি মাত্র গোটা পঞ্চাশেক পঙক্তির না হ'য়ে পাঁচশো পঙক্তির হয়ে দাঁড়ায়। ও যেহেতু তা' লেখার সময় ভালেরি সর্বদাই রাখেন তাঁর অতদিনে অর্জিত কঠিন শৃঙ্খলার সাধনার নজর, কবিতাটি লিখতে বহু সময় লাগে ও তা' প্রকাশিত হ'তে পারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে, ১৯১৭-র আগে নয়। শোনা যায়, লেখার সময় কবি নাকি অভিধানের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, একটি যথার্থ শব্দের সন্ধানে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। কবিতাটি গ্রীক পুরাণের তিনটি নিয়তি দেবীর কনিষ্ঠাটিকে নিয়ে। গ্রীকের প্রতি কবির প্রেমের পিছনেও ঐ একই কারণ। সে-কারণ হ'ল এই যে গ্রীক সাধনাতেও আছে সেই একই শৃঙ্খলার অভিনিবেশ, গাণিতিক নির্ভুলতা, ও তা' মহান, দৃঢ়, নিষ্কম্প।

উক্ত কবিতাটি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় উৎসর্গ করেন আঁদ্রে জিদকে। উৎসর্গ-পত্রে লেখেন: "গত বেশ কয়েক বছর ধ'রে আমি বর্জন করেছিলাম কবিতা লেখার আর্ট। এখন চেষ্টা আমার তাতে আবার নিজেকে বাধ্য করার।

বর্তমান পরিশ্রমের ফলটি তোমায় উৎসর্গ করলাম।" যেমন শাঁ-জন পের্সের ক্ষেত্রে, তেমনি ভালেরিয়ের ক্ষেত্রে, আশা ছিল যেন আসেন তাঁদের কাছে তাঁদেরই নিয়তির ডাক শুনিয়ে, এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এই সময়োচিত আসা না ঘটলে হয়তো পের্স ও ভালেরি তাদের কবিতার পথে আর অগ্রসর হতেনই না।

পরে, ১৯২২-এ, প্রকাশ "কবিতার" (ফরাসীতে Charmes, অর্থ মায়া, কিন্তু গ্রীক অর্থে কথাটি হ'ল কবিতা ও এই নাম দিয়ে ভালেরিও বোঝাতে চেয়েছিলেন কবিতাই), আরো একটি কাব্যগ্রন্থের। "সমাধিভূমি সিন্ধুতীরে" অন্তর্ভুক্ত এই গ্রন্থে, যদিও তা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় একটি পত্রিকার আগে, ১৯২০-এ। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির খ্যাতির ব্যাপ্তি ঘটা শুরু হয়ে গেল।

তাঁর গদ্য রচনাতেও ক্রমান্বয়ে চলছিল নতুন সংযোজন। একটি বিখ্যাত লেখা, ১৯২৩-এর, "আত্মা ও নৃত্য।" বহুকাল কাব্য সাধনার শৃঙ্খলায় কাটিয়ে অবশেষে কবিকে আয়ত্ত করতে হ'ল জাগতিক জীবন। খানিকটা খ্যাতির খাতিরে, খানিকটা সহকারী চাপে, চলাফেরা শুরু করলেন উচ্চ সমাজের চাকচিক্যময় মণ্ডলে। বাগ্মী হিসেবে খ্যাতিও পেলেন। এ সময়ে যত বক্তৃতা তাঁর পাঁচ খণ্ডে সংকলিত "বিচিত্রা" গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

কিছু পরে, ১৯২৫-র ১২শে নভেম্বর, ফরাসী আকাদেমীর সদস্য নির্বাচিত হলেন। আকাদেমীর যে আসনটি খালি ছিল আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যুর ফলে, সেই জায়গায়। ১৯৩৩-এ ভূমধ্যসাগরীয় এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালকের পদ পেলেন, ১৯৩৬-এ তাঁকে নির্বাচিত করা হ'ল জাতি সঙ্ঘের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পদে। ১৯৩৭-এ পেলেন পারীর কলেজ দ্য ফ্রাঁসে কাব্যদর্শনের অধ্যাপকের পদ।

নাৎসী-অধিকৃত পারীতেও, শীতের প্রকোপ ও স্বাস্থ্য সত্ত্বেও, কলেজ ফ্রাঁসে তাঁর অধ্যাপনা তিনি বন্ধ রাখেন নি। তাঁর শেষ গদ্য রচনা, "আমার কাউই", তাও সম্পন্ন করলেন এই সময়েই। জিদী সহকারের প্রতি তাঁর প্রত্যক্ষ বিরূপতা জানিয়ে ১৯৪৩-এ নাম লেখালেন এক প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘে। এল পারীর উদ্ধারের দিন। সে দিনে পাওয়া গৌরব দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর ঘটল। অবশেষে ১৯৪৫-এ মৃত্যু। আশিজন জীবনের শেষ সূর্যাস্তকে।

একটি জীবন, একটি সাধনা। তবু এমনি জীবন ও সাধনা। "তাঁকে

কেউ পড়ল না, বুঝল না? কী দুঃখের বিষয়ই লক্ষিত মহাত্মাদের প্রতি।"— ভালেরির এই উক্তি খানিকটা প্রযোজ্য হ'তে পারে তাঁর নিজেরই সম্বন্ধে। খানিকটা বলছি এই কারণে যে ভালেরি সম্পূর্ণ অপঠিত নন, অবোধ্যও নন। বরং ফরাসী কাব্যের একটি মহান দিনান্তের দিগন্তের তিনি এক অন্যতম দিকপাল। পরবর্তী বিশ্ব কবিতার ধারাতে তাঁর প্রভাবও কিছু কম নয়।

তবে আজকের কবিতা যে নানান পথে চলেছে ও ভবিষ্যতের কবিতা যে আরো অজস্র নানা পথে এগোবে, তার সঙ্গে ভালেরির পথের দূরত্ব একটি আছে ও হয়তো থাকবেও। আমি যা চেয়েছি আমার এই বর্তমান প্রয়াসে, তা শুধু নমস্কারের একটি ক্রম হয়তো। ভালেরির সাধনাকে নমস্কার করার যোগ্যতা সমস্ত সমার্থ কবিরই থাকবে। যে-কবি (বা শুধু কবিই কেন? আমাদের ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র যাঁদের সহৃদয় আখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের সকলেই) আজকের, কালকের, বা আজ হ'তে একশো বছর পরেরও, তাঁদের অনেকেই এক অর্থে ভালেরির সাধনার দিকে চেয়ে হয়তো বলতে পারবেন: "হে অপরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও।" তবে সেই এক অর্থে এই বলা হবে না ভালেরির অর্থে বলা।

ভগ্নসেতু

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

"ভগ্ন সেতু মরীতে মরীছে, হয় অমরে অমরে।"—রবীন্দ্রনাথ

এমন একদিন ছিল যখন নিজের গ্রামটুকু ঘিরে যে-দিগন্ত তাকেই যেন মনে হতো পৃথিবীর সীমান্ত। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই দিগন্ত বিস্তৃতি পেতে থাকে। এর ফলে আজকের ইতিহাস এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভৌগোলিক ব্যবধান অলিক, যেখানে এই গোটা পৃথিবীটা পরিণত হয়েছে এক সর্বগত স্বদেশে। ভালো হোক অথবা মন্দ হোক এ-তথ্য আজ সীমান্তকে আর খুঁজে পাচ্ছে না, বরং দেশ-কাল-সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে আপন অবস্থিতির ক্ষুদ্রতা তথা অসহায়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে মস্কো বা ওয়াশিংটনে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বা হচ্ছে না তার উপরে এসব স্থান হতে পৃথিবীর দূরতম কোণবাসী মানুষটিরও ভবিষ্যৎ অভ্রান্তরূপে নির্ভর করছে, এমন কি যাদের এখনও জন্ম হয় নি তাদেরও ভবিষ্যৎ। সুতরাং একালের যে-শিল্প তা ওই সর্বগত স্বদেশেরই শিল্প। তাকে আর কোনও কল্পায়িত ভৌগোলিক সীমার আবদ্ধ রাখা চলবে না।

অবশ্য আচার ও আচরণ, পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব, এক কথায় সমাজ ব্যবস্থার তারতম্যকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজ নিরপেক্ষ নয় এবং সমাজও গড়ে ওঠে নানা প্রাকৃতিক অবস্থার চাপে ও পারস্পরিক প্রয়োজনের টানাপোড়েনে, এ সমস্তই সত্য। কিন্তু এই সকল তারতম্যের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে সমীকৃত হবার দিকে, এক সমন্বিত রূপ পাবার দিকে, একটি ঐকতান গড়ে তোলার দিকে। পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের যোগাযোগ যতই ঘনিষ্ট হবে ততই এই সকল বাহ্যিক ভেদাভেদ ঘুচে যেতে থাকবে, ঘুচে গিয়ে সব এক হবে না, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পের অন্যান্য বিভাগের মতোই উপন্যাসেরও প্রধান দাবি এই যে তার অন্তঃস্থিত মানবিক বোধটিকে ধ্রুবপদে অধিষ্ঠিত করতে হবে। এটাই শিল্পের মোক্ষম কথা। সুতরাং ভাষা ও সমাজ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করবার পরেও বিশ শতকের উপন্যাসের স্বরূপকে অনুধাবনের প্রয়াস পেতে

হবে। অর্থাৎ প্রচলিত ধারণা অনুসারে কোন একটি বিশেষ দেশের উপন্যাস নয় কিন্তু একটি বিশেষ কালের উপন্যাস। তাই বিশ শতকের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে একালের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এ-কালের আত্মা বা Zeitgeist-কে বুঝে নেওয়া ভালো।

কারণ শিল্পকে যে শিল্প হতে হবে এটা তর্কাতীত। শিল্পের তাৎপর্য স্বকালের আত্মাকে তার ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত করে তোলার মধ্যে। এবং তিন কোণা কাচের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোর মতোই সে-আত্মাও নানা মুখে নানা বর্ণে বিচ্ছিরি হয়ে যায়। কিন্তু বিচ্ছুরিত মধ্যে তো আর শিল্পীর মুক্তি নেই, প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে তাদের ধারণা ও আনন্দকে স্বীয় অভিজ্ঞতার সামিল করে তাদের আকৃতি ও ট্র্যাজেডিকে অভিব্যক্তি দিয়ে তবে বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তিনি সার্থক। বিচ্ছুরণ মধ্যে শিল্পী যেন নিজস্ব স্বাদ। ফলে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিরি সেই সমস্ত নানা বর্ণ মিলে গিয়ে এক বিশিষ্ট বর্ণে, এক Weltanschauung-এ, এক বিশ্বের ভাবলয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ যাকে বিশ্বের ভাবলয় বলে বোঝাতে চাইছি তাকে রূপে রসে গন্ধে ধ্বনিতে ও প্রাণস্পন্দনে মূর্ত করে তোলেন শিল্পী। দার্শনিকের মতো আগুন সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা দেওয়া তাঁর কাজ নয়, তিনি শুধু একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিতে পারলেই তৃপ্ত। সে-দুটি বস্তুর সাহায্যে তিনি দেশলাই কাঠি আলান তার একটির নাম কাল, অপরটির নাম দেশ। যুগেধিয়ে সেই এক প্রশ্ন।

ইতিহাস অঙ্কের নিয়মে চলে না। তার এক একটি ঘটনার শিকড় যে কোন্‌খানে থাকে আর সেই মহীরুহের বীজ যে কোথায় উড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিকানা ঠাহর করা কঠিন। বিশ শতকের প্রথমার্ধ ধরে যে-বৃক্ষের ফল ফলেছে তার বীজ এই শতকে পোঁতা হয়নি, হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে। এবং তা রস সংগ্রহ করেছে ষোড়শ শতাব্দীতে সংঘটিত ইতালীয় রেনেসাঁস হতে। বৃক্ষটির নাম শিল্প-বিপ্লব। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সেটি প্রবল বেগে বেড়ে ওঠে। ইংলণ্ড হতে তার কলম করে নিয়ে গিয়ে অথবা বীজ সংগ্রহ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আপন আপন উঠোনে এটি রোপণ করে। একদিন সেই চারা বাড়তে বাড়তে মহীরুহ হবে, উঠোন ছেয়ে ফেলবে, পুবের ভিত কাটিয়ে দেওয়াল ও ছাদ ফাটিয়ে দেবে সে-কথা তখন কে ভেবেছিল। খোদ্‌ো বা টলস্টয়ের মতো দু'একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা অবশ্য রেনেসাঁস ও শিল্প-বিপ্লবের

মধ্যে এক অন্তঃশীল বৈনাশিক প্রবণতা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেতাবনীতে তখন কেউ কান দেননি। শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানার গর্জন ও তার সাফল্যের হল্লোড় মানবতাকে বধির করে রেখেছিল।

কিন্তু রেনেসাঁস ও শিল্প-বিপ্লবের আগের আমলটাতেই বা মানবতা কতখানি উৎকর্ষ ছিল? এক হিসেবে মানবতা তো সেই আমলটা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। বুর্কহার্টের লেখনীতে আমরা সেই আমলের প্রকৃতি বর্ণনা পাই:

"In the Middle Ages both sides of human consciousness—that which was turned within as that which was turned without—by dreaming or half awake beneath a common veil. The veil was woven of faith, illusion and childish prepossession, through which the world and history were seen clad in strange hues. Man was conscious of himself only as a member of a race, people, party, family or corporation—only through some general category."

মধ্যযুগের ইউরোপ চক্রগতিতে আবর্তিত হচ্ছিল খ্রীস্টান ধর্মীয় তত্ত্ব ও পরলোককে কেন্দ্র করে। পরলোকই হল মানুষের নিজের ঘর আর ধর্ম হলো সেই পথ যা মানুষকে পৌঁছে দেয় তার নিজের ঘরে। মানুষের অধিতীয় লক্ষ্য হলো স্বর্গ আর ধর্মই তার একমাত্র সাধনার বস্তু। মানুষ মেনে নিয়েছিল যে তার সকল দুঃখকষ্টের মূল আদিমানুষ আদম-কৃত পাপ ও আপন আপন কর্ম। সুতরাং এজন্যে কোনও মানুষের কাছে অভিযোগ করে লাভ নেই, বরং ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করতে হবে। আর মানুষের তাবৎ যাতনার উপরে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার জন্যে ছিল গীর্জা। কেমন করে ধর্ম মেনে চললে ভগবানের ক্ষমা ও প্রেম পাওয়া যায় সেই পথটি গীর্জাই বাতলে দিত। ধর্মযাজকদের উপরেই যে ভগবান সমগ্র মানবকে উদ্ধার দেবার আত্মমোক্তারনামা দিয়েছেন এ-বিষয়েও কারও সংশয় ছিল না। তাঁদের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি বিনে ইহলোকের পাপক্ষয় ও মৃত্যুর পরে নরকের শাস্তি হতে মুক্তি মিলত না। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ধারণাও ছিল অতি সরল। এই পৃথিবীটা সমতল ও অচল। তার উপরে স্বর্গ নিচে নরক। মৃত্যুর পরে এই দুইয়ের যে কোনখানে যেতেই হবে। পরম করুণাময় পিতা পৃথিবীর মানুষকে আলো দেবার জন্যে সৃষ্টি করেছেন

আকাশের চন্দ্র-সূর্য-তারা। এই সরল ও ক্ষুদ্রজগতের মধ্যে মানুষের সমস্ত আচার ও আচরণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বদ্ধ।

কিন্তু বুর্লহার্ট বর্ণিত আস্বাদনের তলায় যে কিছু অসম ও বিষম, এমনকি বিপরীত চিন্তাও যে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠছিল, বাইরে আসবার জন্য ছটফট করছিল, এটা কারও নজরে পড়েনি। তখন নজরে পড়ল যখন এই চকমকি একটা দারুণ আলোড়নের রূপ নিল। কাল চালাবার জন্যে হাতের কাছে একটা সন তারিখ রাখা যাক। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীদের হাতে পতন হলো কনস্তান্তিনপলের। অমনই ইউরোপের সিংহদ্বার ইতালিতে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। ঘুমের ঘোরে ঘুম ভাঙল। উপরের আস্তরণটা ছুঁড়ে ফেলে নতুন নতুন চিন্তাভাবনাগুলি লাফিয়ে নামল বিছানা ছেড়ে। কনস্তান্তিনপলের পতন হওয়াতে মানবতার বিজয়-কেতন উড়ল। ঘটল রেনেসাঁস। যার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল দ্বাদশ শতাব্দী থেকে, এবার গর্জন করে সে এসে দাঁড়াল ইউরোপের বুকের উপরে।

বাইরের থেকে দেখলে রেনেসাঁসকে মনে হয় প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। কিন্তু তার গূঢ় তাৎপর্য হলো মানুষের আত্ম-আবিষ্কার। এতদিন সে শুধু পরলোক নিয়েই ভাবিত ছিল। এবারে সে আত্ম-সচেতন হলো, ইহলোক-সচেতন হলো। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে ও নিজের সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আর মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের আধারে কুলোল না, উপচে পড়ল কানা ছাপিয়ে। বিলাস-ব্যসনে স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পদে বিলিষ্ট নাগরিক সভ্যতার প্রসারে পরলোকের আকর্ষণ গেল কমে। পক্ষান্তরে মানুষ চাইল অবাধে ইহলোকের সুখ ও সৌন্দর্য ভোগ করতে।

এইভাবে রেনেসাঁসের সূত্রপাত। রেনেসাঁস বলতে সাধারণত জ্ঞানে ও চিন্তার ক্ষেত্রে একটা বিপুল পরিবর্তনকেই বোঝান হয়। কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবে তাকে সাধ্য করেছে ইতালির তৎকালীন বিশেষ সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা। ভৌগোলিক অবস্থানহেতু ইতালি ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথগুলির উপরে প্রকৃষ্ট সুযোগ ভোগ করে এবং একই কারণে প্রাচ্যের সংস্পর্শে নানা শিল্পের ও বিশেষত রেশম শিল্পের সেখানে প্রতিষ্ঠা হয়। ভ্রাতৃবিরোধ ও সম্রাটের সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদের ফলে ইতালিতে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অধিরাজ্য গড়ে ওঠে। রেনেসাঁসের এক প্রধান সন্তান মেকিয়াভেলি যখনের

রাজনৈতিক অনৈক্যের জন্যে বিস্তর বিলাপ করেছেন, অথচ এই অনৈক্যই ছিল রেনেসাঁসের অন্যতম সহায়কশক্তি। এবং পোপ ও সম্রাটের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্কের ফলে অনেক বুদ্ধি জন্মেছিল ইহলোকের স্বপক্ষে। এটা পোপের বলাই বলত যে সম্রাটের শক্তি শুধু ইহলোকে সীমাবদ্ধ। পরলোক সম্বন্ধে টান যত ক্ষীণ হতে লাগল ততই পোপের প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়তে থাকল। অর্থাৎ রেনেসাঁসের জন্যে যেসব বস্তুগ্রাহ্য শর্ত প্রয়োজন সেগুলো পূরণে ইতালি ছিল সম্যকরূপে সমর্থ।

নিজের সম্বন্ধে সচেতন হবার ফলে, নিজেকে চিনতে পারার ফলে সেদিন ইউরোপের মানুষের সে কী উন্মাদনা, কী উদ্দীপনা। কেমন করে সে ঘরে রাখবে নিজেকে। ইতালি থেকে রেনেসাঁসের ঢেউ গড়িয়ে যেতে লাগল। সেই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দুলতে দুলতে ইউরোপের দামাল ছেলেরা পৃথিবীর সীমা খুঁজতে ভেসে চলল। সীমা মিলল না, তবে জানা গেল পৃথিবীটা সমতল নয়, আর পাওয়া গেল নতুন নতুন ভূখণ্ডের দিশা। তাতেও তৃপ্তি নেই মানুষের। অজানাকে জানবার প্রকৃতিকে জানবার তৃষ্ণাও যে সীমাহীন। পৃথিবীর আকৃতি ও গঠন, সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব তথ্য প্রকাশ পেতে লাগল যে-সবের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থে প্রচারিত তথ্য ও সত্যের এক তিল মিল নেই। নতুন নতুন আবিষ্কার হলো বিজ্ঞানে। চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্ত অধারিত হলো। এই সমস্ত জ্ঞান চিন্তাভাবনাকে সংকলন ও সংরক্ষণ করবার জন্যেই যেন এই সময়ে মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবন হল।

কিন্তু রেনেসাঁসের প্রবল উদ্দীপনার তলা দিয়ে যে একটা অস্বস্তির স্রোত নিঃশব্দে বয়ে যেতে শুরু করেছিল সেটা প্রথমে টের পাওয়া যায়নি। এতদিন মানুষ নিশ্চিন্ত ছিল তার ধারণা ও বিশ্বাসগুলো নিয়ে। কিন্তু পৃথিবীটা যদি গোলাকার হয়ে থাকে, যদি কোনও দিগন্তের পরেও পৃথিবীটা শেষ না হয়ে থাকে, এর উপরে স্বর্গ ও নিচে নরক না থাকে তা হলে ধর্মগ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা কি ভুল? তা হলে মনুষ্যজন্মের তাৎপর্য কী? তা হলে সুকর্ম করা কেন? তা হলে মৃত্যুর পরে আছেটা কী? আর সত্যিই যদি পৃথিবী এত বিশাল হয়ে থাকে তা হলে তার তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব যে খুবই ক্ষুদ্র, খুবই নগণ্য, খুবই অসহায়জনক! ধর্মযাজকদের কাছ থেকে শোনা যে কোন একটি সত্য যদি ভুল প্রমাণিত হয় তা হলে বাকি সত্যগুলোও তো একে একে অযথার্থ হয়ে যেতে

পায়ে। ফলে বিশ্বাসে কাটল ধরে, মানুষের মনে জাগে জিজ্ঞাসা, জাগে সংশয়, জাগে অস্বস্তি। এমন সময় ঘটল রেফর্মেশন। লুথার ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ সনাতন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মযাজকদের বাতিল করে দিয়ে ইউরোপকে বোঝান যে এতদিন সনাতনবাদীরা সবাইকে ভুল বুঝিয়েছে, ভুল শিখিয়েছে, ধোকা ঠকিয়েছে আর মজা লুটেছে নিজেরা। ভগবৎ বিশ্বাসকে তিনি বললেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়, সেটা মোহান্তদের অনুগ্রহসাপেক্ষ নয়। রেফর্মেশনের অপর নেতা কালভিনও বললেন যে ইহলোক হতে মুক্তি নির্ভর করে স্বয়ং ঈশ্বরের করুণার উপরে এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে কোনও প্রতিষ্ঠানের ধর্মযাজকদের সম্পর্ক নেই, সেটা সম্পূর্ণই ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ফলে ব্যক্তিই হলো বিশ্বের মূলাধার। অনেক খ্রীস্টান নাম লেখালেন লুথারের দলে। তাঁরা রেনেসাঁসের জোয়ারে ভেসে গেলেন না, রেফর্মেশনের খুঁটি আঁকড়ে ধরে রইলেন। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুদ্ধিতে রেফর্মেশনের অক্ষয় অবদান হয়ে গেল। রেনেসাঁস যেমন মানুষকে মহান করে দেখতে শিখিয়েছে তেমনই রেফর্মেশনের শিক্ষা এই যে সব মানুষই সমান।

তা বলে রেফর্মেশন তো আর ইউরোপের সব কটি দেশে হয়নি। যেসব দেশে হয়নি সেসব দেশের মানুষগুলো খুঁটি-ছাড়া হয়ে রেনেসাঁসের জোয়ারে ভাসতে থাকলেন। কিন্তু এমন কোন্ পাখি আছে যা আকাশ ছেড়ে মাটিতে নামে না। তেমনই অবিরামভাবে ভাসতে ভাসতে ক্লান্তি আসে। ক্রমাগত জিজ্ঞাসা ও সংশয়ে ক্ষয়ে যায় তাদের উদ্দীপনা। ফলে ইতালিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রেনেসাঁসের বিশেষ বৃদ্ধি হলো না। আবার রেফর্মেশনের মতোই রেনেসাঁসও ইউরোপের সর্বত্র হয়নি। ফলে এই ভূখণ্ডের এক বিরাট অংশই অনগ্রসর ও অনুর্বর তথা সামন্ততান্ত্রিক থেকে যায়। এমন কি জার্মানির মাটিও রেনেসাঁসের জলে ভেজেনি। যদি গোটে ইতালি ভ্রমণে না বের হতেন তাহলে তাঁর রচনায় রেনেসাঁসের সুর বাজত কি না খুবই সন্দেহ। এ-কথা মনে রাখা খুবই দরকার যে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন হলো দুটি ভাস, একটির উপরে আর একটি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একা দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে যা হলো না তা-ই হলো ইংলণ্ডে। সেখানে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশনের সম্মিলন ও সমন্বয় হলো। ইতালি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানি এগিয়েছে দুই পায়ে। একটা পর্যায়ে এসে ইংলণ্ড হাঁটা ছেড়ে ছোটা

শুরু করে। এই সময়টাকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে শিল্প-বিপ্লব। কোনও বিশেষ সন-তারিখ ধরে এই যুগ বা বিপ্লব শুরু হয়নি। ষোড়শ শতাব্দী হতে উৎপাদন প্রথায় যে-পরিবর্তন ধীরে ধীরে সাধিত হচ্ছিল তার গতি ও তাল অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্বাভাবিক দ্রুতি ও চাঞ্চল্য পায়।

রেনেসাঁসের ফলে মানুষ যেমন মানবতাকে তেমনই সমাজ নিরপেক্ষ—সমাজ বহির্ভূত নয়—ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকেও আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতি যে মানুষের ভোগ্য ও দলিত কর্তৃত্বের এবং সৌন্দর্য হিসেবে উপভোগের অপেক্ষা রাখে এই সত্যও রেনেসাঁস হতেই পাওয়া। কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারেনি। দূরের সমুদ্রে সে জাহাজ পাঠিয়েছে, ওপারের দেশ হতে ধনসম্পদ নিয়ে আসতে শুরু করেছে, তবু সে প্রকৃতির অনুগ্রহপ্রার্থী। অনুকূল বাতাস না পেলে তার জাহাজ চলে না। দেশের মধ্যেও এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে দীর্ঘ সময় লাগে। ইংলণ্ডের মতো দেশে চাষের জমি কম, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপন্ন হয় কম। অন্য দেশ হতে খাদ্য আনতে হলে বিনিময়ে কাপড় বা কিছু জিনিস দিতে হয়। দেশের ধন-সম্পদ কম হয়ে আসছে। সুতরাং আমদানির জন্যে রপ্তানি চাই। জাহাজ, বাড়ি, পুল, রেললাইন ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে চাই লোহা। এক কথায় যা চাই তা প্রকৃতির কৃপা নয়, চাই তার উপরে কর্তৃত্ব। রেনেসাঁস মানুষের বুকে এই কর্তৃত্বের পিপাসা জাগিয়েছে, এই প্রভুত্বের জন্যে তার চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে, এই প্রভুত্বের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে। আর শিল্প-বিপ্লব মানুষকে দিয়েছে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অতি প্রয়োজনীয় প্রভুত্ব। তখন কি সে জানত যে এই আকাঙ্ক্ষাই একদিন তার প্রভু হয়ে বসবে! সে তো তখন মনের আনন্দে তার হাতের চাবির গোছা দিয়ে প্রকৃতির রহস্যদ্বারগুলি একটি একটি করে খুলতে শুরু করে দিয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত মানুষ সমাজে তার নির্দিষ্ট ভূমিকার সঙ্গে জন্মসূত্রে গ্রথিত ছিল। কেউ যদি কৃষকের ঘরে জন্মাত তবে তাকে কৃষকই হতে হতো, অন্য কিছু সে হতে পারত না। তেমনই সবক্ষেত্রে। এটা বন্ধন বটে, কিন্তু এই বন্ধনটাই নিশ্চিন্তি। সমাজই জীবনের পথটা জন্মাবার আগে থেকেই স্থির হয়ে থাকত, জন্মাবার পরে কাউকে আর জীবিকার পথ খুঁজে বেড়াতে হতো না। সমাজের যে স্তরে জন্ম হতো সেই স্তরে থেকেই জাতক পূর্বপুরুষদের মতোই

জীবন অতিবাহিত করবে—এই নিশ্চিতি দৃঢ়ভাবে নিমিত সমাজের মধ্যেই নিহিত ছিল। জীবিকা সম্বন্ধে সংশয় ও প্রতিযোগিতার অবকাশ ছিল না। আপন নিগম বা বণিকসংঘ বহির্ভূত কোনও ব্যক্তির কাছে উৎপাদনের গুপ্ত-কৌশল ফাঁস করা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হতো। সেসব কলাকৌশল মুষ্টিমেয় কয়টি বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং বংশশীর্ষ শুধু মৃত্যুর আগে তা শিখিয়ে যেত উত্তরপুরুষকে। জীবনের সমস্ত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো বিশেষ কতকগুলি অমোঘ ও সুপ্রথিত নিয়মের দ্বারা। বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা সংঘ ইত্যাদির একজন হিসেবেই তখনকার মানুষের পরিচয় ছিল, সেসবের বাইরে তার কোনও নিজস্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। যেমন বাঁধা পথে সবাইকে এগোতে হতো এবং শ্রেণীপরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল না তেমনই মানুষের জীবন বাঁধা থাকত এক একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমাতে। যেখানে যে জন্মাত সেখানেই মরত। উৎপাদন করত ছোট হাতে। যেখানে খাদ্য বা পণ্য উৎপাদন করত, বিক্রির ব্যবস্থাও থাকত সেখানে বা তার নিকটে। মানুষের গোটা জীবনটাই ছিল ভূমিলগ্ন। ভূমির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার বা আদৌ অস্বীকার করবার কোনও ক্ষমতা তার ছিল না। এই ভূমিই তখনকার সামগ্রিক জীবনের প্রতীক। পায়ের তলায় মাটি থাকার জন্যে নিশ্চয়তাবোধ ছিল, কিন্তু মাটির অচলতা মানুষকেও সব দিক থেকেই অচল করে রেখেছিল।

এক কথায় মধ্যযুগীয় সভ্যতা ছিল স্থাণু। রেনেসাঁসের ফলে জাগে প্রাণ-স্পন্দন এবং শিল্পবিপ্লব দেয় প্রকৃতির উপরে কর্তৃত্ব ও অধিকার। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই বিপ্লব সূচিত হবার সৌলতে অচিরেই ইংলণ্ড এক রকম গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসে। শুধু ইংলণ্ড নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো সুখী সময় পৃথিবীর ইতিহাসে কি আর কখনও এসেছে? সাধ্য কাহানের তখন মানুষ জাঁহাপনা। প্রকৃতি তো মানুষের হাতে-ধরা হয়ে গেছে। মানুষ আর পরাধীন নয়। না প্রকৃতির, না পুরোহিতের, না রাজার। গণতন্ত্রের চেতনায় গোটা ইউরোপ উদ্বুদ্ধ। শুধু মানুষের নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার জয় জয়কার। ইতিহাসে যুদ্ধ নামক বিপর্যয় যাতে আর না ঘটে সেজন্যে মানুষ শুধু আর একটি যুদ্ধ করবে। তারপরে পৃথিবীতে বিরাজ করবে অক্ষয় শান্তি। এই মর্ত হবে স্বর্গ। কত আশা কত সাধ কত স্বপ্ন!

কিন্তু অলক্ষিতে ঈশাণ কোণে মেঘ জমছিল। রক্তের কালো মেঘ।

রেনেসাঁস প্রাতিস্বিকতার জন্ম দিয়েছে, রেফর্মেশন তাকে ছুগিয়েছে শক্তি আর শিল্প-বিপ্লব তাকে লালন করেছে। শিল্প-সভ্যতার উপর তলায় টিঁকে থাকার ভিত্তি হলো ব্যক্তিক কৃতিত্ব যা শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ এ যুগে কোন আইন বা অনুশাসন বা ধর্মীয় বিধান দিয়ে কাউকে কোন বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে চিরকালের মতো বেঁধে দেওয়া হয়নি। উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি যে-শিল্পপতি যত বেশি উদ্ভাবন করতে পারবেন তিনি তত এগিয়ে যাবেন এবং তা না পারলেই তাঁর অধঃপাত অনিবার্য। সামন্ত-তান্ত্রিক সভ্যতায় এ-ধরনের প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা ছিল না। তবে শিল্প-বিপ্লবের চাপটা গিয়ে পড়ে ব্যক্তির উপরে। চাপে পড়ে প্রাতিস্বিকতা সাংঘাতিক অর্জন করে। কিন্তু প্রাতিস্বিকতা তো শুধু ব্যক্তির সমৃদ্ধি নয়, তা বিশেষজ্ঞতার পরিপুষ্টি, তা নিজত্বের পরিচর্যা, তা হলো অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য। সমাজের আর সবার থেকে বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ হতে গিয়ে ব্যক্তি হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন তথা নিঃসঙ্গ। আর্থনীতিক অর্থে। এই আর্থনীতিক নিঃসঙ্গতার যুগে যে প্রতিযোগিতা তা বলা বাহুল্য। কে কার চেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারে তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব Laissez Faire নীতিতে, শিল্পপতিদের নিজস্ব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত উদ্যমে এবং সরকারী হস্তক্ষেপকে দূরে সরিয়ে। যেন তেন প্রকারেণ উৎপাদন বেশি করতে হবে, এ-ধারণার বশবর্তী হবার ফলে সমস্ত মানবিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে যাবতীয় নিষ্ঠুরতা ও শোষণের সহায়তা নিতে শিল্পপতিগণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি। আর একালের সভ্যতাটা যখন তাদেরই আকাঙ্ক্ষার ছাঁচে তৈরি এবং সমাজের আর দশজন যখন তাদেরই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে তখন তাদের অকপট স্বার্থের বিষ গোটা সমাজের শরীরে অচিরেই ছড়িয়ে পড়েছে।

যখন সমাজের মধ্যে এই নির্বিবেক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রক্রিয়া সবে শুরু করেছে তখন এরই পাশে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস-এর সহযোগিতার আবর্তন প্রবর্তন করলেন তাঁর বৈপ্লবিক বিবর্তনবাদ, যার সঙ্গে জড়িয়ে গেল অস্তিত্বের সংগ্রামের তত্ত্ব। এ-আবর্তনে বিবেকের প্রশ্ন অবান্তর যেহেতু শক্তির সংগ্রামে প্রতিপক্ষের উপরে নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তিতে টিঁকে থাকাই শ্রেষ্ঠতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টগণ খ্রীষ্টান ধর্মীয় তত্ত্বকে বাতিল করেছিলেন বটে

কিন্তু খ্রীস্টান নীতিবোধের ভিত্তি তথা প্রেম দয়া করুণা অহিংসা ইত্যাদি আদর্শকে স্পর্শ করেননি। যখন ডারউইন দেখালেন যে জীবজগতে শক্তিই হলো টিঁকে থাকবার একমাত্র শর্ত তখন এই অথো শিল্পপতিগণের অস্বাভাবিক আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেল। অবশ্য পরোক্ষ যুক্তি।

ডারউইন জীবজগতে শক্তির যে-ভূমিকা দেখেছিলেন তা জার্মানির রাজনৈতিক জীবনেও অভিব্যক্ত হয়। বিসমার্ক নিশ্চয়ই "প্রজাতির উৎপত্তি" পড়েননি. তবু তাঁর ব্রত ছিল জার্মান জাতিকে অদ্বিতীয় সমরশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এই সংগ্রামের নীতিকে যথার্থ বলে প্রমাণ করবার জন্যে প্রয়োজন হলো একজন দার্শনিকের। এই নব শক্তিবাদের দার্শনিক হলেন ফ্রীডরিশ নীট্‌শে। অবশ্য দার্শনিকের চাইতে তাঁকে কবি আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে মানুষ যে স্ব-সৃষ্ট সভ্যতার সম্মুখে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে যাবে যেন তা অনুমান করে সেরকম পরিস্থিতির জবাবে তিনি মানুষের সামনে ধরলেন অতিমানবের আদর্শ। আর তাঁর শক্তিবাদের বাস্তব রূপায়ণ বিসমার্ক এমনভাবে সম্পন্ন করেছিলেন যে তার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি ইউরোপের আবহাওয়াকে 'সশস্ত্র শান্তি' আখ্যা দিতে হয়। কিন্তু বিসমার্কের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিকতার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ফলে শিল্পক্ষেত্রে যখন জার্মানির আজগুবি রকমের উন্নতি হলো তখন সে বিশেষ বেগ পেতে লাগল উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিক্রি করতে। তার যে বাজার নেই। সুতরাং লড়কে লেজা উপনিবেশ। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড সারা পৃথিবী জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে ফেলেছে। তাদের অনুকরণ করবার জন্যে জার্মানি অস্থির হয়ে উঠেছিল, এরকম অনুমান অনর্থক। আসলে তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটাই ঔপনিবেশিকতা ভীষণ ভাবে দাবী করছিল। অতএব স্বীয় পণ্যের জন্যে বিদেশী বাজারের উপর অবাধ কর্তৃত্ব স্থাপনাই হলো অতঃপর জার্মান Weltpolitik-এর প্রধান লক্ষ্য। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব বাজার দখলের জন্যে জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে তীব্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ও সংঘর্ষকে ক্রমে ক্রমে অনিবার্য করে তোলে ; সংঘর্ষ যতই অনিবার্য হতে থাকে ততই ঊনবিংশ শতাব্দীর সুখস্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে।

এই যেমন গেল সংকটের একটি দিক তেমনই অপর দিকে রয়েছে ব্যক্তি-জীবনের সংকট। মধ্যযুগে পরনির্ভরতার মধ্যে একটা পরম নিশ্চিন্তি ছিল।

খাঁচা ভেঙে বাইরে এসে মানুষ সেই নিশ্চিন্তি হারাল। সেই যে রেনেসাঁস মানুষের মনে অসহায়তা ও অস্বস্তি জাগিয়েছিল এবং যেটাকে রেফর্মেশন শাঁস দিয়ে মাঙ ঢাকার পর্যায়ে আনতে চেয়েছিল সেটাকে শিল্প বিপ্লব প্রায় দেড় শ' বছর ধরে উস্কেছে। ভূমি যেমন ঘাস, লক্ষ্মী তেমনই চঞ্চলা। এখানে লক্ষ্মী মানে পুঁজি। ফলে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজের সামান্য বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হয়ে উঠল।

চাষের জমিকে বেড়া দিয়ে ঘেরবার রেওয়াজ বা Enclosure Movement শুরু হতে ইংলণ্ডে মাঝারি অবস্থার কৃষকবর্গ পিতৃপুরুষের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। এরই পাশাপাশি গড়ে ওঠে বিভিন্ন কল-কারখানা। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে ইংলণ্ডে জনসংখ্যার শতকরা নব্বইজন কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে। ততদিনে ইংলণ্ড তার স্বনির্ভরতা হারিয়ে উপনিবেশ-নির্ভর হয়ে পড়েছে। আগে ছিল কুটির শিল্প। কারখানা-প্রথার সঙ্গে শুরু হয় বিপুল হারে উৎপাদন; কৃষি ও শিল্পের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে। কারখানাতে কাজেরও নিশ্চয়তা নেই। পারা দিয়ে উৎপাদন করতে করতে সেই পণ্যে বাজার ছেয়ে গেল, চাহিদার চেয়ে বেশি হয়ে গেল জোগান। জোগান ও চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে উৎপাদন বন্ধ রাখতে হল। তার মানে মজুর ছাঁটাই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 'বাণিজ্য বৃত্ত' নামে কুখ্যাত ভারসাম্যের এই বিপর্যয় নিয়মিতভাবে ঘটেছে। পরবর্তীকালে নানারূপ সতর্কতা নিয়ে এই বিপর্যয়-গুলির নিয়মিত আগমন ঠেকানো গেলেও একেবারে বন্ধ করা যায়নি। একে তো একটা যন্ত্র দিয়ে মালিক দশজনের পরিশ্রম পায়, তদুপরি ডেমোক্লিসের খড়্গের মতো মাথার উপরে সর্বদা ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক ঝুলতে থাকে। কর্ম-ব্যবস্থা ছিল যেমন বিপদজ্জনক তেমনই দীর্ঘ ছিল কর্মকাল। মজুরদের দু'পেয়ে জন্তু হিসেবে মালিকেরা গণ্য করত। কারখানা-প্রথার বাইরে রইল বস্তিজীবনের বিভীষিকা। যেসব খুপরিতে তারা থাকত সেগুলো শূয়োরের পক্ষেও বাসের অনুপযুক্ত। এখানেই উনবিংশ শতাব্দীর স্ববিরোধিতা। একদিকে সুখস্বপ্ন, অফুরন্ত আশা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং অন্যদিকে প্রদীপের নিচে অন্ধকার এমন ঘন যে সেদিকে তাকালেই শিউরে উঠতে হয়।

গ্রাম ভেঙে গেছে, জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে, একান্নবর্তী পরিবার

ভেঙে আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিজন কে কোথায় ছিটকে গেছে জীবনের বাস্তায়, জীবিকার নিশ্চয়তা নেই : যে কোন একটা কাজ পেলেই করা যায়—কাজ পাওয়াটাই সমস্যা, জীবনে অবসর ও অবকাশ নেই, সবাই কাজের নাগর-দোলায় চব্বিশ ঘণ্টা কলুর বলদের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী সন্তান কারও প্রতি কারও দৃষ্টিক্ষেপের সময় ও সুযোগ কোনটাই নেই, সবাই এক বিপুল জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে, সবাই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ। এইভাবে কাটে সারাটা দিন। সন্ধ্যাবেলা গলা অবধি মদ টেনে রাত্রিবেলা বস্তির এক চিলতে ঘরে মুর্গিসাধা হয়ে ঘুম। এরকম জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবনে সুনীতি সুরুচির কোনও বালাই থাকতেই পারে না।

এবং যতই দিন যেতে লাগল ততই বোঝা গেল যে এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটা প্রতারণা মাত্র : শ্রমিকদের তো বটেই, কেননা সম্পত্তিতে অধিকারে বঞ্চিত ও বস্তু সম্পূর্ণ অলীক, তাছাড়াও তারা নির্ভর করছে বাজারে পণ্যের চাহিদার উপরে। এমন কিছু সক্ষম মজুরদের কখনই থাকে না যা দিয়ে হাঁটাই বা বেকার অবস্থায় পেট চালানো যায়। মজুরের ভাগ্য নির্ভর করছে মালিকের উপরে, আবার মালিকের ভাগ্য বাজারের উপরে। যে-বাজার আসলে কাটকা বাজার। যতদিন না মালিক একচেটে বাজার তৈরি করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত মালিকের ভাগ্যও অনিশ্চিত। সুতরাং মজুর ও মালিক উভয়ই এক বৃহৎ ও জটিল শক্তির হাতে পরাধীন। কিন্তু তাদের সম্পর্ক কি আর মানবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত? উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি দেখা গেল যে একজন পুঁজিপতির কাছে তার একজন মজুর নেহাতই একটি 'যন্ত্র মাত্র, কারখানায় অন্যান্য লোহালক্কড়ে তৈরি যন্ত্রের মতোই সে-ও মুনাফা লাভের একটি 'উপায়'। আর মজুর নিজেও জানে যে তার দেহ পণ্যের আধার, এই দেহের শ্রম বেচেই সে পেট চালায়। মালিক তার কাছে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, যার মূর্ত রূপ হলো টাকা। অর্থাৎ মজুরের পক্ষে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে মালিকও শুধু একটি 'উপায়' মাত্র। অতএব কোন্ পক্ষ তার 'উপায়'-কে কত বেশি খাটিয়ে নিতে বা ব্যবহার করতে পারে, তাই নিয়ে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মানুষে মানুষে মানবিক সম্পর্ক অন্তর্হিত হলো, তার স্থানে এল বেচাকেনার ও স্থূল বস্তুর সম্পর্ক।

কিন্তু মালিক ও মজুর উভয়ই যদি উভয়কে 'উপায়' রূপেই বিবেচনা করে

তা হলে তাদের 'উদ্দেশ্য'টা কী, তা হলে মালিক ও মজুর পরস্পরের কাছে কোন বিশেষ 'উদ্দেশ্য'তে পৌঁছনোর 'উপায়'? এটাই হয়েছে একালের সবচেয়ে বড়ো ধাঁধা। যান্ত্রিক হয়েছে 'উপায়' আর পরাযান্ত্রিক পুঁজিবৃদ্ধিই হয়েছে 'উদ্দেশ্য'। পুঁজি নিয়োগ করা হয় মুনাফালাভের জন্যে। আবার সেই মুনাফাটাই যোগ করা হয় পুঁজির সঙ্গে। মুনাফালাভের জন্যে যেমন পুঁজি নিয়োগ করা হয় তেমনই পুঁজিকে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট করে তোলার জন্যেই মুনাফার প্রয়োজন। যদি কোনও পুঁজিপতি তার মুনাফাটা পুঁজি হিসেবে নিয়োগ না করে অন্য কিছুতে খরচ করেন বা স্বত্ত্ব সঞ্চয় করতে চান তাহলে দুদিনেই তার কারবার লাটে উঠবে। কারণ পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবস্থাই এমন যে সারাক্ষণ টাকা ঢেলে নিত্য নতুন পদ্ধতিতে আধুনিকতম রূপের পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং তা না করতে পারলে সেই পণ্য বাসি মাল বলে বাজারে বাতিল হয়ে যাবে। তাই আজকের মানুষ সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে হন্যে হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মুনাফা লুটের জন্যে পুঁজি ঢালছে আর পুঁজি বাড়াবার জন্যে মুনাফা লুটছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের নিজের মূল্য বা সার্থকতা কোথায়? এই পরিস্থিতিতে তার ব্যক্তিস্বরূপ কী? সে আজকে স্বখাত সলিলে মজ্জমান। এই সমাজে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সিদ্ধি, বৈষয়িক সাফল্য ইত্যাদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন, এদের অন্যকোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ নেই, এদের অতীত অথবা এদের ঊর্ধ্বে কোনও মহৎ আদর্শ বা মূল্যবোধ নেই, এদের বাইরে মনুষ্য-জন্মের কোনও সার্থকতা নেই। মধ্যযুগের পারলৌকিক কল্পনার খোলস ছাড়িয়ে রেনেসাঁস যে-মানবতাকে আবিষ্কার করেছিল, রেফর্মেশনে ও ফরাসী বিপ্লবে যার জয়ধ্বনি ইউরোপের আকাশ উচ্চকিত করেছে সেই মানবতা বিশ শতকে হয়েছে ভূলুণ্ঠিত।

মধ্যযুগের মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকত বটে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের পরিণততর পর্যায়ে একচেটিয়ার যখন শুরু হলো তখন তা উপরের তলাতে উঠবার সব পথ বন্ধ করে শুধু নিচে নামার পথগুলি খুলে দিল। পুঁজি মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির অর্থাৎ এক অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গোষ্ঠী বহির্ভূত আর সবার পক্ষে উদ্যম হয়েছে নিষ্প্রয়োজন, সাহস ও বুদ্ধির প্রয়োগ অনর্থক।

এই পরিস্থিতিতে বাঁধা পথে কেবল ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ও এক অনড় ব্যবস্থার মধ্যে দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়াও মানুষের আর কিছু করবার নেই। যে-অস্তিত্বার মানুষ এই সোলকর্খানার মধ্যে ঢুকেছিল তা আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত এবং এর বাইরে বের হতে আজ সে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শুধু অক্ষম নয়, স্বীয় আকাঙ্ক্ষার হাতে শুধু পুতুল নয়, আজকের মানুষ নিঃসঙ্গও বটে। নিঃসঙ্গতার অর্থ হলো বিমুক্তি। মহাত্মাজী কারাগারে অন্তরীণ থাকা কালেও মনে মনে ছিলেন দেশবাসীরই মধ্যে, আপন অস্তিত্ব বা সত্তার বাইরে একটা অস্তিত্ব বা সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই অন্তরীণতার অভাবই হলো নৈতিক নিঃসঙ্গতা। শিল্প বিপ্লবের ফলে গোটা জীবনের ছকটা এমন ভাবে ভেঙে গেল যে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন মানবিক বা স্বাভাবিক সম্পর্ক রইল না। মালিক ও মজুরের মধ্যে কোনরকম আত্মীয়তাবোধই অবাস্তব। আর মজুর যেখানে নয় জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে তার দেহ একটা আত্মাহীন পণ্যমাত্র, সেখানে মজুরে মজুরে আত্মিক সংযুক্তি থাকবেই বা কেমন করে? তদুপরি সমগ্রভাবে জীবনের টানাপোড়েন এমন বেড়ে গেছে যে এর মধ্যে নিজের মন বলে কোন পদার্থ আছে কিনা সেটাই বোঝা যায় না, মনে হয় যেন আমরা প্রত্যেকে পণ্যের আধারে পরিণত হয়েছি। শিল্প-সভ্যতায় কেউ কারও সহযোগী নয়, এমন কি মজুরও মজুরের প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগিতা অবশ্য শিল্পপতিদের মধ্যেই সবচেয়ে প্রকট, সে-পথে যে কোনও সঙ্গীই অনড়, সবাই-ই একক হতে চায়, ফলে তারা যে যার স্বার্থের খাঁপে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মন ও আত্মার প্রতিষ্ঠা চায় বটে, কিন্তু এই শ্রেণী দেখেছে, মজুর ও মালিক যে হিংস্র-নিষ্ঠুর ও পুরোপুরি বস্তুবশ জীবনসংগ্রামে লিপ্ত তার একমাত্র তাৎপর্য পুঁজির জন্যে মুনাফা ও মুনাফার জন্যে পুঁজির অন্তহীন চক্র পরিক্রমা, এর ভিত্তিতে বা শীর্ষে বস্তু-বহির্ভূত কোনও কল্পনা বা সত্তা বা সত্য নেই। সুতরাং মানুষে মানুষে আদর্শগত বা মূল্যগত সঙ্গ একেবারেই মিলছে না, ফলে ঘটে আত্মিক নিঃসঙ্গতা। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি বলো তাই ধন পুঁজি,—এই হলো বেকালের মূল মন্ত্র বেকালটাকে অনায়াসেই মূল্যবোধের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের যুগ বলে বর্ণনা করা যায়। মন্ত্র জপতে জপতে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। তবু কি হুঁশ হয় বাবুদের। তাই ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এর পরে আবার তৃতীয়

মহাযুদ্ধ বাধবে কিনা কে জানে। আর যদি বলা যায় যে মানুষ যুদ্ধের ধরন পালটেছে তা হলে তো যে মানুষ যুদ্ধ বর্তমানে চলছে তাকেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ বলে অভিহিত করা যায়। বস্তু সভ্যতা মানুষের আপন আকাঙ্ক্ষারই সৃষ্টি। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আর তার স্রষ্টাকে মানছে না। বরং মানুষ আজ তারই হাতে-গড়া যন্ত্র-দানবের হাতেই পরাধীন।

উনবিংশ শতাব্দী রেলগাড়ীর যুগ। এই রেলগাড়ীতে চড়ে সারারাত সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে একটি শতাব্দী অতিবাহিত করা হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালে রেলগাড়ী প্রতীচ্যকে এক অজানা ষ্টেশনে এনে নামিয়ে দেয়। বিশ শতকের ভোরবেলাকার আলোতে এই নতুন দেশের রূপ যখন আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে শুরু করল তখন সারারাত ধরে মানুষ যত আশা করেছিল যত স্বপ্ন দেখেছিল সব একে একে ভেঙে পড়ল ধুলোতে। এই কি সেই 'সব পেয়েছির দেশ'। নাকি এটা সব-হারানোর দেশ! প্রেম, মানবতা, মানুষ, স্বাধীনতা, নিশ্চয়তার শান্তি—সব কিছু ষ্টেশনের চেকারবাবুর হাতে সমর্পণ করে ঢোকা গেল এই নতুন জগতে। ঢুকে মানুষের মনে হলো তার এ-অস্তিত্ব যেন একটা দুঃস্বপ্ন। হেনরী জেমস্ একেই বর্ণনা করেছেন, "a nightmare from which there is no waking save sleep."

এই সব-হারানোর দেশে মানুষের অবস্থিতিটা কী রূপ? সে শুভাশুভ ও সত্যাসত্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। তার মনন ক্লিষ্ট হয়েছে। অনুভূতি অসাড়। স্থূল জৈব অস্তিত্ব তার সম্বল। মধ্যযুগের ভগবানের মতোই এক বিরাট ও দুর্জ্ঞেয় ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির সম্মুখে তার অক্ষম অশক্ত অস্তিত্ব। কিংবা বলা যায় অন্ধকার সমুদ্রের বুকে তার জাহাজ ডুবি—কাল ইঁয়াস্পার্সের ভাষায় "Scheitern"—হয়ে যাবার ফলে সে একা ও অসহায়: চারপাশে কেবল অতল অন্তহীন অনভিজ্ঞতা অর্থহীনতা। কখনও সে হতাশাতে ভবিতব্য দ্বারা অভিভূত। আবার কখনও নিজের বার্থতায় কখনও মানবতার অপলাপে ক্ষুব্ধ ও রুদ্ধ। ব্যক্তি স্বাধীনতা এখানে নিতান্তই মামুলি অভ্যাস বোলায়েম করে হয়ত বলা যায় একটি ধনতান্ত্রিক বিলাস। এই যেশকালে যে-মানুষ বেড়ে উঠেছে সে এই যেশকালকে ঘৃণা করে বেড়ে উঠেছে, এর সংস্কার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মনের মধ্যে পুষে অথবা খোলাখুলি বিদ্রোহ করে। তার প্রিয় ঐতিহ্যের বিনাশে মর্মান্তিক বেদনায় আপ্লুত হয়েছে, এই বিনষ্টি নিয়ে নিষ্ঠুর হয়

করেছে. নিজেকেই আঘাত হেনেছে। সমাজের অভিভাবকদের হাতের নাগালে না পেয়ে গভীর অভিমানে ঘর ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, কখনও আত্মহত্যা করেছে। উপস্থিত ও বর্তমানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার কখনও যন্ত্রণাতে জর্জরিত হয়ে বিদীর্ণ হৃদয়ে আর্তনাদ করেছে। এরাই একালের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র, এরাই একালের শিল্পী, কবি ও চিত্রী, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলন : একটি পত্রিকার বিশিষ্ট ভূমিকা

শিবনারায়ণ রায়

এক

বাংলা পত্রপত্রিকায় 'রেনেসাঁস' শব্দটির প্রয়োগ অনেককাল ধরেই চোখে পড়ে। হয়ত এটা শুভ লক্ষণ, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, এদেশে এই শব্দটি যাঁরা সচরাচর ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক অর্থের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত নন। তা না হলে এক নিশ্বাসে রামমোহন এবং রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীকে ভারতীয় রেনেসাঁসের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে তাঁদের নিশ্চয়ই বাধত। সততা, উদ্যম অথবা সংগঠনশক্তি যতই প্রশংসনীয় কর্ম হোক না কেন, এগুলি রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণ নয়। পশ্চিমের ইতিহাসে লুথার কিংবা ক্যালভিনকে কেউ রেনেসাঁসের প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করেন না। বরং গোয়েটের ভাষায় বলা যায়, লুথারের প্রচণ্ড প্রভাব জার্মান রেনেসাঁসকে কয়েকশ' বছর পিছিয়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমীরেনেসাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য কী, তা নিয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য, লেখকের "মৌমাছিতন্ত্র" গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ : "চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র", পৃঃ ১১৩—১৫২)। রেনেসাঁসের দ্বিতীয় দিকে ইয়োরোপে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ গড়ে ওঠে, যাকে এককথায় বলা হয় হিউম্যানিজম। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে এই জীবনবোধের প্রভাব আমাদের দেশেও পড়তে থাকে, প্রথমে বাংলা দেশে, তারপর মহারাষ্ট্রে, এবং তারপর উত্তর এবং দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে। যদি কোনো ঘটনা এবং তারিখ দিয়ে ভারতীয় রেনেসাঁসের সূচনা চিহ্নিত করতে হয়, তবে সেই ঘটনাটি বোধ হয় কোলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং সেই তারিখটি হোল ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৮৪। সোসাইটির প্রথম সভাপতি উইলিয়ম জোন্স্-এর ভাষায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। এটাই রেনেসাঁসের মূল কথা। গুরুবাক্য, দৈববাণী, শাস্ত্রীয় নির্দেশ কিম্বা অভ্যস্ত

ধারণার আশ্রয় নেওয়ার বদলে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণ, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান। দর্শনের কেন্দ্র থেকে ঈশ্বরকে ক্রমে হটিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতিষ্ঠা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইহজগতে ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়াও রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং বিচিত্র সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ রেনেসাঁসের অন্যতম মূল সাধনা। এর জন্য একদিকে দরকার বুদ্ধির মার্জনা, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমতাসাধন, বাহ্য উপাদানকে নিজের ইচ্ছার শাসনে আনবার ক্ষমতা বৃদ্ধি। অন্যদিকে চাই ভোগের সম্পদ বাড়ানো, সেই সম্পদ-সম্ভোগের সুযোগ সকলের জীবনে এনে দেওয়া, তার পথে যে সব বাধা আছে তার অপসারণ। অতীতের জঞ্জালের নীচে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে চাপা না দিয়ে অতীত সংস্কৃতির যেটুকু ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করতে সক্ষম রেনেসাঁস তারই পুনরুদ্ধার এবং স্বীকরণে আগ্রহী। তেমনি সাংস্কৃতিক সম্পদ বাড়াবার প্রয়োজনে রেনেসাঁসী মন নিজের দেশ এবং জাতির গণ্ডী পেরিয়ে সারা জগত থেকেই পুষ্টির উপাদান সংগ্রহে অধ্যবসায়ী।

পশ্চিম থেকে আগত এই জীবনবোধ উনিশ শতক ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ায়। বাংলা দেশে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, এবং মহারাষ্ট্রে লোকহিতবাদী, আগরকর, ফুলে প্রমুখ মনীষীরা এই নবীন জীবনবোধকে তাঁদের জীবনে এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিস্ফুট করে তোলেন। তাঁদের সেই উদাহরণ এবং চেষ্টা না থাকলে ভারতবর্ষে আজ সেকুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হোত না। এই নতুন জীবনবোধের তাগিদে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব এবং পরিপুষ্টি ঘটে; কাব্যের এবং কাহিনীর ঐতিহ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়; সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে নানারকম সংস্কারের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ, এবং প্রকৃতি, সমাজ ও সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে কৌতূহল প্রবল না হয়ে উঠলে কখোপ-কথনের ভাষা গদ্যসাহিত্যের ভাষায় বিকাশলাভ করে না। অন্যপক্ষে ব্যক্তির স্বকীয়তার উপলব্ধি থেকেই আধুনিক কবিতা, নাটক, ছোটগল্প এবং উপন্যাসের জন্ম। এবং আজ যে এদেশে মোটামুটিভাবে স্ত্রীপুরুষ, বর্ণ বিত্ত, অথবা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মৌলিক মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শ গৃহীত হয়েছে, তার মূল উৎস গীতা, মহাভারত, মনুসংহিতা অথবা অর্থশাস্ত্র নয়, একান্ত

আবেই তার কারণ হোল ইংরেজি শিক্ষা মারফৎ এদেশের শিক্ষিতজনের ওপরে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রের প্রভাব।

দুই

এখন ইয়োরোপের রেনেসাঁসের প্রসারের পথে কম প্রতিবন্ধক দেখা দেয়নি। রেনেসাঁসের পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল রিফর্মেশন. হেলেনিক ঐতিহ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করান হয়েছিল বাইবেলকে। আমাদের দেশেও রেনেসাঁসের প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে; পশ্চিমের তুলনায় আমাদের দেশে সেই বাধার শক্তি বরং অনেক বেশী প্রবল এবং দৃঢ়মূল। নবা ইয়োরোপের পরে গ্রীসের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া যত সহজ ছিল, আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে ইয়োরোপের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া এত সহজ ছিল না। প্রথম সমস্যা হোল ঐতিহ্যগত ব্যবধান; কিন্তু তার চাইতেও বড় বাধা ছিল বিজয়ীর সঙ্গে বিজিতের সম্পর্ক। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এদেশে বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু হয়ে ওঠে জাতীয় স্বাধীনতা। পশ্চিমী ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে জাতীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ এদেশে প্রবল হোত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঐ আগ্রহ যতই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল, ততই আমরা পশ্চিম থেকে আগত মানবতন্ত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে শুরু করলাম। তাছাড়া বিদেশীর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজন ঘটল। এ দেশের সাধারণ মানুষ গ্রামে বাস করে; তারা পুরোনো আচার বিচারে অভ্যস্ত; পুঁজির চাইতে অক্ষবিশ্বাস. ব্যক্তির চাইতে গোষ্ঠিকে তারা অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। ফলে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ পশ্চিম থেকে আগত নবীন ভাবধারাকে পরিহার করে ক্রমেই স্বদেশীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সমর্থক হয়ে ওঠে। বিদেশের ঠাকুরের চাইতে দেশের কুকুরও ভাল। এই ধারণা শিক্ষিতদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রামমোহন বিদ্যাসাগরের পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তারা দয়ানন্দ-বিবেকানন্দের বিকল্পে আশ্রয় খোঁজে। আগরকরকে হটিয়ে দিয়ে মহারাষ্ট্রের নেতা হোয়ে ওঠেন তিলক। বিশ শতকের ভারতবর্ষে রেনেসাঁস-বিরোধী এই আন্দোলনের প্রধান তিন নেতা হলেন গান্ধী, জিন্না এবং সুভাষচন্দ্র বসু।

কিন্তু রেনেসাঁস-বিরোধী আন্দোলন যতই প্রবল হয়ে উঠুক, এদেশে রেনেসাঁসের প্রয়োজন শেষতে কিছু কমে যায় নি। এক জাতি, এক ঐতিহ্য, এক নেতা, এই বুলির জোরে বিদেশীর সঙ্গে হয়ত লড়া যায়। কিন্তু দেশের সর্বসাধারণের বিকাশ সম্ভবপর হয় না। দেশের স্বাধীনতার অর্থ যদি দেশের সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়, তাহলে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সমাজ-ব্যবস্থাতে আঁকড়ে ধরে সেই বিকাশের ব্যবস্থা করা একেবারেই অসম্ভব। তার জন্যে দরকার রেনেসাঁস, এবং রেনেসাঁসের জন্য দরকার আধুনিক সংস্কৃতির স্বীকরণ। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, বর্তমান শতকে তাঁরাই রামমোহন-আগরকরের যথার্থ উত্তরসূরী। জাতীয় ঐতিহ্যের নানা উপাদানের মধ্যে যেগুলি যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ঐহিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি মানবতন্ত্রী আদর্শের সমর্থক, তাদের পুনরাধিকার এবং জনচেতনায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তার চাইতেও বড় দায়িত্ব হোল জাত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর সব দেশ এবং কাল থেকে মানুষের বিকাশের উপযোগী বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ করে এদেশের মানস-উজ্জীবনকে বলিষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ করে তোলা। বিশ শতকের ভারতবর্ষে এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যজন মানবেন্দ্রনাথ রায়।

তিন

মানবেন্দ্রনাথের কর্ম জীবন তিন মহাদেশে বিস্তৃত। তাঁর প্রথম বই ছাপা হয় মেক্সিকোতে ১৯১৭ সালে এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলীর একটা বড় অংশ এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। রুশ, জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিস্ এবং ইংরেজী, পাঁচটি ভাষায় লেখা তাঁর শতাধিক গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাপা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো গ্রন্থাগারে সেগুলি একত্রে সংগৃহীত হয়নি। তাছাড়া প্রায় দু'বছর জেলে বসে তিনি ৩০০০ পৃষ্ঠার যে বিরাট পাণ্ডুলিপি রচনা করেন সেটি আজো ছাপা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে তাঁর কর্মজীবন অথবা তাঁর জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আপাতত আমাদের সাধ্যাতীত। এখানে শুধু "ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া" এবং "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট" পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এদেশের মানস উজ্জীবনে কী দান করেছিলেন তার কিছু সামান্য আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ বাংলাদেশে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন। ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে (১৯১৫) তিনি এদেশ থেকে পালিয়ে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং তারপর মেক্সিকোতে (১৯১৭) আশ্রয় নেন। এখানে এসে তিনি হিন্দু স্বাজাত্যবাদ ত্যাগ করেন এবং মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২০ সালে লেনিনের আমন্ত্রণে তিনি মস্কো যান এবং পরবর্তী আট বছর কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৮ সালে ষ্টালিনের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। এবং ফলে কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৩০ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং তারপর ছ বছর কারাভোগের পর ১৯৩৬ সালের শেষ ভাগে তিনি প্রকাশ্যভাবে আবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তাঁর সম্পাদনায় "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৯ সালের ৩রা এপ্রিল পত্রিকার নাম বদলে রাখা হয় "দি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট।" তখন থেকে এতাবৎকাল ঐ পত্রিকা সেযোক্ত নামেই প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'র মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ এদেশে যে জীবন দর্শনের প্রস্তাবনা করেন গোড়া থেকেই তাকে র‍্যাডিক্যালিজম্ নামে অভিহিত করা হয়। র‍্যাডিক্যাল, কারণ মন থেকে বিচার এবং আমূল রূপান্তর এই জীবন দর্শনের স্বীকৃত আদর্শ। মানবেন্দ্রনাথের মতে জাতীয় স্বাধীনতা তখনি সার্থক যখন তা ব্যক্তির জীবনেও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তির বিকাশের পথে বিভিন্ন বাধাকে দূর করে তার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল সম্ভাবনারাশিকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়াই হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ উদ্দেশ্য। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন একদিকে ব্যক্তির মনে স্বাধীন চিন্তার সামর্থ্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে দেশব্যাপী সক্রিয় এবং সচেতন গণতান্ত্রিক সংগঠন। স্বাধীনতার পথে বিদেশী শাসন ব্যবস্থা যেমন অন্যতম প্রধান বাধা তেমনি আর এক বড় বাধা হলো এই দেশের যুক্তি-বিমুখ বিকাশ-বিমুখ প্রাচীন সমাজ সংস্কৃতি। প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করতে হলে যেমন বিদেশী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে হবে তেমনি তারি সঙ্গে এদেশের অভ্যাসাশ্রয়ী, ভাবনিষ্ঠ, আজ্ঞা-বিরোধী, অন্ধবিশ্বাসপরায়ণ, শাস্ত্রনির্ভর সমাজ সংস্কৃতিকেও মূল থেকে উপড়ে

ফেলতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতাকে যদি ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থি মেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ্য কর্তব্য জনসাধারণের মনে বৈজ্ঞানিক এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্বোধন। মানবেন্দ্রনাথ এই উদ্বোধনের নামকরণ করেছেন ভারতীয় রেনেসাঁস।

এখন এই রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হলে বর্তমান যুগে যে সব ভাবধারা এবং সংগঠিত উদ্যোগ যুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী, তাদের প্রকৃত রূপ দেশবাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করা দরকার। তিরিশের দশকে পশ্চিমে রেনেসাঁস বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ছিল ফ্যাসিজম্; "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া"তে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ফ্যাসিজম্-এর ভয়াবহ স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মধ্যে রেনেসাঁস বিরোধী আন্দোলন তৎকালে কম প্রবল ছিল না। এর দুই শাখার দুই প্রধান প্রবর্তক ছিলেন গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র। গান্ধী যুক্তির জায়গায় অন্ধবিশ্বাসকে বিজ্ঞানের জায়গায় ধর্মকে, সর্বাঙ্গীন বিকাশের জায়গায় আত্মনিগ্রহকে, ঐহিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গায় পারলৌকিক পরমার্থকে, বিশ্বনাগরিকতার জায়গায় জাতীয়তাকে, ব্যক্তি স্বাধীনতার জায়গায় গোষ্ঠির প্রতি আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারণের মানস উজ্জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেও গান্ধীর প্রভাব কমাতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবেই পশ্চিমী ফ্যাসিজম্-এর অনুপ্রেরণায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে মানবেন্দ্রনাথকে বার বার গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের মতবাদ ও কার্যকলাপের কঠিন সমালোচনা করতে হয়েছে। এই সমালোচনার মূল সূত্র রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা ব্যাপক অর্থে দার্শনিক। সুভাষচন্দ্রের গোষ্ঠিবাদী সামরিক আনুগত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি উপস্থিত করেছেন গণতান্ত্রিক সমবায়ী জীবনযাত্রার আদর্শ। গান্ধীর নিগ্রহপন্থী, বিজ্ঞান-বিরোধী মৌমাছিতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকল্পরূপে তিনি প্রস্তাব করেছেন মুমিত ভোগবাদের আদর্শ, যুক্তির দ্বারা পরিচালিত জীবন, ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ, এক কথায় বৈজ্ঞানিক মানবতন্ত্র। দারিদ্র্যের মধ্যে পুণ্যের সন্ধান না করে সম্পদের বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টনের দ্বারা সকলের আত্মপ্রকাশের সুযোগ বাড়ানো তাঁর বিচারে সুস্থ সমাজের লক্ষণ। আনুগত্যের বদলে অনুসন্ধান। ঈশ্বরের অনুগ্রহের

ওপরে নির্ভর করার পরিবর্তে মানুষের সৃষ্টিশীল কল্পনা এবং প্রচেষ্টার সামর্থ্যে আস্থা—এটিই তাঁর দর্শনের মূল প্রত্যয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে ফাসিস্ট বাহিনীর পতন ঘটে এবং পুরোনো সাম্রাজ্যবাদগুলি দ্রুত ভেঙে পড়ে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে এবং এশিয়াতে আরেক ধরনের জুলুমতন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে: কমুনিজম্ যে ফ্যাসিজম্ এর আরেকটি রূপ মাত্র এটি আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। মানবেন্দ্রনাথ বহু যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে কমুনিজম্-এর প্রকৃত স্বরূপ হোল গোষ্ঠির কাছে ব্যক্তিকে বলিদান, কেন্দ্রিভূত ক্ষমতার সাহায্যে দাসব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যুক্তিকে অন্ধ বিশ্বাসের ঘরে পর্যবসিত করা, ব্যক্তিগত বিবেকের বিলোপ সাধন, এবং সৃজন প্রেরণার উচ্ছেদ। এদিকে কিন্তু স্বাধীন ভারতেও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী অনেকগুলি ধারা ক্রমে প্রকট হতে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ এই বিপদের দিকেও বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পত্রিকার নাম আর "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া" রাখা যুক্তি-যুক্ত ঠেকে না। যে জীবনদর্শন এই পত্রিকার মূল অনুপ্রেরণা তারি ভিত্তিতে পত্রিকার নতুন নাম করা হয় "দি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট।" এই পত্রিকার মারফৎ মানবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা বিচার করে দেখান যে শুধু ভারত-বর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর সার্থক পুনর্গঠন মানবতন্ত্রের ভিত্তিতেই মাত্র সম্ভব। মানবতন্ত্রের মূল প্রত্যয়গুলিকে তাঁরা বাইশটি সূত্রের আকারে উপস্থিত করেন। আধুনিক সমাজের সব চাইতে বড় সমস্যা হোল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতা যতই কেন্দ্রীভূত হয়, ততই সাধারণ মানুষের স্বাধীন বিকাশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তির মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বিচারের সামর্থ্য এবং সমবায়ী সংগঠনের প্রয়াসকে শক্তিশালী করে তুললেই ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভবপর। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের এটিই হোল বিশিষ্ট কর্মপন্থা।

চার

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট ভাবধারা এদেশে কতগুলি প্রত্যক্ষ ফলতে পেরেছে, এখনি তার হিসেব করা অসম্ভব। তবে একথা বোধহয় বলা যায় যে দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রের দ্রুত ক্ষমতাবৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে অনেকে যে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছেন, তার কিছুটা কৃতিত্ব বোধহয় "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট" পত্রিকার

প্রাপ্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদ আজো প্রবল বটে, কিন্তু সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও সম্প্রতিকলে যে এদেশে প্রসার লাভ করেছে এটা অস্বীকার করা যায় না। এ ব্যাপারেও উক্ত পত্রিকার একটা বড় অংশ আছে। অপর পক্ষে কম্যুনিষ্ট মতবাদ এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ যে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী, শিক্ষিত জনে এই চেতনার উদ্বোধনে উক্ত পত্রিকার দান কম নয়। তাহারা বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ছাড়া যে ভারতের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভবপর নয়, শুধুমাত্র দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকার অর্থ যে আত্মিক মৃত্যু, বিশ্বনাগরিক মানবতন্ত্রের এই মূল প্রত্যয়টিকে বুদ্ধিজীবীদের মননে গত পঁচিশ বছর ধরে উপস্থিত রাখার দায়িত্ব এই পত্রিকা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে, তা বোধহয় তুলনাহীন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া' অথবা 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' কখনো প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু যে ভাবান্দোলন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশে সম্ভবপর করেছে, তাতে তার দান নগণ্য নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের যায়গায় বস্তুনিষ্ঠাকে, টাইপের বদলে ব্যক্তিকে, অতিন্দ্রিয়ের বদলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে, ঐতিহ্যের চাইতে উদ্ভাবনা এবং পরীক্ষানিরীক্ষাকে, উদ্ভাবনের বদলে গাঢ় এবং তীব্র অনুভূতিকে, গদগদ এবং অস্বচ্ছ ভাষার বদলে দৃঢ়বদ্ধ, অর্থবহ এবং সুগঠিত ভাষাকে, রূপমুগ্ধ তৃপ্তির বদলে বিশ্বনাগরিক কৌতূহলকে প্রাধান্য দিয়ে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন এদেশের নব্য সাহিত্যিকদের ওপরে পরোক্ষভাবে কম প্রভাব ফেলেনি। এটা অন্তত আমার কাছে মোটেই আকস্মিক ঠেকে না যে আধুনিক বাঙালী কবি এবং ভাবুকদের মধ্যে যে প্রতিভাধর ব্যক্তিটির সঙ্গে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সবচাইতে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তিনি হচ্ছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাছাড়া এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং পাঠকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমার বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই সাহিত্যকর্মের মধ্যে যে বিশিষ্ট গুণগুলি কম বেশী চোখে পড়ে সেগুলির জন্য তাঁরা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট জীবনদর্শনের কাছে অনেকখানি ঋণী।

প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখ করেছিলাম এই পত্রিকার পরিপ্রেক্ষিত বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, কোলকাতা থেকে বম্বে, ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই গত পঁচিশ বছর ধরে এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং

পাঠক বর্তমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব নব্য মানবতন্ত্রী আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে এই পত্রিকার যোগ অন্তরঙ্গ। ১৯৪২ সালে আমস্টারডাম শহরে এশিয়া, ইয়োরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবতন্ত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টায় ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিষ্ট অ্যাণ্ড এথিক্যাল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন উক্ত আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। সম্প্রতিকালে মানবতন্ত্রের মুখপ্রবক্তা রূপে যে সব মনীষী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, তাঁরা প্রায় সকলেই "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট" পত্রিকার লেখক এবং পাঠক। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জুলিয়ন হাক্সলি, এরিখ ফ্রোম, মরিস গীনবার্গ, হেম আর্, কলিন লামন্ট, কান প্রাগ্ এবং অধ্যাপক র‍্যাকহ্যাম এদেশে সুপরিচিত। অর্থাৎ বিশ্বনাগরিকতা এই পত্রিকার আদর্শ মাত্র নয়, এই পত্রিকার ইতিহাস এবং জিয়াকলাপ উক্ত আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা চিহ্নিত।

কবিতাবলী

মনীশ ঘটক

প্রশ্ন

চাঁদে কি মানুষ আছে ?
তারাও কি তোমার আমার মতন
শুধুমাত্র জন্মমৃত্যু পরিধিতে বাঁচে
যতক্ষণ বেঁচে থাকে দেখে শুধু সোনার স্বপন ?

ভূগোলে যে সব কটি গ্রহতারকার কথা আছে
সব কটি ঘুরে এসে
শুধু বলে যাও হেসে
ছোটো মাটি পুরোনো এ পৃথিবীর কাছে
তারা কি অনেকগুণ বড়ো ?

জড়োসড়ো
জীবনের মস্তিষ্যাও সব কটা খুলে
হোমোস্যাপিয়েন্স দাও র‍্যকেটে উর্ধ্বে তুলে
দেখো দেখো পাও কিনা
বামুর্ষের নতুন ইশারা,
বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধে ত্রিলোভমার স্তন পীনা,
নিয়ান্ডের বজ্রহাস্তে অসীমের হারানো দিশারা ?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দশী

হরিণীনীলনয়না রে,
কী হবে তোর নাম শুধিয়ে ?
এখনিতে বুক শুকিয়ে যায়
যখন চলিস্ রাস্তা দিয়ে ॥

অরুণ ভট্টাচার্য

ভয়ঙ্কর মুখের চিত্র

আমি ঘুমোতে পারছি না সারারাত
সারারাত আমি তোমার মুখ দেখলুম
নরম জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতায় স্থির
আমি ঘুমোতে পারিনি সারারাত।

আমি স্বপ্ন দেখতে পারছি না সারারাত
সারারাত আমি তোমার মুখ দেখলুম
কুৎসিত কালো ভয়ঙ্কর চিহ্ন সেখানে
আমি স্বপ্ন দেখতে পারিনি সারারাত।

আমি ঘুমোতে পারিনি। যেহেতু দেখেছি
তোমার উজ্জ্বলতর মুখশ্রী। আমি স্বপ্ন দেখিনি
তবুও দেখেছি তোমার কুৎসিত ভয়ঙ্কর মুখের চিত্র।
তুমি কাছে এসোনা আর। এসোনা, তাহলে
আমি নিশ্চিত এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে,
আমাদের অহঙ্কারের দুঃস্বপ্নে ডুবে যাবো, ডুবে যাবো।

মিহিরকুমার গুপ্ত

একটি কবিতা : কবিতা সম্পর্কে

(সমসাময়িক কোন কবির প্রতি)

কবিরা ধরুক হাল
আকাশের পুকুরে
সবুজ সোনালী পাল
কবিরা ধরুক হাল
এ সমুদ্র উত্তাল
পৃথিবীর পুকুরে
কবিরা ফেলুক জাল
আকাশের পুকুরে :

পুকুরের চারিপাশে
ঘাসদের বন নেই
আছে শুধু শিশু ঘাস
পুকুরের চারিপাশ
পৃথিবীতে বারোমাস
চাঁদের যাজন চাই
পুকুরের চারিপাশ
মানুষের বন নাই।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

অজাণে, শীতের রাতে

তুমি দাও নির্জনতা শীত
শাতাতুরা সন্ধ্যার কুয়াশা
জ্যোৎস্নায় শাদারেণু পথে
ফাঁকা ঘরে একা ফিরে আসা—।
কুকা চাঁদের হিম, পীত
স্মৃতির শরীরে ভালোবাসা।

উত্তরসূরী

কি জানি তোমার নাম। তুমি—
অন্ধকারে অত্যন্ত একাকী।
আকাশ সমুদ্র, মরুভূমি—
তাকাব না। চোখ বুঁজে থাকি।

গুহামুখে অন্ধকার ভয়
রক্তরেখা নিঃশব্দ সোপানে
মন্ত্রগুলি মৃত্যুধ্বনিময়
দেবতারা বলি টেনে আনে।
আর নয়! প্রভু, আর নয়।

কি আদিম অরণ্য কুহাশা
ঝরা ডালে। হলুদ পাতায়
কীটের কুটিল ভালোবাসা।
ছায়ারা নিঃশব্দে আসে, যায়।

অন্ধকারে সতর্ক শরীর
আমি খুঁজি আরও অন্ধকার
গাঢ় তাপ আনব নারীর
ঘনগন্ধ সবুজ পাতার।

অসিত দত্ত

একাকী যন্ত্রণা

সকলে সুখেই আছে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে ঘরে।
জ্যামিতিক পথ হেঁটে বৈদ্যুতিক আলোর হোটেলে
সন্ধেটা কাটিয়ে আসে। বিকেলের ডাকে চিঠি এলে
ঘরে বুকে ঢেকে রাখে, পড়া যাবে রাত্রির প্রহরে।

একাকী যন্ত্রণা

সকলে সুখেই আছে নরলোকে ছুঁয়ে ঘাসে ঘাসে।
প্রেমিকার হাত ধরে পরিমিত তিনঘণ্টা সুখ
অবকাশ ভুলে রাখে সারাদিন কাজের কামুক,
সন্ধে হলে ঘোরে ফেরে ভেসে যায় কালের বাতাসে।

সকলে সুখেই আছে, জীবন আন্তিক ভাগে ভাগে :
অর্থের নিমিত্ত পড়া, যৌবনে চাকুরি, সফল অবশ্য হলে বাড়িগাড়ি,
কর্তব্য নিয়মে সুখ, বারের ওষুধ, মাসে মাসে স্ত্রী-র শাড়ি।
ক্রিকেটিয়ার এমাসে, কিন্তু পুজোয় আরামবাগে।
দুঃখ শোক অবসাদ নিয়ে তুমি মূঢ় অবাস্তিক,
নির্বোধ শিল্পীর মতো পোড়, যন্ত্রটা অমানুষিক।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

ব্যস্ত চড়ুই

কবিতা আমার ক্ষমা, আমার প্রথম ভালবাসা :
আমাকে শিখিয়ে দিল। পাখীদের গল্পগুচ্ছ ঘুরে,
দূর কোলেঝোপে গাঢ় আসর বসতো দেখ আছে।

সূর্যের বর্ণনা ক্লান্ত, নিবিকার মেঘের অরণ্যে।
শেষবেলাকার দুঃখে অন্যমনা ঘনিষ্ট বৃক্ষেরা
জলে জলছবি হয়। এই সব স্নিগ্ধ গল্প ফেলে
চড়ুই তখন ব্যস্ত চারিদিকে খড়কুটো নিয়ে।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

রাজনীতি

আমার বন্ধুকে তুমি কোথায় ডাকছ অন্ধকারে
কোথায় চলেছ নিয়ে অদৃশ্য পলকে
আমার বন্ধুকে তুমি কোথায় ডাকছ বনস্পতি !

হে চতুর, প্রেমিক বৈষ্ণব,
আমার বন্ধুকে দূরে রাখো,
বিপুল বিভূতি নিয়ে পরমায় তোমে সুখ থাকো
মুক্ত রেখে আমার বন্ধুকে।

কি করে আকাশ মাটি তোমার মুঠোয় বন্দী—
মনে করো,
কি করে প্রতিটি প্রাণী তোমার স্পর্ধায় বেঁচে—
মনে করো,
কি করে পৃথিবী আজো বেঁচে আছে তোমার খেয়ালে—
মনে করো ;
ঈশ্বর জানেন।
বড় অসহায় আমি তোমার কৃপায়—
বড় অসহায় আজ তোমার স্পর্ধায় ;

কোন সম্পর্কই থাক্,—চাইনি কখনো ;
তোমার পশ্চাতে কিংবা সম্মুখে বা পাশে
আমরা থাকিত নই।—ভিন্ন পথে মুক্ত বিহঙ্গেরা।
তাহলে লাঞ্ছিত কেন দুর্গত সহজ মানুষেরা,
কেন জর্জরিত হয় তোমার অসাধ্য কৌতুকে।
আমরা কখনো ক্ষমা করব না।
তোমাকে কঠিন দূরে রাখলাম চতুর প্রেমিক !

তোমার লোলুপ পাঞ্জা, সাপের কঠিন পেশী
দূরে রাখো।
কী দুর্গন্ধ তোমার শরীরে
প্রতি রোমকূপে পচা ; হাজার নোংরামি পদে পদে ;
এর মধ্যে আমার বন্ধুকে কেন অহেতুক !
তোমার নিকটে গেলে হাত-পা কুঁচকে আসে,
ঘী-ঘী করে ঘৃণায় শরীর।

তুমি তো জানো না,
তোমার শরীর করা আতর ছাপিয়ে
আমার এই তোতা নাকে
কুৎসিত ক্ষতের গন্ধটাই
তীব্র করে তোলে।

অথচ, তবুও
আমার বন্ধুকে তুমি সহজে ভুলিয়ে তিলে তিলে
বিষাক্ত করছো।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

হাওয়া

(শ্রীযুতনারায়ণ চক্রবর্তী, বন্ধুবরেষু)

ইচ্ছে করছে আমিও ওই দীর্ঘ স্তব্ধতা ভেঙে হাওয়ার চাকলো নিজ কণ্ঠ দিই।
আখো না হাওয়ার রক্তে কী বিচিত্র উদ্দামতা, আমাদের শহরে বিলাস
যতদূর দৃষ্টি যায় নেইকো কোনো সূত্রেও কোথাও ;
আমারও ইচ্ছে করছে উল্লসিত দু'বাহু বাড়িয়ে উচ্চকিত হাওয়ার মধ্য হই,
শুধু হাওয়া
হা-হা করছে ; কেউ মানা করছে না
ভালবাসছি ভালবাসছি।

না কেউ বকছে না ঐ হাওয়াকেও, কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না
ওরা কী উদ্দাম কী চঞ্চল কী যৌবনবতী হাসছে শুধু ;
হাসছে খেলছে দুলছে শুধু ; বাইরের অঙ্গে আশ্চর্য কী নেশা,—
হা-হা করছে ; কেমন স্তব্ধতা ভেঙে গান গাইছে অশরীরী স্তব্ধতা অথচ
রৌদ্রে কী অসীমমায়া কল্পনাঘন সামুদ্রিক চোখ

কি দেখছে কী দেখছে দেখছি ; দেখছি দেখছি
ইচ্ছে করছে আমিও ওই দার্ঘ স্তব্ধতা ভেঙে হাওয়ার চাঞ্চল্যে নিজ কণ্ঠ দিই
কাউয়ের শাখায় নূতো মত্ত হই অরণ্যের চিৎকার উল্লাসে ;
রৌদ্রে কী অসীমব্যাপ্ত কল্পনাঘন সামুদ্রিক চোখ
দেখেও হাওয়ার লীলা, হা-হা করছে চতুর্দিকে, নৈঃশব্দ্য চূর্ণ করছে
আমারও ইচ্ছে করছে উন্নসিত দু'বাহু বাড়িয়ে উচ্ছকিত হাওয়ার আনন্দে
নিজেকে ছড়িয়ে দিই, হাওয়ার জড়িয়ে পড়ি, কণ্ঠ দিই ;
মুক্তবদ্ধ হাওয়াকে কেউ তর্জনী তুলে মানা করছে বলে ঐ হাওয়াকে ভালবাসছি
ভালবাসছি ভালবাসছি ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রেমিকেরা চিরকাল বালকস্বভাবী

অনুরাগিণীর কাছে প্রেমিকেরা চিরকাল বালকস্বভাবী ;
অটিকা-সম্ভোগে চূর্ণ সোত থেকে তিনি হাঙরের
নখদন্ত চিহ্ন শোভিত দেহকে দোলার মতন
সাহসিকা রমণীরা কোল দেয়। অর্ধ মূর্ছাস্ফুট
শোনিতে, ভ্রাবিত ওষ্ঠ, বিরাট বক্ষের পাটাতন
রোমাকীর্ণ জানুস্তম্ভ ক্ষতে পাংশু—এই সব কিছু
কামিনীরা বুকে তুলে নিতে পারে স্বযোনিজ সন্তানের মত।

বা এমনও হতে পারে পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
কামার্ত পুরুষ যারা বিদেশে বাণিজ্য পাট ছেড়ে
বন্দরে নোঙর করে দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের শেষে
যে অকূলে মধ্যরাত্রে বসতি হঠাৎ অন্ধকার
সেখানে মার্জার-পদে চলে যায়, সেথায় নারীরা
আমাদের ভগ্নী, ভোগ্যা, সুস্বাস্থ্যাল অলসতাগুলি
মায়াঠগিনীর মত উন্মুক্ত সুজাণ কেশজালে
লক্ষ কণা নাগিনীকে সাপটে রাখে ছলে। সেই মত

প্রেমিকেরা চিরকাল বালকস্বভাবী

অনিশ্বসিত বিষকন্যা যারা কখনো মমতা
কখনো মরণ—সেই অজাগরী প্রেম খুঁজে মিক

জাগবুদ্ধি রাজপুত্র বালকস্বভাবী প্রেমিকেরা ;
যে যাক, সে যাক, আমি কোনদিন সেথায় যাবোনা।

অবশ্য ইএট্‌স্ বলেন

সুস্পষ্টতা সুগভীর নাভি, জঘন-তরঙ্গ
এ কাঙ্ক্ষনীয় কামোদ্দীপক আলিঙ্গনের
যোগ্য মূর্তি গড়তেন যদি প্রাক্সিটিলেস
তাহলেও তুমি পারতেনা ছুঁতে সে বৈভবতায়
পদ্মাকাঠাকে। কারণ তুমি ভারতবর্ষীয়
গাত্রাবে, খাজুরাহোতে এমন মূর্তি দেখোনি
প্রাকৃত অর্থে নারীমূর্তি যা। যামিনী রায়ের
তাবার এদেশে সকল মূর্তি অপ্রাকৃত
নির্ভুলভাবে সুরময়ী। এবং ইএট্‌স্
প্রায় এরকম বলেছেন : সপ্রাণ মোহিনীরা
ছেলে-ছোকরারা লুটেরা বয়রা ; তাহলে রতি
বা মারকন্যা রক্তকুমিতে মূর্তিমতী
অংগে অংগে চীৎকার করা যৌবন নিয়ে
তবু স্পষ্টত অতিমানবিক। অবশ্য আমি
এ্যানিক্যাটা কি এলুরা যাইনি, তবুও জানি
প্রমাণিত হয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব দেশজ প্রধি
শ্রীকশিল্পই অলে অম্লান প্রকৃতিপন্থী।

বিজয় কুমার দত্ত

চিত্রাবলী

একমাস বার্ষতার চিত্র এঁকে জীবনকে বাস করে যাবো—
সুখ অতি সুবস্থন, আলেয়ার আংশভাক, আর
দূরের নিষিদ্ধ দুঃখ আবেগের ম্লান গাঢ়তায়

উত্তরসূরী

কাছে আসে ; শরীরের রক্ত মাংস প্রবৃত্তির সত্তায়
একান্ত অস্থির হয়ে ওরে দেয় অন্যের যৌবন।

সবাই তৃপ্তির সুখে নিমজ্জিত মনে হয় যেন
প্রেম অর্থ সুবিশাল ঐশ্বর্যের দীপাবলী ঘিরে
আলোর উজ্জ্বল শিখা পিপাসার্ত রাত্রির শরীর
ভ'রে আছে। অস্পষ্ট ছায়ার মতো অন্ধকার কোণে
কেউ কি সবলে টানে তুলিবার কঠিন সেবণে ?
একরাশ ব্যর্থতার চিত্র এঁকে হৃদয়কে প্রণয় প্রত্যাশী
কখনো করব না জেনো। কি লাভ বুকের মাঝে ব'য়ে
কামনার নীল সাধ, স্বচ্ছলতা নিটোল আধার—
জীবনের শেষ কথা কে জেনেছে মরণের আগে ?

পবিত্রমল চক্রবর্তী

বিষণ্ণ কবিতাবলী

ভোরবেলা, তোমার মুখের ছবি কতদিন মনে পড়ছে না—
ভোরবেলা, শান্ত ভোরবেলা। অত্যন্ত নির্জন লাগে
যখন তোমাকে ভাবি। তোমার কাছে আমার কত দেনা
হয়ে আছে ! ভাবতে গেলে খুব দুঃখ লাগে ;
অনেকটা বিকেলবেলায় নদীর তীরে বসে স্বপ্ন দেখার মত
মনে হয়। সর্বনাশা ইচ্ছেগুলো জলে পুড়ে থাক্ হয়ে গেলে
ভালোবাসা, তোমার কথা মনে জাগে আর অবিরত
ব্যথা পায় এই প্রাণ বিষণ্ণ বিকেলে।

করুণ বকুলতলার দিকে আর তাকাতে পারি না।
বুকে যেন শেল বেঁধে, হে করুণাহীনা,
যখন বিস্রস্ত প্রেমে কাজল ধুয়ে চলে যায়।

আমি শুধু দূর থেকে সিক্ত মমতায়
চেয়ে চেয়ে দেখি আর দেখি ; দেখে দেখে
মুগ্ধ হই আর ভাবি : এই গাছ মনে-মনে কত স্মৃতি রেখে
একদিন মিশে যাবে জীবনের ওপারের ক্লান্ত অন্ধকারে।
শুধু অনাদৃত কিছু ফুল, ছিন্ন মালা পড়ে থাকবে এধারে ওধারে ;
সেই ফুল সেই মালা সিক্ত আমি তোমার খোঁপায়
একদিন গুঁজে দিতে চাইতাম ভালোবেসে, সিক্ত মমতায়।

তোমার জাহাজে চড়ে অন্তহীন সমুদ্রের বুকে
কখনো যাবোনা আর ; ও জাহাজ ডুবে যাবে জানি—
যে সব নাবিক আছো ও জাহাজে মত্ত আছে সুখে
তাদের করুণা করি, ওরা সব দুঃখের সন্তানী।

তোমাকে তো চিনতাম জীবনের দ্বিতীয়াহ্ন হ'তে
যখন নিজেকে ভুলে খেলা করতে, আহ্লাদের ঢেকে
না চড়েই হেসে উঠতে কৈশোরের আনন্দ ও সুখে।

অথচ আশ্চর্য। তুমি যৌবনের বাঁকা রাজপথে
হাঁটো আজ, ভুলে গেছো কার সাথে খেলতে ধুলো মেখে।
তোমার জাহাজে চড়ে কখনো যাবো না আর কূলহীন সমুদ্রের বুকে॥

শান্তি লাহিড়ী

চতুর্দিক. সাতাশ বছরে

চতুর্দিক খোলা, ওই, দূরে ওই কদম বিথীকা
ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, চতুর্দিকে জানালার শত
জ্যোৎস্নার আলোকে আমি—প্রতীক্ষার দারুণ রজনী,
উত্তরে বাতাস আসবে কদম বিথীকা ছুঁয়ে—কদম বিথীকা।

সম্রাটের হৃৎপিণ্ড দিবারাত্র আমার শোণিতে
আর, তারি পাশাপাশি স্পন্দিত রয়েছে আমি বেঁচে,
জ্যোৎস্নার আলোকে আমি উদ্ভাসিত আশ্চর্য সংরাগে—
কুটিল ব্যাধির চিহ্ন আলোর আড়ালে। আলোহীন
কে বেঁচেছে? চতুর্দিক এ পৃথিবী বর্ণালী মেশানো,
একটু আলোর খুশি, অন্ধকারে একটু বেদনা
এখানে কয়েকটা রাত পাশাপাশি ঘুমিয়ে কাটানো,
অবশেষে দু-চোখের মণিগুটো অন্ধ হয়ে যাক্।
আঙুরের গুচ্ছ গুচ্ছ ঝুলন্ত লতার ফাঁকে ফাঁকে
সেখানে মদের ক্লান্ত রাত। আমি সকালে উৎসাহে
আনন্দে আঙুর ছিঁড়ে খেতে খেতে কখনো তাকিনি
আঙুরে যোতল ভরে মদ খাবো, বাইজী নাচবে।
মাঠের শালিচাষির সোনালী গালিচা, এক হৃত
রাজত্বের খোঁজে রাজপুত্র, এক হৃত প্রেয়সীর
বক্ষলগ্ন নিদ্রাহীন রাত্রের স্খলিত ছায়াময়,
এ পৃথিবী ছবিময়, সঙ্গীতের আলাপের মত
অজস্র সুরের। শুধু পাঞ্জাবীর নিচেই হৃদয়
কাঁপছে তখন থেকে, সম্রাটের মত কত দুর্জয় ক্ষমতা,
প্রেয়সীর মধুকরী আমাকে মানিক এনে দেবে।
দূরে ওই নীলসাথে সকাল কি করুণ মমতা।
এখানে বিজনে কিছুক্ষণ
এসো, বসে আলোচনা করি—
দেখি কি পেলাম আমরা, আর কত অনাদায়ী আছে,
ওইতো অদূরে তরা সব
জন্ম নিচ্ছে, লাল নীল সবুজ বেগুনী—
ওইতো খেলার মাঠে, জানে না কি করুণ মমতা।
চতুর্দিকে জন্ম মৃত্যু, তার মাঝে অবিচল দিবস-রজনী
এখানে আঙুর বসে দ্রাক্ষা নিংড়ে মদের পেয়ালা
ভরে ঠোঁটে তুলে নিচ্ছি, জানি ওই আরোগ্য নিবাসে

চতুর্দিক, সাতাশ বছরে

যে বন্ধু সুদীর্ঘকাল সূর্য তারা কিছুই দেখেনি—
শুধু তার করতলে কিছু রেখা অপরিচিত।
শুধু তার শরীরে মমতা।
প্রত্যহ বিকেল হলে বন্ধুদের হাত থেকে আঙুরের থল
যদের মতন খায়, এবং নিজেকে ঘুম পাড়ায় সে হাত জেগে জেগে।
আমি কি অব্যর্থ সত্যে পৌঁছে যাব, এই ভেবে ভেবে
ভুল গায়ে জল দিইনে। প্রতিবাদে দুর্জয় সাহস
কোথায় হারিয়ে ফেলি আর রোজ রোজ
সন্ধ্যায় একেলা ঘরে ঘরে থেকে বন্ধুদের দিয়ে যেতে হয়।
কি অজ্ঞান নিপুণতা সত্যে শিবে, কি মূঢ় কানন!
আমি কি নিপুণ হয়ে দৃঢ় হাতে জানালার কাচ
বন্ধ করে বসে আছি, উত্তুরে বাতাস আজ সমস্ত রজনী
বাইরে কাঁদাবে, আমি কি আনন্দে ভেঙে ফেলে দেব।
বিনিদ্র রজনী, আমি শিথিল শয়নে,
সম্রাটের মত দুই হাতে
হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরে বিনিদ্র রজনী
দূরে ওই উত্তুরে বাতাসে
করুণ বিধীকা কাঁদে, সকরুণ করুণ বিধীকা।

বিনোদ বেরা

মাছ শিকার : বঙ্গোপসাগরে

বঙ্গ সমুদ্রের বুকে ছোট ডিঙি উদ্দাম ভাসিয়ে
জাল ফেলে এক মনে একটি মানুষ,
ভিন্নিক ঢেউ-এর কণা চতুর্দিকে —কৌতুকে ছোবল
বসায় জলের হিংসা ডিঙিটায়, ডিঙি ও মানুষ টলমল;

উত্তরসূরী

ভাসা মাছ, চাঁদা মাছ, সূর্যের মতন রাঙা মাছ
ধরা পড়ে জালে—কেউ ফুরধার গতির বিদ্যুতে
তীব্র চিরে নীল জল দূরতম সমুদ্রে পালায়,
বাতাসে ঝিলিক হেনে জাল ফেলে একটি মানুষ,
মাছ পড়ে ছোট বড় রূপালী-সোনালী নানা মাছ,
ডিঙিটির ছোট খোল—পাটাতন আলো করে শুয়ে
কোমল উজ্জ্বল মীন মীনাক্ষীর ভাষাহীন
নিষ্পন্ন তাকিয়ে থাকে সুগোল সুন্দর চোখ মেলে।
বিশাল জলের মাঠে একটি মানুষ মনযোগী
প্রচুর প্রহর ভরে জাল ফেলে ফেলে মাছ ধরে
উজ্জ্বল রূপালী কত লোভনীয় মাছ।

অনন্ত দাশ

বুকের ভিতর

এখন নিজের কেন্দ্রে স্থিত আছি আপন স্বভাবে
ব্যবধানে জেগে ওঠে ব্যাপ্ত এই ঘরের সুষমা
সুস্থতা কোথাও নেই, দূরে কাছে কুশল প্রস্তাবে
শুধু অবিশ্রাম জলে আত্মলীন জীবনের ক্ষমা ;
বাহিরে মুখর লোক প্রথাগত সামর্থ, সম্প্রীতি
গভীর রহস্যে তাই ফিরে যাব বুকের ভিতর
অনুরাগে আকাশনে ঐ দেখ পরোক্ষ নিশ্চিতি
হৃদয়ে সংহতি নেই, তবু আমি করেছি নির্ভর।

একান্ত নিজের মধ্যে একমাত্র নিজে অভিলাষী
উচ্ছলতা থেমে যায় তরঙ্গের বহু সুপ্ত স্বর
নিবিড় মেঘের রেখা ধরে আমি প্রণয় বিলাসী
নিগূঢ় ধ্বনিতে ঘুমো মুখরিত বুকের ভিতর ;

শিল্পিত যৌবন

কারা আসে উন্মোচনে, কারা যায় স্নিগ্ধ শুভ্রতায়
সমারোহে ডেকে নেবো, ফেলে দেবো স্রোতে, স্থিরতায়।

মৃণাল দত্ত

শিল্পিত যৌবন

পাথরে যৌবন আঁকা তার।
আমি ছুঁলে শ্রাবণ-নিশীথ
বেজে উঠবে, হে নীল আঁধার,
হোক্ তবে দৃপ্ত বিপরীত।

সতর্ক বয়স-ক্ষত নদী
বন্দী মৌন রেখায় নিটোলে ;
ডেকেছে সঙ্কেতে সে অবধি
সাড়া দেবো যৌবন ডাকলে ?

পাথরে ও শিল্পিত যৌবন
অটুট সম্মোহ। স্থির জানি
হাত দিলে নিশীথ শ্রাবণ
কেঁপে উঠবে, দীপ্ত অভিমানী।

ছুঁয়েছি জেনেই বিদ্ধ কর
অন্তরাল চোখের কিংশুক
ফোটাতে পারি না। নিরন্তর
ঝোরা ভাল মল্লিকার সুখ।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

দুপুরের যুদ্ধ

যদিও পায়রা খোঁটে চড়ুই উঠোনে যান দুপুরবেলা
অলস ছাওয়ায় বুকে মুখ ঘসে দুরন্ত জাফলং
দূরত্ব পোয়াতি ঢেকে রোদের চাদর ভারী স্বপ্নে মশগুল
মে'টা দিগম্বর শিশু একমনে সারা গায়ে মাখিতেছে ধূলা

শিয়ালি নদীর জল যদিও বহিয়া যায় অলস নিয়মে
নারিকেল ছায়া বেয়ে, বাঁশগাছ নেচে ওঠে ককির হাওয়ে
ধান কেটে নেওয়া মাঠে, আলো ও আকাশে নীল নির্জনতা জ'মে
যদিও কেবলি চায়—'জগতে শান্তি আছে'—একথা বোঝাতে—

তবুও সূর্যমুখী ম্রিয়মান হ'লে পড়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ
মৃতকামনার চিতা অজ্ঞানের তেজহীন সূর্যে জ্বলেনা ?
নিঃস্বের কান্না কি বিশ্বের বাতাসে নেই ? আপাতদৃশ
আলোর গ্রহণগুলি শেয়ালের সন্ধ্যার কবলে চলে না ?

প'ড়ে আছি আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি পরাহতে সেনা—
দুপুরের পৃথিবীতে শান্তি-অশান্তির যুদ্ধ আর যে থামে না।

মাহবুব তালুকদার

নাস্তিক বান্ধবীকে

আমার মৃত্যুর পর শুভ্রতায় দু'চোখ তোমার
শান্ত-অশ্রুলক,
এবং তোমার দেহ নির্বিকার বরফ-প্রতিমা হয় যদি :
তবে তুমি—
আরেক মৃত্যুর ছবি
আধা ঘুমে কাফনের পবিত্র শিয়রে।

নাস্তিক বান্ধবীকে

প্রার্থনার সঙ্গীতের মাঝে
না, জানি না,
সে মুহূর্তে ঈশ্বরকে মনে হবে কি না।

বিমলেন্দু মজুমদার

অরণ্য-পাহাড়

দুচোখে দূরবীণ নেই।
তবুই অরণ্যে বসে তবুও পাহাড় দেখি,
উত্তরের বিনিদ্র পাহাড়।

তিন পাহাড়ের অনন্ত উদ্গমে
উপাদের মাংসের সুঘ্রাণ;
আর পাশের জলায়, আম্বালে জনোয়ারের
পদশব্দে অরণ্যে বন্যতা আসে।

এখন শীতের শেষ।
সহসা পাহাড় জ্বলে
(যেন কারো প্রচ্ছন্ন মশালে),
কারণ ফসল-মাস অনতি-নিকট।

নিরুচ্চার মন্ত্র পড়ি আমরা সবাই
অন্ধকারে অভ্যুজ্জ্বল আমাদের চোখ;
মনে মনে সকলেই উত্তরের বিনিদ্র পাহাড়।

সাগর চক্রবর্তী

জন্মের যন্ত্রণা

(মা-কে নিবেদিত)

যাগো, ভাখ, নৈঃশব্দের অন্ধকার গুহাগর্ভ থেকে
উঠে আসে হিংস্রতার দাবী করে শরিকানা, আর
প্রাগৈতিহাসিক কাল অবয়বী বর্তমান হয় :
আমার মৌলিক ইচ্ছা রক্তহীন বাপদী আদরে !
যাগো, বলো কোন মন্ত্রে দাবীদার দৈত্যকে ঠেকাবো ॥

নিতান্ত দেউলে আমার তবস্থকে বাধা গেছে সব।
সোমত্থ যৌবন ছিল তাও দেখ খণ্ড খণ্ড আজ
অনুভূতি, রক্তমাংস, স্পর্শ, দৃশ্য, শব্দের প্রাঙ্গণ
ইচ্ছার বর্শাণী ডানা ছিঁড়ে নেবে লোভের আড়ালে
সব কেড়ে নেবে ওরা— যাগো, তবে কি নিয়ে বা ব'ব।

তুমিও তো দাবীদার, তোমাকে কি দেব অহঙ্কার ?
ভাখো সব নিয়ে যদি পারো মোছো জন্মের যন্ত্রণা ॥

বাসুদেব দেব

বিদূষকের উক্তি

পার্কের সবুজ বেঞ্চে বসে
গল্প করে চলে গেলো এক জোড়া মানুষ-মানুষী।
চেয়ার টেবিল ঘড়ি আয়না কাপ প্লেট ও আলোর
এবং খেয়েটি : অন্ধকার কমা যায় এমন আলোতে এই সব
সে গল্পের পাত্র পাত্রী। চিনেবাদামের খোসা পড়ে আছে
ব্যবহৃত শব্দের মতোন। ওরা ভালোবাসে। ছাই ভোলে।
ঐ সব শব্দগুলি ধার করে আনা, খেয়েটি সম্ভব
নেকলেসটিও চেয়ে এনেছিল, একটি সন্ধ্যার জন্যেই।

বিদূষকের উক্তি

ওরা শরীরের খেলা খেলতে খেলতে, মনের অস্ত্যাদ
মানতে মানতে, ভালোবাসতে বাসতে আমার মতোন
বুড়ো হবে। আর গভীর ঘুমে ঘুমে স্বপ্নে একটা ঝর্ণার
কল্লোল শুনবে। একবার ছুটিতে ওরা
সে ঝর্ণার কাছে সবে বেড়াতে গিয়েছিল।

রবীন্দ্র গুহ

শিশুর মুখ

দরজাটা খুলে দাও, দুঃখ যত দু'পায়ে হাঁটুক।
ভালোবাসা, তুমি কেন বৃথা ভয় পাও;
এ ঘরে অনেক আলো।

তোমার উজ্জ্বল মুখে কালো ভ্রমরের মত অগণন তিল
তারার তিমির।
তবুও বিপুল সুখ, খুশির দেয়ালি···
আমাদের বাসনার বসন্তের ফুল।

পৃথিবীতে আরো কত দুঃখ আছে, অন্ধকার ঘর,
সে ঘরে খোকন একলা, শিওল মাটিতে
ঠোঁট রেখে, গাল রেখে, ঈশ্বরের দয়ায় কাঁপছে।

বাসবী দত্ত

মুখটা সরাও তোমার

তোমার ঐ ভ্রমরের উজ্জ্বল মুখটা সরাও
আমার অনেক বাসন-কোসনের কাজ পড়ে :
আমার এই অন্ধকার মেরুপ্রদেশে

উত্তরসূরী

তোমার নিশিথ-সূর্যের মুখটা কেমন বেমানান—
শুধু বেমানান নয়
আততায়ীর গুপ্ত বর্শার মত কুটিল।

তোমার ঐ মুখে এখনও জীবনের চিহ্ন বর্তমান
পায়ে-চলা-পথে ঘাসের সবুজতায় সজীব
বনতুলসীর গন্ধের মত উদাত্ত করা হাতছানি—

আমি বসন-বাসনের ভাঁড়ারী
অপগত দুশ্চিন্তার সহচরী এখন ;
তোমার ঐ উজ্জ্বল মুখটা সন্ধ্যাত
আমি আর স্মৃতির হরিণ হবো না।

সুবোধ আচার্য

সমর্পিত প্রেম, উৎপন্ন রক্তাক্ত কবিতা

আমার মাথার ওপরে কোনো নক্ষত্রের নিবিড় সূচনা নেই আজ আর,
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঈর্ষা এখন আঁধার চরে চতুর্দিকে জলে, ব্রহ্মাণ্ডের সব
যাত্রাদল মৃত্যুর অস্থির থেকে জাত, তীব্রতম বক্ষে কোনো শব্দ নাই,
অযোধ তরঙ্গদল সহসা বিপুল শূন্য যেন কোন বাহুর নিমেষে।
আমি শেষরাত্রির আভাষ, করুণ জলের স্রোত, অনায়াস সমারোহে
নিশীথের আবেগ উচ্ছ্বাসে ঘরে শব্দ পীড়নের বিপন্ন উচ্চার,
রাত্রির সমাধি যেন দিনের কঠিন ; চিরকাল বেঁচে আছি এত বেশী প্রবঞ্চনা
লিপ্ত বক্ষমূলে, ঘনীভূত ললাটপ্রদেশে। অথচ নিকটে নাই কেহ নাই,
কেহ নাই নিঃসঙ্গ মূর্তিরে সান্ত্বনার মাটি দেয়, কেহ নাই আজ আর।

এ আমি একদা কোনো মেঘের স্তবক হয়ে এখানে এসেছি—
এখন অচেনা আমি নিজেরও নিকটে। আমার শরীর, চোখ
ঈশ্বরের পরিবর্তে মুহুর্মুহু রক্তে ঘৃণার বিষেরে আপ্লুত,

সমর্পিত প্রেম, উৎসর্গ রক্তাক্ত কবিতা

আমার শরীর বড় ছিঁড়ে যায়। আমি নীলিমায়, আকাশে
রৌদ্রে, কোনো শুভ্রতায় স্থির চোখে তাকাতে পারি না,
আমি দেবতা দেবতা বলে ডাকতে পারি না, আর ঈশ্বর
চোখের মতো চতুর্দিকে প্রতিটি ছদয়, ক্ষরিত রক্তের তুলা প্রেম।

আমার শরীরে আজ মাস বর্ষ সপ্তাহের
আমার শরীরে আজ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাব্দের
কিংবা কোনো, আমার শরীরে যেন
রৌদ্রের সবল নেই ; আমি প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে
প্রতিটি মুহূর্তে অনায়াস স্রোতের প্রবাহে
ভেসে যাচ্ছি রক্তপাতের প্রসাদে, স্মরণে—

তবুও আমার রক্ত গোলাপের পিপাসা, তৃষ্ণায়,
আমার বহুল রক্ত গোলাপের পিপাসায়, পিপাসায়
আমার বহুল রক্ত গোলাপের পিপাসায়, আমার
বহুল রক্ত.....।

প্রতীচ্য মধ্যযুগ ও দান্তে আলিগিএরি : চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। ৬৯৮এ, পি ব্লক, নিউ আলিপুর কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতা এবং তার পটভূমিকায় কবি দান্তের স্বরূপ বিশ্লেষণই এই পুস্তকের অদ্বিষ্ট। চঞ্চলবাবু তাঁর নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে এই যুগের আবির্ভাব লগ্ন, পেগানিজম্-এর সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানিজম্-এর বিরোধ ও সমন্বয়, কবি দান্তের রচনায় এই সমন্বয়ের প্রতিফলন—প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক চিন্তাধারার এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে 'শেক্‌স্‌পীঅর' ও 'গ্যোটের' সঙ্গে দান্তের তুলনায় তিনি অনেক নূতন কথা বলেছেন। "দান্তের রচনায় একদিকে গোটা প্রতীচ্য সভ্যতার চিহ্ন, অন্যদিকে কবিতার অসাধারণ পরিণতি। দান্তের সমালোচনা দুটিই একই সঙ্গে আলোচনা করা অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় নি। যেমন দান্তের কবিতা বোঝাবার জন্যই প্রতীচ্য কাব্যকে দুটি কৃত্রিম উপায়ে ভাগ করা হয়েছে—প্রথমটি প্রার্থনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি স্বতঃস্ফূর্ত মানবচৈতন্যের মধ্যে প্রকট—প্রথমটির দৃষ্টান্ত দান্তে, দ্বিতীয়টির শেক্‌স্‌পীঅর।.....উভয়েই বিশ্বের স্বরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন।" অথবা, "যেখানে দান্তে উপস্থিত সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মহাকাল যুগান্তর বর্তমান। কিন্তু গ্যোটে কোথায় পৌঁছলেন? ঊর্ধ্বে? সে কোথায়? বলা বাহুল্য দান্তের উক্তি মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান সম্মত এবং তার কাব্যের রসানুভূতি আজো কিছুমাত্র কমেনি। অপরপক্ষে গ্যোটের উক্তি ব্যক্তিগত আবেগপ্রসূত, ব্যক্তিগত চিন্তার ফল এবং তার কাব্যিক বেশভূষণ অনেক সময়ই খেয়াল প্রসূত;..... দান্তের কবিতায় সব সময়ই একটা মহান বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যে মহান বোধকে তিনি কাব্যিক রূপ দিতে পেরেছেন। গ্যোটে মহান বোধকে খুঁজে ফিরেছেন সারাজীবন ধ'রে, এবং জার্মান বাহোক তাই হোক বা কোনো মহান দর্শনের অভাবই হোক, তার কাব্যে 'আমি পরিপূর্ণতা চাই,' 'আমি বিশ্ব সত্যকে খুঁজছি',

এর অতিরিক্ত তিনি কিছু বলতে পারেন নি। তা ছাড়া যে স্বাভাবিক বিনয়ের মধ্যে মহাকাব্য সৃষ্টি হতে পারে তারও অভাব ছিল তার"।—উদ্ধৃতি দীর্ঘ হওয়ার কারণ যে, আমাদের প্রবীন কবি ও সমালোচকদের সঙ্গে চঞ্চলবাবুর মতের যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তা এই দুটি উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হবে। আমি নিজে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেন, ইউরোপীয় ক্লাসিক সাহিত্য সম্পর্কেও কোন অভিজ্ঞ পাঠক নই। তথাপি, ইংরাজী তর্জমায় মায়কভ্‌স্কি গ্যেটে ও দান্তের কবিকর্ম সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা, চঞ্চলবাবুর মত থেকে তারই সমর্থন পেয়েছি। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে আমরা আর একটি স্তরে পৌঁছোতে পারি যে প্রার্থনা ও বিনয় বিশেষ ক'রেই কবিধর্ম; এদের অভাবে কবিতার গুণাভাব ঘটে।

সমসাময়িক প্রবীন ও তরুণ কবি এবং কবিতার সমালোচক মাত্রকেই আমি চঞ্চলবাবুর বইটি পড়ে দেখতে বলি। একটি মাত্র প্রবন্ধই এখানে সংকলিত হয়েছে। তথাপি বক্তব্যের পরিবেশনে এবং বিশ্লেষণশক্তির গুণে চঞ্চলবাবুর প্রবন্ধটি অসামান্য শ্রীমণ্ডিত; এবং এ-বই সংগ্রহ করলে কেউ শেষ পর্যন্ত ঠকবেন, এমন কথা আমি অন্তত চিন্তা করি না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সমাজমানস: নারায়ণ চৌধুরী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-৯॥ আধুনিক উপন্যাসে মানবপ্রত্যয়: অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা-১২॥

'সাহিত্য ও সমাজমানস' নারায়ণ চৌধুরীর নবতম সমালোচনাগ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত লেখকের কয়েকটি রচনা আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রচনাগুলি প্রধানতঃ সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক। বর্তমান সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সমাজ চিন্তার ধারাও লেখক নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। লেখক গ্রন্থের প্রস্তাবনায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে সমাজ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য রচনা ছাড়া বর্তমানে সাহিত্য সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। তাই

সমাজ ভাবনা অনুপ্রাণিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গেও সমাজ চিন্তা নানাভাবে প্রবেশ লাভ করেছে।

লেখকের রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচয় রয়েছে সহজেই মনে হয় লেখক যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ সচেতন ও বর্তমান সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ। তিনি কয়েকটি বিশেষ মূল্যবোধে আস্থাশীল। আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যে এই মূল্য-বোধগুলির অভাব লেখক বিশেষভাবে অনুভব করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্য কীর্তি বিষয়ক আলোচনা, বর্তমান সাহিত্যের রূপ ও সমস্যা, এবং সমাজ চিন্তা।

কবি ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত রচনাগুলিতে লেখক মধুসূদনের কাব্যরূপ, বিভূতিভূষণের সাহিত্যকীর্তি ও রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীন সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

চারিত্রিক কাঠামো ও আদর্শের দিক থেকে লেখক বর্তমান যুগের সঙ্গে মধুসূদনের যুগের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে উভয় যুগই প্রধানতঃ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে পরিচালিত।

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গঠন ও প্রকৃতি, ছোট গল্পগুলির রূপগত বৈশিষ্ট্য এবং উপন্যাস ও ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মানব চরিত্র ও সমাজজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতি লেখক ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাচুর্য বিষয়ও পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরাট পটভূমি, রচনার বহুমুখীনতা লেখককে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। রবীন্দ্রজগতের মধ্যে লেখক তার নিজস্ব চিন্তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে তিনি বর্তমান সাহিত্যের রূপ, সমস্যা ও মূল্যবোধের পর্যালোচনা করেছেন। নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে তিনি বর্তমান সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অভাব উপলব্ধি করেছেন। জীবনবোধের সঙ্গে সাহিত্যের একাত্মতা প্রকৃত সাহিত্যের মাপকাঠি। প্রকৃত সাহিত্য জীবনচর্চার এক অংশবিশেষ। লেখকের অভিযোগ,

আধুনিক কথাসাহিত্যে জীবনচর্যা ও সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধানের ফলে সাহিত্যে চিত্ত-দারিদ্র্য এত প্রবল হয়ে উঠেছে। এ মন্তব্য অবশ্য তর্কসাপেক্ষ।

বর্তমান সাংবাদিকতাধর্মী সাহিত্যে জীবনবোধের চেতনা ও গভীর শিল্প-দৃষ্টির পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। লেখকের অভিযোগ সমকালীন সাহিত্যে রসবাদী সাহিত্যের প্রাচুর্য থাকলেও জ্ঞানগভীর সাহিত্যের অনুশীলন সেই অনুপাতে হয়নি। সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি জ্ঞানবাদী ও রসবাদী সাহিত্যের যুগ্মচর্চার পক্ষপাতী।

প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার নগ্ন রূপায়ন, লঘুরচনার প্রাধান্য ও রুচিবিকৃতি আধুনিক কথাসাহিত্যের মূল্যমানকে নিম্নগামী করেছে। সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্র্য ঘটলেও সমাজ কল্যাণের আদর্শের অভাব ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীহীনতা সাহিত্যের আদর্শরূপকে বিকৃত করেছে। সাহিত্যচিন্তা প্রবন্ধে লেখকের জীবনবোধ ও নিজস্ব চিন্তাধারার প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে।

সমাজ ভাবনা অনুপ্রাণিত নিবন্ধগুলিতে বাংলা সমাজের রূপ, সামাজিক আচার ব্যবহার ও কয়েকটি সামাজিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। বাংলা সমাজের রূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক বর্তমান বাংলা সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। বর্তমান সমাজে অধিকার শ্রেণীর পূর্ব ক্ষমতা নিঃশেষিত। এই সমাজ গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও সুস্থির প্রত্যয়ের দ্বারা পরিচালিত নয়।

সংস্কৃতি একটা গোটা সমাজের সমষ্টিগত ভাবনা বাসনার প্রকাশ ; আচরণের তারতম্যের দ্বারাই তার মান নিরূপণ করা যায়। সামাজিক আচার প্রসঙ্গে সংলাপ ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে তিনি কটাক্ষপাত করেছেন। বর্তমান শিক্ষানীতিতে সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবও লেখককে পীড়িত করেছে।

বস্তুতপক্ষে আলোচ্যগ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধগুলিতে লেখকের সমাজ সচেতনতা ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত মূল্য বিচারের মানদণ্ডে আধুনিক সমাজে ও সাহিত্যের অনেকদিকই সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত নয়। সাহিত্যের এই রুচিবিকৃতি স্বীকার করেও লেখক সাহিত্যের মূল্যমান উন্নয়নে প্রয়াসী। বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যের বিচারে লেখকের মতামত অনেক সময় একপেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে যে নানা সংঘাত ও সাহিত্যিক আদর্শের তালচুর ও নববিন্যাস ঘটবে—এ বাস্তব ঘটনাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় কি ?

উত্তরসূরী

অরবিন্দ পোদ্দারের গ্রন্থটি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সঙ্কলন। মূলতঃ উপন্যাসের সমস্যা আলোচিত হলেও এই গ্রন্থে সাহিত্যের অন্য কয়েকটি দিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এই উপন্যাসে যেমন নতুন রূপ বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন, তেমনি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের অভাবও অনুভব করেছেন। লেখকের মতে আধুনিক ঔপন্যাসিকের ভাষার কারুকার্য বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় সবেই কৃতিত্ব অর্জন করলেও সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধি ও সুস্থ মূল্যবোধের অভাব তাঁদের সাহিত্যের পরিধিকে সংকীর্ণ করে তুলেছে।

লেখক বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকায় উপন্যাসের এই সমস্যাকে আলোচনা করেছেন। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সমাজে মানুষের অসুস্থ জৈবসত্তার প্রভাবই বেশী। সামাজিক মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যে নাস্তির ধারণাও বদলেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিক যুগে সংক্রান্তির অবক্ষয়ের চেতনা কথাসাহিত্যিকেরা যতটা বুদ্ধিগত করেছেন, মানুষের মানবিক সত্তায় ততটা উদ্বুদ্ধ হননি। আধুনিক সাহিত্যে মননশীলতার ছাপ থাকলেও প্রেরণার চিন্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লেখকের মতে সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানুষের সত্তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে কাহিনী রচনা করাই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় মানব জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি গভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধে গভীর বিশ্বাস ও সৃষ্টিধর্মী হৃদয়ানুভূতির পরিচয় এঁদের রচনায় যতটা পাওয়া যায়, বর্তমান কথাসাহিত্যে এই চেতনা তত ব্যাপক নয়। সামগ্রিক শিল্প চেতনার পরিবর্তে খণ্ডিত শিল্পবোধ ও মানবিক রসের স্বল্পতার পরিচয় উপস্থিত।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক তাঁর রচনায় শিল্প-নৈপুণ্যের উন্নত পরিচয় না পেলেও মানব প্রীতি ও গভীর মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। বাস্তবতার আধুনিক রূপায়ন সম্বন্ধে লেখকের অভিযোগ, বাস্তবতার নামে বর্তমানে যৌনবিকৃতির সমস্যাকেই তুলে ধরা হচ্ছে। বাস্তবতার মূল প্রত্যয় বিষয়বস্তুর রূপায়নের সত্যতায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে সৃষ্টিশীল

মানুষের রূপায়নের পরিবর্তে মানুষের অসুস্থতা ও বিকৃতির দিকটাই বেশী বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে।

বৃহত্তর শ্রেয়ের অভাব ছাড়াও লেখক ভবিষ্যৎ কথাসাহিত্যের উন্নতির প্রয়োজনে সাহিত্যবিচারের স্থির মানদণ্ড ও পাঠক সমাজের বিদগ্ধতার আবশ্যকতা অনুভব করেছেন।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁর অভিমত, যে সমাজ ও জাতির পরিবর্তিত ইতিহাসেই এদের পরিচয় নিহিত। এরা উভয়েই রূপান্তরশীল সত্য। সংস্কৃতি প্রবাহিত জীবনধারার এক অখণ্ডরূপ। ঐতিহ্য বিষয়ে এলিয়টের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক ঐতিহ্যকে ইতিহাসের সামগ্রিক বোধের দ্বারা উদ্ভূত ও অখণ্ড চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন।

আধুনিক কবি ও কাব্যরীতির বিস্তৃত আলোচনায় লেখক এক বিশেষ মানসিক ভঙ্গিকে আধুনিকতা বলেছেন যা বর্তমানকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। আধুনিক কাব্যের প্রগতিতে লেখক গভীর আস্থাশীল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের অভিনব চিত্রকল্পের ব্যবহার, শব্দে নতুন বৈচিত্র্য ও সামগ্রিক প্রকাশ চাতুর্যের কুশলতা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

জীবনানন্দের কাব্যে মানবজীবন সম্বন্ধে অখণ্ডতা ও মমত্ববোধ, তীব্র অনুভূতি ও চিত্রধর্মী মনন শক্তি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের সুমিত প্রকাশ ভঙ্গি লেখককে আকৃষ্ট করেছে। বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে লেখকের অভিযোগ যে তাঁর কাব্যরীতি কোন স্থির মূল্যবোধে আশ্রিত নয়। কালচেতনার পরিচয় বিষ্ণু দের কাব্যে পাওয়া যায়। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণশংকর সেনগুপ্তের কবিতায় লেখক রোমান্টিক অনুভূতির পরিচয় পেয়েছেন। চিত্ত ঘোষের কবিতা গভীর ভাববোধের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতার প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এযুগের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে লেখক দুজন কবিকে বেছে নিয়েছেন। এরা হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য। কাব্যরীতির বৈপরীত্য সত্ত্বেও বক্তব্যের সারল্য ও স্পষ্টতায় এঁরা আধুনিক কাব্যকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

সমালোচনার প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল্য প্রসঙ্গে লেখক সমালোচনাকে সাহিত্যের মূল্যবিচারের মানদণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। সমালোচনা সাহিত্যের দীনতা কোন দেশের সাহিত্যকর্মের হীনতাই সূচনা করে। মানবমনকে সমগ্র-

ভাবে বিচার করা সমালোচনার সমস্যা। ইতিহাসবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রস ও বিজ্ঞানের যুগ্ম চেষ্টাই সার্থক সমালোচনার মাপকাঠি। লেখকের মতে আধুনিক সমালোচনার মুখ্য সমস্যা অভিজ্ঞতার সার্থক মূল্যায়ন।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী প্রবন্ধে লেখকের সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতীত বাংলার গৌরবময় ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলার অবক্ষয় নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃজনশীল বাংলা সমাজের কোন পরিচয় আজকের শতাব্দীর আচারে ব্যবহারে ও কৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। এই পরিবর্তনের জন্য লেখক আধুনিক রাজনৈতিক বিন্যাস ও বাঙ্গালী চরিত্রের বর্তমান স্বার্থকেন্দ্রিকতাকে দায়ী করেছেন। অতীতের মত সমাজের একাত্মতাও আজ তত নিবিড় নয়। বাঙ্গালীর জাতীয় সত্তা আজ লোপ পেয়েছে। বর্তমান সমাজের সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েও লেখক ভবিষ্যতের উন্নত সমাজ গঠনের জন্য ভারতীয় জীবনধারার উদার আদর্শে নিজেদের সংকীর্ণ বোধকে মিলিয়ে দিয়েও রূপান্তরিত সমাজ বিন্যাসে মানবিক সম্পর্ককে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী।

এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাস ও গল্প রচনায় সামগ্রিক উন্নতি দেখা গেলেও প্রবন্ধ বা সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এখনও অল্পই পাওয়া যায়। এই ধরণের গ্রন্থের বিরলতা বাংলা সাহিত্যে চিন্তার দীনতা সূচনা করে। চিন্তামূলক গ্রন্থের প্রাচুর্য্য সাহিত্যের গভীরতা ও সামগ্রিক চিন্তাবোধকে জাগ্রত করে। এই দিক থেকে এই গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য্য। লেখকের প্রত্যেকটি রচনাতেই চিন্তা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্যার গভীরতা ও মূল বক্তব্যের সুচারু বিশ্লেষণ লেখকের রচনারীতির মৌলিকতা প্রকাশ করে।

কমলকান্তি ভট্টাচার্য

নন্দনতত্ত্ব : সুধীর কুমার নন্দী। প্রকাশ মন্দির, কলিকাতা ॥

সুধীর নন্দী প্রণীত 'নন্দনতত্ত্ব' বইটি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত বই খুবই কম। এই বইখানি সে অভাব কিছুটা পূরণ করবে। নন্দনতত্ত্ব বিশাল শাস্ত্র। এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, মনোবিজ্ঞানীর

দৃষ্টিতে, দার্শনিকের দৃষ্টিতে ও শিল্পশাস্ত্রকারের দৃষ্টিতে ঈক্ষণ করা চলে। ভট্টর নন্দী মুখ্যত দার্শনিকের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্বের মূল সূত্রগুলির পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নিজে দর্শনের অধ্যাপক এবং বর্তমান রচনায় তিনি তাঁর দর্শন ও নন্দনতত্ত্ববিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন।

মোট তেরটি অধ্যায়ে বইটি বিভক্ত। সাধারণত নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের মনে যে যে প্রশ্ন জাগে গ্রন্থকার সে সব সমস্যার উত্থাপন করেছেন। আর্টের সংজ্ঞা কি, আর্টে বাস্তবতা আছে কি না, আর্ট কি অর্থে সার্বলৌকিক, আর্ট কি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে—এই সব সমস্যার সমাধান করতে তিনি সচেষ্ট। সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে তিনি সরলভাবে নন্দনতত্ত্বের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। বাক্‌চাতুর্য দ্বারা আসল ব্যাপারটিকে ঢাকা দেন নি। অতিসহজ সরল ও নিপুণভাবে কোচে বা বেলা, অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের শিল্পকথা লিখেছেন। আবার সহানুভূতিপূর্ণ অথচ বুদ্ধিদীপ্তভাবে এঁদের মতবাদের সমালোচনাও করেছেন।

ভারতীয় সৌন্দর্যদর্শনকে ভিত্তি করে গ্রন্থকার এক স্থানে বলেছেন যে 'শিল্পের অমের দান শিল্পরসিকের অন্তরে রসের প্লাবন আনে'। কথাটি প্রণিধানযোগ্য। শিল্পরসিক যখন শিল্পের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে তা বিচারবুদ্ধির সাহায্যে নয়। সে এক মহা অনুভূতি, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সদৃশ। শিল্প রসই পরিবেশন করে, তথ্য বা আবেগ নয়। এই রস আস্বাদনের সময় রসিকের মনপ্রাণ এক সুগভীর সাম্যে ভরে উঠে।

বিনয়গোপাল রায়

আমার কবিতা তুমি : রণজিৎ কুমার সেন। বাণীবিতান॥
অন্তর : শক্তিব্রত ঘোষ। পরিবেশক : বুক্‌স এণ্ড বুক্‌স॥
সাগর আকাশ : অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরী॥

বর্তমান কালে কবিতা যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হতে পারে এর প্রমাণ বিরল নয়। আংগিকের পরীক্ষা এবং রচনা ও বক্তব্যের বিভিন্ন দিকে তার স্বাতন্ত্র্য আরো উজ্জ্বল বলে মনে হয়। এবং সমকালীন কবিদের মধ্যে কাব্যসাধনার

অভিমান ক্রমে স্তিমিত হয়ে কাব্যচেতনা ক্রমে স্বচ্ছ এবং অভিনন্দিত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ক্রমপরিণতির দিক থেকে তা বিশেষ অর্থবহ। অনেক কবির কবিতাই একথা সপ্রমাণ করবে।

শ্রীযুক্ত বণজিৎ কুমার সেন এই ছন্দের ঠিক মাঝখানের কিছু বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবস্থান। অর্থাৎ আধুনিকতার বর্তমান পর্যায় তাঁকে যেভাবে আকৃষ্ট করেছে, তাতোধিক আকৃষ্ট করেছে রবীন্দ্রযুগের ছন্দরীতি। শ্রীযুক্ত সেন জন-সাধারণে গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশী পরিচিত, কবিরূপে ততটা নন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আলোচ্য গ্রন্থ 'আমার কবিতা তুমি' বিশেষ মূল্যবান। একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে তিনি স্বেচ্ছায় বিগত দশ এবং বর্তমান অনুশীলনের একটা সমন্বয়কে স্বাগত জানিয়েছেন। সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে বিভিন্নধর্মী কবিতা চোখে পড়ে। দেশাত্মবোধ, প্রেম, সমাজচেতনা প্রভৃতি বিষয়গুলি কবির কাছে বিশেষভাবে চিহ্নিত বলে মনে হল।

'স্বদেশ', 'জন্মভূমি' প্রভৃতি কবিতা বক্তব্যপ্রধান হয়ে পড়ায় কবিতার স্থির আবেগ যে পরিমাণে অনুপস্থিত থেকেছে, অন্যান্য কবিতার তার মৃদু উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে কবিতাকে সুন্দরতর করেছে। ছন্দের ও মিলের উপর শ্রীযুক্ত সেনের বিশেষ দরদ লক্ষণীয়। 'অসীম' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট আত্মীয়তায় কবি সম্পূর্ণ নিমগ্ন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা-বিদ্ধ কবি-মন এ গ্রন্থের দু-এক জায়গা ছাড়া প্রায় সর্বত্রই অনুপস্থিত, তবে তারই মধ্যে হঠাৎ এক একটি তীক্ষ্ণ চীৎকার সেই বোধকে কিছু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'বলবন্ত দেও' কবিতায় যে মুক্ত কবিছন্দ বার বার উদ্বেল হয়ে উঠেছে, বা অন্তত যে যন্ত্রণার ছায়া দু-একটি ছত্রে উজ্জ্বল, আসলে শ্রীযুক্ত সেনের কবিতায় তার চেয়েও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক স্বয়ম্বর পৃথিবী। সে সাম্রাজ্যে দুঃখ, অভিযোগ, ষড়যন্ত্রের গ্লানি কিছু পরিমাণে থাকলেও সব মিলিয়ে এক তন্ময়তা, নিবিড় অনুভবের অস্ফুট গুঞ্জন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত।

শক্তিব্রত ঘোষের দ্বিতীয় কবিতা সংকলন 'অন্যতর'। কবি নৈর্ব্যক্তিক হিসাবে প্রথমেই বলেছেন, প্রথম গ্রন্থ থেকে, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট না হলেও, অন্তত উপলব্ধির ক্ষেত্রে, একটা রূপান্তর হয়েছে মনে করেই বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হয়েছেন তিনি। 'অন্যতর' পড়তে পড়তে মনে হল, যদি পূর্বগ্রন্থের সঙ্গে উক্তিটির সম্পর্ক অস্বীকারও করি তবুও একটা কথা স্পষ্ট

যে আজিকের বয়নে এবং কবিতার বক্তব্যে তাঁর নিজস্ব মৌলিকত্ব কোথাও অনুপস্থিত নয়। তবে উপলব্ধির সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্পর্শ যদি কিছু থাকত, কবিতা-গুলো পাঠক মনে উজ্জ্বলতর হত, সন্দেহ নেই! নিসর্গের প্রতি কবির আকর্ষণ এবং আপন চেতনায় তার যে প্রতিফলন—এই গ্রন্থের বহু কবিতা তারই দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে এক আবেগময় কবিহৃদয় তার বক্তব্যের দৃঢ়তা থেকে কাব্যের স্বর্ণাধারাকে প্রবহমান রেখেছেন কবিতার শরীরে। কিছুক্ষেত্রে সোজাসুজি বোঝার খুঁকি বহু পংক্তিতে বর্তমান, এবং এই বোধ পরিণত এক স্বচ্ছতায় উপস্থিত। যেমন,

> সাদা অন্ধকারে আজ ঢেকে গেছে পাইনের শাখা,
> সাদা সমুদ্রের লোনা জল খেয়ে আমি এক বিশ্ব পুরুষ,
> সাদা হিমে রক্তহীন দুঃখের বুকের মধ্যে মৃত্যুকেই দেখা,
> বিশ্ব যা মৃত্যু আর অন্ধকারে অন্তরীণ পৃথিবীর সকল মানুষ।

কিছু কবিতা চিত্রময় এবং আলঙ্কারধর্মী। তবে একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করি যে ভাবাবেগকে কিছু সংযত করলে কবিতাগুলি আরো সুন্দর হতে পারত। ভবিষ্যৎ রচনায় কবিকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

'সাগর আকাশ' কাব্যগ্রন্থের সর্বাংগে দুর্বল মিল, ভূলিষ্ঠ, সেতু প্রভৃতি শব্দ, অবান্তর উপমা প্রভৃতি যেন অনাবশ্যক প্রাচীনত্ব সৃষ্টি করেছে। গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে মনে হয় যে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলা কবিতার বিবর্তন কিছুই হয়নি। যদি শব্দের এ জাতীয় ব্যবহার কবির ইচ্ছাকৃত হয়, তবে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আমাদের আশা আছে। কিন্তু যদি এটা তাঁর বদ্ধমূল সংস্কার হয় তবে তা নিতান্তই বিরক্তির কারণ হবে!

কিছু কিছু কবিতায় জিজ্ঞাসা, বা চেতনার আভাস যে ছিল না তা নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেগুলো কবিতা হয়ে ওঠে নি। এবং কবির একটি বক্তব্য সচেতন ভাবে অনেক কবিতায় কাজ করেছে বলে মনে হল। যে কোন সৎ কবির পক্ষে যা বর্জনীয়, যেমন, ভাষায়, ছন্দে, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অন্য কবির অনুকরণ, তাও বহুৎ কাব্যচর্চার পক্ষে অন্তরায়। গীতিময়তা নানা জায়গায় সুন্দর আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্ভবত কবির সত্য পরিচয় সেখানেই নিহিত।

শান্তি লাহিড়ী

পল ভেরলেন

ছদ্মবেশের সংলাপ

পুরনো নির্জন ভুবার শীতল পার্কে
এইমাত্র ভেসে এল দুটি কায়া।

তাদের দুচোখ মৃত, শিথিল অধর
কোন ক্রমে শোনা যায় তাদের সংলাপ।

পুরানো নির্জন ভুবার শীতল পার্কে
দুটি প্রেতাত্মা অতীতকে ডাকে।

—"তোমার কি মনে পড়ে আমাদের পুরানো উল্লাস ?"
—"তুমি কেন আমাকে তা স্মৃতিতে জাগাও ?"

—"তোমার হৃদয় কি এখনও আমার নামে কাঁপে ?
তুমি কি এখনও আমার আত্মাকে স্বপ্নে দেখো ?"—"না।"

—"আহা! সেই অবাক সুখের মধুর দিন
যখন আমরা ঠোঁটে ঠোঁটে রাখলাম।"—"তাই তো সম্ভব।"

—"আকাশ কী নীল ছিল, আর কী বিশাল ছিল আমাদের আশা।"
—"পরাজিত আশা পালিয়েছে অন্ধকার আকাশে।"

তারা তাবা হেঁটে গেল ভবিষ্যতে আর
কেবল শুনল রাত্রি তাদের সংলাপ॥

অনুবাদ : অর্ণব সেন

ফেদেরিকো গার্সিয়া লরকা : দুটি কবিতা

সরাইখানা

সরাইখানার
ভিতরে বাহিরে
আসা যাওয়া করে মরণ।

সীটারের গুরু গভীর
সড়কে সড়কে বেড়ায় ঘুরে
কালো ঘোড়া আর
শয়তান লোকগুলো।

আর বালিয়াড়ি জোড়া
ভয় রজনীগন্ধার ঢেউয়ে
লবণের আর
নারীরক্তের গন্ধ।

মরণ সে ওই
আসা যাওয়া করে ভিতরে বাহিরে
বাহিরে ভিতরে
আসা যাওয়া করে
সরাইখানার মরণ।

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রান্তরের গান

মেয়েটি জলপাই কুড়োচ্ছে বুঝি ?
আহা, চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি !
হাওয়ায় হাত ওর কটিদেশ জড়িয়ে ধরছে।
চারজন ঘোড়সওয়ার পথ বেয়ে চলেছে,
গায়ে তাদের নীল আর সবুজের কুর্তা
আর কালো অঙ্গরাখা।

উত্তরসূরী

'চলো কফিতোরা-য় যাই'—ওরা ডাকলো মেয়েটিকে—
মেয়েটি কান দিলো না সে-ডাকে।
তিনজন যুবক ষণ্ড-লড়ুই এগিয়ে যাচ্ছিল ;
তাদের কোমর ক্ষীণ, গায়ে কমলা রংয়ের কুর্তা,
আর কোমরে সেঁকেলে রূপোর তলোয়ার।
'এসো না, সেভিল্-এ যাবে ?'
ওরা মেয়েটিকে বললো। মেয়েটি জবাব দিল না সে-কথার।

বিকেল যখন তরল আলোয় গড়িয়ে গড়িয়ে
হালকা বেগুনে হল,
একটি তরুণ এলো সে-পথে—
হাতে তার গোলাপ আর চাঁদের সুষমার গন্ধ।
বললো—তন্বী, প্রানাদায় যাবে ?
মেয়েটি ভ্রূক্ষেপ করলো না তার কথায়।
জলপাই কুড়িয়ে চললো চাঁদের মত মুখ
নামিয়ে নামিয়ে।

হাওয়ায় ঝির্-ঝির্ হাত দুখানা তখনও ওর
কোমর জড়িয়ে।

অনুবাদ : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এল্ এড্‌লার
শীতের দিনে যাত্রিরা

এখানে যখন শীতের জন্য সব তৈরী
আলোর পাখা সূর্যের হিমশৈল পেরিয়ে নীচে নেমে যায়,
কালো পাথরগুলি যারা জড়াজড়ি করে আছে—
তাদের শেষ পাথরখানা ভেসে ওঠে যাত্রিদের দৃষ্টিপথে।
গাছের ডালে ফুটেছে বরফের মঞ্জরী,
নদীর বুকে প্রসারিত বাড়ির উপরে।

শীতের দিনে মারিয়া

সবাই যখন প্রস্তুত
চিমনি পাতার ঝুলছে শুকনো বাতিগুলো
তার হাত দুটো ডেস্ক চেয়ারের হাতলের পরে বিন্যস্ত
যেন তার আত্মা নদীর হাতে স্পর্শ পেয়েছে
আর পাহাড়ের শীতল মুখের—
যা হৃদয়ে সাহস আনে।

এখানে যখন সবাই শীতের জন্য তৈরী
আলো যখন অস্তরাগে ম্লান
সাহসিকা মারিয়া চেয়ারে স্থির হয়ে বসলো।
আর অন্ধকারের স্তরে স্তরে,
শুরু হ'ল তার ধীর নিঃশব্দ পরিক্রমা।

অনুবাদ : ভাস্কর দাশগুপ্ত

উইলিয়ম্ এম্পসন
হারানো সে দিনগুলি

ধীরে বিবর্জিয়া সারা শরীরের শোণিতের স্রোতে বয়।
জানে না ক্লান্তি প্রথের প্রয়াস, অথবা ব্যর্থতাতে ;
ক্ষতি রয়ে যায়, ক্ষতি রয়ে যায়, তাতেই মৃত্যু হয়।

যে-সব ক্ষুদ্র বস্তু দিলনে জীবনের উপচয়,
তারা পরিপাক পায় না পাচক রসে কি বিজ্ঞতাতে :
ধীরে বিবর্জিয়া সারা শরীরের শোণিতের স্রোতে বয়।

মুখা কুকুরের উষ্ণ রক্ত মুক্তের মেহময়
পুনঃসঞ্চারে মাংসখানেকের ইচ্ছা যেটালো তাতে ;
ক্ষতি রয়ে যায়, ক্ষতি রয়ে যায়, তাতেই মৃত্যু হয়।

উত্তরসূরী

চীনা কবরের অথবা ধূসর পাহাড়ের। আনে ভয়,
গ্রাস করে মাটি, সে মাটি ফেরে না, হারায় অনাকাঙ্ক্ষাতে।
ধীরে বিষক্রিয়া সারা শরীরের শোণিতের স্রোতে বয়।

উত্তাপহীন বুকে শোনা যায় কর্কশতার জয়।
অতি উত্তাপে মৃত্যুই আনে। উত্তাপহীনতাতে
ক্ষতি বয়ে যায়, ক্ষতি বয়ে যায়, তাতেই মৃত্যু হয়।

হারানো কবিতাবলী, আহা সেই দুখের কাহিনী বয়
হারানো দিনের, হৃদয় দীর্ণ তাদেরই তো সংঘাতে।
ধীরে বিষক্রিয়া সারা শরীরের শোণিতের স্রোতে বয়।
ক্ষতি বয়ে যায়, ক্ষতি বয়ে যায়, তাতেই মৃত্যু হয়।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ইব্‌ন আর-রুমী

নারসিসাস্

সন্ধ্যার নির্জনে সেই মদ্যপায়ী, সকালে মাতাল
যখন নিশ্চুপে আসে আমার সখের আঙিনায়
সাজানো টবের প্রান্তে ফুটন্ত ফুলের অভিলাষে
তখন বাতাস কাঁপে ; ঠিক যেন প্রিয় ও প্রিয়ার
মিলন দক্ষিণ তটে কম্পমান দুইটি হৃদয়।

একবার চেয়ে ভাখো আকাঙ্ক্ষিত ফুলের শরীর,
অজস্র শিশির বিন্দু মুক্তোর মতন সারা গায়ে
ছড়িয়ে রয়েছে যেনো। মনে হয় চোখের প্রান্তরে
ফোটা ফোটা অশ্রুজল বিচিত্র কান্নার সমারোহ।

তোমরা এসেছো যদি আমার সখের আঙিনায়
পানের মুহূর্তে কের ভেবে নাও আর একবার।

মূল আরবী থেকে অনুবাদ : আবদুস্ সাত্তার

Camus-এর উচ্চারণ প্রসঙ্গে

বিগত কয়েক সংখ্যায় "উত্তরসূরী"র পৃষ্ঠা একটি বিশেষ বিতর্কের আলোকে আলোকিত হচ্ছে বলে অনেকের মনে হলেও আমার ধারণা এ শুধু অন্ধকারেরই ছড়াছড়ি—বিষয়টি হচ্ছে, বিখ্যাত ফরাসী লেখক Camus নামের উচ্চারণ। শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার গুপ্ত বাংলা অক্ষরে "কাম্যু" বানান লেখায় শ্রীযুক্ত অরুণ মিত্র তার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের প্রতিবাদে মিহিরবাবুর চিঠি অরুণ বাবুকে অধিকতর প্রতিবাদের অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু এ-সকল আলোচনা এবং প্রতিবাদ যে কতকটা মূলাহীন তার প্রমাণ রয়েছে "উত্তরসূরী"-র দশম-বার্ষিক প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অরুণ বাবুরই লেখায়। ফরাসী 'u' ধ্বনিটির উচ্চারণ সম্পর্কে অরুণবাবুর যথার্থ আলোচনা থেকে এ কথাই বোঝা যাবে যে যে-বানানই লেখা হোক না কেন [কাম্যু/কাম্যু/কাম্যু] তা, মূল শব্দের ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারবে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে বানানের দিক থেকে "কাম্যু" এবং "কাম্যু" দুটিই ভ্রান্তিকর। বিশেষ করে শেষের বানানটি ব্যবহার না করাই ভালো কারণ য-ফলাযুক্ত শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ একরকম, বাংলা উচ্চারণ আর একরকম। য-ফলা সংস্কৃতে একটি Semi-vowel ; এর উচ্চারণে অনেকটা ইয় (y), বাংলায় সংযুক্ত বর্ণের য-ফলা উচ্চারণে সর্বদাই প্রগত সমীকরণের ফলে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব সৃষ্টি করে,—যেমন :

যোগ্য > যোগ্‌গ [সং-yogya]

কিন্তু Camus শব্দ কখনই Kamya অথবা Kammu উচ্চারিত হতে পারে না। য-ফলার চিহ্ন ব্যবহার করে সাধারণ বাংলা "উ-কারের ধ্বনি থেকে একটা পার্থক্য" সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমার মতে অর্থহীন।

যতদূর মনে হয় Phonetic symbol ব্যবহার করতে না পারলে সোজাসুজি "কাম্যু" লেখাই ভালো। বাংলায় 'উ' ও 'ঊ' লেখার বেলায় প্রায়ই যাওয়া হারিয়েছে, সুতরাং "কাম্যু" অথবা "কাম্যু" নিয়েও বাদানুবাদের অর্থ নেই।

জামশেদপুর উইমেনস্ কলেজ

প্রণব মিত্র

স্বদেশ সংস্কৃতি স্বাধীনতা

ক্রোড়পত্র

অমিয় চক্রবর্তী, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
অনিরুদ্ধ কর, অরুণ ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী : প্রবাসী কবির উত্তাপ

November 20, 1962

শ্রিয়বরেষু

আপনাদের দুজনের চিঠি পেয়ে গভীর তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম। তার পরেই তো তাপমাত্রার ঝড় উঠল—এখনো ভারতের সীমান্তে তার তীব্রতা চলেছে। চীনের সামরিকতার মত নেতারা হঠাৎ কী কারণে যুদ্ধ থামাবার প্রস্তাব করেছে, কী তাদের উদ্দেশ্য তা এই দূর থেকে বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষরা নিশ্চয়ই সজাগ, এবং তারা শক্তির সঙ্গে কল্যাণকে মেলাতে পারবেন। একদিন তো যুদ্ধ থামবেই কিন্তু কিভাবে তার যথাযথ ব্যবস্থা হয় সেইটেই বিচার্য। সংকট বাড়ানো যেমন যুক্তির কথা নয়, তেমনি নকল আপোষের প্রস্তাবও শান্তির উপায় নয়। গান্ধীজির পথাবলম্বী হয়েই বলছি যুদ্ধকে মানিনা, কপট মৈত্রীবচনকেও নয়। নূতন যে পন্থা তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই পথেই মুক্তি, সেই পথেই শুভযোগ, সেই পথেই আজকের পৃথিবীর ত্রাণের উপায়। দেশে দেশে বিদ্বেষ এবং সামরিক উত্তেজনা বেড়েই চলেছে, তাতে আশুন থামেনা, আনবিক বোমার সর্বনাশের দিকেই পৃথিবীর মন এগিয়ে যায়। কী কঠিন পরীক্ষা হঠাৎ আমাদের দেশের উপর এসে পড়ল। জরী আমরা হবই এবং সেই কল্যাণময় বৈজয়ন্তী যেন আমরা শীঘ্রই শুনতে পাই, শোনাতে পারি। অবশ্য সামনে কিছু কালো কঠিন দুঃখ এবং ত্যাগ আমাদের মেনে নিতে হবে।

দূর থেকে ভারতীয় যারা এখানে আছি নানাভাবে দেশের এবং আধুনিক পৃথিবীর অন্যান্য আক্রান্ত জনসাধারণের জন্যে যথাসাধ্য সেবায় নিযুক্ত আছি। দেশের জন্যে অর্থ এবং খাদ্য সংগ্রহ চলেছে। ওষুধপত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা ভারতীয় Embassy এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সহযোগে আমরা করবার চেষ্টায় ব্যস্ত—খুবই উৎসাহ এবং সাহায্য আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে পাচ্ছি। অথচ এসব কতই স্বল্প, দেশের লোকের যা প্রয়োজন তার তুলনায় এর মূল্য কতটুকু। তবু সকলেরই চিত্ত সাড়া দিয়েছে এটা বড়ো কথা—ছাত্রদের ওপর ভবিষ্যতের অনেকখানি ভরসা।

স্বয়ং বিধাতা যখন মানুষকে নানা মতামতের স্বাধীনতা দিয়ে পৃথিবীতে

পাঠিয়েছেন তখন কোনো দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা হরণ করবার চেষ্টা না করেন। খুবই আশা করি কল্যাণের দেশ ভারতবর্ষ, বিচিত্র মুক্তির সন্ধানী ভারতবর্ষ সভ্যতার চিরন্তন আদর্শ রক্ষা করবে।

আর একটা ভুল যেন আমরা কেউই না করি। সব দেশেরই জনসাধারণ তাদের অগণ্য শিশু, নারী, "সামান্য" মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ—তারাই তাদের অন্যায় রাষ্ট্রের পদতলে পিষ্ট, একই কাঠামোর কোনো সমস্ত দেশের লোককে যেন আমরা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা না করি। তার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। যদি কেউ নিরপরাধ পরদেশের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তার প্রতিকার উল্টো অবিচারের পথে নয়। এসব কথা আমাদের নতুন আবিষ্কার নয়—ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত সত্যকে মানতে চাই।'

* * *

প্রীতি জানবেন।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

১ অমল ভট্টাচার্যকে লিখিত

সীমান্তের ঘটনা ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের ওপর চীন হানা দেবার পর প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর কাছে নিজস্ব ধারায় নতুন ভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে। সৌন্দর্য ও শান্তি এই দুটো শব্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মানুষ এই চিন্তা করতে চেয়েছিল যে যুদ্ধের পরিস্থিতি মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। শুদ্ধ মন নিয়ে তারা ভাবতে চাইতেন—যেমন রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-রলাঁ আইনস্টাইন—তাঁরা এই যুদ্ধ প্রক্রিয়ার কি রকম মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আমরা দেখেছি, এমন কি কেউ যুদ্ধ কিম্বা সমর্থন না করার জন্যে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু একটি দেশ যদি সমাজতান্ত্রিক সমস্ত পদ্ধতিগুলো স্বীকার না করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একজোট বাঁধে এবং সেই দেশ যদি এ বলে গর্ব অনুভব করে তারাই সমাজতান্ত্রিক দেশ—তবে সমাজতন্ত্রের তাঁরা পুরোধা ছিলেন, কিম্বা সেই চিন্তার ভিতরেই কোন গলদ ছিল কিনা, তাও বিচার্য। আমরা দেখছি সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজের দেশের সমাজতান্ত্রিক উন্নতির ব্যবস্থাগুলো বন্ধ রেখে যুদ্ধই একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অস্ত্র, এই চিন্তা যখন করে, তখন কিভাবে চিন্তা করা যায় তারাও চিঙ্গিস খাঁর বংশধর হিসেবে প্রমাণ দিতে চাচ্ছে না? (কাগজে দেখেছি বর্তমান চীন চেঙ্গিস খাঁকে নিয়ে আবার গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখছে।) যদিও মার্কস্‌বাদের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানেন মার্কস্ শ্রেণীসংগ্রামের পদ্ধতির ভিতর অলক্ষ্যে এই বীজ রোপন করে গেছেন. এবং গান্ধীজী সময়ের দাক্ষিণ্য পেয়ে এই বীজের সন্ধান পেয়ে আন্দোলনের প্রাথমিক সূত্র হিসেবেই অহিংসার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

এবং বর্তমান ঘটনার পর, বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই চিন্তা আদৌ স্বাভাবিক, সত্যিই কী আমরা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি এবং ধ্বংসই কী জীবনের এক্সিয়ম? কট্টর সাম্যবাদিক চিন্তানায়কেরা নিজেদের চতুর্দিকে গণ্ডী টেনে বলতে চান, এর বাইরে কিছু নেই। আমরা বিশ শতকের এই গণ্ডীর পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন দেশে

অনেকগুলো যুদ্ধের হত্যা দেখেছি। জার্মানী থেকে মান ও আইনষ্টাইনকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, ফরাসীতে হলাঁ ও কম্যুনিষ্ট নেতা থোরেজের গান্ধীজীকে নিয়ে কথা কাটাকাটি, রাষ্ট্রের পদ্ধতি নিয়ে হ্যারল্ড লিস্কি প্রভৃতির শ্লেষোক্তি, রবীন্দ্রনাথ-মোতচির মতান্তর—কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁদের এক একটি বিশেষণ তৈরী ক'রে তাঁদের ঘায়েল করতে চেয়েছিল। দালাল শব্দ তখন যথেষ্ট ব্যবহৃত হ'তো, আশ্চর্য ক্রুশ্চেভের বিশতম কংগ্রেসে স্বীকারোক্তির পর এই দালাল শব্দ ব্যবহারে তাঁদের নিজেদের মুণ্ডা আসা উচিৎ ছিল। আর আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিতর ক্রুশ্চেভ আক্রমণের পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছেন। 'আধ্যাত্মিক উন্নতি' 'অর্থনৈতিক পদ্ধতির ভিতর যা ভাল তা গ্রহণ', 'সহ অস্তিত্ব'—এই সব শব্দই ভিয়েতনামীয় বেঁচে থাকবার জন্যে মূল প্রশ্নের। বাকি অর্থনৈতিক উন্নতির পর একটি দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরে যাচ্ছে! তা হলে এত রক্তপাতের কি প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখেছি, ফরাসী দেশে বিপ্লবের পর বুর্বোঁদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছিল, অথচ অনেক লোকক্ষয়ের পর একটি দেশে আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা শোনা যাচ্ছে। আমরা কি সোয়োকিনের একটি মন্তব্য স্মরণ করবো, পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে যেখান থেকে আরম্ভ সেখানেই আবার ফিরে যাওয়া। জহরলাল একটি কথায় ওপর আগে খুব জোর দিতেন, মার্কস্ যদি এযুগে জন্মগ্রহণ করতেন তিনি তাঁর পদ্ধতির বদল করতেন। গোঁড়া মার্কস্বাদীরা ছাড়া সবাই জানেন, মার্কস্ শেষ জীবনে স্বীকার করে গিয়েছিলেন—কট্টর ভাববাদীদের বিরুদ্ধতার জন্যেই তিনি অর্থনীতির ওপর এত জোর দিয়েছিলেন এবং এ-ও স্বীকার করেছিলেন—পৃথিবীতে বহু বিষয় আছে যা অর্থনীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ জন্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে জহরলাল মাঝে মাঝে বক্রোক্তি করতেন, মার্কস্বাদ তিনি বুঝতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের না।

দুই

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের কাজ শেষ হবার পর এ দেশে ফিরে এসে মার্কস্বাদ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, মার্কস্বাদ তিনি হয়ত গ্রহণ করতে পারতেন যদি তার ভিতর ছন্দ পরিবর্তনের কথা থাকতো। কথাটা এজন্যেই উল্লেখ করা হলো, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন গান্ধীদর্শনের ভক্ত।

গান্ধীবাদের সাথে যাঁরা সম্পর্ক রাখেন তাঁরা জানেন, গান্ধীদর্শনের সমস্ত অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে হৃদয় পরিবর্তনের ওপর। এই হৃদয়গত প্রবৃত্তি নিয়ে ভারতীয় দর্শনে বৈদিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সাত্ত্বিক চেতনা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিও এই মূল কথাটাকে অনুসরণ করে নিয়েছে। উদ্দেশ্য এক হলেও গান্ধীবাদের সাথে মার্কস্‌বাদের পার্থক্য হচ্ছে তার পদ্ধতির ওপর। মার্কস্-এর শ্রেণীবিদ্বেষ রক্তাক্ত ঘটনার দ্বারা সৃষ্টি করতে চায়, কিন্তু গান্ধীর রীতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যেই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ফলের পরিণতি বীজের ভিতরেই আছে। আজকে যদি বলা হয় ষ্ট্যালিন কিংবা মাও ভুল করেছে, কথাটাকে তাহলে উল্টো ভাবে সাজানো হয়। হেগেলীয় ধারণাকে মার্কস্ বলেছিলেন, এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ী। মার্কস্-এর পরিণতিও এই ঘোড়ার আগে গাড়ী থাকার পৃথিবীব্যাপী এত বিপর্যয় তৈরী করছে। ক্রুশ্চেভ যদিও সংশোধন করতে চাচ্ছেন (যাকে চীনাতন্ত্র গাল দিচ্ছে) তথাপি তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করবেন তা ভবিষ্যৎ বলতে পারে। কারণ কতগুলো জিনিস এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি—স্তালিনকে ক্রুশ্চেভের সময়েও শান্তি দিয়ে মরতে পারেন নি, রুজেনবুর্গ ষ্ট্যালিনের সময়ে বুক বুঁজে ছিলেন—ক্রুশ্চেভের সময়ে মনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও আজ আবার রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত মনস্তত্ত্ববিদ-এর কোপে পড়তে হচ্ছে।

এ কথাগুলো বলা হলো এইজন্যে, যে একটি দেশ কখনো উন্নতি লাভ করেছে কিনা তা তার সংস্কৃতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। মার্কস্‌ও শিল্প সাহিত্যকে বস্তুর দৃষ্টি থেকে বেশী কিছু দেখতে চেয়েছিলেন, কারণ তা মনের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের মত মার্কস্ বলতেন, স্বর্ণকার সোনাকে বাজারঘরের থেকে বেশী কিছু দেখতে পারে না, কিন্তু শিল্পীর চোখ তার চেয়ে আরও বেশী দেখে। লেনিনের এই চোখ ছিল। গোর্কিকে টলষ্টয়কে ঈশ্বরবাদী বলে একপেশে করে যারা রাখতে চেয়েছিল তাদের এই বলে ধমক দিয়েছিলেন—কোনটা প্রগতি আর কোনটা প্রগতি না, তা চেনার জন্যে ভিন্ন চোখ দরকার।

এবং মানবিকতার ব্যাপারেও এই ভিন্ন চোখ না থাকলে চলে না। সে জন্যে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ ভাবে একটি উদাহরণের মুখোমুখি হলে কথাটা বোধ হয় স্পষ্টভাবে ধরা যায়। ভারতে মুসলিমযুগের ইতিহাসে আকবরের শাসনকালকে বিশিষ্ট বলে ধরা হয়,

তার কারণ বিভেদমূলক প্রবৃত্তির তিনি অপসারণ করেছিলেন—তার চেয়ে আরো বড় গুণ, তিনি সেই সব গুণী ব্যক্তিদের নিজের কাছে ডেকেছিলেন, যাঁরা এক একদিকে বিশিষ্ট ছিলেন। সাজাহানের নাম তাজমহলের সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিত্ব, স্বধর্মে রক্ষণশীলতা এবং রাজকীয় আরও অন্যান্য গুণ সাজাহানের থেকে বেশী থাকা সত্তেও আওরঙ্গজেবের নাম ইতিহাসে কতটুকু!

এই প্রসঙ্গের দ্বারা আমরা এ রকম ধারণা করে নিতে পারি, রাজনীতিজ্ঞ হতে হলে—রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সৌন্দর্য নামক বস্তুর বিশেষ যোগাযোগ থাকা দরকার। একজন বৈজ্ঞানিক যখন অবসর সময়ে বেহালার সাধনা করেন তখন, তার পেছনে, একটি বিশেষ কারণ থাকে। যেমন আইনষ্টাইন। পদেহি, ফরাসী কবি সাঁ জ'ঁ পার্সের সঙ্গে শিল্পতত্ত্ব আলোচনার পর দুজনেই যখন ওঠার উদ্যোগ করছেন, তখন বাইরে ভোর হয়ে গেছে। এই আইনষ্টাইন নাগাসাকি হিরোশিমায় আনবিক বোমা ফেলার পর সাত রাত ঘুমুতে পারেন নি। মৃত্যুর আগে বিজ্ঞানযাত্রার পরিণতি দেখে যে যন্ত্রণা তিনি পেয়েছিলেন তাও আমাদের মনে আছে।

আর একটি উদাহরণের সামনে দাঁড়ালে আমার কথা আরো স্পষ্ট হবে। বিপ্লবোত্তর সময়ে রাসেলের সঙ্গে লেনিনের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। সেই স্মৃতি রাসেলের মনে একটি প্রচণ্ড দাগ রেখে গিয়েছিলো। বিপ্লবের সময় অনেক ধনীব্যক্তিকে হত্যা করার প্রসঙ্গে লেনিনের অট্টহাস্য দেখে রাসেল চমকে উঠেছিলেন। হত্যা ব্যাপারে মানুষের এরকম আত্মপ্রসাদ আসে কী করে। রাসেল বোধ হয় এখন জানেন এটা বীজের উপকরণ, ধ্বংস ব্যাপারে ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র মুহূর্তখানেক, কিন্তু সৃষ্টির জন্যে অনেকগুলো মুহূর্তকে ব্যয় করতে হয়। যাঁরা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চান, কোন কিছু নির্মূল করবার ব্যাপারে সেই বস্তুর সৎ উপকরণগুলোর কথা তাঁরা বারবার চিন্তা করেন। মার্কসবাদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, মার্কস-এংগেলসকে সবাই নয়া-হেগেলিয়ান বলে ধারণা করতো। তার কারণ, বস্তুবাদের ব্যাখ্যার জন্যে মার্কসের নতুন অবদান আছে কিন্তু মনের ব্যাপারে মার্কস্ পুরোপুরি হেগেলিয়ান দ্বান্দ্বিক ধর্ম স্বীকার করেন। এজন্যে হেগেল উভয়েরই প্রেমের ছিলো। ইতিহাস হলো অভিজ্ঞতার জন্যে প্রেমের, এবং পরিবর্তনের জন্যে সূত্র নির্ধাতা। এবং এই চেতনাগুলোই দার্শনিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। কোন রাজ-

নীতিবিদ এই রকম চেতনারহিত হলে বিপদ ঘনিয়ে আসে হয়। মার্কসের পূর্ব ইতিহাস তাঁকে রক্তাক্ত বিপ্লবের সন্ধান দিয়েছিলো, জার্মান জাতের ইতিহাসে যুদ্ধ রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। গল্-দের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উত্থান ও ধর্মযুদ্ধ, তারপর চোখের সামনে রুশদেশী বিপ্লব—এই চেতনা আমার পক্ষে এ সমস্ত ধারণা ছিল প্রচুর উপযোগী যে দৃষ্টে পরিবর্তনের বিপ্লব। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি গান্ধীর অনুভবগুলো চিন্তা করি, বুঝতে পারি গান্ধীজি কেন অহিংসা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। অশোকের রূপান্তর তার বিরাট সাক্ষী, এবং তার মূল প্রেরণা হচ্ছেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবই ভারতবর্ষের রাজকীয় ও সামাজিক জীবনে নতুন স্পন্দন এনেছিলেন, এবং এই স্পন্দনের ইতিহাস সমস্ত পৃথ এসিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো। সমন্বয়বাদ ভারতীয় নীতিতে কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে, গ্রীক সংস্কৃতি কিভাবে ভারতের সাথে যুক্ত হোয়ে গিয়েছিলো এবং সাংখ্যধর্মের চেতনা নিয়ে পাইথগোরাস কিভাবে গ্রীক দর্শনে নতুন চিন্তা সংযোজিত করেছিলো এই দৃষ্টান্ত থেকে। এবং এই সমন্বয়বাদ নিয়েই আকবর মুসলিমধর্মকে ভারতের আত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কবীরের ধর্ম কী এ অনেক সময় চিন্তা করতে হয়, ফকীর সম্বন্ধের চিন্তা বাউলের সাথে মিশে গেছে। এগুলো বলা হচ্ছে এইজন্যে যে কোন কর্মই রক্তাক্ত জীবনের পরের ঘটনা না। চৈতন্য যুগ কিংবা গান্ধীর আচরণ একই সাক্ষী দিচ্ছে। বিবেকানন্দর একটি কথা—শংকরের মেধা, মুসলিম ঐক্য এবং খৃষ্টীয় প্রেমধর্ম-এর সমন্বয় নিয়ে যদি যুবক তৈরী হয় তবে সমস্ত পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তর সংশোধিত হয়। বিবেকানন্দের সমস্ত চেতনাও এই সমন্বয়বাদী চেতনা।

তিন

বর্তমান ঘটনাও বিভিন্ন আদর্শগত চেতনার ফল। চীন তার বর্তমান চেতনা পেয়েছে গৃহযুদ্ধের মারফৎ। শক্তির মারকতা এমনই বস্তু যে, সব সময় জোর যার মুলুক তার চেতনায় তারাই সে সমস্ত কিছু মীমাংসা করতে চায়। আর রাষ্ট্রও এমনই একটি জিনিস যে তার আওতায় যারা আসে তারা সব সময় এই ধারণা করে নেয়, সমস্ত শক্তির উপকরণ তার হাতের মুঠোয় স্তিমিত। লেনিনের মৃত্যু আকস্মিক, এবং লেনিনের ইচ্ছেও ছিলো, তাঁর অবর্তমানে

ট্রটস্কিরই রাষ্ট্র চালাবার অধিকার থাকবে। কারণ ট্রটস্কির চেতনার ছিলো মনের প্রসারতা এবং এই প্রসারতা জ্ঞানের মারফৎ-ই এসেছিলো। আর জ্ঞান এমনই একটি বস্তু যাকে কেউ পশুত্বে নামিয়ে আনতে পারে না। যে কোন সভ্যতার অবদান হচ্ছে, তাদের অবদানে বিভিন্ন বহুদেশের জ্ঞান এসে যুক্ত হয়, গ্রীক সভ্যতারও তাই বিশেষত্ব। গ্রীক ও এশিরিয়দের ভিতর দুই শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের অবদান এখন পর্যন্ত সাধারণের পাঠ্য হিসাবে স্বীকৃত। গ্রীকদের কথা এইজন্যেই উল্লেখ করা হলো যে, গ্রীকদের অবদান গণতান্ত্রিক, কিন্তু আলেকজান্ডারের সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিচ্যুতি ঘটেছিলো এবং এই বিচ্যুতিই তাকে সাম্রাজ্যবাদের নেশায় মাতাল করেছিলো। যতই মানুষ প্রজাতন্ত্রের আওতা থেকে সরে আসবে ততই তাকে পশুত্বে নেমে আসতে হবে, ততই সে নিজের প্রয়োজনের জন্যে একটির পর একটি হত্যা করে যাবে।

রাষ্ট্র সেজন্যে এমনি একটি পদার্থ, যার ভিতর কূটনীতি শয়তানি যেমন জড়িয়ে আছে তেমনি জড়িয়ে আছে ত্যাগ তিতিক্ষা। প্রজাতন্ত্রজনে রামচন্দ্র এজন্যেই আমাদের কাছে একটি আদর্শ, অশোকের পূর্ব ইতিহাস থেকে পরের ইতিহাসই পৃথিবীর চেতনায় ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ তৈরী করেছে। কিন্তু শক্তি এমনই একটি বস্তু, সে মানুষকে অহমিকার পঙ্কে নীচে নামিয়ে আনে। হিটলার মিসো বা কালাপাহাড় বংশের মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। ষ্টালিনও নিজের প্রয়োজনের জন্যে প্রতিপক্ষদের হত্যার কারণ হয়েছে, নিরোর ভয় কী ষ্টালিনের ভিতর সংক্রামিত হয়েছিলো, এদিক থেকে ষ্টালিন ও হিটলারের মধ্যে কী সাদৃশ্য! কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রয়োজন যেমন জার্মানীতে হয়েছিলো, তেমনি রাশিয়ায় হয়েছে, তেমনি চীনে। প্রশ্নটা এইভাবে করা যায়, সিদ্ধান্তে পার্থক্য থাকলেও পদ্ধতিতে কী মিল!

রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমাদের মনে পড়ছে, মতান্তর হোক যেন মনান্তর ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মার অনেক বিষয়েরই মিল ছিলনা, কিন্তু মনান্তরের কথা তাঁরা মুহূর্তেরও চিন্তা করতেন না, বরঞ্চ উভয়ে উভয়ের প্রতি 'মহাত্মা' 'গুরুদেব' বিশেষণ দেওয়া আমাদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মার মতবিরোধ ছিলো, কিন্তু শ্রদ্ধা ও স্নেহ উভয়ে কি অক্ষুণ্ণ ছিল। জহরলাল প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলতেন, আমরা দুই যেমন যমজ।

এই মতপার্থক্য জহরলাল বরদাস্ত-এ ছিলো। কিন্তু মতের পার্থক্যের জন্যেই ট্রটস্কির মৃত্যু আমাদের কাছে কি বেদনাদায়ক স্মৃতির কথা মনে করায়। এই বিরুদ্ধতার কারণ কী? ভারতবাসীরা শিখেছিল, বিরুদ্ধতার মধ্যেই ঐক্য যাতে সকলের জন্মগত অধিকার। অনেকে বলতে পারেন, মার্কস্‌বাদও বিরুদ্ধতার মধ্যে ঐক্য খোঁজে, কিন্তু বাস্তবে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য!

কথাগুলো নানাকারণে চিন্তা করতে হয়। মার্কস্ যেমন অর্থনীতির ওপর জোর দিয়ে তাঁর প্রমেয়গুলো দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁর ধারকরাও রাষ্ট্রের ওপর জোর দিয়ে চলতে চাচ্ছেন। রাষ্ট্র ছাড়া জীবনে যেন আর কোন সাম্বনিক চেতনা নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে সব কিছু যুক্তবদ্ধ করার ষ্টালিনের কি আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিলো। রাষ্ট্রের শক্তি হাতছাড়া হয়ে যাতে না যেতে পারে তার জন্যে ব্যারিকেড নির্মাণ। এবং একটি প্রচেষ্টা চৈনিক সাম্যবাদের অন্তর নীতিতে। সমস্ত কিছু ভেংগে চুরে রাষ্ট্রই একমাত্র, এই নীতি চালু করবার জন্যে একই পদ্ধতি সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষই ঈশ্বর, ফায়ারবাকের এই প্রমের শেষ পর্যন্ত ভাববাদে পৌঁছে যায় বলে মার্কস্ সেই পদ্ধতি বাতিল করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্র-স্বাধীনতার এই প্রচেষ্টা কোন বাদে পৌঁছোয়? ব্যক্তিপূজা ষ্টালিনী আমলে চালু হয়েছে, এবং সেই ব্যক্তিপূজা চীনাত্মে।

শুধু মার্কস্ নিজেই এর উদ্গাতা ছিলেন, তাঁর ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলিটারিয়েট বাক্য এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ইন্ধন জুগিয়েছে। নাজীজম্-এও রাষ্ট্র-প্রাধান্য ছিলো, এবং সেই বাদই হিটলারকে যুদ্ধবাজ হবার নেশায় মাতিয়েছিল, কি আশ্চর্য পরিণতি! মার্কস্‌বাদ এই পরিণতির বিরুদ্ধ-দর্শন হলেও তাঁর শিষ্যরা সেই বৃক্ষের ভিতরই আত্মনিমজ্জন করেছেন। হয়ত বীজ তাতে নিহিত ছিল। গণতান্ত্রিক রীতিগুলো বিচার করলে দেখি, সহনশীলতা মানুষকে কত ব্যাপকভাবে চিন্তার অধিকার দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক সত্যের একটি চমৎকার নিয়ম র‍্যাসেল বর্ণনা করেছেন—তোমার আদর্শের ভিতর কতগুলো সৎ নিয়ম আছে, তা বুঝবার জন্য সর্বদাই তুমি প্রতিপক্ষের যাচাই হও। জহরলাল এই কারণের জন্যেই বারবার শক্তিশালী বিরুদ্ধ দলের কথা বলেন; তার কারণ তাঁর চাই রাষ্ট্রপদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে অশোকচক্র—যার আসল সত্য হলো অন্যের মতের ওপর শ্রদ্ধা দোষণ করা। আমরা বারবার দেখেছি, ভারতবর্ষে অনেক বিরুদ্ধ মত ও পথ বিরাজ করলেও যুদ্ধ থেকে নিজের দেশকে দূরে রাখবার জন্যে তার আন্তরিক

চেষ্টাই ছিলো। ক্রুশ্চেভের মত কিছুটা সহনশীল হলেও, কিছুমাত্র ব্যতিক্রমের জন্ত তাঁর মন্তব্য কিরকম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ পেয়েছি কিছুদিন আগে কিছু শিল্পীকে তাদের এক্সপ্রেসনিজম-এর প্রচেষ্টার জন্তে তাঁর কাছে কি পরিমাণে ধিক্কৃত হতে হয়েছে, এবং এরেনবুর্গ এর সহকর্মি ছিলেন বলে কি রকম ধিক্কার লাভ করেছেন। পিকাসোর ছবি সাধারণে বুঝতে না বলে, সেখানে পিকাসোর জন্মাবার অধিকার নেই। ষ্টালিন আমলের পদ্ধতি সম্পর্কে এরেনবুর্গের 'রাইটার্স এণ্ড রাইটার্স' বই-এর অভিমতগুলো আমরা স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধিজীবীদের কী এই বিপদ? বিপদ, চিন্তার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপে?

স্বাধীনতার জন্তে আমরা বৃটিশ আমলেও যুদ্ধ করেছি, এবং এই যুদ্ধ বোধ হয় প্রত্যেক দেশেই এবং প্রত্যেক যুগেই চলে। আমরা যখন দেখি, একটি দেশ হামলা করতে চাচ্ছে আর তার প্রত্যেক পরিণতিই ধ্বংসাত্মক তখন যে কোন আদর্শগত মানুষের মন সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। চীনের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক শ্রীতান্ যুন সানের অভিমত চাওয়া হয়েছিলো এবং তাঁর উত্তর এই ছিলো:

'আমি রাজনীতি বুঝি না। রাজনীতির বিরোধ-মিলনের অতীত বিষয় নিয়েই আমার কাজ। সুতরাং এ সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। শুধু এই দুর্দিনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে দাও, পৃথিবীতে শান্তি আনো। ...গুরুদেবের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমরণ তাঁর নির্দেশিত পথেই চলবো।' (সুধাস্তরে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতনের চিঠি' থেকে, ডিসেম্বর) এবং পত্রলেখকের মন্তব্য:

'বলতে বলতে অধ্যাপকের গলা ধরে এলো। আর কোন প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল না, সঙ্গতও ছিলো না।'

আমাদেরও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, শুধু সংযোগ করতে পারি, সুস্থ মন ধ্বংসের প্রকৃতি দেখে যন্ত্রণা পায়; এ হচ্ছে সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের পরিচয়।

চার

আমরা বুদ্ধিজীবীরা চীনকে বিশ্বাস করেছিলুম। বিশ্বাস করেছিলুম মানবতার অন্তর্নিহিত সত্তা শুভবুদ্ধিকে। কিন্তু চীনের প্রয়োচনা আমার এই সংকেতই দিচ্ছে, আদর্শের সংঘাত আবার আরম্ভ হলো। এবং আমরা বুদ্ধিজীবীরা

সেই আদর্শগত চেতনা নিয়েই ভাবি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে চীনের বর্তমান কার্যকলাপের ওপর রচিত কবিদের কয়েকটি প্রবন্ধ নজির হিসেবে রাখলে বোঝা যাবে :

১. 'ধন্যবাদ তোমাকে, সন্ধিসূত্রি শঠতা !
আমার তুমি চমকালে।
ভুলতে বসেছিলুম হয়ত, যে
শিবশক্তি অভেদ
অবিরোধী মানে নিবীর্য নয়।
শুধুই মেষ হ'তে চেয়েছিলাম হয়ত
—করুণা কোমল ধারা আর লঘু গম্ভীর শোভা।'
'বসুধা কুটুম্ব ভেবে মন
ছিল খুশে, তুমি তাকে জাগালে ঘৃণায়,
সে মনোবীণায়
আজ শুধু বাজে রুদ্রতাল।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য)
'যাদের হয়ে আমরা অনেক লড়েছি
যাদের হয়ে আমরা অনেক বলেছি
আমরা যাদের দু'হাজার বছর ধরে
পরম বন্ধু মনে করে এসেছি
এই কি সেই দেশ ?'

প্রবীণ কবিদের পাশে কনিষ্ঠদের চরণ :

১. 'উত্তর যৌবনে আজ বাষট্টির উত্তুরে বাতাসে
আবার মৃত্যুর হিংসা, বারুদের গন্ধ ভেসে আসে।'
'এতদিন ওরা মুখোস পরেছিলো
মুখোসটা খড়ের তৈরী, ফাঁপা।' (অরুণ ভট্টাচার্য)

৩. 'যদিও আমি শপথ করলাম
যদিও আমি সহোদরের নাম
এখন থেকে ভুলে থাকবো তবু
তোমার নদী, তোমার মাটি, তোমার স্মৃতি, চীন।—
বুকের মধ্যে জীবন যন্ত্রণা।' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এবং স্তবকগুলোর ভিতর কী গভীর আশাভঙ্গ, ঘৃণা, যন্ত্রণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোন কবি যদি এই কথা বলে তবে ভুল কোথায় ?

'এসো তোমরা এই পথের ওপর এসে দাঁড়াও।
এসো তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই হাওয়াকে একবার
ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে ওঠো
মা আমার ! মা আমার !' (বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এবং একেবারে নবাগত কবি আরো স্পষ্ট ক'রে ডাক দেয় :

'১৯৪৪ : পক্ষীদের সমর্থন ক'রে
আমরা তোমাকে স্বাগত জানিয়েছি
জনতা তোমাকে বলেছিলো
আমরা তোমার ভাই !
১৯৬২ : আজও আমরা দাঁড়িয়েছি
কঠিন একটা প্রত্যয় নিয়ে
তোমাকে স্বাগত জানাবো বলে বুলেটে,' (শান্তনু দাস)

আমাদের অতীত আত্মার স্মৃতি নিয়ে বুকের মধ্যে এই যন্ত্রণা ওঠে 'বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে এখন রক্তমুখে এগিয়ে যাচ্ছি কুরুক্ষেত্রে, চীন।' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এবং স্পষ্ট আদর্শের কথা যখন এই ভাষে ব্যক্ত হয় : 'আমার আকাশ নীল, তোমার আকাশ থাক লাল।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য) ; তখন বুঝি সে চেতনা কত গভীরে। লাল-এর প্রতীকগত অর্থ রক্ত, কিন্তু নীল। আবার চীনাভবনের অধ্যক্ষের সেই কথাই স্মরণ করি—গুরুদেবের বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস হ'ক ! কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস এবং পৃথিবীর বলাকা কোনদিকে যেতে পারে।

যুদ্ধ শান্তি ও মানবিক
সেরকম তেরোটি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মাতৃভূমি

সমস্ত পৃথিবী এক দেশ করো,
সমস্ত পৃথিবী
মানুষের মাতৃভূমি করো।

না হলে এ যুদ্ধের যন্ত্রণা
থামবে না।
কেননা এশিয়া জুড়ে কয়েকশো কোটি মানুষের
সারা রাত এর-ওর পিঠে কাঁধ রেখে
ঘুমবার মত মাটি নেই।

কেননা সত্তর কোটি মানুষের মাতৃভূমি চীন
এখন মাটির জন্য
দক্ষিণে, পশ্চিমে তার সকল ভাইকে অনায়াসে
গলা টিপে মারতে পারে।

কেননা সত্তর কোটি মানুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষে-ও
মাটির জন্য হাহাকার
রাস্তায়, স্টেশনে, ফুটপাতে উন্মাদের
মাতালের, ভিক্ষুকের বুকের মধ্যে কান পাতলেই
গর্জনের মতো শোনা যাবে।

উত্তরসূরী

এখনও আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া
জাতি ধর্ম বর্ণ নিরপেক্ষ মানুষের
স্বদেশ যদি না হয় ;
সামনে ভীষণ যম চতুর্দিকে যুদ্ধের দামামা
বাজাবেই। কেউ রুখতে পারবে না তাকে।

সমস্ত পৃথিবী এক দেশ হবে ; যদি মানুষের জন্য
সামান্য করুণা বুকে থাকে।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চীন ১৯৬২

হাতে ছিল শুধু স্নিগ্ধকাঙ্ক্ষিত বীণা
সদা সুভাষিত মৈত্রীর গান তাতে,
প্রীতি-আবদ্ধ ছিলাম—ছিল না ঘৃণা,
দু'টি ফুল একই বৃন্তের যৌতাতে।

দুর্গম ধবল পর্বতে বন্ধুর
বহু বাধা ঠেলে পায়ে-পায়ে এসেছেন
মৈত্রীমন্ত্রের গান গেয়ে-গেয়ে দূর
এই মাটিতেই একদিন কা-হিয়েন।

শতাব্দ গেছে, তারপর শত-শত
এসেছে শ্রমণ এবং ঘুরেন সারা,
প্রেমে নন্দিত, তবু কেন উদ্যত
চোখ মেলে কের মৃত চেঙ্গিস খান্ ?

সময় গড়ায়, শুধু এক পরিহাস
চিহ্নিত থাকে ; অযোমুখ ইতিহাস।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

যুদ্ধের কবিতা : সকলকে

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
যখন দিনের আলোকে আড়াল করল
আমাদের জন্মসত্ব ঐ সূর্য ওঠা প্রকৃতিতে স্ফূর্ত
বাগানের ফুলগুলি, শিশুর হাসি যৌবনের স্বপ্ন
আমাদের যা ছিল যা হবে, ছিনিয়ে নেয়.
ছিনিয়ে নেয় যারা
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধ।

আমাদের নিঃশ্বাস বৃথাই বইবে না
বৃথাই না আমাদের অস্থির অস্তিত্ব
যত বারুদ জমবে. খুন। মৃত্যু আগুন
আগুন মৃত্যু যত বারুদ জমবে যত ;
বৃথাই বইবেনা। আমাদের রক্তে
যুদ্ধ. যুদ্ধ, যুদ্ধ।

শান্তির কবিতা : তোমাকে

অনেক দূর থেকে তোমাকে ভাবতে ভাল লাগে
তুমি যে কী সুন্দর আমি তুলনা পাই না।
এখন বিষণ্ণ বেলাগুলো আলোয় কালোয়
কখনো আকাশে কখনো এই উঠোনে,
মাটির সীমায় থেমে থাকে, হঠাৎ কখন তারার
সভা থেকে ঢং ঢং ঘন্টা-বাজা তোমার গাড়ী
নেমে আসে ঝড়ে লণ্ঠন-নেভা বাড়ীটার কোনে
কোয়ারা পরীর এক ঝলক নিঃশ্বাস যেখানে
শীত যাখান পাহারা-ডাকা বুক। সময়হীনতায়
দুরন্ত, তোমার তুলনা পাইনা।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্বদেশ আমার

সদর দরজায় থেকো আমি যুদ্ধে যাবো
প্রথম পবিত্র এই মর্মভেদী দুঃখের আহ্বান—
তোমার গলার নীল শিরায় আগ্রহ, আর ছোট বালিকার
আগুনের আঁচ লেগে মুখ জ্বলছে, দুখ তার রক্তের গোলাপ,
দেয়ালের ছবি পেড়ে অম্লিমালো বিভূষিত করো
বাড়িটার এক কোণে মূর্ছান্বিত রেখো বিষ-ফল
পোষা পাখি অন্য কিছু বলে উঠবে, গাছে ফুটবে অন্য কোন ফুল
তোমার শঙ্খের শব্দ ভীরু রেখো সমস্ত সময়.....

আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাও একবার
বারুদের গন্ধে বড় প্রিয়তম বিচ্ছেদের স্বর
লক্ষ প্রতিবাদী হাতে বজ্রমেঘই যেন অঙ্গীকার
লক্ষ পায়ে মুহূর্তেই অতিক্রান্ত সহস্র যোজন।
যুদ্ধ, ফুল, রক্তকণা, ঘরবাড়ি, স্বদেশ আমার.....
ঘরের গভীরে থেকো বন্ধ ঘরো ভিতরে বাহিরে!

অনিরুদ্ধ কর

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

এক

তোমার মৃন্ময়ী রেখা স্পর্শ করতে গিয়ে
একসঙ্গে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের পৃথিবীর
দেহের আদিম তাপ স্পর্শ করি বাষট্টির শীতে।
সমস্ত সীমানা আজ ভেঙে ফেলে স্থির
নিরন্ত বিশ্বাসখানি উড়ে যায় দীর্ঘ উঁচে যায়
উড়ন্ত ছায়ার মধ্যে সমগ্র অতীত পূর্বপুরুষেরা কথা বলল।
তোমার মৃন্ময়ী রেখা যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ বেঁচে আছি.....কুমারী দৃশ্যের সহবাসে।
যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের ভিতরে
সময় আবহমান জুড়ে কী ভীষণ কাল নিয়ে রয়ে আছে।

দাঁতের কোকরে তার আটকে আছে
শ্বেত কপোতের মাংস, পাকাশয়ে হীন অজীর্ণতা,
চিন্তায় উদ্ভিট শব্দ ; লম্পট যুদ্ধের
কালেণ্ডারে মধ্যযুগ ঝুলতে থাকে !
জিহ্বার লালায় যদি মানচিত্র আঁকা যায় তবে
তুমি পৃথিবীর পতি।
হায় রে ! রক্তের বর্ণ জানা ছিল
রক্তের স্রোতের কথা কেন তুমি জানো নি বাবর।

স্বদেশ সংস্কৃতি স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথ

যে দেশে আমরা জন্মেছি, যার আকাশ বাতাস নদী নালা আমার বাল্যের সহচর, কৈশোরের ভাবনা, সে আমার আপন। তাকে ভালোবাসা আমার স্বভাব। চিৎকার করে মানুষ যেমন জানায় না সে তার বাবা মাকে, পুত্র কন্যাকে ভালোবাসে, তেমনি চিৎকার করে সে জানায় না দেশকে সে ভালোবাসে। আজকে চারিদিকে সেই চিৎকৃত অঙ্গীকারে তার হচ্ছে, আমাদের স্বদেশকে ভালোবাসার বুঝি বা কিছু খাদ আছে।

আমরা সংস্কৃতিবান, কেননা আমরা মানুষ, জন্তু নই, কেউ কেউ একথা বলেছেন। হয়ত বিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন মূল্যবোধ বিসর্জিত, ঈশ্বর-বিশ্বাসে আমরা পরাঙ্মুখ, ঐতিহ্যে আর আস্থাশীল নই, অথচ নতুন কোন জীবন-আদর্শে স্থিতিলাভ করি নি তখন এই সব কথা আমাদের বহুভাষিত মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি মনকে সংস্কার করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য, শিক্ষা বিনয় চরিত্র এ সকল মানুষেরই আন্তর ধর্ম, শুধুমাত্র ভূষণ বা অঙ্গসজ্জা নয়; সংস্কৃতি একটা আলাদা কিছু পড়ে পাওয়া নয়। প্রতিদিনের জীবনচর্যায় মানুষের সংস্কৃত মনের প্রকাশ ঘটছে। এ ছাড়া সংস্কৃতি কথার অন্য কোন দ্বিতীয় অর্থ নেই। চারিদিকে 'সংস্কৃতি বিপন্ন' 'গেল গেল' এমন রব শোনা যাচ্ছে—এটাও লাজানো বলে বুঝি বা আমার ভ্রম হচ্ছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, আমরা জেনেছি। মানুষ তৎসত্ত্বেও মুক্তির স্বাদ পায় নি। গণতান্ত্রিক মুক্তির পথে হয়ত আমরা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এক, মানুষের গণতান্ত্রিক মুক্তি অন্য। হিটলার-শাসিত ইয়োরোপে একদা জার্মান বা এশিয়া-খণ্ডে চীনবাসী—এদের কি আমরা স্বাধীন বলবো। উপর থেকে চাপানো কোন মতবাদই—সে যতই স্বয়ং-রাজ্য গড়ুক না কেন—মানুষকে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে নি। কম্যুনিজম্ একদিন সেই স্বপ্ন তুলে ধরেছিল। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর মানবতাবাদের আদর্শে তাও ইতিহাসের কোন এক অন্ধকার বিগত ঘটনা মাত্র।

গণতন্ত্রের আদর্শকে কম্যুনিজম্ একদা নিজের ধর্ম-স্বরূপ ব্যাখ্যায় করেছিল। কিছু কিছু ভারতবাসীও সেই ধন্দে ভুল বুঝেছিল—অনেক পণ্ডিতরাও ভুল করেছিলেন। কিন্তু কোন কোন দূরদর্শী মনীষী তখনই বুঝেছিলেন কম্যুনিজম্-এর আদর্শ গণতন্ত্রের আদর্শ থেকে বহুদূরে। এরা দুই বিপরীত মেরুতে। ভারতবর্ষের কাছে কম্যুনিজমের আদর্শ মুক্তির বার্তা আনতে পারে নি—কেন না এদেশের ঐতিহ্য চিরকালই বলেছে, মানুষ অমৃতের পুত্র। সুতরাং সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। বাইরের কোন শক্তি মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখতে পারে না। আমরাও, প্রতীচ্যের মত, বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী—কিন্তু এই বস্তুতন্ত্র মানুষের শুভ বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে—নৈতিক মূল্য ও মানবিক প্রেরণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হবার অপেক্ষা রাখে; ভোগবাদ ও ত্যাগ—কোনটিই এককরূপে গ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাজ্য নয়। ব্যক্তিই রাষ্ট্রের ভিত্তি—এ হেন চিন্তাই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রথম পাঠ।

আজকে চীনের ভারত দুখণ্ড আক্রমণে আমাদের এই সকল কথা ভাবতে হবে। উনিশ শতকীয় স্বাদেশিকতায় উজ্জীবিত হবার দিন আর নেই—কেন না তথাকথিত জাতীয়তাবাদের শুভ লগ্ন বহুদিন গত হয়েছে। কম্যুনিষ্ট আদর্শও সেই জাতীয়তাবাদকে লালন করে আসছে দেশে দেশে। বিশ শতকীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবতাবাদী ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে এর কোনটিই আমাদের আজ গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের স্বদেশ-চিন্তাকে নতুন রূপ দিতে হবে। উচ্ছ্বাসে দেশপ্রেম নেই, দেশপ্রেম আছে জ্ঞান কর্ম ও যুক্তিবাদের শুভ সমন্বয়ে।

শিল্পী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব কি নতুন কিছু? আজ চীন আক্রমণেই কি তাঁরা দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলেন? একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে কম্যুনিজমের স্বপ্ন-সৌধ, মাত্র এ দুটি পথই কি তাদের সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল? যে সব মনীষীরা বহু পূর্বেই, এদেশে ও বিদেশে, এর ভয়াবহ সম্ভাবনাকে লোকচক্ষুর সামনে যুক্তি তর্ক ও গভীর চিন্তার দ্বারা উপস্থাপিত করেছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁরা কি কোন খোঁজই রাখেন নি? আমার তো মনে হয়, গণতান্ত্রিক যুক্তি-কামী প্রত্যেক লেখকের—যাঁরা স্বাধীন স্বকীয় চিন্তার

অধিকারী,—তাঁদের চিন্তার ধ্যানে, শিল্প বা সাহিত্যকর্মের মধ্যে চিরদিনই এই মুক্তির কথা বলে এসেছেন। আজ কেউ কেউ নতুন করে এসব কথা বললে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে আসে, এতদিন তাঁরা অন্ত কিছু বলেছিলেন কি?

একথা মনে রাখবার দিন এসেছে আজ, দেশাত্মবোধ এক, মানবপ্রেম অন্ত; জাতীয়তাবাদ এক, গণতান্ত্রিক মুক্তি অন্ত। আমরা যেন হুজুগে পরে মানবতাবাদী ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট না হই। একনায়কত্ব যদি গণতন্ত্রের মুখোস পরে কোন দেশে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কোন দেশ যদি বন্ধুত্বের পরিবর্তে শত্রুবৎ আচরণ করে তবে সে মুখোস আমরা টান মেরে খুলতে দ্বিধা করবো না; কিন্তু উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদে—যে-জাতীয়তাবাদ একদা শিক্ষা দিয়েছিল বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর শ্রেয়—ফিরে গেলে, প্রতিরোধ আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা শুধু চ্যাপটা নাক খ্যাবড়া মুখ বলে গালাগালি দিতে পারব মাত্র। তাতে না ভারতবাসীর গৌরব, না কবি শিল্পীদের সম্মান!

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ১৬-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক কেশন প্রেস, ৭, ভাগবত দেন ও শ্রীবৃন্দাবন প্রেস, ১৮৬১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়

প্রবন্ধ

দিলীপকুমার রায় : প্রেমের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ২৬৭। সুরোজিৎ দাশগুপ্ত। জন্মশতবর্ষে ২৭১। অরুণ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের গান, ছন্দ ও মনের আবেদন ৩০১। শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়। সুনীল মুখোপাধ্যায় (বিয়োগপঞ্জী) ৩৫০।

কবির ভাষ্য । কবিতাবলী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৯২। অরুণ ভট্টাচার্য ২৯৭।

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী সঞ্জয় ভট্টাচার্য গোপাল ভৌমিক রাজেন্দ্রীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সুশীল রায় পূর্বেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য অনিল চক্রবর্তী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আলোক সরকার লোকনাথ ভট্টাচার্য মানস চৌধুরী শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় শেফালি সোম প্রকাশ ভট্টাচার্য দেবেশরঞ্জন দত্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত অশ্রুকুমার সান্যাল হারাণচন্দ্র রায় বিবেকানন্দ পালিত, অলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর কর শান্তি লাহিড়ী পরিমল চক্রবর্তী বন্দিতা মাইতি অমিতাভ দাশগুপ্ত অশোক মুখোপাধ্যায় মনোজেশ মিত্র বাসুদেব দেব সঞ্জয় মজুমদার রূপেন্দ্রনাথ দেব অশোক চট্টোপাধ্যায় সন্তোষ চক্রবর্তী গণেশ বসু তাপস গুপ্ত (৩১৮-৩৫২)

বিদেশী কবিতা

একটি আধুনিক ওয়ালী কবিতা : নলিনীকান্ত গুপ্ত। গারসিয়া লরকা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল ভালেরি। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ধরিত্রী পাবলোনেরুদা। নচিকেতা ভরদ্বাজ। হাইমান্ হেস্। অমিত দত্ত (৩৫৪-৩৬২)

সমালোচনা সাহিত্য

অশ্রুকুমারের গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। উত্তরসূরী সান্যাল সম্পাদিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা। জনৈক ধান (৩৬০-৩৭৩)

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের দুটি গান, পরিবেশনায় অসংগতি : জীবেন্দ্রকুমার গুহ (৩৭৪-৩৭৭)

সম্পাদকীয় দপ্তর। ১বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও স্থপতি

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম, আর, এ, এস-এর

কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ

The Swami Vivekananda - a Study

Rs. 3·00

বিবেকানন্দ-চরিত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদান নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা। লেখক বৈজ্ঞানিক সুলভ বুদ্ধিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখেছেন বেদান্ত-কেশরীকে।

উড়িষ্যার দেব দেউল

টা ৪·৫০

আর্য-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উড়িষ্যার মন্দির-মন্দির। এদের প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতির আলোচনা, পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতির সাথে তুলনামূলক বিচার এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রচারিত ভ্রান্তমতের যোগ্য প্রত্যুত্তর। বাংলাভাষায় একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর (যন্ত্রস্থ)

ভারতীয় জীবন ধারায় ইংরাজি ভাষার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অপূর্ব ফলশ্রুতি।

কলেজ্টোলা পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক :—

ইষ্টার্ণ এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০

প্রেমের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

দিলীপকুমার রায়

আমার "স্মৃতিচারণ"-এর প্রথম ভাগে আমি লিখেছি ২৪ পৃষ্ঠায় যে, পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল আমার ওস্তাদি গানের গোঁড়ামি দেখে হেসে বলতেন: বাঙালী হিন্দুস্তানী গান থেকে সুর নেবে বাংলা গানকেই বড় করতে, হিন্দুস্থানী ওস্তাদ হয়ে নাম কিনতে নয়। "কারণ"—বলতেন তিনি—"বাঙালী হল স্বধর্মে ও স্বভাবে কবি ও স্রষ্টা, ভাবপ্রবণ—ওস্তাদিপ্রবণ নয়। তাই আমাদের কাছে নিছক ওস্তাদি পরধর্ম।"

একসময় আমি রুখে উঠে তর্ক তুলতাম: "কেন বাবা? সুরেন মামা?" (বিখ্যাত খেয়ালী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

পিতৃদেব হেসে বলতেন: "তিনি যত বড় গাইয়েই হোন না কেন রে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁকে লোক ভুলে যাবে।" আমি রাগ করে বলতাম মরীয়া হয়ে: "সে তো সবাইকেই যাবে।" তাতে পিতৃদেব বলতেন: "না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস? এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি বা বাঙালীর প্রাণের জিনিস—সুরে বাঁধা গান। আমি যে সব গান বেঁধে গেলাম—সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।"

আজ দ্বিজেন্দ্রলালের শততম-জন্মবার্ষিকী-উৎসবের দিনে তাঁর এ-ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ করেই স্মরণীয়। কারণ আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী অবদানের মূল্যায়নের সময় এসেছে। তাই মনে রাখা ভালো: নিজের বহুমুখী প্রতিভার যে-স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ তাঁর গানের খাতে বয়ে চলেছিল তার ধারা যে কালাতিপাতে "মরুপথে হবে না হারা" এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় ছিলনা। প্রতিভার একটি অভিজ্ঞান—আত্মপ্রত্যয়। তারই

আলোকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর গানের মধ্যে চিরন্তন ভাব ও রূপের এমন এক পরম সমন্বয় হয়েছে যার ফলে তাঁর গান রসোত্তীর্ণ তথা কালোত্তীর্ণ হবে। অবশ্য রসোত্তীর্ণ মানেই কালোত্তীর্ণ—ঋতিরে। অর্থাৎ খাঁটি কারবার ও সুর-সৌরভের মিলনবাসরেই গানের ফুলশয্যা। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ফুলশয্যার সঙ্গীতসম্ভার আহরণ করবার শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন বীণা-পাণির বরেই। সুর ও গানে স্বয়ংসাচী হওয়ার এ-প্রতিভা জন্মলব্ধ না হলে এ-জাতীয় আত্মপ্রত্যয় জাগে না। এ-কথার প্রমাণ মিলবে সহজেই। আজকের দিনে অগণ্য কবিই তো কবিতা লিখছেন, গান বাঁধছেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা বেশ জানেন মনে মনে যে, যেসব "সৃষ্টি" নিয়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িক মাতামাতি করছেন সে-সব সৃষ্টিতে কাল দু-দশ বছরের বাদেই অনাসৃষ্টি উপাধি দিয়ে বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়ে দেবেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল জানতেন—তিনি এ-জাতের কবি ছিলেন না, জানতেন—তাঁর মধ্যে আছে সুরের আগুন, গানের গোলাপ।

এ-গোলাপ সুবাস ছাড়তে সুরু করে তাঁর বারো বছর বয়সে—যখন তিনি চাঁদ দেখে গান বাঁধেন: "গগণ ভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী, কোথা যাও নিশা-নাথ হে নীলনভোবিহারী!" শুধু গান বাঁধা নয়, তাতে স্বকীয় মনোহর সুর দিয়ে গাওয়া[১]—যা শুনে তাঁর পিতৃদেব—আমার পিতামহ—বিখ্যাত ওস্তাদ কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি যশস্বী হবেন।

এ-গানটি ছাপা হয় তাঁর আর্যগাথা প্রথম ভাগে ১৮৮২ সালে। তাঁর বয়স যখন উনিশ বছর। আর্যগাথায় আরো কয়েকটি প্রকৃতিসঙ্গীত ছাপা হয়েছিল—একটি নক্ষত্র, নীহার, মেঘ, গিরিনির্ঝরিণী প্রভৃতি। কিন্তু এ-গান-গুলি তিনি গাইতেন না, কেন না জানতেন এরা রসোত্তীর্ণ হয়নি। আর্যগাথা প্রথম ভাগে তাঁর নানা ঈশ্বর স্তুতি ও স্বদেশী গান সম্বন্ধে একথা বলা যায়। এসব গান এখন ছাপা হয় যেমন অন্য বড় কবিদের লেখা ছাপা হয়—প্রতি জাতির সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রাখবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বার বার বলতেন—তাঁর শৈশব রচনাগুলি ছাপা হয়ে গেছে বলে সর্বনাশ হয়েছে—ভবিষ্যতে তাঁর অনুরাগিবৃন্দ খুঁজে খুঁজে তাদের বার করবেনই করবেন। অতীতের ছেলেমানুষি লেখা দেখে কোন সাহিত্যিক না লজ্জায় মাথা হেঁট করেন—"আমি এইসব লিখেছিলাম!" ভেবে।

তাই দ্বিজেন্দ্রলালও জানতেন কোথায় তাঁর কোন কোন গানে বীণাপাণির ছোঁওয়ার আলো ফুটে উঠেছিল: যথা, তাঁর প্রেমের গানে। আর্যগাথা দ্বিতীয়

১। এ গানটি আমি গ্রামোফোনে দিয়েছিলাম ও এর সুরে যন্ত্র সঙ্গীতজ্ঞরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ভাস প্রকাশিত হয় দশ বৎসর পরে ১৮৯০ সালে। অমনি ফুটে উঠল কথা ও সুরের মিলনে ফুলের তারা। তিনি লিখলেন ভূমিকায়। "এ-দশবৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠ্যাবস্থাপন্ন, অনূঢ়...বালক নই—

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো?
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।"

এই গানটির মধ্যে ফুটে উঠেছে প্রেমের ছোঁওয়ায় আলোর উদ্ভাস। কবিতা অমনি শিক্ষানবীশ বালকের খসড়া থেকে রসোত্তীর্ণ পদে উন্নীত হল। এক কথায়, প্রেমের গানেই তাঁর প্রতিভা প্রথম নিজেকে খুঁজে পেল।

অবশ্য আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগের সব গানেই নয়—তবে শ্রেষ্ঠ গানে। এ-গানগুলি আমি "দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়নে" পেশ করেছি তাঁর শততম জন্মোৎসবের একটি উপচার হিসেবেই। এ-সংকলনে "প্রেম"-পর্বে চল্লিশটি গান আছে যে-গুলি সুর ও কথার মিলনে সার্থক সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য হবে একথা মনে করার যথেষ্ট একাধিক সঙ্গত কারণ আছে। প্রধান কারণ—গানগুলির মধ্যে কবির প্রতিভা, ছান্দসিকের ছন্দকুশলতা ও প্রেমিকের আন্তরিকতার ত্রিবেণী-সঙ্গম হয়েছে।

আমাদের বাংলা দেশ গানের দেশ—একথা আমি নানা প্রবন্ধেই লিখেছি, নানা ভাষণেই গান গেয়ে আরো প্রাঞ্জল করবার প্রয়াস পেয়েছি। এযাবৎ আমাদের গানের দুটি ঠিকানা হয়েছে বাংলাদেশে। এক, ভক্তি সঙ্গীতে মাতৃ-নামে—শ্যামা কালী তারা দুর্গার পায়ের অর্ঘ হিসেবে; দুই, রাধাকৃষ্ণ লীলায় —বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে অন্য সব গানের তুলনা করলে একটা কথা মনে না হয়েই পারেনা: যে রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রমুখ কয়েকজন শাক্ত কবির কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হলেও অধিকাংশে গানই কালের বিচারে মজুত হয় নি। তাই এসব গানের সংকলন আজো মিললেও সে সব গানে কারুরই হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে না। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য উদ্ভাস চোখে পড়ে: বাঙালী ভক্ত কবি ভক্তি ছাপিয়ে উঠেছেন প্রেমের যমুনা-পুলিনে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর বহু কীর্তনেই আজো আমাদের হৃদয় দলে ওঠে, চোখে জল ভরে আসে।

চণ্ডীদাসের:

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়ে কলঙ্কের হার গলায় পরিয়ে সুখ,

জ্ঞানদাসের :

তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে
হেন মনে হয়—ওদুটি চরণ সদা নিয়ে রাখি বুকে,

বিদ্যাপতির :

জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন ন গেল।

গোবিন্দদাসের :

সুন্দরি রাধে আওতে বনি ব্রজরমণিগণ মুকুটমণি

রাধামোহন, কবিবল্লভ, শশিশেখর, যদুনন্দন বলরামদাস, নরোত্তমদাস ..... আরো কত কবিই যে বেঁধেছেন রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে আশ্চর্য গান যা প্রেমে রসে ভাবে রূপে ঝলমল করছে।

এ কেমন করে হল ? না, এক এক যুগ বহুর মধ্যে এক একটা অভ্যুদয় হয় বলে। এহেন যুগকে ফরাসী ভাষায় বলে—Renaissance : কোনো শিল্পের বা ভাবের নবজন্মোৎসব। বৈষ্ণব কবিদের যুগে ভক্তির মন্দিরে ঝলকে উঠেছিল প্রেমের নবজন্ম।

এখানে আমাদের সকলেরই যে-কথা মনে হয়—মনে না হয়েই পারে না বলে—সে-কথাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর একটি অবিস্মরণীয় কবিতায় —সেটি পিতৃদেব সোচ্ছ্বাসে পড়তেন আমাদের কাছে বিশেষ করে তাঁর (ও রবীন্দ্রনাথের) প্রিয় বন্ধু শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে কাব্যালোচনায়। পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই : রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাটি চিরস্মরণীয় থাকবে। একথা বলতেন কেন বুঝিয়ে বলা বাহুল্য, কারণ এ-আনন্দময় উপলব্ধিটি আমাদের কাছে আজ স্বতঃসিদ্ধ সত্যেরই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে (রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ভাষায়) :

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে—আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

এ-উপলব্ধিটি যে সত্যের সত্য একথা সে প্রেমিক বা প্রেমিকা জানেই জানে যে প্রিয়তমা বা প্রিয়তমকে ভালোবাসবার পর ঠাকুরকে ভালোবেসেছে। কারণ তখন সে দেখে যে, মানবিক প্রেমের মধ্যেও ভাগবত প্রেমের সৌরভ বিজড়িয়ে থাকবেই থাকে যেমনি সে-প্রেম আত্মহারা হয়ে বলে : আমি না—তুমি তুমি। বিশুদ্ধ প্রেম হল : তৎসুখসুখিত্বম্—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার মানেই আমার মান, তোমার রূপেই আমার রূপ।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাবকবি তথা স্বভাবপ্রেমিক। কাজে তাঁর এ-দুটি প্রবণতাই তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল প্রেমের কবি-র এই পুণ্য রসলোকে। দেবতাকে যে-ভক্তি তিনি নিবেদন করেছিলেন সেই ভক্তিই প্রেমের উপচার জুগিয়েছিল তাঁর গানের মন্দিরে। তাই বলতে পেরেছিলেন প্রিয়তাকে লক্ষ্য করে (দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন ২৫১ পৃ)ঃ

লোকালয় বন বিহনে লো তোর, গৃহে আমি রে দরদী
তোরে সঙ্গে লয়ে সংসার ত্যজিয়ে বনে আমি গৃহবাসী রে।

কী সুন্দর সরল অথচ সত্য ভাবরূপ! তার উচ্ছ্বাস সেন্টিমেন্টালিটি হয়ে ওঠে কখন? না, যখন যা অনুভব করি তার চেয়ে বেশি বলি ফাঁক করে —দেখ গো দেখ আমি কেমন ভালোবেসেছি! কিন্তু যে সত্যি ভালোবেসেছে সে যে তার প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতেও রাজি, বনে গিয়ে ঘর বাঁধা তো কোন কথা। আর সে না থাকলে কিসের সংসার? শুধু সঙ্গের সাধ—সব থেকেও সে-দুর্ভাগার কিছুই নেই যে নিখিল বিশ্বে কাউকে খুঁজে পেল না যাকে ভালোবেসে সে সার্থক হতে পারে। তার কাছেই 'লোকালয়' হয়ে ওঠে 'বন'। বটেই তো।

শুধু তাই নয়, ভালোবাসলে সমস্ত জগতের উপর পড়ে সে-প্রেমের প্রতিফলিত দ্যুতি। তখন সে দেখে (সঞ্চয়ন ২৫২ পৃ)ঃ

আমি প্রভাতের ফুলে সাঁঝের মেঘেতে হেরি তোর রূপরাশি,
আমি চাঁদের আলোতে তারার হাসিতে নিরখি তোমার হাসি।

আর সে মনের মানুষকে সাজাতে ইচ্ছা হয়—অথচ হাজার সাজালেও সাধ মেটে না (সঞ্চয়ন ২৫২-৫৩)ঃ

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিয়ে উহারি সঙ্গে রে!
কঠিন হীরা হেম রজতে সাজায়ে পুরে না মনের সাধ রে!

কারণ তাকে দিতে ইচ্ছা হয় যা শ্রেষ্ঠ—এ জগতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ-প্রসাধনে কী হবে? তাকে সাজাব।

জলধিনীলে অঞ্জন করি দিই ও আঁখি অপাঙ্গে বুলায়ে
কুড়ায়ে তারা হীরা ভাতি চারু কণ্ঠে দুল দি দুলায়ে।

আর তাকে মনে হয় আশাতীত বর—পাবো কেমন করে? (সঞ্চয়ন ২৫৩ পৃ)

রাজা কি কিসের আশে ভিখারী দুয়ারে আসে?
জোনাকীর প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা?

কেমন তার চাহনি? সে কি বলা যায়? (ঐ ২৫৪ পৃ)ঃ

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো)
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী অমনি অধীর প্রাণে!

সে যে শক্তি ধরে সব উলটে পালটে দিতে (ঐ ২৫৫ পৃঃ)।

তুই মিস মায়াময়ী, বিরাগিনী রহি দিনকে করিয়া রাতি
পুন হাসি রাশি দিয়ে আঁধার গলিয়ে আইস অরুণভাতি।

এরই তো নাম প্রেমের জাদু। জাদু বই কি—নইলে কি বন্দী হয়েও মনে হয় সার্থক? (ঐ ২৫৯ পৃঃ)

তুমি বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ, পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে!
একি বিচিত্র নিগূঢ় নিগাঢ় মধুর—প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ!

তাই না তার কাছে নত হয়েই নিজেকে মনে হয় ধন্য—শৃংখল আর শৃংখল থাকে না তো (ঐ ২৬০ পৃঃ)ঃ

সে কে? মধুর দাসত্বে যার লীলাময় কারাগার শৃংখল নূপুর হয়ে বাজে!
সে কে? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া যার হৃদিপ্রহেলিকা মাঝে!

তার বিয়োগে সব মনে হয় শূন্য—বর্তমানকে মনে হয় মায়া—অতীতের স্মৃতির আলোয় ম্লান হয়ে আসে বর্তমানের প্রত্যক্ষতাঃ

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার
আজি সহসা হেরিল চোখে কেন বারিধার?
আজ আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়,
আজ আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়।

আর যখন সে কাছে থাকে তখনও মনে জাগে বিস্ময়—এ কি? কাছে পেয়েও পাই নি—দিয়েও সাধ মেটে না (ঐ ২৫৬)ঃ

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর হেথা কি দিব এ ভালোবাসা?
যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই দিয়া প্রেম মিটেনাকো আশা।

সে চাক বা না চাক আমি যে তারই—সে যেখানে থাকুক—যদি চায় ফিরে আসুক—হৃদয় আসনে তার স্থান চিরদিনের ঃ

এ-হৃদি যাও চলি চরণে দলি তার, অথবা তুলে ধরো আমার বলি তার,
রবে সে চিরদিন তোমারি পরাধীন যখনই মনে পড়ে অভাগিনীরে
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

প্রেমের মধ্যে আছে এক অদ্বিতীয় নির্বাচন—এ ও অ নয় কেবল সে, সে যে (ঐ ২৫৮ পৃঃ)

সে-মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে পড়ে মনে?
নিখিল ছাড়িয়ে কেন কেন চাই সেই জনে?

আর আছে আত্মহারা আনন্দ—বিস্ময়-জিজ্ঞাসা কী অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করব তাকে? (ঐ ২৬০ পৃঃ)ঃ

যদি এসেছ এসেছ এসেছ বঁধুহে ধরা করি কুটীরে আমারি,
আমি কি দিয়ে তুষিব তুষিব তোমারে খুঁজিতে না পারি ?

সে যে আমার অতীত, তাই তো এত কুণ্ঠা—পাছে তাকে বরণ করতে গিয়ে অনাদর করে বসি ! (ঐ ২৬০ পৃঃ)

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার আশার অতীত গণি।
আমি আঁধারে পথের ধূলায় মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।

কী অপরূপ উপমা ! যেখানে তার আগমন অসম্ভব ছিল সেখানেই কি না মিলল তার দেখা—এ যে অভাবনীয়—পথের ধূলায় আঁধার রাতে মিলল কি না মনের মণি !

এল আত্মলুপ্তি—absorption—আনন্দ থেকে আবেশ, আবেশ থেকে নেশা, নেশা থেকে ভাবসমাধি—সমাধি ছাড়া আর কি ? (ঐ ২৬১ পৃঃ)

মুছে যাক চোখে এ নিখিল সব প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব
মিলিত হৃদির মৃদুগীতিরব—আধ নিমীলিত আঁখি।

ভাবসমাধিতে মুছে যাবেই তো অবান্তরেরা :

বহুক বাহিরে পবন বেগে কহুক গর্জন অশান্তি মেঘে.....
তুমি আমার বঁধু আমি তোমার বঁধু এই নিয়ে শুধু থাকি,
বিশ্ব হতে সব লুপ্ত হয়ে যাক আর যা রহিল বাকি।

সরল প্রেমের সহজ আনন্দ—মালা গাঁথাতেও (ঐ ২৬৩ পৃঃ), কারণ এ তো যে সে মালা নয়, তার স্মিতহাসি ভরা :

বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুমে কুড়ায়ে,
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণগীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে।

আর সব ছাপিয়ে—তুমি, তোমার হাসি :

আছে সবার উপরে মাখা তার বঁধু তব মধুমর হাসি গো !
ধরো গলে ফুলহার মলাটি তোমার, তোমারি কারণে গেঁথেছি,
মালা সকালটি বসে বসে এই সাঝের মালাটি গেঁথেছি।

ভালোবেসে সান্ত্বনা চাই আমরণ কার কাছে ? কে দিতে পারে সান্ত্বনা—সত্যিকার সান্ত্বনা ?—সে, শুধু সে—এ বিদেশে সে যে একটিমাত্র স্বজন—একমেবাদ্বিতীয়ম্—তাই তাকে ছাড়া কার কাছে যাব জ্বালা জুড়াতে ? (২৬৫ পৃঃ)

এ-জগতে আমি বড়ই একা বড়ই দীনা !
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বই কারেও চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে প্রতি প্রাণে
তোমার কাছে ছুটে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা ?

কবির আর একটি অনুযোগের গান—তাকে না পাওয়ার ব্যথা—সে যে বহু-দুর্লভ কেমন করে ধরণীর জীব পাবে আকাশের চাঁদকে সাগরের মণিকে? (২৬৫ পৃঃ)ঃ

আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালোবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা?
সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ, আমি তো তাহারে পাব না।

কিন্তু শুধু তাকেই যে আমার চাই। সে দুর্লভ জানি, তবু তাকে না পেলে তাকে না পাওয়ার ব্যথাই থাকবে স্মরণের সম্পদ হয়ে—কান্না সেও ভালো কিন্তু তাকে ভুলে আনন্দ চাই না (ঐ ২৬৫ পৃঃ)ঃ

আমি পারি না তো হায় ধূলায় পড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো!
তবে কেন হেন বেচে দুখ লই মেখে, কেন না ভুলিতে পারি গো?
না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে
আমি লভেছি যদি এ বিরস জীবন লভিব সরস মরমে।

সে-মরণও হবে সরস কেন? এই জন্য যে, বড়কে পাইনি বলে আমি ছোটকে চাই নি, মণিকে পাইনি বলে কাঁচ নিয়ে ঘর করিনি। দুরাশার মধ্যেও কি নেই এই সান্ত্বনা যে আমি বরণীয়কে বরণ করে পাইনি বটে তবু তার ছাড়া আর কারুর শরণ চাই নি।

বিদেশ থেকে যখন প্রবাসী ফিরে আসে ঘরে—তখন তার বুকের ভার চেপে ওঠে কার কথা ভেবে? স্মৃতির পটে ফুটে ওঠে কার পথ-চেয়ে-থাকা দৃষ্টি? যখন গগনে মেঘ ডাকে, অবনী কাঁপে ভয়ে, চন্দ্রতারা লুপ্ত, তখন মনে পড়ে কাকে? (২৬৬ পৃঃ)

যখন সঘন গগন গরজে বরিষে বরষা ধারা.....
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্রতারা
দীপ্ত করি সে তিমির আসে কাহার আননখানি?
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয় রাণী।

তারপর জ্যোৎস্নারাতে তারই মুখ ভাসে আঁধারে আলোতেও তারি বাঁশি ওঠে বেজে হাসি জেগে ওঠেঃ

আঁধারে আলোতে কাননে কুঞ্জে নিখিল ভুবন মাঝে
তাহারি হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহারি মুরলী বাজে।

সে আছে সব কাজেই ছড়িয়ে (২৬৬ পৃঃ)ঃ

আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারি রূপের আলো
তারি পদযুগ ধরে হৃদে বলে ধরারে বেসেছি ভালো

শুধু ভালোবেসেই শক্তি পাই সব সইতে, দুঃখ জয় করতে, সব হার-মানা ভুলতেঃ

জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি নিয়তির যত ছলনা ভ্রুকুটি
ও দুটি আঁখির কিরণের তরে সকলি ভুলিতে পারি।

তার রূপ কেমন? (লঘুগুরু ছন্দ ২৬৯ পৃঃ)ঃ

চাই—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন পলকে
হাস—উজল সহসা সব বিমল কিরণ ঝলকে
কেশে তব নৈশ নীল অরুণ ভাতি বরণে
অঙ্গে ঘিরি মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে

সব কিছুতেই পড়ল তার ছবি, তার ছাপ (লঘুগুরু ছন্দ ২৭০ পৃঃ)ঃ

অনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ করি অনুকম্পা?
কার হাস্যটুকু করি পরিলুণ্ঠন গর্বিত বিকশিত চম্পা!

তার মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া—এইই তো প্রেমের একটি পরম বর। (২৭০ পৃঃ)ঃ

তোমারেই ভালোবেসেছি আমি তোমারেই ভালোবাসিব
তব হাস্যোজ্জ্বলবিকশিত শতদল
বিতরিব তোমারি গৌরব পরিমল

ফুল হয়েও তারই সুরভি বিতরণের দুরাশা, মেঘেও তারই নয়নজল হয়ে ভেসে চলা।ঃ

সজল-জলদজাল-স্নান-গগন তলে তোমারি নয়নজলে ভাসিব।
জীবনে মরণে আমি তোমারি তোমারি রহে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

মীরার গান মনে করিয়ে দেয়।ঃ

তুম হো জনম মরণকে সাথী
মীরা প্রভু রঙ্গ রাতী
জনম জনমকী দাসী
আঈ সুন কর বাঁসি।

দ্বিজেন্দ্রলালের আরো নানা প্রেমের কবিতারই বেজে উঠেছে গানের সুর, কারণ তিনি ছিলেন স্বধর্মে কবি, স্বভাবে সুরকার। গান বাঁধতে বাঁধতে সুর, সুর জাগতে জাগতে গান উদয় হত তাঁর গুণী তথা কবিপ্রাণে। তাঁর মন্ত্র কাব্যে এমনি একটি কবিতা নিটোল গান হয়ে ফুটেছিল (সপ্তরন, ১৭ পৃঃ)ঃ

এলো আঁখিভরে আজ দেখি হে তোমার হাসিভরা মুখখানি।
এসো শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও-মধুর অধরে মধুর বাণী।

দীর্ঘ গান, কিন্তু ছত্রে ছত্রে মাধুর্য।

কত নবীন বসন্তে শিহরিতাম গো, তব আগমন গণি।
কত চাহিতাম, শুনি কিশলয়দলে মলয়ের পদধ্বনি।

শেষে প্রেম উঠল পূজায়—যেখানে প্রেম ও ভক্তি মিলে একাকার হয়ে গেছে :

আজ সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব প্রাণের বাসনাগুলি
বহু দুর্লভ আমার হল—আর কি চাই ?
আজ জীবন আমার সফলকামনা পেয়ে তব পদধূলি
তাই আজ শুধু একটি করুণা চাই।
আজ শুনাব নিভৃতে হৃদয়ে রেখেছি যে সব গান
নাথ, তোমারে আজিকে ছেয়ে দিব দিয়ে প্রণয়ের অভিধান

তারপরে কী ? আর কিছু নয়—শুধু পরম লুপ্তি—তোমার মধ্যে আমির মজন :

মোর পরম করুণ বিকাইব তব কমলচরণতলে
আজ হাসিব কাঁদিব মরিব ডুবি এ অগাধ জলবিজলে।

তাই বারবার বলেছি—আবার বলি—আজকে আমরা এই কথাটি যেন না ভুলি যে, সাহিত্যের পরম বিকাশ কাব্যে এবং কাব্যের পরম বিকাশ গানে—অন্ততঃ আমাদের দেশে। তাই এই গানের রাজ্যে যিনি ফলিয়ে তুলেছিলেন ভক্তির প্রেমের নানামুখী মতিগতি আলানিরালা আনন্দবেদনা—কথা ও সুরের আকাশে যিনি রঙ্গিয়ে তুলেছিলেন হৃদয়রাগের অশ্রু-হাসির ইন্দ্রধনু—তাঁকে যেন আমরা সব আগে মনে প্রাণে বরণ করতে পারি—বাংলার বরেণ্যতম কবিদের অন্যতম বলে। এ-প্রণামী যদি আমরা তাঁকে না দেই তাহলে সেটা হবে পূজাপূজ্য ব্যতিক্রম। কারণ আর কেউ মানুক বা না মানুক বঙ্গ-ভারতী একথা কোনো দিনও ভুলবেন না যে তিনি সর্বান্তকরণেই তাঁর চরণে নিবেদন করেছিলেন তাঁর কবিহৃদয়ের পরম প্রণামী—(সঞ্চয়ন, ২৪০ পৃঃ)

জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

তাঁকে বড় নাটকার বলে কি হাসির গানের অদ্বিতীয় উদ্গাতা বলে মান দিতে চাই—বেশ কথা। কিন্তু সব আগে তাঁকে স্বীকার করতে হবে (তাঁর শিখরমহিমার পরে দৃষ্টি রেখে) যে, তিনি কবি—স্বাদেশিকতার কবি, আদর্শ-বাদের কবি, মনুষ্যত্বের কবি, সত্যনিষ্ঠার কবি—সর্বোপরি ভক্তি ও প্রেমের কবি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এমন সার্থক ভক্তি ও প্রেমের গান অতি বিরল—যে ভক্তির আবেগে তিনি গেয়েছিলেন :

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, দেখি না—আপনি দিয়েছে মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।

যে-প্রেমের আলোকিত উচ্ছ্বাসে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন (২৬১ পৃঃ)

প্রেমে নয় আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়।
আপনে প্রেম হয় না কো হীন দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী ওঠে,
প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফোটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গায়ে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে,
আকাশ মেলে সাগরজলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্যে আনে নেমে,
মর্ত্য স্বর্গে ওঠে প্রেমে,
প্রেমে গান হয় গগনভরা, প্রেমে কিরণ ভুবনময়।

মানুষের মুক্তি ধনৈশ্বর্যে নয়, প্রতিষ্ঠান গঠনে নয়, এমন কি বিজ্ঞানের অভ্রভেদী গতিসিদ্ধিতেও নয়—মানুষের মুক্তি হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আলোর আবাহনে। আধারভেদে আলোর মধ্যে ফোটে নানা দ্যুতি, আভা, রং, কিকিমিকি। কিন্তু তার উৎস এক বই দুই নয়—যার নাম প্রেমময়, প্রেমদাস, প্রেমনাথ। তিনি প্রসন্ন হন যখন আমরা পরস্পরকে বরণ করি প্রেমের মালাচন্দনে, শ্রদ্ধার আরতিতে, প্রীতির অভিনন্দনে। জীবন তাই ধন্য হয় শুধু প্রেমেরই দীক্ষায়—বাকি সব দীক্ষা কাজে আসে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান দেয়, কিন্তু প্রাণকে উত্তীর্ণ করে না রসলোকের দীপ্ততম সদানন্দ শিখরে—যে-শিখরে আরূঢ় হলে তবেই দেখতে পাওয়া যায় চর্মচক্ষে (২৬১ পৃঃ)

নিখিল জগতে সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর পরশে
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত দশদিক কলরব-মুখরিত
গগন মুগ্ধ চন্দ্র সূর্য গতিহত মরু বরষে।

তখন যেন চোখের ঠুলি খসে পড়ে যায়, মন প্রাণ গান গেয়ে ওঠে (২৭৫ পৃঃ)

আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান
ঘুমাব কেতকীসুবাস শয়নে চাঁদের কিরণে করিব স্নান।

আর তখন প্রেমের প্রসাদে

সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল ইন্দ্রধনুর চন্দ্রহার
তারার করিব কর্ণের দুল, জড়াব গায়েতে অন্ধকার।

আমি কোনোদিন ভুলব না তাঁর 'সীতা' নাটকে প্রেমের অপরূপ মহিমাকীর্তন। বশিষ্ঠ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'প্রেম না কর্তব্য বড়?' উত্তরে

বাল্মীকি প্রেমের যে-স্তবগান গেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেলা ভার সত্য-অঙ্গীকারের স্পন্দিত ঘোষণায় (২১৮ পৃঃ):

করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি, প্রেম না কর্তব্য বড়।
আমি মূর্খ, আমি যুবা—প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি'।
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।
প্রেম নয় ভ্রম মহাভাগ! বাতুলের স্বপন নহে।
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম সেথা প্রেম। যেথা পাপ—প্রেম নাহি রহে।
প্রেম—প্রভু, কর্তব্য—তাহার ভৃত্য। বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে? বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময়?—প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবন্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি মহারাজ!
কর্তব্য—নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ। তাহে শিল্পী ভাস্করের মত
প্রেম দেয় মূর্তি। শুষ্ক কর্তব্যকঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ। শুষ্ক তরুবর শিরে
প্রেম দেয় কুসুমপল্লব। রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম—পবিত্র শিশিরস্নিগ্ধ জলে
সুমন্দ পবনে। ধীরে চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে
প্রেম আসে সুপ্তিসম—কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে?
চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি—এ-সুন্দর
বিশ্ব মুখরিত—প্রেমে। নিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পূর্ণে পূর্ণে জাগে লক্ষ নক্ষত্র, চন্দ্রমা প্রেমে হাসে।
প্রেমে বহে বারিধারা, প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্বহাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্যনিয়ত প্রেমের বীণা বাজে!

ভগ্নসেতু

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এ-কালের সব শিল্পীই এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে। এই শ্রেণী হলো সেই সুপর্ণ যে একই শাখাতে বসে পাশের সুপর্ণটির ফলভক্ষণ দর্শন করেই সেই ফলের আস্বাদন করে। এই শ্রেণীই সবচেয়ে আত্মচেতন, তাই এদের মননেই ইতিহাসের প্রক্রিয়া সবচেয়ে প্রবল, এদের উপলব্ধিতেই দেশ ও কালের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে সবচেয়ে সার্থকরূপে। বিশ শতকের লোচনীয় সত্যকে এঁরা ধরে দিয়েছেন চিত্রে ও সাহিত্যে। শিল্প তো আর সরাসরি ও অবিকল যা যথাযথ রূপে বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত করে না তা সকলের আত্মাকে পাতন করে নেয় শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে। এক হিসেবে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং শিল্প অভিন্ন বস্তু, কিংবা বলা উচিত যে, ওই ব্যক্তিত্বের প্রতিমাই হলো শিল্প, তাতেই ব্যক্তিত্ব পায় রূপ, রং, ধ্বনির সমাহারে একটি সুস্পষ্ট আকার। আবার সেই ব্যক্তিত্ব সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে ও প্রতিঘাতে গড়ে ওঠে বললেই বোঝা যায় যে শিল্প একটা বিশেষ ছাঁচের মধ্যেই সম্ভব হয়। বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও বিশ শতকের আত্মার টানাপোড়েনেরই অন্যতম ফলশ্রুতি হলো বিশ শতকের উপন্যাস।

আগে বলি, দেশকালের প্রভাব যে পাত্রের কার্যকলাপকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে একথা ভাবা মারাত্মক ভুল হবে, বরং সে-নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সর্বদাই অতি পরোক্ষ ও সুদূর, কখনও বা অদৃশ্য। কিন্তু দেশকালের যে একটা ছাঁচ বা একটা মানসিক আবহাওয়া থাকে তা অস্বীকার করা চলে না। যদি তেমন কোনও ছাঁচ না-ই থাকত তা হলে এটা কেমন করে সম্ভব হলো যে এ-শতাব্দীর প্রথম দু দশকে ইউরোপের দক্ষিণ কোণে বসে শ্বেচ্ছা-নির্বাসিত জেমস জয়স, পশ্চিম কোণে এক অন্ধকার ধ্বনি-নিবারক ঘরে বসে মার্সল প্রুস্ত এবং ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে বসে ভরোথি মিলার রিচার্ডসন—পরস্পরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকে, এমন-কি পারস্পরিক পরিচয় ছাড়াই —বাইরের জগতের ঘটনাবলীকে স্থাপন করলেন অন্তর্জগতের মঞ্চে, ঘটনা-

বিন্যাসের পদ্ধতিকে বর্জন করে লিখলেন শুধু মনের কাহিনী, অভিজ্ঞতার যে-দিকটা থাকে চিন্তার ভিতরে সেই দিকটাকেই নিলেন কাহিনীর অবলম্বন রূপে! এই যে একই সময়ে তিনজন বিভিন্ন লেখক প্রতীচ্যের তিন বিভিন্ন কোণে বসে একই ধরনের অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জগৎ-আশ্রয়ী—উপন্যাস লিখলেন, এটাকে নিছক একটা আকস্মিক যোগাযোগ বললেও সবটা বলা হয় না, অনেকখানিও বলা হয় না। তাই এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়, এ-সময়ে প্রতীচ্যের মানসিক আবহাওয়াটাই এমন হয়ে গিয়েছিল যে তীব্ররূপে অনুভূতিশীল লেখক-লেখিকা বাইরের জগতের অবলম্বন হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আশ্রয় নিয়েছিলেন আপন আপন অন্তরের জগতে।

আবার একই সময়ে লেখকদলের কল্পনাতে যে-আপেক্ষিকতা এবং কণিকা-বিজ্ঞানে যে-অনির্দেশ্যতা আবিষ্কৃত হয় তা-ও কথাশিল্পের সদা গৃহীত ধারার প্রকরণগত মৌল ধারণাটির পরিপূরক। একথা বারবার বলা প্রয়োজন যে এই যোগাযোগগুলির সুস্পষ্ট কার্যকারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত কাকতালীয় ভ্রান্তির খাদে টেনে নিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কশূন্য সত্যগুলিকে যোগ করলেই মিলবে আধুনিক মানুষের মনের সম্পূর্ণ আব-হাওয়াটিকে। এই সত্যগুলি কেবল অর্থনীতি ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত নয়, একালের অস্তিত্ববাদী দর্শনও একই সত্যকে ব্যক্ত করছে। এই দর্শন যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলেই বিশেষ প্রচারিত হয়, তবু এর কয়েকজন প্রধান প্রবক্তার আবির্ভাব হয় বিশ শতকের প্রথম দু শতকেই: এবং এই দর্শন একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি পেয়েছে ফ্রানৎস কাফকার উপন্যাসে ও গল্পে, কিছুটা রাইনার মারিয়া রিলকের রচনাবলীতেও।

অবশ্য অস্তিত্ববাদের জনক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানুষ ও যে পরমশক্তির সম্মুখে আপন আতঙ্কিত ও কম্পিত অস্তিত্বকে এই নগ্ন স্বভাবের তত্ত্বলোক অনুভব করেছিলেন সে-শক্তির নাম ঈশ্বর: এবং ইয়াস্পার্স অথবা গাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ এই দর্শনের কোন কোন প্রবক্তা মূলত ঐশীচেতনাতে পরিসিন্ধ; কিয়ের্কে তো বটেই, কাফকাও ছিলেন ঘোর ঈশ্বর-বিশ্বাসী। কিন্তু এই দর্শনেরই অপর ধারাটিতে আছেন মার্টিন হাইডেগ্গার, জাঁ-পল সার্তরের মতো চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাঁরা ডাকসাইটে নাস্তিক—তাঁদের রচনায় মানুষ কোনও সান্ত্বনা পায় না, বরং প্রতিক্ষণে এক বিভীষিকার সহবাসে আপনাকে ক্রমাগত ক্ষইয়ে নিঃশেষ করে। এই বিভীষিকা একটা পরাব্যক্তিক ও পরম শক্তি যার কাছে মানুষ নিতান্তই তুচ্ছ, যা মানুষকে দু আঙুলের ফাঁকে পোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে উদ্যত, যার শক্তির সঙ্গে মানুষের কোনও তুলনাই চলে না। তবুও শোপেনহাওয়ারের হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা এঁদের চিন্তায়

পরিপূরক নয়, কেননা সচেতন মানুষের কাছে এই বিভীষিকা হলো "perpetual challenge." আজকের মানুষকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে এক অনাত্মীয় বিশ্বে, এখানে সে নিঃসঙ্গ তথা অগন্তুক, এখানে তার অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত উগ্র উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত। এ বিশ্ব অনাত্মীয়েরও বেশি, এ মানুষের প্রতি বিরূপও বটে। এই অনাত্মীয় ও বিরূপ বিশ্বে যে-দানবের কবলে সে পড়েছে তাকে মামুলি অর্থে নিরাকৃতি বলা চলে না, বরং বলা চলে যে তা মানুষেরই আপন আকাঙ্ক্ষা। শুনতে অবাক লাগে যে মানুষ তার নিজেরই হৃদয়ের ইচ্ছের হাতে শৃঙ্খলিত। পারমাণবিক যুগে মানবজাতি থাকবে কি একেবারে মুছে যাবে পৃথিবী থেকে সেটাও নির্ভর করছে মানুষের ইচ্ছের উপরে।

যেন কোন বিদেশের হোটেলের পর-পর বন্ধ দরজার সামনে আজকের ভ্রাম্যমান মানুষ, অগন্তুক মানুষ একা এসে দাঁড়িয়েছে, জানে না কোন্ ঘরটি তার, কেউ তাকে বলে দিচ্ছে না কোন দরজা খুললে কার ঘরে প্রবেশ করবে অথবা কী বিপর্যয় ঘটবে। অথচ কোন-না-কোন দরজা তাকে খুলতেই হবে। কারণ এ-পান্থশালায় প্রবেশের পূর্বেই তাকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল যে নিজের ঘরটি সে নিজেই খুঁজে বের করে নেবে যদিও কোন কোন বন্ধ দরজার আড়ালে তারকের বিপদ লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও আছে এবং তখন সে এই চ্যালেঞ্জ-টাকে গ্রহণ করেছিল। তার জন্য কোনও উপায় ছিল না সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া যেহেতু যারা ওই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ তারা অস্তিত্বহীন। এখানে প্রকাশ থাকে যে টেবিল চেয়ারের মতো পৃথিবীর খানিকটা স্থান জুড়ে থাকাটাকে অস্তিত্ববাদী বেঁচে থাকা বলেন না, বলেন সেই অস্তিত্বকে যা চেতনার সক্রিয়তার উপরে নির্ভরশীল, যে-অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে অর্থাৎ ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তেমন বাঁচাটাই সমাক অস্তিত্ব, তেমন অস্তিত্বই সমাক বাঁচা। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে এসে সার্ত্র নির্বাচন করা ও নিপাত যাওয়াটাকে একই বিষয় মনে করেন। আজকের মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ এক অনিশ্চিত, কিংবা বলা যাক, এক অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতে। যখন সে লাফ দিয়ে বাস-এ ওঠে তখন কি সে আগে থেকে জেনে ওঠে যে বাস-চালক সুস্থ আছে কিনা, নেশা করেছে কিনা, স্টিয়ারিং ঠিক সামলে রাখতে পারবে কি না, দুর্ঘটনার কারণ উপস্থিত হলে ঠিকমতো বাস থামাবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা স্নায়ুর জোর আছে কি না? এমনই ভাবে খুঁটিয়ে দেখলে মানতে হবে যে আমার বেঁচে থাকার উপরে আমার নিজের যতখানি হাত তার চেয়ে অনেক বেশি হাত আমার চারপাশের মানুষগুলোর। আর আমরা যে প্রায় সকল সময়েই নিজের বেঁচে থাকার এই স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান তাতেও সন্দেহ নেই। অজ্ঞানের এই আধিপত্যকে কি মায়া বলব? অস্তিত্ববাদ কি নব মায়াবাদ?

কিন্তু যে-নামেই অভিহিত করি, আজকের মানুষের অসহায়তা ও অক্ষমতাকে কোনও ক্রমেই অস্বীকার করতে পারিনে।

যন্ত্রতান্ত্রিক অর্থনীতি যে-নৈর্ব্যক্তিক ও পরাক্রান্ত শক্তিকে গড়ে তুলেছে এবং সেই শক্তির সম্মুখে যে-অসহায় উৎকণ্ঠিত, নিঃসঙ্গ ও বিভীষিকাগ্রস্ত আগন্তুক মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই একই শক্তি ও একই মানুষের কথাই অস্তিত্ববাদ বলেছে, সেই একই বাধা এগিয়ে দিয়েছে যে উক্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি মানুষেরই আপন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি। তাই কাফকার 'দি ট্রায়াল'-এর বিচারক কোনও রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, অন্তত সেভাবে তাঁকে কখনও দেখা যায় না, সারাক্ষণ তিনি বসে থাকেন অনেক দূরে বিচারকের উঁচু আসনে, অন্ধকারে অস্পষ্ট ও রহস্যময় হয়ে এবং উপন্যাসটি শেষ করবার পরেও পাঠকের কাছে তিনি অশরীরী ছায়ামূর্তির মতোই থেকে যান; অথচ তিনিই যে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও তাঁর সামনে মানুষ যে সম্পূর্ণ অসহায়—এ বিষয়ে লেখক কোনও রূপ সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। অবশ্য কাফকা বর্ণিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি স্বয়ং ঈশ্বর; এখানে তিনি কিয়ের্কেগার্ডের চিন্তাধারার অংশীদার। এই শক্তি যতক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক ততক্ষণই তা ভয়ঙ্কর, তাই 'দি ট্রায়াল' ওই শক্তির থেকে দূরে পালাবার আর 'দি ক্যাসল' ওই শক্তির গূঢ় স্বরূপকে জানবার জন্যে ও তার নৈর্ব্যক্তিকতা ঘুচিয়ে দেবার জন্যে ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনী। এই প্রয়াসের সাফল্যেই পাওয়া যায় পরম প্রশান্তিকে; কিন্তু লেখকের কল্পনাতে সে-সাফল্য অসাধ্য, সুতরাং পরম প্রশান্তি চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। তিনি মানুষের আন্তরিকতা ও সাধুতায় বিশ্বাসী, তবু একথাও জানেন যে মানুষের যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। কাফকা নিজেই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁর উপন্যাসকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ রেখে দিয়েছেন; তাই উপন্যাসে বর্ণিত বিচারক বা দুর্গাধিপতিকে ঈশ্বরের পরিবর্তে যদি কোনও ঐহিক শক্তি বলে ভাবা যায় তাহলেও তাঁর শিল্পের তাৎপর্য কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

কাফকার মতো রিলকেও চান সেই পরম প্রশান্তিতে উপনীত হতে, কিন্তু তিনিও জানেন যে আধুনিক মানুষ এক দারুণ প্রতারণার দ্বারা অভিভূত; তাই 'দি নোটস্ অব মাল্টে'-তে তিনি এই কপট খণ্ডিত অস্তিত্বকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে: "We discover that we do not know our role; we look for a mirror; we want to remove our make-up and take off what is false and be real. But somewhere a piece of disguise that we forgot still sticks to us. A trace of exaggerration remains in our eyebrows; we do not notice that the corners of our mouth are bent. And so we walk around, a mockery and a mere half:

neither having achieved being nor actors." সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদিও অস্তিত্ববাদী ভাবুকেরা মাথা ফাটাফাটি করেননি এবং কাফকা বা রিলকে মানব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি-অবস্থিতির স্বরূপকে অনুধাবন ও উন্মোচন করতে চেয়েছেন তবুও তাঁরা যে-সকল জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন, যে-সকল সমস্যার ফাঁদে জড়িয়ে গিয়ে ছটফট করেছেন, যে সকল আর্তিতে উপদ্রুত হয়েছেন, সে-সকল এই শতকের দেশ-কাল কর্তৃক সৃষ্ট বিশেষ মানসিক আবহাওয়া বহির্ভূত নয়।

মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে। কথাশিল্পের রূপদী যুগে ট্র্যাজেডির বীজ থাকত চরিত্রেরই মধ্যে এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংঘর্ষে ঘটত তার বিস্ফোরণ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক পরাব্যক্তিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। টমাস হার্ডির "দি রিটার্ণ অব দি নেটিভ"-এ ট্র্যাজেডির বীজ ক্লিম ইয়োব্রাইট বা অপরূপা ইয়োস্ট্যাসিয়া ভাই বা আরাবেলার জামন উইলডিভ প্রমুখ চরিত্রে নেই আধুনিক অর্থে এরা ব্যক্তি বটে এবং উপন্যাসটি এদেরই জীবনের মহতী বিপর্যয়ের কাহিনী, অথচ এই বিপর্যয়ের বীজ নিহিত ছিল কাহিনীর পরিবেশে, এগডন হীথ-এর নিসর্গে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভিতর থেকে না এসে কিছুটা গ্রীক নাটকের মতো ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হয়েছে বাইরের থেকে এবং চরিত্রগুলির সমস্ত উদ্যোগ ও প্রয়াসকে পণ্ড করে দিয়েছে : কিন্তু এ-আবির্ভাবকে অবাস্তব না বললেও নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে আকস্মিক বলা যায়। হার্ডির নিসর্গচেতনার সাদৃশ্য ওয়র্ডসওয়র্থের মতো রোমান্টিক যুগের কবিচরিত্রেই মেলে; অথচ তাঁর নিসর্গ কেবল নিষ্পৃহ নয় নিষ্ঠুরও বটে। আবার সেই নিষ্ঠুর নিসর্গই মানুষের নিয়তি, তার ভাগ্যের নিয়ামক। ফলে হার্ডির উপন্যাসের ব্যাখ্যা দুরূহ। অবশ্য এটা জানা আছে যে ভারউইনের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল এবং, মনে করা যেতে পারে, এই পরিচয়ের দরুন নিসর্গ তাঁর কাছ থেকে যেমন পূজো আকর্ষণ করেছে তেমনই তাঁর মনে জাগিয়েছে অব্যক্ত অসহায়তা ও তীব্র ত্রাস।

কোথাও-না-কোথাও যে একটা দারুণ ধ্বংসাত্মক শক্তি রয়েছে, এ-বিষয়ের সংশয়ের অর্থ আমাদের এক আন্তরিক অনুভবকে অস্বীকার করা : হার্ডি যেন সেই শক্তির দায় হতে মানব-ইতিহাসকে অব্যাহতি দিয়ে তা চাপিয়ে দিয়েছেন নিসর্গের কাঁধে—সেই শক্তি মধ্যে মধ্যে জেগে উঠে কুম্ভকর্ণের মতো তাণ্ডব বাধিয়ে দেয়। মোট কথা, রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যক্তিই ছিল বিশ্বের মূলাধার, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতেই এই বোধে ফাটল ধরে : এবং ব্যক্তি যে দুর্বল ও আরও পরাক্রান্ত শক্তিবল, এরূপ এক নতুন বোধ

গড়ে উঠতে শুরু করে। এই নতুন বোধের আভাস আছে হার্ডির উপন্যাসে, তাই তিনি দ্বৈপদী যুগের ও বর্তমান যুগের কথাশিল্পে সেতুবন্ধ করেছেন।

আধুনিক কথাশিল্পী গ্রাহেডির বীজ বাস্তির চরিত্রে তো নয়ই, নিসর্গেও খোঁজেন না, তিনি খোঁজেন মানব-ইতিহাসে; তাই আধুনিক উপন্যাসে দেশ ততটা প্রাধান্য পায়নি যতটা পেয়েছে কাল। কেবল উপন্যাসে নয়, শিল্পের সমস্ত বিভাগেই বিশ শতাব্দী বিশেষভাবে কালচেতন। সালভাদো দালি অঙ্কিত "লাস্ট্রুক্সেপ: দি পারসিস্টেন্স অব মেমরি" (১৯৩১)-র বিষয়বস্তু হলো কাল নামক বিমূর্ত ভাবসত্তের ত্রিমাত্রিক রূপায়ণ, যার অপর মাত্রা হলো দেশ বা স্থান। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত যে আধুনিক শিল্প তার মর্মকথা ও মূলতত্ত্বকে এই ছবিটি অতি সার্থকরূপে ব্যক্ত করেছে। ছবিটির দৃশ্যপট হলো অন্তহীন আকাশ ও সমুদ্র, ডান পাশ হতে একটা পাহাড় এসে মিশিয়ে গেছে সমুদ্রে। আকাশ ও সমুদ্রের অন্তহীনতাকে খুব অল্প জায়গার মধ্যে আভাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বেশি জায়গা জুড়েছে সমুদ্রতীর ও তীরে অবস্থিত একটি বেদী, বেদীর উপরে একটি শুকনো গাছ, যার মাথাটি ভাঙা ও যার একটিও পাতা নেই এবং গাছটির মরা ডালে ঝোলানো একটি ঘড়ি, বেদীর ধার-ঘেঁষে আর একটি ঘড়ি ও বেদীর তলাতে আরও একটি ঘড়ি। ঘড়ি তিনটে সমতল বা সুসমঞ্জস আকারের নয়, বরং অসাধারণ লম্বাটে ও নরম ও নমনীয়। কিছুটা যেন তলতলে। গাছের ডালে টাঙিয়ে-দেওয়া ঘড়িটির দুটি প্রান্ত ডালের দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। বেদীর ধার-ঘেঁষে রাখা ঘড়িটির খানিকটা বেদীর মেঝেতে আছে, বাকিটুকু গড়িয়ে পড়েছে বেদীর গা বেয়ে। তৃতীয় ঘড়ির দক্ষিণপ্রান্ত মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। ঘড়ি তিনটে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীক, এবং একটি কোনও নির্দিষ্ট দৃঢ় সীমাতে আবদ্ধ নয়, প্রতিটির প্রবণতা নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়ার দিকে, নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে। বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান উপন্যাসগুলি দেশ-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাল-এর এই প্রবণতাকে ধরতে ও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। কোথায় গেল নিউটনের চিরস্থায়ী ও সুস্থির দেশ, কাল ও বস্তু।

বিশ শতকের উপন্যাসগুলির কোন কোন লক্ষণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেতেই কারও কারও রচনায় দেখা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবোর "এ সীজন্ ইন হেল"-কে এক নতুন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মচরিতমূলক কাহিনী-কাব্য বলে মেনে নিলে একথাও অনায়াসে বলা যাবে যে এ-শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক কেবল একটি নির্দিষ্ট দৃঢ় সীমায় আবদ্ধ বা আধুনিক কালের মধ্যে একটি অবয়বসম্পূর্ণ পর্যায় নয়, তা অতীতেও কিছুদূরে পর্যন্ত নিজেকে

বিস্তৃত করেছে, যেমন করেছে পরবর্তীকালেও অর্থাৎ Samuel Beckett, Yvan Goll প্রমুখ ঔপন্যাসিক ও কবিদের রচনাতে।

"এ সীজন ইন হেল" যদিও রচিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, তবু এইটেই বোধহয় বিশ শতকের প্রথম উপন্যাস—অবশ্য যদি আলোচনার সুবিধার্থে এই কাহিনী-কাব্যকে উপন্যাস বলে মেনে নেওয়া যায়। এই শতকের প্রধান উপন্যাসগুলির নায়ক হয়ে থাকেন অধিকাংশ সময়েই লেখক স্বয়ং, অথচ এ-নায়ক আদর্শ মানুষ নয়, তার মাধ্যমে আপনাকে মহিমান্বিত করবার কোনও উদ্দেশ্য লেখকের থাকে না বরং নিজেকে বন্দনা দেওয়াতে, নিজের ব্যর্থতা ক্ষুদ্রতা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করাতেই তিনি মুখ্যত প্রয়াস পান। এখনকার অনেক বিখ্যাত উপন্যাসই প্রকৃত প্রস্তাবে অখ্যাত অসফল মানুষের আত্ম-জীবনী বা জবানবন্দী। "এ সীজন ইন হেল"-ও এই ধারার অন্তর্গত; এ বইয়ের উদ্দেশ্য ও বিশেষত্ব বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির উদ্দেশ্য ও বিশেষত্বের শামিল। এক পরাবাস্তব শক্তির জাল যে মানুষের জীবনকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে তা র‍্যাঁবো সে-সময়েই অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরে যে প্লাবন আসবে, বিশ শতকে যে-ট্রাজেডির সংঘটন অনিবার্য সে-সম্বন্ধে র‍্যাঁবোর অনুভব ছিল যেমন তীব্র তেমনই তিক্ত।

"Yes, I have my eyes closed to your light. I am a beast, a black. But I can be saved. You are false blacks, you are maniacal, fierce, avaricious. Merchant, you are a black; emperor, old scab, you are a black; you have drunk an untaxed spirit from Satan's factory." সাদা চামড়ার মানুষদের ভিতরের কলুষতা ও কালিমাতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত র‍্যাঁবো আফ্রিকাতে চলে যান। এই তথাকথিত সভ্য-জগৎকে তাঁর কেন নরক মনে হয়েছিল, কেন এই সভ্যজগৎ থেকে পলায়নের জন্যে তিনি অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, কেন তাঁর হাত দিয়ে আর কবিতা বের হলো না, কেমন করে তাঁর মতো প্রতিভাবান কবি বাণিজ্যের নেশায় মেতে ওঠেন, তা অবশ্য সোল ভেয়লোন কিছুতেই বুঝতে পারেননি। প্রতীচ্য যে মানব-ইতিহাসে ট্রাজেডির অমোঘ বীজ বপন করেছে- এ-ট্রাজেডি যে প্রকৃতির জন্যে মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষারই সৃষ্টি—এই সত্যকে র‍্যাঁবো তাঁর প্রতীক অনুলম্ভ সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন। এই সভ্যতার সাগর মন্থন করে যে-হলাহল তুলেছিলেন তা পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হতে পারেননি সে-কথা সত্য, বরং সেই বিষেই মাত্র ছাব্বিশ বছরের বয়সে স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর কবিজীবন। বিশ শতাব্দীতে যে-বিপর্যয় সংঘটিত হলো আক্ষরিক অর্থেই র‍্যাঁবো তার বাস্তব ও মূর্ত প্রতীক।

র‍্যাঁবোর ট্রাজেডি প্রসঙ্গে পোল গঁগ্যার কথা মনে জাগা স্বাভাবিক। গঁগ্যার প্রথম জীবনে শিল্পের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না। তিরিশের ঘরে পা দিয়ে তাঁর ঝোঁক আসে চিত্র-সংগ্রহে। তার থেকে ক্রমে জাগল চিত্রাঙ্কনে আগ্রহ। আটত্রিশ বছর বয়সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী দর্শক ও সমালোচক মহলে কোনও সাড়া তুলতে পারেনি। এদিকে যতই তিনি নিজেকে চিত্রকররূপে আবিষ্কার করেছেন, যতই আপন শিল্পীসত্তাকে গভীর ও নিবিড়রূপে অনুভব করেছেন, এক কথায় যতই তাঁর আত্মবিশ্বাস জন্মেছে ততই সভ্যজগৎ সম্বন্ধে তাঁর অবিশ্বাস এসেছে, অবিশ্বাস রূপান্তরিত হতে থাকে ঘৃণায়। স্ট্রিন্ডবার্গকে তিনি লিখলেন: "Your civilization is your suffering. My barbarism is health to me." সুতরাং আদিম জীবনের অনাবৃত সরলতার অভিসারে তাঁকে মার্টিনিক্যু ও তাহিতিতে ছুটতে হয়েছিল। কিন্তু আপন জগতের ছকের বাইরে গিয়ে যথাস্থিতবাদকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়তো সত্যিই সম্ভব নয়, তাই জেমস জয়স বা টমাস মান স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে নির্বাসনে গেলেও তাঁদের অন্তরে সর্বদা আপন জন্মভূমিকে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত হতে আগলে রেখেছেন। পৃথিবীর যে-দেশেই তাঁরা যান না কেন স্বদেশেই তাঁদের বাস। গঁগ্যার বেলায় হয়েছে উল্টো ব্যাপার। মাথা নিচু করে পা উপরে তুলে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে! তাই তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হলো অভিশপ্ত ও অবক্ষয়ী ইউরোপে। কিন্তু আবার তিনি ফিরে গেলেন তাঁর আদিম জীবনের শ্রীক্ষেত্রে। এইভাবে এক উদ্দাম অশান্তির মধ্যেই ঘটে তাঁর শিল্পীজীবনের সমাপ্তি। তাঁর শিল্প আদিম জীবনের নিরাবরণ সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি নয়, তাঁর রং, রেখা, ছবির জমির ব্যবহার সমস্তই প্রকাশ করছে ইউরোপের এক বিশেষ মানসিকতাকে। পক্ষান্তরে যীশু খৃষ্ট, প্রার্থনান্তে গির্জা হতে বেরিয়ে-আসা নরনারী, বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে আসীন নারী প্রভৃতি তাঁর ছবির আধেয়। অর্থাৎ স্বকালের বস্তুসভ্যতার কবল হতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ধর্মসচেতন সভ্যতায় এবং তাঁর শিল্পের যেটা আধার সেটা প্রথাসিদ্ধ ধারার বিরোধী তথা বাতিক্রম হলেও তা কখনই আদিম জীবনধারণেও সংপৃক্ত হয়নি।

র‍্যাঁবো ও গঁগ্যা সভ্যতা সম্বন্ধে যে-প্রতিবাদ তুলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি ঘটে ডেভিড হর্বট লরেন্সে। তাঁর পূর্বসূরী দুজনেই এই সভ্যতাকে ষোল আনা বাতিল করেছিলেন, কিন্তু খুব দৃঢ় অর্থে লরেন্স তা করেননি। লরেন্স চেয়েছিলেন ইউরোপকে "Dark Mother"-এর মন্ত্রে দীক্ষা দিতে, আদিম জীবনের উষ্ণ স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে, টলস্টয়ের মতো এই বস্তুবশ বস্তু-পরাভূত ইউরোপকে মুক্তি দিতে। বস্তুবশ্যতা ও যান্ত্রিকতাকে

ব্যাধি বলে তাঁর মনে হয়েছিল। রাঁবো ও গগ্যার মতো আদিম জীবনের অন্বেষণে সমুদ্রের ওপারে অপসরণে নয়, ব্যাধিগ্রস্তের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করে তোলার প্রয়াসেই লরেন্স পেয়েছিলেন শিল্পীসত্তার সার্থকতা। তিনি মনে করতেন যে শিল্পীকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হলেই চলবে না, শিল্পীকে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সম্পর্কের গোটা ছকটাকেই পরিবর্তনের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে, উপস্থিত ও প্রচলিত ছকের উত্তরে স্বপরিকল্পিত ছকটিও শিল্পী উপস্থাপন করবেন তাঁর শিল্পে। শেষ জীবনের টলস্টয়ের মতো লরেন্সও শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সংস্কারকরূপে। যে-সভ্যতা দেউলে হয়ে গেছে তাকে মিথ্যে মোহে আঁকড়ে না থেকে তাকে পরিত্যাগ করে তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন এক সভ্যতা —এই ছিল লরেন্সের স্বপ্ন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এ-স্বপ্ন শুধু তাঁর একার নয়, এবং ওই বিশ্বাসে সমধর্মী ও একই স্বপ্নের যাঁরা দ্রষ্টা তাঁদের সন্ধানে লরেন্স পৃথিবীর নানা কোণ পরিক্রমা করেছিলেন। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সম্পর্কে ও নিত্য মিথ্যাচার যোগাযোগে তাঁর স্বপ্নের জগৎ সমৃদ্ধ, সে-জগৎ দেহের সহজ ও স্বাভাবিক দাবিগুলি মেটাতে পারপান; পুঁজিবাদী ইউরোপ সেসব দাবি মেটাবার কথা স্বপ্নে ভাবলেও জিব কাটে, কেননা তা তথাকথিত ভব্যতা ও মার্জিতরুচির আড়ালে নীরক্ত ও দুর্বল, কপট ও বিকৃত, তাই সারাক্ষণ সেখানে স্নায়ুগুলিকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত রাখার পাগলামি, দেহের দাবি সেখানে নানারূপ অবদমনের ফলে বিচিত্র সব কুটৈষার কুটিল পথে বিভ্রান্ত।

এ জন্যেই টমাস মান-কেও "দি ম্যাজিক মাউনটেন"-এর অসুস্থ অবক্ষয়ী বিশ্ব হতে পেছন ফিরে যেতে হয়েছে জোসেফ-পুরাণে; পুরাণের জগৎ অতীতের হলেও মৃত নয়, জাতির স্মৃতির পরতে পরতে তা সদা জীবন্ত, সদা সক্রিয়— সেখানের আদিম সমাজ আধুনিক মানুষের জন্যে যেন এক মহাভোজনের উৎসব খুলে দিয়েছে, সেখানে সবার এক পংক্তিতে অধিকার। প্রকৃতপক্ষে তা মানুষে মানুষে অবাধ মেলামেশার ও সৎ সম্পর্ক স্থাপনের উৎসব, কোনও মানুষ সেখানে খাপছাড়া নয় অথবা জীবন নয় বেসুরো। প্রতীকতাও সেখানেই সবচেয়ে ভালো ফসল ফলাতে পারে যেখানে জনসাধারণ পারস্পরিক সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন, প্রতি ব্যক্তি যেখানে প্রতি ব্যক্তি হতে স্বাতন্ত্র্যে নিঃসঙ্গ নয় কিংবা যেখানে প্রতি ব্যক্তির চরিত্রে কিছু সামান্য লক্ষণ বিদ্যমান, প্রতি ব্যক্তি যেখানে একটি সাধারণ অথচ চরিত্রের মৌল মিলনক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে পারে। কেননা প্রতীক যেমন সবার প্রতিনিধিত্ব করে তেমনই আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের মধ্যেই তা বর্তমান। আদিম জীবনের ঐক্য হতে প্রতীক খুঁজে বের করতে তাই মান-এর মতো

পাবলো পিকাসোকেও যেতে হয় নিগ্রো শিল্পের দরজায়; আদিম জীবনের প্রতীককে তিনি অনেক সময়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকতে দেননি, তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন আধুনিক বিষয়ের মধ্যে। পিকাসোর মতোই জয়স-ও হামেশাই পুরাণ, কিংবদন্তী, রূপকথা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ, প্রতীচ্য-সংস্কৃতির বিপুল ঐতিহ্য ও স্মৃতিতে প্রয়াণ করেছেন; কিন্তু খুব যথার্থরূপে বলা উচিত যে তিনি কোনও সময়েই মান-এর মতো অতীতে প্রয়াণ করেননি, যা করেছেন তা হলো অতীতকেই নিত্য বহমান বর্তমানে রূপান্তকরণ। এক হিসেবে মান ও লরেন্স দুজনে দুটি চরম-পন্থা নিয়েছেন; একজন প্রস্থান করেছেন পৌরাণিক জগতে অন্য একজন সেই জগতের স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বিশ শতকের মূলে।

অবশ্য পিকাসো বা জয়স-এর মতো লরেন্স অতীতকে বর্তমানের স্রোতে মিশিয়ে দেননি আবার মান-এর মতো পুরাণের নবতর রূপায়ণেও উদ্‌যোগী হননি। তিনি বলেছেন যে ইউরোপের মানুষগুলি "শুধু টাকার জন্যে বাঁচে" ও নিছক যৌনপ্রবৃত্তির চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর সামাজিক প্রবৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ যেগুলির বশে মানুষ সমাজ গড়ে, সম্প্রদায় গড়ে, পরস্পরের কাছাকাছি ও পরস্পর একসঙ্গে থাকতে চায়, পরস্পরে অন্তরঙ্গ হতে চায় এবং যে-অন্তরঙ্গতার আগ্রহাই একটা উচ্চ পর্যায়ে দৈহিক মিলনে পরিণত হয় সেই প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে অক্ষম ও অসহ্য করে ফেলেছে; লরেন্সের এই অভিযোগের অন্তর্নিহিত সত্যকে অস্বীকার করা চলে না, অথচ এর থেকে প্রতিকারের যে-পন্থা বাতলেছেন তাকেও গ্রহণ করা কঠিন। অবশ্য লরেন্স বলবেন যে তাঁর নির্দেশিত পন্থা গ্রহণে এই বাধাটাই বর্তমান সভ্যতার অক্ষমতা ও অসততার নিশ্চিত প্রমাণ। সচেতন হয়েই মানুষ নিজের সর্বনাশ করেছে, তাঁর এই মতকে যাচাই করলেই বোঝা যাবে যে লরেন্স যথার্থ রোগনির্ণয় করতে পারেননি। তাঁর যুক্তি অনুসরণ করলে শেষে বাইবেলকেও মেনে নিতে হবে অর্থাৎ যখন আদিনারী শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করল তখন থেকেই মানুষের সর্বনাশের শুরু। কিন্তু লরেন্স এতে সায় দেবেন না; পক্ষান্তরে যে-সামাজিক প্রবৃত্তিগুলির অপলাপ নিয়ে তাঁর বিলাপ এবং যা খুঁজতে তিনি দেশবিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন জয়স তা খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক ডাবলিন শহরের এক নারীর মধ্যে এবং আপাতচোখে যে-নারী অতি সাধারণ, এমন-কি যাকে নষ্ট-নারীও বলা চলে, অথচ যে মাতা যশুমতীর ভূমিকায় নেমেছে, যে সব দেশের সব কালের নারীদের প্রতীক, দান্তের বিয়াত্রিচে ও গোটের মার্গারেটের পাশে যার স্থান। একালের মানুষ তার সচেতনতা হারিয়ে ফেলে স্থূল জৈব অস্তিত্বে পরিণত হলে তার যে কী রূপ হয় তাও

জয়স দেখিয়েছেন ওই নারীরই স্বামী লিয়োপোল্ড ব্লুমের চরিত্রে। অবশ্য জয়স যে-সমাজের মধ্যে স্বামী চরিত্রটিকে স্থাপন করেছেন তা য়রোপীয় সমাজ অবশ্য নয়; ফলে জয়স-এর নায়ক বিশ শতকের উর্ণাজালে বন্দী এবং এই বন্দীত্বকে সে নিরুপায়ভাবে মেনে নিয়েছে। সে ডাবলিনের পথে পথে সারাদিন ঘুরে গভীর রাতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে—তার কাছে এই পরিক্রমা অডিসিউসের বিশ্ব-পরিক্রমারই সামিল। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হাস্যকর। কোথায় লিয়োপোল্ড ব্লুম কোথায় অডিসিউস! কিন্তু তার অস্তিত্বের এই হাস্যকর দিকটাকে, এই ক্ষুদ্রতাকে জয়স দেখেছেন, অলডুস হাকসলির মতো নিষ্ঠুর হৃদয়হীন উপহাসের সঙ্গে নয়, আন্তরিক সমবেদনা ও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এবং তাঁর অকপট বেদনাকে ঢেকে দিয়েছেন আপাত পরিহাস দিয়ে। "হালকা তুমি কর পাত্রে হালকা করি, ভাই, আপন ব্যথাটিই।" আর এই পরিহাস জয়স বজায় রেখেছেন বৃহদায়তন উপন্যাসটির শেষ পর্যন্ত যেখানে একালের অডিসিউস শ্রীযুক্ত ব্লুম তার নষ্ট-নারীর পাশে শুয়ে সিন্দাবাদ নাবিকের স্বপ্ন দেখে।

জয়স-এর নায়ক বন্দীত্বকে স্বীকার না করে পারেননি। কিন্তু তখন পরাজয় তাঁর নায়ক বা নায়িকা মেনে নেবে একথা য়রোপের পক্ষে অকল্পনীয়। তাই "দি রেনবো"-র নায়িকা উরসুলা ব্রাংগোয়েনএর মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠককে নিয়ে যান অসম্ভবের অপার বাস্তিতে, স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে, নবজন্মের বিগলিত স্বর্ণ-দিগন্তে। কারণ য়রোপের জগৎ বিশ শতকীয় সভ্যতার তথা জয়সীয় প্রতিবাদ : সেখানে দেশ বা স্থান প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল, সেখানে কাল হলো বুদ্ধি ও ধীশক্তির প্রতিমান, সাপের খোলস ছাড়ার মতোই সেখানে জয়সীয় "ইতিহাসের ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন" থেকে জেগে ওঠাই জীবনের সার্থকতম গতি। যখন উরসুলা প্রান্তরে কৃষ্ণ অশ্বগুলির গর্জনের মধ্যে এবং আকাশ-জোড়া রামধনুর তলায় তার অতীতকে ছেড়ে ফেলে তখন সে যেন সমস্ত সমসাময়িক বাস্তির হয়ে সকলের অতীতের বোঝাই নামিয়ে দেয় বলে পাঠকের প্রতীতি হয়, তখন তার হৃদয়ে সব-কিছুই জীবনীশক্তিতে উজ্জ্বল ও সব-কিছুই চিরন্তন:

"She knew that the sordid people who crept hard-scaled and separate on the face of the world's corruption were living still, that the rainbow was arched in their blood and would quiver to life in their spirit, that they would cast off their horny covering of disintegration, that new, clean, naked bodies would issue to a new germination, to a new growth, rising to the light and the wind and the clean rain of heaven. She saw in the rainbow the earth's new architecture, the old, brittle, corruption of houses and factories

swept away, the world built up in a living fabric of Truth, fitting to the over-arching heaven." এই লরেন্সীয় সমাধানে যে সান্ত্বনা প্রচুর তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই এবং এতে রয়েছে অস্তিত্বের যন্ত্রণা হতে সুনিশ্চিত অব্যাহতি।

কিন্তু আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হতে আমরা জানি যে সমাধান সত্যিই এত সহজ নয়, এমন-কি লরেন্স যে-সমাধান দিয়েছেন তা এতই উপলব্ধিসাপেক্ষ যে সর্বজনীন-পটে তা অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর। এ-ধরনের সমাধানের যথার্থতা টমাস মান যাচাই করতে চেয়েছেন অন্য ভাবে। তাঁর অন্যতম নায়ক টোনিয়ো ক্রেগর আধুনিক শিল্পীর শ্রেণীগত সমস্যাতে জর্জরিত—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সে পীড়িত ও ক্লান্ত, অথচ, এর জাল ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে যে শক্তি চাই তার তা নেই। জাল ছিঁড়ে বের হতে হবে এই সমাধানটা তার জানা থাকলেও তা সাধনের ক্ষমতা থেকে সে বঞ্চিত। একই সমস্যাতে বিদ্ধ হয়েছিলেন জয়সও। মান ও জয়স মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে আগত নায়কের যন্ত্রণাকে অনেক বেশী সর্বজনীন করে তুলেছেন লরেন্সের চেয়ে। লরেন্স যে তা পারেন নি তার কারণ তিনি সমস্যাটাকে দেখেছেন অন্য চোখে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা একেবারেই মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

সত্যি বলতে কি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে লরেন্সের কোনও আত্মীয়তা ছিল না, এই শ্রেণীর কৃষ্টিসভ্যতা ও সংস্কার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি; কয়লাখনির মজুরের ঘরে জন্ম গ্রহণের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধা-দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা হতে তিনি মুক্ত ছিলেন বলেই বোধহয় প্রাক্তনী তাঁর পক্ষে কোনদিন বন্ধন হয়নি, নিরাসক্ত চিত্তে নতুনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু জয়সের শিরায় শিরায় পরাক্রান্ত স্মৃতির অনুরণন, তাই তাঁর একমাত্র আশ্রয় ও সমাধান হলো শিল্প অর্থাৎ যে-বেদনা জীবন তাঁকে ঘিরেছে সেই বেদনাকেই রূপান্তরিত করে তাকে নিছক আর্তি ও ঐকান্তিকতার ঊর্ধ্বে তুলে জীবনেরই হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। নীলকণ্ঠের মতো গরল নিজে ধারণ করেছেন যাতে পৃথিবী অমৃতের আস্বাদ নিতে পারে। তাই মান-এর মতো জোসেফ-পুরাণের অনুরূপ কোনও পুরাণ হতে প্রতীক খুঁজে বের করবার প্রয়োজন তাঁর হয়নি, তিনি শিল্পের উপকরণ আহরণ করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতেই, জীবনের সত্য ও শিল্পের সত্যকে জয়স যুক্ত করেছেন অতি নিপুণ কৌশলে। "আমি গান শুনেছি আর আমি গাছ বেড়ে উঠতে দেখেছি—এ হলো দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের দুটি সত্য, দুটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াকে যোগ করে রিলকে গড়ে তুলেছেন শিল্পের সত্য : এ দুটি সত্যকে ভেঙে নেড়ে আঁকিয়ে যখন ঘিতোতে দিলেন তখন আমরা ওই চিত্রকল্পের স্কেচটিকে দেখলাম যেমন করে গাছ আস্তে আস্তে বেড়ে

ওঠে, বিস্তৃত হয়, নিজেকে মেলে দেয় পল্লবিত করে, নিজের ভিতর থেকেই নিজেকে ফুটিয়ে তোলে তেমনই শ্রুতির মধ্যে একটি সঙ্গীতও ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে, উন্মোচিত হয় পরতে পরতে, দলে দলে বিকশিত হয়। চিত্রকল্প সৃষ্টির এই পদ্ধতিকে কী বলব? কেলাসন? তা যদি বলা যায় তবে জয়স যে-আগুনে সারা জীবন ধরে দগ্ধ হয়েছিলেন তারই কেলাসিত রূপ হলো তাঁর বিদগ্ধ শিল্প, সেখানে আলো আছে কিন্তু জ্বালা নেই। এইটেই তাঁর শিল্পাদর্শ। স্টিফেন ডেডালাস-এর স্বরূপে "The Portrait of an Artist as a Young Man"-এ জয়স বলেছেন যে শিল্প "cannot awaken in us an emotion which is kinetic." এক হিসেবে এই শিল্পতত্ত্বের ভিত্তিতেই জয়সের নিজের শিল্পও যথার্থ ও সার্থক।

[ক্রমশ]

কবির ভাষ্য কবিতাবলী

এক : কবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার কাছে কোন কোন বৃক্ষের বিশেষ মূল্য। সব বৃক্ষের নয়, যেমন সব কবির অথবা যে-কোন কবিতার নয়। কোন কোন কবির, কোন কোন কবিতার; যাদের সঙ্গে আমি অনায়াসে নিম চন্দন অথবা আমলকীর তুলনা করতে পারি। সে কাঠে, সে ফলে আমার আসক্তি নিশ্চয় আছে যা দিয়ে ঘরের টেবিল-চেয়ার বানানো যায়, অথবা: ক্ষুধার সময় যা আমাদের জঠরের অগ্নিকে নির্বাপিত করে। আমার কাছে তাদের মূল্যও অনেক। কিন্তু নিম চন্দন আমলকী হরিতকীর তুলনা নেই—কেননা এইসব বৃক্ষ এবং ফল নিরাময়ের। সেই কবিতা, যা আমাদের মনের কলুষকে ধুয়ে দেয়, আমাদের অমল করে; অথবা প্রচণ্ড মারীর রক্তবমনের সময় যা বিশল্যকরণীর মতই আমাদের সকল যন্ত্রণাকে অমৃত করে;—আমি সেই কবিতা যদি একটিও কোনদিন লিখতে পারি; তাহলে, এবং তখনই আমি বলতে পারব—আমি একটি কবিতাই লিখেছি।

তার আগে, এখন পর্যন্ত আমি যে কবিতা লিখেছি, তা নিয়ে কি আত্ম-বিলাপ করাই তবে আমার পক্ষে সঙ্গত ও শোভনীয় হবে? আজ আমি অত্যন্ত জ্বরাক্রান্ত: কেবল রক্তবমন করছি—অথচ তবুও তো লিখছি। কেন? আমি এ-সম্পর্কে বেশী বিনয় করব না—বরং একটি স্পর্ধিত উক্তিই করব।, আমি নিজেই জ্বরাক্রান্ত, তাই কবিতা কিছু লিখছি না। শুধু মানুষের মত বেঁচে থাকার দাবী জানাচ্ছি—অমানুষিকতার বিরুদ্ধে আমার যতটুকু প্রতিবাদ করার তাই করছি। আমি কবিতা লিখছি না—কিন্তু চারদিকের প্রচণ্ড মার ও অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। মানবধর্ম পালন করছি।

আমি কোন কবিতা লিখছি না। যাঁরা লিখছেন, তাঁদের কবিতা আমি পড়বো। পড়ে নিরাময় হব। আমি যাকে কবিতা বলি, এমন কবিতা যাঁরা লিখছেন, আমি সেইসব মানুষকে জানতে চেষ্টা করব।

যদি তেমন মানুষ আজো পৃথিবীতে থেকে থাকে; তেমন বিশল্যকরণী যদি, নিরাময়ের অমল আনন্দ—যাকে আমি কবিতা বলি।

অন্ধকার বুকের ভেতর

তোদের মুখের ভালবাসায়
আমার মন ভরেনা—রে!
আমি তোদের বুকের মধ্যে ঘুমুতে চাই
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে নয়।

আমি তোদের বুকের মধ্যে জেগে উঠতে চাই
তোদের মুখের কথা শুনতে নয়॥

সাইক্লোন

সেই ভয়ঙ্কর সাপটা
কাল সমস্ত রাত আমার বুকের ওপর বসেছিল,
কাল সমস্ত রাত আমার বুকের ওপর বসে সে গর্জন করেছিল,
আর তার বিষদাঁতদুটো
আমার গলায়, দেখুন ডাক্তার, আঃ! হাত দেবেন না। শুধু
তাকিয়ে দেখুন,
সেই ভয়ঙ্কর সাপটা

•

তারপর লোকগুলো এল। জোর করে আমাকে খাটের
ওপর শুইয়ে দিল;
আর খাটটাকে কাঁধে নিয়ে সাপটাকে বলল রাস্তা দেখিয়ে দিতে।
সাপটা বলল, প্রথম রাস্তা আকাশের চেয়ে উঁচু, তারপর একটা
গভীর গর্ত দিয়ে যেতে হবে,
ওরা তাকে চুমু খেল; একজন দুঃখ করল,কলেরায় আর
তেমন লোক মরছে না!
আরেকজন তাকে বাহবা দিল; সাপটা বলল, তার প্রস্তাব
অনেক ভোটে পাশ হয়েছে;

তারপর আমাকে ওরা পুড়িয়ে ফেলল। ডাক্তার! একটু জল—
ওরা ফলসী করে জল নিয়ে এল, তবু আগুন যেন নেভে না;
আর আমার বুকের মাংসখানটা, দেখুন ডাক্তার, হাত দেবেন
না।
শুধু একবার দেখুন,

এইভাবে সমস্ত রাতটা
ওরা আমাকে মারল। কাল সমস্ত রাত ধরে
একটা ভয়ঙ্কর সাপ আর কয়েকটা মানুষ আমাকে খুন করল;
কেউ বাধা দিল না—কেউ না—শুধু যে মানুষগুলি
কবরখানায় শুয়েছিল
তারা একে একে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল; তারা
ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল

বোধহয় যুদ্ধের কথা। এবার আমেরিকানরা এলে যদি
সব মলা ধ্বংস হয়ে যায়
তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল।.....একজন বলল মেয়র হয়ত
এসব কিছুই জানেন না;
তারপর সবাই পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল;

আর সাপটা, তাদের সব কথা যেন গিলছিল, সেও পকেট
থেকে রুমাল বের করল,
তারপর বলল, দশ টাকা দিলে সে রুমালটা বিক্রী করবে,
কেননা এই টাকা জওয়ানদের পাঠান হবে। তারা সাপটাকে
সভাপতি করল।

সেই সময়, ওদের সভা যখন সুরু হয়েছে, আমি পালালাম:
এই জন্যেই পালালাম যে ঘরের মধ্যে বুকটাকে কোথাও
রাখতে পারছিলাম না—
ঘরের মধ্যে, ঘরের বাইরে, কোথাও তখন এতটুকু খালি
জায়গা নেই;
তাই ছুটতে লাগলাম.....ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে.....

খবরের কাগজের একজন রিপোর্টার, সেই বলে দিল
বুকটাকে রাখবার জায়গা—যেখানে সব খালি, সমস্ত
ঘরটাই খালি,

ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলাম। হাওয়া, অফুরন্ত
হাওয়া;
শুধু এককোণে একটা ভাঙা শিশি থেকে
নাইট্রিক এসিড গড়িয়ে পড়ছে, মেঝের ওপর, সেই মরা
মানুষটা যেখানে শুয়েছিল—
সেখানটাতে আমি থুথু ফেললাম।

তারপর রিপোর্টারকে গিয়ে বললাম, তার কাগজ খুব
বিক্রী হচ্ছে;
তাকে ধন্যবাদ দিলাম। সে আমার কানে কানে বলল,
আরেকটা মানুষ অন্য এক জায়গায় শুয়ে আছে; যদি নাইট্রিক
এসিডের ভাঙা শিশিটাকে
তার গলার মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে পারি
তাহলে কাল সকালের জন্য আরেকটা খবর হয়।
তাকে ঘুষ খেলাম। তারপর খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম
যেন সে ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়,
ঘরটাতে কোন সাপ আছে কি না?—সে আশ্বাস দিল,
সাপটা এখন ওই বারান্দায় যাবে না;
কেননা, সে এখন একটা উপন্যাস লিখছে।

সে রাস্তায় কোন আলো ছিল না। আর একটা মাতাল
ইলেকট্রীক কোম্পানীকে গাল দিতে দিতে অনেক অশ্লীল
কথা বলছিল;
তাকে বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার মুখের
ওপর বমি করল;
তারপর বলল, সে দীঘায় যাচ্ছে, সেখানে জিজ্ঞাসা করতে
রাত্তিরবেলায় রাস্তার আলো নিভবে কেন? তাকে সাপটার
কথা জানালাম—
সে রাজী হল, সভায় সে-কথাও তুলবে। তারপর বাড়িটা
দেখিয়ে দিল।

লোকটা ঘুমের মধ্যেই কি যেন বলছিল; তাকে ধাক্কা দিলাম,
চোখে মুখে জল ছিটালাম—

সে মিছিলের খবর জিজ্ঞাসা করল। বললাম, মিছিল জাহান্নমে
যাক! সে মন্তব্যের লক্ষ্য করে থুথু ফেলল;
আর সে-সময় আমি তার মুখের মধ্যে শিশিটাকে—
ডাক্তার! একটু জল।...আমার সমস্ত শরীরটা এতক্ষণে যেন
একটু হাল্কা হয়েছে; বাইরে অফুরন্ত বাতাস;
আমি রিপোর্টার-কে খোঁজ করতে লাগলাম—তার কাগজ
অনেক বিক্রী হবে—
বাইরে বাতাস, আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে, আকাশের
এক কোণে একটা তারা জ্বলছে
আমার মনে হল, সব অসুখ তাহলে সেরে যাবে, আবার
আমি ভাল হয়ে উঠব—
ডাক্তার! সে যে কী আনন্দ! ভাবছিলাম যদি রিপোর্টার-কে
খুঁজে না পাই
নিজেই খবরের কাগজের অফিসে যাব...তার সিঁড়িগুলিকে
আমি চুমু খাব;
আর, ঠিক সেই সময়, সে এলো! এমন ভয় আমি
জীবনে পাই নি;
যখন তাকে দেখলাম, যখন বুঝতে পারলাম, আর আমার
কোন আশা নেই!
না ডাক্তার! সাপ নয়। দিনের আলোয় সাপ আমার
কী করতে পারে—
যাকে দেখলাম সে একজন কবি। সে কবিতা লেখে, আর
যাতে মাইনে বাড়ে
সেজন্য রোজ ঘুম থেকে উঠেই মস্তবড় একটা বাড়িতে
যায়,
সেখানে গিয়ে একজন মানুষের পা চাটে!
সে কবিতা লেখে, আর একজন মানুষের পা চাটে—
ডাক্তার। তখন আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে; আর আমি
তার মুখ প্রথম দেখেছি!

ডাক্তার! আমাকে বাঁচান।

কবির ভাষ্য । কবিতাবলী

দুই। সুমুখ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা আমার কাছে একটি আশ্চর্য ভাষা। সে-ভাষায় কোন অলংকার না থাক, এক অবিশ্বাস্য জাদু আছে। কি করে কখন কোন অভিজ্ঞতার স্পর্শে কোন দুঃখ যন্ত্রণার অথবা প্রণয়ের মধ্যে এই জাদুর জন্ম আমি এখনো ধরতে পারিনি। জানিনা, কারু পক্ষে ধরা সম্ভব কিনা।

কবিতার বিষয়বস্তু মানুষ না, প্রকৃতি না, সামাজিক বা অসামাজিক ঘটনাবলীও না। কবিতার বিষয়বস্তু অনুভব। অনুভবেই এর প্রারম্ভ, এর অন্তিম।

কবিতার জন্ম নৈঃশব্দে। যখন দুচোখে বিস্ময়, নিরীহ সংশয়ের বিশ্বাস অবিশ্বাসের রাস্তা দুরুহ—সেই প্রচণ্ড অনুভবের মধ্যে লালিত হয় কবিতার বীজ।

কবিতার বক্তব্য গোপন। এত সে গোপন যে সহমর্মী বন্ধু বা প্রিয়তম স্ত্রীর কাছেও তা দুরপনেয়। এই গোপনতা কবিতার মাধুর্য, কবির বিস্ময়।

আর আছে কবিতার মধ্যে প্রাণবন্ত, কবির বিবেক। এই বিবেক বহু বছরের সংস্কার অথবা সংস্কার ভেঙেগে নতুন বোধ। যা উজ্জ্বল চেতনার আলোকে আরো উজ্জ্বল, মহিমায় চরিত্রবান।

বাড়ি

চারিদিকের গোলমাল চিৎকারে আমার
ঘুম ভাংগলো। তীব্র আলোকে
চোখ মেললাম। সব কাপ্সা লাগছে
চিনতে পারছি না কিছু। সব
অপরিচিত মানুষ কে কারা
এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কে কার সঙ্গে
কথা বলছে। যে ভাষা বুঝতে পারছিনা।
মনে হলো বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি ফেরা হয়নি
সারারাত। সারারাত আমার মধ্যে
অন্য কে কে যেন কথা বলেছে
সে ভাষা আমি বুঝিনি।

উত্তরসূরী

আমি বাড়ি ফিরব। চিনতে পারছিনা
রাস্তাঘাট। ঘর বাড়ি সব লাল নীল সবুজ
মনে হচ্ছে। নর্দমার দুপাশে
কালো রক্ত। চাপ চাপ রক্ত এপাশে ওপাশে।

আমি ঘুরছি এখনো। বাড়ির রাস্তা
সম্ভবত হারিয়ে ফেলেছি। আমার সেই
ছোট্ট নিষ্ঠুর বাড়ি।

কোনখানে মাটী নেই

(আমাদের লক্ষ্মীদিকে)

বন্ধু তোমরা দূরে যাও যে যেখানে পারো।
আমি মুখ দেখাবোনা অতঃপর আর
লোকালয়ে অথবা আড্ডায়। কেননা এই
প্রচণ্ড উত্তাপে মুখে পোড়া পোড়া দাগ,
চরিত্র অনামনস্ক; এবং আশ্চর্য
রুচির কখনো আমার মুবক বয়সের
পাগলামি ভয় করে। তাই আজকাল
একলা থাকতে চাই।

একা, ভয়ঙ্কর
একা আমরা সবে। যতই হাসছি কিম্বা
জমাট আড্ডায় গল্পের তুফান তুলি,
অথবা আসরে সামাজিক সেজে থাকি
বস্তুত আমরা সব ছিন্নমূল, একা।

কেননা কোথাও আর মাটী নেই। সমস্ত শহরে
নোংরা সুড়কি পীচ কিম্বা বাঁধানো এ্যাসফল্ট
রৌদ্রে বা পূর্ণিমার রাত্রে চিক্‌চিক্‌ করছে
অথবা হাসছে ধূর্ত হায়েনার মত তার দাঁত বার করে।

বন্ধু তোমরা দূরে যাও। পা রাখবার মত
কোনখানে মাটী নেই। আমিও বরং
গোপন শৈশবে ফিরে পৃথিবীর মুখ
মনে করতে চেষ্টা করব অমল আশায়।

কথামালার অন্তর্গত চাঁদের অনুকরণে

গর্ব

সর্বদা সভয়ে আছে। কখন প্রভুর
রোষদীপ্ত দুনয়নে ভর্ৎসনা জাগবে।
সর্বদা করুণ চোখে তাকাচ্ছে চারদিক
কী জানি, কী ভুল বা সে করেছে হঠাৎ।

সারাদিন বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত তার
দুঘরানো শরীরটাকে নিতান্ত অক্ষম
মনে হয় আজকাল। যৌবন বিগত,
বাকীটা বার্ধক্যের ছায়া। অতএব ভয়,

এক অদৃশ্য ভয়ের হাতছানি ডাকছে
তাকে। চিরকাল অন্যদের বোঝা টেনে
ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিম্বা ভালো লাগবার
সামান্য ক্ষমতাটুকু হারিয়ে এখন

সে একটা বিশেষণে রূপান্তরিত,
প্রভুতেই মোক্ষ যার। সামনে পিছনে
দেখতে পাচ্ছে না সে। আলো অন্ধকারে
পৃথিবী অসমতল মনে হচ্ছে তার।

২. সর্প

দুশ্চরিত্র নষ্ট মেয়ের চোখ দুটিতে যে
ক্রোধের অন্ধ এক মোহিনী ইংগিত
কুটীল গন্ধকে আয়ো রহস্যের অন্ধকারে টানে,—

তাকে বলছি সংগোপনে,
কী আনন্দে সারাদেহে তোর
বিদ্যুৎ বইছে! কী স্বপ্নে মশগুল তুই?

না কি তুই বিষকন্যা
ধ্বংসের আনন্দে যার কুটীল গহ্বরে
রহস্যের অন্তরীণ কোন এক মায়াবী জাদুতে
আচ্ছন্ন রাখবে?

তোর গা বেয়ে বেয়ে
শীতল মসৃণ এক স্পর্শময় দুরন্ত অতীত
কথা বলছে। ওরে ভীরু, বলছে হাঁক দিয়ে,
মৃত্যুকে অতই ভয়? কি করে পৌঁছুবি তুই
মন্দিরের শেষ ধাপে অন্ধকার নদী না পেরোলে?

৩- শৃগাল

হ্রাঙ্কাকুলে এক লোভী শৃগালের কথা
আমরা জেনেছিলাম কোন সুদূর শৈশবে
এবং মানবকুলে অধিকল চিত্র যার
দেখতে পাচ্ছি সংসারের ত্রিকোণ রাস্তায়,
মনে হচ্ছে আজ, যেন দর্শনের সব কটি অধ্যায়ে
তার কী চতুর নিপুণতা।

মনে হচ্ছে,
যেন ধূর্ত অভিজ্ঞান নিয়ে এতকাল
চিনেছে জহুরীর মত দেশকালপাত্র।
সুতরাং, আমরা সকলে তার কাছে
শিখতে পারি বাঁচবার অলীক কৌশল।

কিম্বা নির্জন এক হ্রাঙ্কাকুলে গিয়ে
পৃথিবীর যাবতীয় শান্তি সুষমাকে
ভর্ৎসনা করতে পারি অপলাপ জ্ঞানে।

৪· ময়ূর

সাজাতে সাজতে পারি রঙিন পোষাকে
সৌখীন বাবুর মত, বিকেলের হাওয়া
খেলায় বা বসন্তে, যদি দেখতে একবার
কুশলী শিল্পীর মত মুগ্ধতা কেবলি

অথবা বেলোল্লা হাসি, অফুরন্ত গানে
গঙ্গার জেটীতে বসে মাঝি মাল্লার
চটুল ইয়ার্কি, খুশি মনের মতন,
পাউ পাউ কুকচুড়া ওপারে কলকার;
ময়ূর এইসব জানে। জলের কিনারে
প্রতিবিম্ব দেখে, ঘোরে পেখমের আভা,
রক্তিম ঠোঁটের নীচে উদ্ধত যৌবন,
তীব্র সুখ অহংকার দিবা অনুভবে।

ময়ূর এইসব জানে। আর জানে মাতাল হাওয়ার
দিন যায় দিন যায় বিড়ম্বিত রজনী পোহালো।

৫· শূকর

খানিকটা কাদামাটি, শরীর ঘিন্‌ঘিন্
ওপাশে নর্দমা, ঘুরে ছাইভস্ম কি মাখছে গায়ে,
পচা ফুল, জলস্রোতে না তারকা না আকাশ কিছু;
দেখা যাচ্ছে না। এমনি গন্ধ, নোংরা স্তূপীকৃত
একপাল বিভৎস পশু। গাদাগাদি পড়ে আছে, কেউ
উঠছে নামছে, নামছে উঠছে সারাদিনমান
চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠ সব আছে আছে আছে,
অথচ কিছুই নেই, কেবল অস্তিত্বে
একরাশ যন্ত্রণা ছাড়া—যে যন্ত্রণাও
বোঝবার ইন্দ্রিয় নেই, হায় রে ঈশ্বরের
কী ভীষণ রসিকতা, দেখো একবার।

রবীন্দ্রনাথের গান । হৃদয় ও মননের আবেদন

অরুণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আমার মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই। উচ্ছ্বাস নেই বলেই, এবং এই গানের অকৃত্রিম অনুরাগী হিসাবে, আমার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কয়েকটি সত্যভাষণ আজকের দিনে প্রয়োজনীয়। কিছু কিছু সমালোচক, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন সমস্ত মন্তব্য করছেন যেন মনে হয় বাঙালীর গানে রবীন্দ্রসংগীতই একমাত্র উৎকর্ষ, রবীন্দ্রসংগীতে রাগরাগিণীর প্রয়োগের মধ্যেই অনেকে এমনই সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান যে যুগযুগান্তের রাগসংগীতও তার পাশে তুচ্ছ। অপরপক্ষে, হিন্দুস্থানী সংগীতের গুণগ্রাহী ও তথাকথিত দুচারজন সমালোচকের মন্তব্য হচ্ছে, যাদের কান একবার রাগরাগিণীর সুরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত নিতান্তই হাল্কা ও জোলো। প্রথমোক্ত মতামত যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, দ্বিতীয় মন্তব্যও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। আমার ধারণা তাঁরা রাগসংগীতের তান গমক মিঁড়কিরী বা লয়কারীর মধ্যেই সংগীতের মেজাজ পান এবং রবীন্দ্র সংগীতে এসকল অনুপস্থিত বলে সুর বোধহয় ঠিক জমেনা মনে করেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গান যে হৃদয়বেগ ও মননের এক অবিমিশ্র কল্পনা সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝবার অবকাশ তাদের নেই। বলা বাহুল্য আমি কোন পক্ষেরই এজাতীয় মন্তব্যে আস্থা রাখিনা। এবম্বিধ আলোচনার ফলে ভারতবর্ষ ও বাংলার সাংগীতিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের যথাযথ স্থান যেমন সঠিক নির্ণীত হয়নি, অন্যদিকে তাঁর গানের সত্যকার আবেদন কোথায় এবং কেনই বা ক্রমশ জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের গানে ক্রমশ আনন্দ লাভ করছে এসকল কথা ভেবে দেখা হয়না। বলে রাখা ভালো, এই প্রবন্ধ সমালোচকের রচনা নয়, শ্রোতার মনে রবীন্দ্রনাথের গান কিভাবে আবেদন সঞ্চার করে তার বিবরণ মাত্র।

ইংরেজ সমালোচক ডোনাল্ড টোভে, যিনি বেঠোফেন সম্পর্কে অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি রেখে মারা যান, উক্ত সুরকারকে পৃথিবীর অন্যতম 'complete artist' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকেও, সামগ্রিকভাবে, উক্ত বিশেষণে ভূষিত করা চলে। শুধুমাত্র একারণে নয় যে তিনি শিল্প সাহিত্যের সকল শাখাতেই অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অথবা একারণেও নয়

যে তিনি সংগীত রচনাতেও সুরে লয়, মাত্রাভেদ, তালের বৈশিষ্ট্য, মীড়ের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, স্থায়ী অন্তরা বা সঞ্চারী আভোগের সমতা রক্ষায় আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়েছেন। তিনি যে পরিপূর্ণে শিল্পী তার কারণ তিনি জীবনকে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন বিভক্ত অংশে দেখেননি। একটা সামগ্রিক পূর্ণ রূপে তিনি এই সৃষ্টিকে নতুন অর্থে প্রাণদান করেছিলেন। অফুরন্ত বৈচিত্রে এই প্রকৃতি ও মানবজীবনের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আজও বহমান তার রহস্য উদ্ঘাটনে সক্রিয় ছিলেন। এক কথায়, তাঁর রচিত সংগীত শুধুমাত্র সাংগীতিক গুণাবলীর বিচারে ত্রুটিহীন নয়, একটি গভীর সত্যদর্শন ও জীবনবোধে সর্বদাই উজ্জ্বল। তাঁর সংগীত যে বার বার ধারা পরিবর্তন করেছে তাও সেই বৃহৎ জীবনসত্যেরই প্রমাণস্বরূপ। শিল্পীর অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি, সুখ দুঃখ বেদনার, নানা বৈচিত্র ও রসাস্বাদে সম্পৃক্ত তাঁর মন সংগীতে মুক্তি খুঁজেছে। সাহিত্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন, চিত্রশিল্পে মনের দ্বিধাবিভক্ত অনুভূতি নিরাবরণ রেখায় বিনাসে উন্মুক্ত হয়েছে এবং সর্বশেষে পরিশীলিত চেতনা ও সূক্ষ্ম রসবোধ সংগীতে এসে বিস্ময়ে বৈচিত্রে নানা ধারায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এখানে সেকারণেই তিনি মুক্তি খুঁজেছেন 'আলোয় আলোয় এই আকাশে'। সেই বাণীকে বেঁধেছেন সুরে। এবং অসম মাত্রার তালে গানটিকে বেঁধে তেওড়ার ছন্দে এক আশ্চর্য ঝোঁক এনেছেন যার ফলে কথা ছাড়িয়ে, সুর ছাড়িয়ে অন্য এক চেতনা শ্রোতার মনে নিরন্তর কাজ করতে থাকে। বস্তুত রবীন্দ্রসংগীতে এই ব্যঞ্জনাই তার বৈশিষ্ট্যের কারণ, অন্যদিকে এই ব্যঞ্জনা সম্ভব হতনা যদি না সংগীত সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবন সম্পর্কিত এই নিগূঢ় চেতনা এক অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ধারায় নিয়ত প্রবাহিত হত।

রবীন্দ্রজীবনের এই সত্যদর্শন মনে না রাখলে রবীন্দ্রসংগীতের সুষ্ঠু বিচার সম্ভব হবেনা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর সংগীতসৃষ্টি পুরোপুরিই একটা ইন্সথেটিক অভিজ্ঞতা: রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিচারে কবি হলেও তাঁর জীবনের সাংগীতিক ধর্মও তাঁর ভাবাচর্চাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর জীবনের মধ্যপর্বের কবিতাগুলি আজও সেই সাক্ষ্য বহন করছে। পরবর্তীকালে তাঁর বহু কবিতাকেই তিনি গানে সুর দিয়েছেন—তা কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচার না করেও এ-কথা বলা যায় যে সংগীতের প্রতি, সুরের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল, এমন অন্তর্নিহিত টান ছিল যে তিনি জীবনের কোন সময়েই তাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেননি।—বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্বীকারোক্তি থেকেও সংগীতের প্রতি তাঁর সর্বাধিক সময়ের কথা আমরা জানতে পারি। অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনের একটা বিরাট অংশে যে সংগীত-

চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল, তার নানাবিধ কর্ম ও চিন্তার মধ্যে যে সংগীতই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২

যতদূর জানা যায় খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিশুদ্ধ রাগসংগীত শুনেছিলেন, সেই পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েছেন, শুদ্ধ সুরে তার কাণ তৈরী হয়েছিল। রাগ রাগিণীর দুরূহ পার্থক্য বোঝবার অবসর বা ওস্তাদের মত দীর্ঘদিনের সাধনা তাঁর ছিলনা—তিনি সে প্রয়োজনও অনুভব করেননি। কেননা, তিনি নিজে গায়ক হবার আদর্শে নিজেকে তৈরী করেননি; গীতিকার ও সুরকার হিসেবেই সংগীতের চর্চা করেছিলেন। এবং একাধারে গীতিকার ও সুরকার হতে গেলে সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা রবীন্দ্রনাথের অপর্যাপ্তই ছিল—অর্থাৎ সূক্ষ্ম রস বোধ। কোন্ সুর কোন বাণীতে প্রযোজ্য, সুরকে কতটুকু ছন্দের অবাধ মুক্তিতে ছেড়ে দিতে হবে, কোথায় তাকে বেঁধে রাখতে হবে এর সুসম ব্যঞ্জনা তাঁর নিজের মধ্যে অতি অনায়াসেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে তিনি যেটুকু ভারতীয় সংগীতের পাঠ নিয়েছিলেন তাই শেষ জীবন পর্যন্ত তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। যদিও একথা স্বীকার্য তিনি পরবর্তীকালে সুরপ্রয়োগে শুদ্ধ রাগ রাগিণীর পরিবর্তে দেশজ লৌকিক বা নানাবিধ সুর মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এও সমভাবে সত্য যে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধিতে যে প্রধান দুটি সত্য অধিগত করেছিলেন তার সংগীতে সেসকলের আশ্চর্য প্রতিফলন দেখতে পাই।

প্রথমত তাঁর ধারণায়, শিল্পের মূল তত্ত্ব তার পরিমিতিবোধে, দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংগীত মূলত মানবমনের অন্তর্নিহিত ভাববৈচিত্র্যেরই প্রকাশ। এবং আমার মনে হয়, যিনি এদুটি তত্ত্বে বিশ্বাসী সংগীতরচনায় তাঁর চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া দুরূহ। রবীন্দ্রসংগীতের যে বিশিষ্টতার জন্য ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা এবং সুধীসমাজের কাছে তার আকর্ষণ, সংগীত সৃষ্টির পেছনে এই অনন্য বোধই সেকারণে দায়ী।

রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টতার মূলে আর একটি সত্য উপলব্ধির প্রয়োজন। তাঁর কাব্যে মননশীলতা ও সংগীতে হৃদয়াবেগ—এদুটিই গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারার মত একটি পরিপূর্ণ ঐক্যে এসে মিলেছে, একটি অখণ্ড মূল সৃষ্টি হয়েছে—যাকে কোন কিছু মানদণ্ডে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণে বোঝানো যাবেনা হয়ত, এবং যা সম্পূর্ণই অনুভবের বিষয়। কণ্ঠকৃত সংগীতেও যে মননশীলতার স্থান রয়েছে তা এর পূর্বে একমাত্র রাগসংগীতেই আমরা জেনেছি।

সর্বশেষ প্রস্তাব এই যে রাগসংগীত যেমন মূলত সুরনির্ভর, দেশজ বা

লৌকিক গান তা নয়—সেখানে বাণীকে কেন্দ্র করেই অর্থাৎ ভাবের ব্যঞ্জনায় সুরের আবর্ত রচিত হয়ে থাকে। বাণী প্রধান না সুর প্রধান এ চিন্তা যেমন কোন সংগীতস্রষ্টারই ভাবনার কারণ ছিলনা, রবীন্দ্রসংগীতেও ঠিক তাই ঘটেছে। দেশজ গানের এই বিরাট ঐতিহ্যেই রবীন্দ্রসংগীত রচিত। বাণীর উপযোগী সুর সৃষ্ট হয়েছে, কখনো সুর মনে এসেছে—সেখানে উপযুক্ত বাণী রচিত হয়েছে। এবং পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে যেমন অখণ্ড নতুন সৃষ্টি, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতে বাণী এবং সুরের যুগ্মমিলনে এক নতুন সার্থকতায় উত্তীর্ণ; ইংরেজীতে যাকে বলে organic structure রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টিও তাই—যে কোন বড় সৃষ্টি organic হতে বাধ্য, নইলে সেখানে অভিজ্ঞতার অভাব বড় প্রকটভাবেই ধরা পড়ে। এবং রবীন্দ্রনাথের গানে যাঁরা আজকাল রাগরাগিণীর ব্যবহার নিয়ে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন তাদের একথা বলি যে মল্লার সুরে বা ভৈরবী সুরে কোন রবীন্দ্রসংগীত শুনলে কোন শ্রোতারই প্রথমে সেটা মল্লার বা ভৈরবী মনে হয়না। মনে হয়, রবি ঠাকুরেরই গান। এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের এই আশ্চর্য ঔৎকর্ষই তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সুরপ্রয়োগের রীতি দেখে সংগত কারণেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন-দিনই তাঁর গানে বিভিন্ন প্রকার মল্লার, কানাড়া বা টোড়ীর পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাননি, এখনকার রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা যা নিয়ে অনাবশ্যক চর্চা করে থাকেন, সমালোচকেরা কূট তর্ক উপস্থাপিত করেন। বস্তুত শিল্পীর মন যে মুক্ত থাকবে, কোন বন্ধনই সে স্বীকার করবেনা, প্রচলিত প্রথা তাকে কখনোই শাসনে রাখতে পারেনা এ-সত্য সুরকার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সার্থক পরিমাণে প্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে জানিয়ে-ছিলেন "গানসৃষ্টির নিরন্তর আনন্দে আমার দিনরাত্রি উচ্ছল হয়ে উঠত। ঝরণা হয়ে যেত আমার অন্য কর্মের ধারা।.....রাখাল যেমন একলা মনের আনন্দে কর্মহীন প্রহরগুলি ভাসিয়ে দেয় সুরে সুরে, না থাকে কেউ জুড়ি তার, না থাকে কেউ শ্রোতা, আমার সেই দশা ছিল। আমার গান তখন অবজ্ঞার এমনকি বিদ্রূপের বিষয় ছিল, কিন্তু আমার জীবন ছিল রসে পূর্ণ".....

রবীন্দ্রনাথের এমনতর উপলব্ধি থেকেই তাঁর সংগীতরচনার উৎস জানা যাবে। সেখানে রাগরাগিণীর কণ্টকিত চিহ্ন নেই, স্বরলিপির সূক্ষ্ম তারতম্য নেই কোমল বা শুদ্ধ নিষাদের মারামারি নেই। আছে সহজ প্রাণের আনন্দ সৃষ্টির অনন্ত স্বাধীনতা। এবং এই বোধ একজন শিল্পীর তখনই আসে যখন তাঁর চেতনায় সমগ্র জীবনবোধ একটা গভীর ঐকাসূত্রে গ্রথিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে সেকারণেই complete artist বলা সংগত বলে আমার মনে হয়েছে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে

তার গানের সুর রূপ থেকে রূপান্তরে বিচরণ করেছে রাগিণীর রসলোকের উপর দাঁড়িয়ে। তাই তাঁর গানে আমরা যতই মিশ্র রাগিণী দেখি না কেন, এ-মিশ্রণ সচেষ্ট কোন পরিকল্পনার উদ্ভূত নয়।' আমি আরো একটু বাড়িয়ে বলতে চাই যে রাগ রাগিণীর সুরকে কেন্দ্র করে যে ভাবরূপ ও অবশেষে ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের রসমাধুর্যে তা যেন অতি সহজেই আপন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত আর তিনি যখন কোন গানে সুর যোজনা করতেন সেসকল সুরের ভেতরকার আত্মা যেন অবলীলাক্রমেই তাঁকে ভর করে দাঁড়াত। রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য তার রাগরাগিণীর অজস্র ব্যবহারে নয়, বিভিন্ন তালের বিধিনিষেধেও নয়। যে অপার স্বাধীনতা ও মুক্তির আস্বাদ এনে দেয় তাঁর রচিত গান তাই—তাকে বিশিষ্ট করেছে, সকল সুরকারের সকল গীতিকারের চেয়ে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি, একথাটাই ছোটবেলা থেকে বারবার বিঘোষিত হয়েছে, তাঁর কাব্যসত্তা ওতপ্রোতভাবে সকল রচনার মধ্যেই জড়িয়ে আছে একথাও সত্য। তবু আরো একটা সত্য সহজমনে স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন আজকের দিনে বোধ হচ্ছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গীতি-প্রতিভা ততটাই উজ্জ্বল, ততটাই ধ্রুবতারকার মত নিশ্চিত, স্পষ্ট, ভাস্বর। যাঁরা কখনো মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যজীবনের অতি দীর্ঘ ভূমিকার পাশে সংগীতজীবন সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত, তারা ভুল করেছেন। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের পাশাপাশিই বয়ে চলেছিল একটি গভীর মননশীল সংগীত সাধকের জীবনধারা। শুধু তাই নয়, এমন প্রমাণ সহজেই আমরা তুলে ধরতে পারি যাতে মনে হবে তাঁর জীবনের বহু সময়েই তার সংগীতসাধনাই প্রভাবিত করেছে তার কাব্যচর্চাকে। গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্যের যুগকে, আমি তো মনে করি, মূলত সাংগীতিক প্রতিভার যুগ—যখন তার কাব্যচর্চা গীতিময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর জীবনের সাংগীতিক ধর্ম প্রথম থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ও শেষ জীবন পর্যন্ত পরোক্ষ ভাবে কাব্যরচনার সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার সম্বন্ধসূত্রে জড়িত থেকেছে।

অন্যপক্ষে যেসকল গান তিনি রচনা করেছেন তাতেও কাব্যের মৌলিক আবেদন রয়েছে, ভাবে, ব্যঞ্জনায়, অনুভূতি ও স্পর্শময়তায় সে-সকল সংগীতকে উৎকৃষ্ট কবিতা ছাড়া কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ একদিকে যদি সুরের মাধ্যমে হৃদয়বৃত্তি ও ভাবরূপের আবেদন শ্রোতার কাছে পৌঁছায়, অন্যদিকে কাব্যের রসাস্বাদনে মননধর্মের একটি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চেহারা সেখানে পাশাপাশি একই মুকুরে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। 'এ পরবাসে রবে যে হায়', 'আমি কেমন করিয়া জানাব', 'ওই শুনি বেন চরণধ্বনি রে' প্রভৃতি গানের মধ্যে যে আকুল ও রহস্যঘন আবেদন রয়েছে তার মননশীলতা সকল সং-

কাব্যপাঠককেই স্পর্শ করবে। যেসব গানকে আমরা সাধারণভাবে ব্রহ্মসংগীত বলে জানি বা 'পূজা' পর্যায়ের গান বলে তাকে আধ্যাত্মিক মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তারও অধিকাংশেই এই রহস্যঘন আবেদনে আপ্লুত। এবং বলাই বাহুল্য, অনুরূপ সুর যোজনায় তার মর্মস্পর্শিতা আরো বহুগুণে বেড়েছে। সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেও কোথায় যেন একটা আকুতি নিরন্তর প্রাণে বাজতে থাকে, যার সুরের রেশ মিলিয়ে গেলেও ভাবের গ্রন্থি ছিন্ন হয়না—এমনই এক আশ্চর্য দুর্নিবার আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের গানকে কবিচিত্তের কাছে পরম মহিমময় ও মননশীল আবেদনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার বৈচিত্র্য সকলকেই বিমুগ্ধ করে, তার বিস্তার বিস্মিত করে। কিন্তু এই তথ্য থেকে যে কথাটি প্রমাণিত হয় তা বহু সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে হয়ত। পূর্বে যে রবীন্দ্রনাথকে complete artist বলে অভিহিত করেছি, বস্তুত সেই তত্ত্বটি আবার পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিভক্ত সত্তা বা অভিজ্ঞতার চেহারা যতক্ষণ ধীরে ধীরে একটা পূর্ণ সুষমা লাভ না করছে, রবীন্দ্রনাথ ততদিন নিশ্চিন্ত হন নি: এই প্রক্রিয়ার ফলে হয়ত অনেক সময় প্রকৃত রসোত্তীর্ণ কাব্য বা সংগীত রচিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে, তাঁর জীবনের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতার নিরিখে বোঝা যায়, সব কিছুর মধ্যেই সেই আশ্চর্য জাদু ছিল, যার জন্য তার সমগ্র সাংগীতিক জীবন একটা ঐক্যের দিকে, পরিপূর্ণতার দিকে, সুষমার দিকে এগিয়ে গেছে। সেখানে হয়ত বাণী সবচেয়ে প্রধান নয়, কোন সময় সুরও নয়, ছন্দও নয়। এক অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, এক লাবণ্য তাকে অবয়ব দিয়েছে যার ফলে সমস্ত সৃষ্টি অনন্য হয়ে উঠেছে। সৃষ্টির এই বৈচিত্র্যে তার অফুরন্ত উৎসাহ ও বিশ্বাস না থাকলে 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় সুর সংযোজনা করার কথা ভাবতেন না, ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে রচিত 'একটা আষাঢ়ে গল্পকে পরবর্তীকালে 'তাসের দেশ' এর মত নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করবার বাসনা হোতনা, 'ভারততীর্থের' মত নিছক কবিতায় সুর সংযোজিত হতনা। ('ভারততীর্থ" কবিতাটিতে সুরারোপ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে—কোনক্রমেই সংগীতের ভাবরূপে উক্ত কবিতাটি উত্তীর্ণ হয়েছে বলে আমার মনে হয়না) কিন্তু এসকল অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার পক্ষে একটি আশ্চর্য নির্দেশক সূত্র। শুধু সুরের বৈচিত্র্য বা দুঃসাহসিক ব্যবহার নয়, বিষয়ের অফুরন্ত বৈচিত্র্যও তার সংগীতের ভাবকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তিনি চলে গিয়েছেন—শুধু অভিজ্ঞতার সীমানা যে তাতে বিস্তৃত

হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে কি কি অনুভূতি তাকে প্রবল টানে আকর্ষণ করেছে তাও ক্রমশ জানা যাচ্ছে। এই তথ্য থেকে তার জীবনের প্রধান প্রধান ভাবধারার সূত্র অনুসন্ধানও সহজ হয়ে পড়েছে।

সুরের গুরুকে আবাহন করে বলেছেন, সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা / মোরা সুরের কাঙাল। সুরকে কাঙালের মত ভিক্ষা করতে হয়—তা না হলে সুর ধরা দেয়না, এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনেই বুঝেছিলেন। কিম্বা, তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, / সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে—ইত্যাদি গানেও সেই সুরের আবাহন ও প্রভাবের কথা। সুর অথবা সংগীত, বীণা অথবা কোন গানের চরণ কবি রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশই টানছে—পূজা পর্যায়ের প্রথম থেকে ৬০ সংখ্যক গানের প্রায় প্রত্যেকটিতেই হয় সুর, নয় বাণী, হয়ত সংগীত, নয়ত বীণা হয়ত বাঁশি, অথবা তান—এমনি-ভাবে সাংগীতিক পরিমণ্ডলের আভাষ পাচ্ছি—রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুতেই এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তিনি বেরোতে চান না, তাই বার বার ঘুরে ফিরে একই অভিজ্ঞতায় ডুব দিতে চান। ১৯, ২০ সংখ্যক কবিতায় বীণার ঝংকারে বাঁশি ব্যবহার করেছেন। বেলাশেষের তান শুনেছেন তিনি এবং বঁধুর কাছে আসার বেলায় শুধু গানটি গলায় নিয়েছেন। কতগুলি বিশেষ বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করেছেন এই সকল কবিতায়—যা তাঁর এজাতীয় গানের ভাবকে এক বিশেষ রূপে মণ্ডিত করেছে, তরী, পাল, কূল, বাতাস, গগন, ইত্যাদি এবং অনুভবের দিক থেকে বেদনা, বিচ্ছেদ, প্রেম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে একটি সুন্দর সমর্পণের ভাব রয়েছে। বলা বাহুল্য, এদিককার গানে রবীন্দ্রনাথ এজন্য করুণ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর সুর দিয়েছেন—ইমন বা বেহাগে এদের রূপ ফুটে ওঠেছেন।

এবং প্রায় এই সময়ে ৬০ সংখ্যক গান থেকে তাঁর আবির্ভাবের কথা বার বার ধ্বনিত হচ্ছে। যাঁর জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করে আছেন, যাঁর আভাষমাত্র পেলে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে উঠবে, যাঁর জন্য তাঁর এত গানের আয়োজন, তিনি কোথায়। তাঁর সঙ্গে সুরকার রবীন্দ্রনাথের মান-অভিমানের পালা চলছে—কত অভিলাষ, অভিমান, ক্রন্দন। মানবহৃদয়ের সমস্ত আকুতি। আলো অন্ধকারের রাত্রি দিবসের প্রতীক এসময় বেশী ব্যবহার করেছেন। রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে / তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহনার ধারে—এমনিতর ছবি তাঁর গানে ক্রমশ আসছে। এসব ঝংকারে ঢালা, মীড়প্রধান সুর ব্যবহার করেছেন—মোহনার ব্যাপ্তি বোঝাতে গিয়ে, রহস্যময়তাকে আরো গভীরে নিয়ে যেতে তাকে সুরের সবকটি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে হয়েছে।

এই সময়কার গানে প্রভু, নাথ, প্রিয়, দেবতা প্রভৃতি নানাভাবে তিনি তাঁর

অন্বিষ্টকে খুঁজে বেরাচ্ছেন। ১০০ সংখ্যক কবিতা থেকে বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জীবনদেবতা প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে নানা কাজে এবং দায়িত্বের বাঁধনে বাঁধছেন। জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথকে যত ভার দিয়েছেন—তা সহজ, কিন্তু তিনি সেভার কিছুতেই বহন করতে পারছেন না। প্রভুকে ডাকছেন, যদি এ আমার হৃদয়বনুয়ার বন্ধ রহে গো কভু / স্বার ভেঙ্গে বুঝি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না কভু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শক্তি কামনা করছেন, সংসারতাপ সহ্য করার ক্ষমতা চাইছেন। আরো প্রার্থনা করছেন, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—শুধু তাই নয়, এ আকুতি তার যেন ব্যর্থ না হয়, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ / তুমি করুণামৃত সিন্ধু করো করুণাকণা দান। যারা রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠে এই গানটি শুনেছেন, সামনে বসে অথবা রেকর্ডে, তারা বুঝবেন, শুধু ভাবকে রূপ দিতে গেলে সুগায়কের অন্তরে একটি অলৌকিক সুর থাকে—যা রাগ রাগিণীর গণ্ডীর মধ্যেও ধরা দেয় না, নিজের প্রাণের এক রহস্যঘন স্থান থেকে যা উদ্ভূত হয়ে চারিদিকে অলৌকিক বিভা সৃষ্টি করে। সেখানে শুধু গভীর আবেগ ও তন্ময়তা, অনন্ত বিশ্বাস ও অমিত শ্রদ্ধা। এর পর নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়েছেন তিনি। যামিনী ও প্রভাতের, অন্ধকার ও আলোকের, রৌদ্রময় ধরিত্রী ও মেঘগর্জনের গাম্ভীর্য উদ্বুদ্ধ পৃথিবীর লালসা,—এ সমস্ত অভিজ্ঞতার রৌদ্র বা ধীর রসের এক অধ্যায় যা তার গান রচনার কোন সময়কার বিষয়বস্তু। দুঃখ যখন প্রচণ্ড তখন তাঁর মনে হয়েছে, এ পরবাসে রবে কে হায়! / কে রবে এ সংসারে সন্তাপে শোকে অথবা দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে—আবার কখনো সেই বিষাদ কাটিয়ে উঠে তাঁর প্রেমগান করেছেন, গাও বীণা—বীণা, গাও রে / অমৃত মধুর তাঁর প্রেমগান মানব সবে শুনাও রে। অথবা একি করুণা করুণাময়—এমন দিবা বোধে তাঁর হৃদয়শতদল কখনো ফুটে উঠছে।

বর্ষীত 'পূজা' পর্যায়ের রচিত গানগুলিতে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। জিজ্ঞাসার, সমর্পনের, আকুতি বা বিস্ময়ের, বেদনা বা আনন্দের—মানবমনের নানা রকম ভাব অনুভাব এর মধ্যে উচ্চগ্রামে বিধৃত। সুরসংযোজন ভাব-অনুযায়ী, রাগ-রাগিণীর ব্যবহার, গায়কী বা চলের মধ্যে, ছন্দপ্রধান, তান-বর্জিত, মীড়, কখনো বা সূক্ষ্ম কাজের অলংকার—এসব মিলে এবং গম্ভীর ছন্দে চৌতাল বা সুরফাঁক্তা অথবা তেওড়ার ঠেকে—এসময়কার গানগুলি রসিক-চিত্তকে এক গভীর অন্তরলোকে সহজে পৌঁছে দেয়। আশ্চর্যের কথা এই যে কখনোই রবীন্দ্রনাথ এমন গানে অমুক সুর দিলে কেমন হয় দেখা যাক—এই ভাব না নিয়ে—সহজে যেমন সুরটি এসেছে তাইতে গান বেঁধেছেন। সেকারণে পূজা পর্যায়ের গান আমার কাছে আবেদনের দিক থেকে অনেক বেশী

সুগভীর। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সুর বসিয়েছেন—সেকথা পূর্বেই বলেছি—অভিজ্ঞতা অর্জন বা বৈচিত্র্যের জন্য—কিন্তু প্রথম দিকে তিনি সম্ভবত পুরোপুরি ভাবের পর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেকারণে রাগ রাগিণীর ভীড় সত্ত্বেও জটিল হয়নি; এই সহজাত সুষম ব্যঞ্জনায় সংগীতগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরী,—এই প্রধান চার অঙ্গের গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ এবং টপ্পার সমাদর করেছেন অনেক বেশী। খেয়ালের অলংকরণ তাঁকে সব সময় আনন্দ দেয়নি, বরং ধ্রুপদের গাম্ভীর্য ও সুরের স্থায়ীভাব তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছে—আবার ঠুংরীর লঘু চালের চেয়ে টপ্পার দানায় তিনি এক আবেগময়তার প্রকাশ দেখেছেন।

এইভাবেই যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে আমরা লক্ষ্য করব, 'প্রেম' পর্যায়ে, 'স্বদেশ' পর্যায়ে, 'প্রকৃতি' পর্যায়ে সৃষ্টির অফুরন্ত দিক উন্মোচিত হয়েছে। এবং 'প্রেম' পর্যায়ের মধ্যেই নানা অনুভব, 'স্বদেশ' পর্যায়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং 'প্রকৃতি' পর্যায়ে অফুরন্ত চিত্রাবলী। কোন দূরদেশী পথিকের সামনে এই ঐশ্বর্যময় ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখলে হঠাৎ তার রসপিপাসু চিত্ত হয়ত বলে উঠবে, এ কোন আশ্চর্য জাদুকরের নিপুণ কারিগরি—এমনি করেই কি কেউ সমস্ত কল্পনাকে এত প্রত্যক্ষভাবে, নিখুঁত পরিকল্পনায় রূপদান করতে পারে! কিন্তু না, এর মধ্যে কোন আপাত পরিকল্পনা নেই। যদি থেকে থাকে তবে এখানে যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনটাই এক আশ্চর্য শিল্প—যে শিল্প এক-মাত্র বিধাতাই গড়ে তুলতে পারেন তিলে তিলে। এবং যেহেতু তিনি মানব-জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকেই বৃথা মনে করেননি সেহেতু সবই তার সৃষ্টির যজ্ঞশালায় এসে জুটেছে। আমরা তা ভালো করে সাজাতে গিয়ে দেখি, সেখানে কী অফুরন্ত বৈচিত্র্য, অজস্র বোঝাপড়ার মধ্যে কী আশ্চর্য নিয়ম! বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনেই এই বিচিত্রতার ঐক্য, এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা—তাই তিনি যে কোন চর্চাতেই হাত দিন না কেন, পরিশেষে তা এক সম্পূর্ণ জীবন-চর্যায় উন্নীত হয়ে গিয়েছে। সংগীতের মধ্য দিয়ে তিনি ভাবার মননের ও সুরে হৃদয়ের সংযোগ রক্ষা করেছেন এমনিভাবে। এভাবেই তার জীবনবোধ ও সংগীতের শিল্পবোধ এক অকৃত্রিম ভাবরূপে এক হয়ে গিয়েছে। সেখানেই তার সকলের ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের জিৎ।

৪

'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলির সংখ্যা ৪৬। কিন্তু এর মধ্যে পাঁচটি সুস্পষ্ট স্তর রয়েছে। দেশপ্রেম, শক্তির উদ্বোধন, আশা ও জয়বাত্রা, স্বদেশের রূপবর্ণনা,

নবীনের আবাহন। গানগুলির বেশীর ভাগই এক সময় রচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জনচিত্তের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে তিনি কিছু উদ্দীপনাময়ী গান লিখে, সুর আরোপ করে, নিজেই গেয়েছিলেন। সেজন্য স্পষ্ট motif নিহিত রয়েছে। কিন্তু সেদিনকার সে ইতিহাস যদি কারু জানা নাও থাকে তাহলেও মনে হবে, কী আশ্চর্য এই গানগুলি, ভোরবেলাকার শিউলিকরা বাগানের শিশিরের স্নিগ্ধতা এতে, এক রমণীয় পবিত্রতা, এক নতুন আশা ও আলোকের বাণী যা বহন করে এনেছে। বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ, যাকেই রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করেছেন, তা অবশ্যেষে দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে গিয়ে এক অনন্য প্রেমবোধে আপ্লুত হয়েছে। সেখানে স্বাদেশিকতা আছে বটে, কিন্তু সে-স্বদেশের চেহারা নিছক গাছপালা নদীনালা বা প্রাকৃতিক বর্ণনায় সীমিত নয়। এ্যাবস্ট্রাক্‌শন-এ কখনো তার বর্ণনা পৌঁছেছে, কখনো ভৌগোলিক সীমানার বাইরে এক 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা রূপ দেখেছেন। ধস্তুত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা কখনোই এক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকেনি। তাঁর প্রবন্ধ রচনাবলীতে যেমন, সংগীতগুলিতে তেমনি, তিনি চিরকাল স্বদেশকে মহামানবের এক তীর্থে মেলাবার চেষ্টা করেছেন।

'দেশপ্রেম' শিরোনামে দুটি গানই রয়েছে মাত্র ঃ 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি / চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি' এবং 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' এদুটি গানে দেশপ্রেম বা দেশবন্দনার একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্র দেশবন্দনায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। করতে হবে শক্তির উদ্বোধন। মনপ্রাণকে মাতিয়ে তুলতে হবে, দুস্তর পথ পরিক্রমা করতে হবে। 'যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা', রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে গেয়েছেন, তোকে একলাই পথ চলতে হবে। দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছে, কূলে কূলে ছেয়ে যাচ্ছে ভাবের প্লাবন, 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে ভাসা তরী', এমনিতর গানে গানে সে সময় রবীন্দ্রনাথ জাতিকে যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন—এতদিনের মোহগ্রস্ততা তাকে নেশার যুপ করে রেখেছিল। শুধুমাত্র কবিতার মধ্য দিয়ে তার জাগরণ সম্ভব নয়, তাই এবার গানে গানে মুখরিত করে দিতে হল বাংলা দেশের আকাশ বাতাস। সুরগুলির উদ্দীপনাময়ী ভাবরূপ কারু ভোলবার নয়। কোথাও বাউলের সুরে, কোথাও দেশজ লৌকিক সুরে, কোথাও আবার স্নিগ্ধ কোমল পর্দায় রাগিণীর সুরে—নানাভাবে গানগুলিকে তিনি এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন। আবার যেখানে প্রয়োজন হয়েছে marching song-এর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন—এরকম গানের উদাহরণ, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে' অথবা 'আমি ভয়

করব না ভয় করব না / দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।' স্বাধীনতার মন্ত্র যে বস্তুত এক গণতান্ত্রিক মুক্তির অঙ্গীকার—একথাও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পূর্বে বুঝেছিলেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'—এই গানটি কেন জানি না, বহুল প্রচারিত হয়নি। হয়ত এর ভেতরকার প্রতীক সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, কিন্তু আজকের দিনে যখন স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে তখন এই গানটি একটি দিগ্‌দর্শনী হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে। গণতান্ত্রিক মুক্তি যে বিফল যদি সবার অধিকার সমান না থাকে—একথাটা রবীন্দ্রনাথ তার অন্তর দিয়ে বহুদিন আগেই বুঝেছিলেন। 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' কিম্বা 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়'—এই গানগুলিতে এক জয়যাত্রার আশা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে ধৈর্য ও সৌর্য প্রয়োজন, যে আশা ও উদ্দীপনা তার পাথেয় তাকেই রবীন্দ্রনাথ মূলধন করেছেন। এক একটি অক্ষরের পর জোর দিয়ে, সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে, সুরের আরোহ-অবরোহ অসমান, ফলত একটা প্রচণ্ড ধাক্কা সবসময়ই রয়েছে—এরই ফলে সুরপ্রয়োগে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এরই পরে আবার অন্য সুরে বাজছে—কোমল ধ্বনি। কোমল পর্যায় শিহরণ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের রূপবর্ণনা করেছেন। এই স্তরের কবিতা ৬টি। বাংলার ঘর বাংলার হাট বন মাঠ বাঙালীর প্রাণ, ভাষা সবকিছুতে ছড়িয়ে রয়েছে জাদু—সবকিছু মিলে আজ যেন তা এক সমন্বয়তা লাভ করে—এই প্রার্থনা দিয়ে সুরু করে তিনি বর্ণনা করেছেন, 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি / তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী / ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে। দেশের দরিদ্র বেশ, মলিন হাসি ভাঙ্গা ঘরে অসীম দুঃখের রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিহ্বল তেমনি আবার 'দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটেতে আশীর্বচন' দেখে তার—শক্তি অমিত। অন্যদিকে 'মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি / তোমার আঁচল জুড়ে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী / ওগো মা তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে। এমন একটি আশ্চর্য গান আমি খুব কমই শুনেছি। এই গানটি জনপ্রিয় নয়। জনপ্রিয় না হবার কারণ স্বাভাবিক। সুরের ওঠানামা নেই, উদ্দীপনা নেই, ছন্দের নৃত্য সে পরিমাণে অনুপস্থিত। কিন্তু এমন ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত গান রবীন্দ্রনাথ খুবই অল্প রচনা করেছেন। তবে বর্ণনাত্মক বলে অন্য গানের তুলনায় এটি একটু দীর্ঘ, কিন্তু কোথাও এর দৈর্ঘ্য আমাদের পীড়া দেয় না, বরং পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে খুলে যেমন নবপ্রস্ফুটিত ফুলের বিকশিত সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে, তেমনি এর এক একটি চরণে কমল কিরণ আনে। বার বার ঘুরে ঘুরে এই refrainটি কানে বাজে 'ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে'। এর

চেয়ে সত্য রূপবর্ণনা আর কি হতে পারে।

আরো কয়েকটি গানে নতুনের আবাহন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ' পর্যায় শেষ করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি যে সব একই সময় এবং এই হিসেব করে রচনা করেছেন তা নয়—কিন্তু এই কল্পনা দেখে মনে হয় যেন এর পেছনে একটি ঐক্য সুগ্রথিত আছে: অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখনই কিছু চিন্তা করেছেন, সুরের বা কথার সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন তখনই তার মধ্য দিয়ে এই সমগ্রতা এসে পড়েছে। অর্থাৎ 'স্বদেশ' পর্যায়ে যে পাঁচটি ক্রম আমি আলোচনার মধ্যে এনেছি—দেখা যাবে যে এর কোনটিকে বাদ দিলেই বোধ হয় স্বদেশ-চিন্তা পূর্ণ রূপ লাভ করত না। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। হয়ত নিজের কর্তব্যবোধে, কখনো আনন্দে, কখনো বিষণ্ণতায় তিনি গান রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর অসীম সৃষ্টিশক্তি ও কল্পনাপ্রবণতা তাঁকে পূর্ব থেকেই একটা সম্ভাবিত ঐক্যের দিকে, এক সমগ্রতার দিকে নিয়ে গেছে; এবং যতক্ষণ তা অর্জিত না হয়েছে, তিনি গান রচনা থেকে নিবৃত্ত হননি।

৩

'পূজা' পর্যায়ের গানসংখ্যা ৬১৭। সবচেয়ে বেশী। তারপর 'প্রেম' পর্যায়ের সংখ্যা ৩১৫, 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ২৮৩। প্রেম ও প্রকৃতির পর্যায়ের কিছু কিছু গান সমধর্মী—তবুও পৃথক পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, সম্ভবত রচনার তৎকালীন আবেদনের দিকে লক্ষ্য রেখে। 'প্রেম' পর্যায়ের গানগুলিরও বিভাগ করা চলে। প্রথমবিভাগের গানগুলির মুখ্য আবেদন, সংগীতের প্রতি কবির ভালোবাসা, ১, ৫, ৯, ১২, ১৪, ১৬; ১৮; ২৪ সংখ্যক গানগুলি এবং আরো কিছু তার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের তখন 'চিত্ত পিপাসিত রে / গীতসুধার তরে'। কিন্তু এ ছাড়াও প্রকৃতি প্রেম ঈশ্বর প্রেম, বিশ্বমানবের প্রেমের গান রয়েছে। যদিও নারীর প্রতি প্রেমই সহজাত মানবিক প্রবৃত্তিরূপে বেশীর ভাগ গানে রূপ লাভ করেছে, তথাপি প্রেমের বিভিন্ন দিক পূর্ববর্তী রচনাগুলির মধ্যে প্রকাশিত।

'মানবীর প্রতি কবির প্রেমের প্রথম নিদর্শনটি বড় বিস্ময়ের, বেদনার। 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে / আমার নিভৃত নব জীবন পরে—' এ গানটি আমার শোনা নেই, কিন্তু এর সুর কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। এই প্রথম কবি-হৃদয়ের জাগরণের কথাটি বড় সুমধুর। তারপরেই সেই বিখ্যাত গানটি 'হে নিরুপমা, / গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা'। এই গানের সুরে এমন একটি বাঞ্ছিত সন্তাকাশ যে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। আবার এমন করুণ বিষাদময় গানে 'যদি

জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম যে সুর দিয়েছেন তা বার বার ঘুরে ঘুরে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ইংরেজীতে যাকে বলে soft notes—তার ব্যবহারে সমস্ত গানটি এক করুণ আবেদনে উন্মুখ। 'মরি লো মরি আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে' গানটিতে কীর্তনের সুরের আকুলতা রয়েছে কার্‌ চোখে এড়ায় না—তীক্ষ্ন সুরের ক্ষেপনে সূক্ষ্ম সন্ধানে গানটির এক মোহিনী রূপ সামনে ভেসে ওঠে। প্রেম পর্যায়ে নানাভাবের, নানা আবেদনের গান রচিত হয়েছে, আনন্দ বিষাদ, লজ্জা, মান অভিমান—প্রভৃতি। এবিষয়ে যদি বলা যায় তিনি বৈষ্ণব পদকর্তাদের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন তবে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। আমরা জানি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব পদাবলী তাঁকে কি পরিমাণে আকর্ষণ করেছিল। সে প্রভাব যে তিনি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন মনে হয় না। কবিতাতে তো নয়ই, সংগীত রচনাতেও না। উদাহরণের শেষ নেই—তাই মূল ধারাটির পরিচয় দিয়েই এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করি।

'প্রকৃতি' পর্যায়ের প্রথম ১টি গান বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ, কবিহৃদয়ের বিস্মিত অধ্যায় সুরের মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় উন্মুখ। হয়ত সেই কারণেই বা 'বিশ্ববীণারবে মোহিছে' গানটিতে বৈদিক স্তোত্রের মত সুর আরোপিত হয়েছে—অন্তত effect-এর দিক থেকে তাই মনে হয়। ১০ সংখ্যক গান থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতু পর পর এসেছে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের বিষয় হিসেবে। 'নাই রস নাই, ধারুণ দাহনবেলা'—গ্রীষ্মের এই প্রখর রূপটি সুন্দর ধরা পড়েছে উদাস-করা সুরে। 'আরুণ অগ্নিবাণে রে' এই ভাবেরই গান। কিন্তু তার পর বৈশাখের ঝড় ও তাকে আবাহন। কিন্তু বৈশাখের অন্য রূপও তার চোখে ধরা পড়েছে—মৌনী তাপসের রূপ। এই অনন্য সৃষ্টির কোন সামান্যতম বৈচিত্র্যও তার চোখ এড়ায়নি। ধরণীকে এই সময়ে তিনি 'তপস্বিনী' কল্পনা করেছেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর সংযোগসূত্র হিসেবে এই গানটি খুব জনপ্রিয়, চেনে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। কিন্তু তারপর ২৬ সংখ্যক গানটি বর্ষার প্রকৃত Invocation, 'এসো শ্যামল সুন্দর / আনো তব তাপহরা তৃপ্তিহরা সঞ্জীবনী সুধা'। তারপর অজস্র বর্ষার গান, সবসুদ্ধ ১১৪টি। বর্ষার কত গান যে তিনি রচনা করেছেন তার বর্ণনা আমার সাধ্য নয়, এক মল্লার রাগিণীর কত বিচিত্র রূপায়ণ—কত প্রকার মল্লারের বৈচিত্র্য, ভাবের গাম্ভীর্য,—কেদার রাগিণীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, মীড়ের অসামান্য দক্ষতা—কত কিছু মিলেছে, নতুন নতুন ভাবরূপে তার সুর সমৃদ্ধ হয়েছে—বর্ষার গানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা যেন শতধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে জৈবলীলার আভাষ তা যেন তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা', 'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী' প্রভৃতি মল্লারের সুরগুলি যে কোন

স্পর্শকাতর শ্রোতাকে আকুল করবে। তিনি এসব ক্ষেত্রে নানা জায়গায় সুর-আরোপের স্বাধীনতা নিয়েছেন—কিন্তু সে স্বাধীনতায়, আমার মনে হয়েছে, রাগের রূপ অক্ষুন্ন আছে। বরং কেউ যদি এ নিয়ে তর্ক করেন তাহলে বলবো, সুরসৃষ্টিই আদি, রাগসৃষ্টি আদি নয়—রবীন্দ্রনাথ সেই অসীম ক্ষমতাধর ব্যক্তি যিনি এহেন অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি রাখতেন। আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, যদিও দ্রুপদাঙ্গ চালের গানেই তিনি সর্বাধিক স্ফূর্তিলাভ করেছেন, এই সময়ে কিছু কিছু খেয়ালের চালে গান রচনা করেছেন, যেন মনে হয়, খেয়ালের বিস্তার অংগ তাকে এক উদার পথের সন্ধান দিয়েছে—যেন তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে দিতে চাইছেন বিস্তীর্ণ বিপুল প্রকৃতির মধ্যে। 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে' গানটি দিয়ে শরৎঋতুর বর্ণনা আরম্ভ। নির্মল আকাশ, অজস্র শিউলি ফুলের সম্ভার, সোনার আলো বিচ্ছুরিত পথে ঘাটে —এমনি কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। হেমন্ত ও শীতের বর্ণনাও বাদ পড়েনি। হায় হেমন্তলক্ষ্মী, এলো যে শীতের বেলা, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, গানগুলি সুপরিচিত। 'বসন্ত' পর্যায়ের গান ১৬টি। বর্ষার পরই বসন্তের আবেদন রবীন্দ্রনাথের কাছে তীব্র। নবযৌবনের দূত হিসেবে তিনি বসন্তকে আবাহন করেছেন। বসন্ত, বাহার বা পরজ এসকল ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। বাহার বিশেষ করে তার খুব প্রিয় রাগিণী ছিল —বহু গানে এই সুর আরোপ করেছেন। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে, ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্ প্রভৃতি গান-গুলি বিখ্যাত। বহু গানের সঙ্গে নৃত্য সংযোজিত হয়েছে—কেননা, বসন্তর মধ্যে যে প্রাণলীলা উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ সেকথাও বার বার স্মরণে এনেছেন।

'বিচিত্র' পর্যায়ে বহু স্বাদের গান, বহু বিচিত্র ভাবনায়, কল্পনায় গান সীমাবিষ্ট হয়েছে। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, কাঁটাবনবিহারিনী, আমাদের শান্তিনিকেতন, হায়রে রে রে রেরে: নমো যন্ত্র, যাবোই আমি যাবোই ইত্যাদি গানগুলি এই বিচিত্র ভাবের স্বাদ বহন করে আনে। সৃষ্টির ধারা যে কত অফুরন্ত রবীন্দ্রনাথের এই সকল পরীক্ষা তার প্রকাশ। তাছাড়া নৃত্যনাট্য, নাট্যগীতি বা অন্যান্য পর্যায়ের গানগুলিও, যা বিষদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে, এই তত্ত্বই সপ্রমাণ করে যে তিনি সর্বদাই নিজেকে নিজে অতিক্রম করে গিয়েছেন, কোথাও থেমে থাকতে চাননি।

৩

সুর এবং তাল ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের একটি সুস্পষ্ট নীতি ছিল বলে

আমার মনে হয়েছে। বাণীর ভাবার্থকে তিনি সর্বপ্রধান মূল্য দিয়েছেন এবং সেই ভাবকে বহমান করে গানের চলন ঠিক করেছেন (স্টাইল)। সেই চালে গানটি বাঁধার পর সুর আরোপের সময় লক্ষ্য করেছেন কোন রাগ বা রাগিণী, শুদ্ধ বা মিশ্র, কোনটি সেই ভাবকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি পারে ভালো, না পারলে ক্ষতি নেই—নানা সুর, দেশী, লোকসংগীত বা বিদেশী সুর—যেমন তার অন্তর সাড়া দিয়েছে সেই রকম সুর আরোপ করেছেন—বাণীর ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাল নিরূপণ করেছেন। দ্রুত ক্ষিপ্র বা ঝাঁপ একই তালের রকমফের ষষ্ঠীতালে এমন নতুনত্ব কিছু আসেনি—কিন্তু মনে রাখতে হবে, তালে নতুনত্ব দেখাবার পাণ্ডিত্যে রবীন্দ্রনাথ এগুলি করেন নি—বাণীর সাহচর্যে যেটি তাঁর কাছে সবচেয়ে organic মনে হয়েছে তিনি তাই গ্রহণ করেছেন—কোন সংকোচ বোধ করেননি। এগুলি শুধুই পরীক্ষা নয়, এগুলি তার অন্তরের নির্দেশ। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা বা ঠুংরী এই চারটি চালের (style) মধ্যে তিনি ধ্রুপদ এবং টপ্পাকেই বেশী গ্রহণ করেছেন—এবং খেয়ালের রীতিও কিছু কিছু নিয়েছেন—কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের যেসব বাহুল্য এবং demonstrative superfluities আছে—যা বাংলা গানের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায়না, রবীন্দ্রনাথ তাকে বর্জন করেছেন। রাগ রাগিণীর যে ভাবরূপ, essence, তাই তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন—রাগসংগীত রচনা করতে বসেননি।

৭

যে কোন শিল্পীর জগৎ সম্পূর্ণ। এই অর্থে যে, তাঁর অভিজ্ঞতা ও তাঁর চিন্তায় একটি সমগ্র রূপ একই সঙ্গে অন্তর্গত রূপ লাভ করে শিল্প সৃষ্টিতে। আর সাধারণ অর্থেও যে সম্পূর্ণতা, সকল শিল্পীর ভাগ্যে নাও ঘটতে পারে মাত্র দু-একজন মহৎ শিল্পী, রবীন্দ্রনাথ বা সেকসপীয়র, গ্যেটে অথবা কালিদাসের বেলায় যা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথই, সকল দিকে মিলিয়ে দেখলে, একমাত্র শিল্পী যিনি সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ—একদিকে যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তায়, শিল্পরীতিতে সম্পূর্ণতা, অন্যদিকে তাঁর ভাবজগৎ কর্মজগৎ ও রসের জগতের এক আশ্চিক মিলনে সৃষ্টিকর্ম সার্থক।

কর্মজগৎ ও ভাবজগতে তাঁর অবদান কারু অজানা নয়। কিন্তু রসের জগতেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম অফুরন্ত থেকেছে, মৃত্যুর দুদিন আগে পর্যন্ত তিনি অবিরলভাবে এই নিখিল বিশ্ব ও মানব জীবন থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন, শিল্পে রূপদান করেছেন সেই অভিজ্ঞতাকে। তাঁর সৃষ্ট সংগীত

এই শেষতম অবদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কবিতা, ছবি ও গান—এই তিনটি শিল্পকর্মের পৃথক অস্তিত্ব যেমন তাঁর রচনায় স্বাধীনভাবে বর্তমান, তেমনি এসকলের সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সহযোগেও তাঁর সৃষ্টিকর্ম উজ্জ্বল। ছবিতে তাঁর সৃষ্টি বাস্তবমুখী অথচ প্রতীকী কল্পনায় আবিষ্ট, কবিতায় মননশীলতা ও অভিজ্ঞতার সংবৃত্তি। কিন্তু সংগীতে সাধনা ও সুরজগতে অবিমিশ্র একাগ্রতার সঙ্গে কাব্যের মননশীলতা যুক্ত। এই সাধনাতেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পজীবন নানাসম্ভার রসসমৃদ্ধ হয়েছে, সুন্দর ও সার্থক জীবনের, ভাবলোকের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই এমন আশা ছিল যে তাঁর সাহিত্যচর্চার অন্যান্য বিভাগ ভবিষ্যৎ কাল যদিও কখনো ভুলে যায়, তাঁর এই অজস্র গান কখনো বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাবেনা। 'আমার গানই চিরকাল বেঁচে থাকবে', এমন চিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি তাঁর প্রকৃত বেদনা এবং প্রকৃত অনুরাগ কোথায়।

ছোটবেলা থেকেই সাংগীতিক চর্চা তাঁর বাড়ীর আবহওয়াতে ছিল। বহু গুণী ওস্তাদদের সাহচর্যে তাঁদের কৈশোর যৌবন কেটেছে। শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর সুর তাঁর কানে, তাঁর মনে তাঁর সত্তায় গভীর চৈতন্যে প্রবেশ করেছে। সেকারণে প্রথম পর্যায়ের তাঁর রচিত গানগুলির সবই বিশুদ্ধ রাগরাগিণী আশ্রিত। পূজা পর্যায়ের গান এর অন্তর্গত। মধ্যযুগে তিনি সুরের মিশ্রণ করেছেন; স্বাধীন কল্পনাকে বাধা দেননি, ফলে বৈচিত্র এসেছে। শেষ পর্যায়ে তিনি অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন সুর সংযোজনায়। নৃত্যনাট্য, গীতি-নাট্যগুলি এবং নানা অনুষ্ঠানের গানগুলি এর সাক্ষ্য বহন করছে। রবীন্দ্র-নাথের প্রিয় রাগরাগিণীর মধ্যে ইমন, বেহাগ, পূরবী, ভৈরো, বিভাস, মল্লার (বিভিন্ন প্রকারের) কেদার, কাফি, কানাড়া ইত্যাদি অঙ্গের রাগগুলি অতি প্রিয় ছিল। এছাড়া লোকসঙ্গীত থেকেও তিনি অজস্র সুর আহরণ করেছেন তার মধ্যে বাউল ও কীর্তনই প্রধান, বিলীতি সুর বা অন্যান্য প্রাদেশিক সুরও যে না মেশেনি এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে, একসময় তিনি কোন রীতিই মানেননি, বিশুদ্ধ শিল্পরীতি ছাড়া, যা শিল্পীর সহজাত আবেগ। তাঁর গানকে তিনি স্বদেশী সংগীতে, অনুষ্ঠানে, বা অন্যান্য প্রয়োজনের বাহন হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। এই অফুরন্ত সৃষ্টিবৈচিত্রের মধ্যেই তাঁর গানের মূল সুরটিকে চিনে বার করতে হবে, তাঁর মানসিকতাকে ধরতে হবে। সুর ও বাণীর বিশুদ্ধ সংযোগে একদিকে হৃদয়াবেগ ও অন্যদিকে মননের যুগ্ম আবেদন রবীন্দ্র-সংগীতকে অসামান্যতা দান করেছে। এ তত্ত্ব অস্বীকার করলে রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা চিরকাল অলক্ষ্যগোচর থাকবে।১

১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী (৪র্থ খণ্ড) স্মারক সংখ্যায় এই প্রবন্ধ উল্লিখিত হয়েছে। লেখক।

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী

লীরিক

পরেছ-যে কানে কলক-দোলানো
হীরে-কাটা ইয়ারিং—
বুকে তারি ধ্বনি পুলক ঘোলানো
বাজে ডিং ডং ডিং!
মায়ামুগার ভয় মানি নি
প্রাণ সে তো নয় শুকনো পাখিশি
লট লুটে বিধিলিং—
প্রেমে রঙে শুধু একটি কাহিনী,
নয় কবি ফুং সুং—
চমক তোলানো
বাজে রোদে ডং ডিং!

হিমালয়ে গিরি ওরা গোপে জানো
দশটা বারোটা শিং—
আমরা দুজনে এসেছি খুশির
ছুটির দার্জিলিং।
থেমে গেছে ঘড়ি রাতে খড়খড়ি
ঘুমে-ঢাকা টিং টিং—
শৈলশিখরে স্বর্গভোলানো
তোমার হীরের আলোর খোলানো
জেগে-ওঠা ডং ডিং
—বাজে ডিং ডং ডিং।

সজল ভট্টাচার্য

ফাল্গুনে-চৈত্রে

১

দু'দিনের শান্তি তুমি দিয়েছিলে, উত্তরফাল্গুনী,
এখনো অলোপ তার শুনি
রক্তে নিরন্তর।
তুমি ত আকাশকন্যা, হারিয়েছ আলোর ভেতর—
হারিয়েছ কবে!
আমি ক্ষণ-যৌবন-বিভবে
এখনো ফুটাই ফুল—অলোক পলাশ,
আকাশে তাকাতে পারি—আছে অবকাশ॥

২

যদি কোনোদিন দেখা হ'ত!—
যখন চৈত্রের হাওয়া রক্তে ওতোপ্রোত,
যখন পলাশে লাল গাছের সংসার!
কপালে কুঙ্কুমচিহ্ন দিত উপহার
কামনা-প্রচ্ছন্ন।
সে-রক্তিমা নেই আজ, হৃদয়ের ধু-ধু শাদা ধূসর
নিস্তরঙ্গ নির্জনতা মেখে।
সেই দর্পণে কে
তবু যেন মুখ দেখে আর
আমাকে নির্জনতর করে বার বার॥

গোপাল ভৌমিক

প্রত্যুত্তর

কাজ যা করেছি, ভেবেছি অনেক বেশি;
ভাবনা বালুতে তাই গড়ে উই ঢিবি
লুকাতে চেয়েছি, এড়িয়েছি রেষারেষি:
তবু কি তাদের ফতনা এড়ালো শিবি?

অন্তরঙ্গী

সকলে যা দেখে সে কেবল দেহখোলা;
মনের গভীরে বল কে ডুবতে চায়?
লড়াই-এ অপটু দেখে ভাবে বিদ্বেষী
ভীরু পলাতক জীবনের সহায়ায়।

অথচ জীবনে বেদনার কালি মেখে
আমি যা পেয়েছি দাম তার কম কিসে?
ভাবন-বিবরে তাই তো নিজেকে ঢেকে
খুঁজি যে অমৃত লুকানো রয়েছে বিষে।
জানি এ জীবন শেষ হয়ে যায় যদি
রবে মহাকাল চিরদিন নিরবধি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

মনটা

মনটা গেছে কোথায়?
তেপান্তরের গাছের তলায়
জীবন হালখাতায়
বুঝতে পারা যায় না
কী যে চায়, কী যেন সে পায় না।
বুঝি গেছে ঘরমুখ
বাসন্তী পাতায়।

মন কি কিছুই চায় না?
তোমার চোখ যেন আকাশ
যেন নীলের আয়না।

মনটা তুমি নাও।
তার বদলে চাই না কিছু
বলবো না দাও দাও॥

নিষ্ঠুরতা । নির্বাসিত সন্তোষ

১. নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর বেঁচে থাকবার
কোনোই উপায় নেই মনে হয়। দ্যাখো দেশে দেশে
কেমন সহজে করে প্রতিদ্বন্দ্বী শরীরের রক্ত অনায়াসে।
একটি ঘটনা ঘটে জর্মনি তখন
কতো অনায়াসে তপ্ত দেহগুলি ধুলোয় লুটায়;
সুচেত নিমেষে হবে শত্রু জন্মাবধি,
গোপন হিংসার দ্বারা মুহূর্তেই কুটিল নির্দয়।

২. বেঁচে থাকাটাই যেন ইদানীং শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুরতা।
বে-শিল্প মৃত্যুর মৃত্যু দেখে পেত ভয়
এবং শিকারী পাখী তুলে নিলে শালিখের ছানা
বেদনার্ত ধ্বনিতেই চমকে দিত মধ্যাহ্ন পাড়াকে,
ভীষণ নিষ্ঠুর দৃশ্য দ্যাখে চোখে সে কতো সাহসে।
নিবিড় বিমর্ষ দৃশ্যে বারংবার রক্ত ঘটনায়
সঞ্জীব মিথ্যার থেকে আহরিত নানা রটনায়

৩. মেয়েরাও ইদানীং সমর্পিত হতে গিয়ে ঘোর অন্ধকারে
লীন হয়। বেঁচে থাকবার কিছু স্থূল প্রয়োজনে
অনেকেই অনায়াসে এক থেকে অন্যের শিবিরে
বিদ্যুৎস্পর্শার মতো রঙ্গময়ী; প্রয়োজনে পাত্রনির্বাচনে
কতো অনায়াসে আজ পক্ষান্তর ঘটে। কালান্তর
হয়তো একেই বলে কিংবা এক নিষ্ঠুর অন্তর!

৪. ভদ্রবেশী লোকগুলো ওই দ্যাখো মগ্ন অনায়াসে
যার যার গোপন আশ্রয়ে। স্পষ্ট দিবালোকে
যদিও সূর্যের সোনা অবিরাম ঝরে
এবং নিসর্গদৃশ্যে অকৃত্রিম সৌন্দর্যরচনা—
মসৃণ চেয়ারে বসে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায়
চায়ের পেয়ালা হাতে কতো অনায়াসে

উত্তরসূরী

প্রতিযোগী বন্ধুদের সর্বাঙ্গীণ অনিষ্টসাধনে
সর্পেরি ফণার মতো সমুদ্যত। শত্রু কে যে মিত্র কে যে
কেউই জানে না আপাতত। শুধু সন্ধ্যাকালে
বিমর্ষ জ্বালায় জ্বলে মনগুলি আড়ালে অন্তত।

যার কাছে, প্রণয়িনী প্রণয়ীর কাছে
অন্তরঙ্গ সুহৃদের কাছে
কেউ কি যাবে না আর তাহলে একালে।
যে বাঁচায়, যাকে নিয়ে বাঁচে এই মৃত্যু শতকের
ডানাভাঙা পাখীর উদ্যোগ,
দলিত ধ্বংসের বীজ পাওয়া যায় স্বর্ণশস্যরেণু
তাকে কে ছড়িয়ে দেবে প্রত্যহের আকাঙ্ক্ষায়
চৈতন্যের সৌন্দর্য সভায়?

সমস্ত সংসার আজ নিষ্ঠুরভাবোধে নির্বাসিত॥

সুশীল রায়

অভিলাষ

আমরা বিপর্যয় নিয়ে বাস করতে ভালোবাসি।
সুতরাং ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি।

তা না হলে, অভিলাষ—নির্বিকার নিরীহ নরম—
তার বদলে গেল কেন রকম-সকম?
শান্ত ছিল, স্নিগ্ধ ছিল,
ছিল সুস্থ সবল সহজ,
হঠাৎ হল সে কিনা সম্পূর্ণ নিখোঁজ?

আমরা দেখা পাই তার,
অথচ সে নিজেকে হারিয়ে
যেন বলছে, 'নাও নাও
নাও বন্ধু আমাকে ফিরিয়ে।'

ফিরিয়ে আনলাম তাকে অবশেষে,
অথচ আবার
অভিলাষ হয়েছে ফেরার।
কোথাও বা জেগে উঠেছে।

সুবোধচন্দ্রের ভাষ্যকার

যা দেখি সবকিই মন

যত কিছু আছে, সব বেঁচে আছে।

পাথরের খণ্ড কিম্বা মাটির ঢেলাও
যা পেলেই সাড়া তোলে। যদিও অবুঝ
তবু জান্ত। অচেতন মন
আষ্টে পিষ্ঠে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে আছে।

ঘাসে গাছে সেই মন
তেমন অবুঝ নয়, অতটা ঘুমন্ত নয়।
তন্দ্রাচ্ছন্ন অবচেতনাকে
ওদের স্নায়ুর জালে ছড়িয়ে জড়িয়ে
ওরা বেঁচে আছে।

কুকুর বেড়ালগুলি আড়মোড়া ভেঙে ৬.
হাই তুলছে, শুঁকছে, দেখছে,
ইচ্ছে মত ঘুরছে, ফিরছে।
তন্দ্রাচ্ছন্ন অবচেতনাকে
সঙ্গে নিয়ে আছে, বেঁচে আছে।

এদের ভীড়ের মধ্যে আরো বেশি সচেতন মনে
যা দেখি সবকিই মন,—
মনেরই বিচিত্র মূর্তি সব।
কোথাও সে ঘুমে অচেতন,
কোথাও চটুল ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে,
কোথাও বা জেগে উঠছে।

উত্তরসূরী

মুখ তরু

আকাশের ধ্রুব কিম্বা সপ্তর্ষি মণ্ডলে
যেই যজ্ঞ আজো জ্বলে, পৃথিবী এখন
আর সেই যজ্ঞ নয়। তবু সেই তেজ
শান্ত ভস্ম ভেদ করে সবুজ শিখায়
উঁকি মেরে, পল্লবিত হয়।

যদিও লতিয়ে ওঠে চতুষ্পদী হামা সে দেয়না।
জিহ্বার লালায় স্বাদে মত্ত মাতাল
দাঁতে নখে ছিন্নভিন্ন করার শরীর তার নয়।
মুখ চোখ নাক মুখে ভীষণ ভয়াল
হতে সে চায়নি বলে আপন স্বভাবে
তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—
অন্ন এবং মুখে-বাঁধির প্রাণের এক মেলা।

এদের মতন স্নায়ু-জালের শরীর নিয়ে আমি
মেরুদণ্ডে অমনি এক মুখতরু জাগিয়ে রেখেছি।

অনিল চক্রবর্তী

সম্ভোগ

প্রতিনিয়তই তুমি পূর্ণতার স্বপ্ন দেখো বসে।
অপ্রাপ্তবয়স্ক যত বালকের চাপল্যমণ্ডিত
হাহারবে অট্টহাসে আপনার গৌরবে সন্তোষে
কিশলয়ে ব্যস্ত থাকো যেন এক স্বয়ম্ভূ পণ্ডিত।
জীবনের ভস্মশাস্ত্র ছলছল আকণ্ঠ সম্ভোগে
কিন্তু যদি হয় হোক তবুও তো যৌবন-শীৎকার
আস্বাদন করা যাবে আনন্দে বিষাদে সুখে-রোগে।
দর্শন-প্রস্থানে তুমি এতই সুদক্ষ কলাকার।

বসন্ত-জাগ্রত দ্বারে এ-কথাটা যতনা সুন্দর
তার চেয়ে ঢের সত্য সুদেহের অমৃত পিপাসা
জানো তুমি, জানে ওই বিগলিত নদীর অন্তর
প্রতিটি মুহূর্তে লয়ে তিলে-তিলে দুরন্ত দুরাশা।
শুধু তুমি জানো না তো প্রাকৃত এ সত্য কথাটারে:
কামনা বিদেহী মন্ত্র, সব শূন্য অস্তির ওপারে!

জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

সৌজন্য

চাতুরী দেখেছি ইচ্ছা শিথিল চাঁচর চুলে,
তা ছাড়াও ভদ্রতা:
কেননা যখন শুকিয়ে গিয়েছে সমস্ত তরুলতা,
যখন পুরুষ অভিহিত জীব তসরের শাড়ি খুলে
পূজারিণী কিনা পরীক্ষা করে রমণীকে, সব ভুলে
সেই মুহূর্তে তুমি বিনুনির প্রচলিত কোনো প্রথা
স্বীকার করে যে দিনের প্রান্তে পথের কিনারে এসে
একলা দাঁড়িয়েছিলে,
সূর্যশূন্য রজনীতে সেই ঘটনাকে ভালোবেসে
একটি কবিতা লিখেছি অন্তামিলে॥

আলোক সরকার

নিঃসীম প্রবাল

সুন্দর রয়েছে চারিদিকে। কিন্তু সবকিছু
মনোনীত সুন্দরতা নয়। যেমন সকালবেলা
আলো হলো, পাখী উড়ে এলো, উঁচুনিচু
প্রশান্ত খোয়াই—একে কি সুন্দর বলবো! সহজ বিশ্বাসে
খুশি হই, দাঁড়াই দালানে এসে প্রসন্ন একেলা।
কিন্তু কই নিমগ্ন রহস্যে বাজে দূরে দূরান্তের সমারোহ
পাহাড়ের উপরে রাজার বাড়ি, তেপান্তর অতল নিশ্বাসে।

বিশিষ্ট সৌন্দর্য চাই। গাছ নয়, ফুল নয়, মেঘ নয়
নয় স্বাভাবিক জ্যোৎস্না, সূর্যমুখরিত নদী, স্ফুরিত প্রবাহ।
একদিন প্রথম দক্ষিণ হাওয়া সুনুর অম্বর
একদিন সমগ্র দুপুরবেলা নিরাসক্ত সংহত সংবাদ
নিয়ে এসেছিলো। এই সব স্মৃতি মনে আছে।
মেয়েটির বাড়ির সামনে গিয়ে ফিরে আসি। অলস বিরাগ
দেখায় গোধূলিবেলা পরিচিত ঘরে-ফেরবার ছবি অনন্ত আকাশে।

সকল-ই পদ্ধতি। প্রেম তারও সুন্দরতা অবারিত
নিয়মের, শীতল নীরন্ত ভাষা, প্রসাধনে প্রত্যাশিত লাল।
প্রকৃতি তো যান্ত্রিক আবেগ শুধু, ফুল লালে হয় নিয়মিত
ভোরবেলা, পূর্ণিমায় চাঁদ খুব বড়ো।
মমতা, আমাকে তুমি কোন রক্ত নিঃসীম প্রবাল
স্বাগত আংটি তুলে সেদিন দেখালে। অনুরূপ দীপ্ত অঙ্গুরীয়
ভেবেছি মন্দারে, বুকি কুচ্ছ্রতা। এমনকি শব্দিত নির্ঝরও
ভেবেছি। নিয়মী বিনাশ শুধু পরিস্ফুট। সব কিছু নিঃস্ব ভাবনীয়।

কোন বিনিময়ে তবে উদ্ভ্রান্ত মিলন! বিশিষ্ট সৌন্দর্য চাই। রাত্রিবেলা
অন্ধকার মুছে-যাওয়া মাঠের ভিতর থেকে যে অগ্নি অমোঘ
ধ্বনির বিভঙ্গে তাকে আত্মীয়তা মনে হয়। মাঝে-মাঝে
আলো-জ্বলা দোকানের পাশের গলির ঘাস, রিক্ত অবহেলা।
কিন্তু কই প্রস্তুত অমর্ত। সারাদিন নত ঘণ্টা বাজে—
মন্দিরে রেখেছি স্মৃতি নিঃসীম প্রবাল, ধ্যানের নিলীন অনিমেষ
বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগবে মরুরূপশ্রীর একা, সাতসমুদ্রের জ্যোৎস্নালোক?

ঈশ্বর

সব বস্তু কার্যকারণের সূত্রে নিয়ন্ত্রিত। দেশ-কাল
অনন্ত অনাদি; সেইমতো কার্যকারণের পরম্পরা
অশেষ অসীম। কিন্তু স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাও যেহেতু উত্তাল
হয়ে ওঠে চরম ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আমরা একটি
সত্তা খুঁজে ফিরি এক নিরপেক্ষ স্বাধীন অমরা
ঈশ্বর। সকল তত্ত্ব মনে রেখে ঘর থেকে বারান্দায়
যখন এলুম দেখি মঠ ভরে মুদ্রিত বৈশাখমাস, মন্ত্রিত দুপুরবেলা।

কী ভাবে অন্বিত করবো ? এই অশ্রু, এই অবহেলা
কোনো কার্যকারণের সূত্রে গ্রথিত কখনো নয়। এই অশ্রু, এই অবহেলা
মনে হয় প্রাচীন আকাশ যেন লোকমণ্ডন আপন নিশ্বাসে।
কতদিন অরব নদীর তীরে দেখেছি বালির ধু-ধু নির্নিমেষ
কতদিন নির্মেঘ রাত্রির একা অনিকেত শঙ্কিত সময়
নিয়ে উন্মোচিত। সব অভিজ্ঞতা মনে আছে।
কেন যে প্রেমিকা তার বাড়ি থেকে ফিরে আমি কখনো ভাবিনি
কেন সব সমারোহ ভাঙি, কেন মানি নিস্বে অন্তরেব।
অনির্ভর শোকের প্লাবিত স্রোত চারিদিকে। অনির্ভর বিষাদ, কখনো
অনির্ভর আনন্দও পাখির গতির মতো দীপ্ত স্বপ্রকাশ।
যেতে-যেতে হঠাৎ পুরোনো পথ কেন অলোকিত হয়, তার কোনো
ব্যাখ্যা নেই। আমি সারাদিন ভাবি
নির্মেঘ রাত্রির একা, আলোকিত পথের সহসা জোৎস্না, অমন উদ্ভাস।
আমি সারাদিন দেখি ঈশ্বর আমার পাশাপাশি
মূক অনিমেষ যেন আমারি হৃদয়, অশ্রুময় কিন্তু অভিমান
কারো জন্য নয়, নেই কোনো অনিবার্য দাবি।

ঈশ্বর সর্বত্র এক জাগরণ, নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রকাশ
বিচ্ছিন্ন চৈতন্য ওই আত্মকুক্ষে, ওই দুঃখময় পথিকের
কিছুদূর গিয়ে ফের ফিরে-চাওয়া ভবলেশহীন চোখে।
সমাজ নির্মাণ কিংবা রক্ত বস্তুবাদ কিংবা একনায়কের
অবিবেকী পরিশ্রম সাজার নির্দেশী পথ, প্রস্তাবিত শীতল পসরা
কিন্তু সর্বব্যাপ্ত সেই অকারণ চারিদিকে নিমগ্ন উদ্ভাসে
ধ্বনিময়। মূর্ত উপস্থিতি স্থির স্বয়ংনির্মিত, সলয়ীর এই মর্তলোকে।

গোপন নির্ঝর

ভোরবেলা দর্শটি সবুজ পাখি আবার এসেছে। ঘুম থেকে উঠে
দেখলাম। একই স্বর, ডানার প্রসিদ্ধ কারুকাজ। রোজ ভোরবেলা
দর্শটি সবুজ পাখি, কখনো আর্টটি, কখনো বারোটি
দালানের হলুদে রোদ্দুরে আসে। দ্রুত যায় ছুটে
নিমগাছটার ডালে। একই পাখি, একই পল্লবিত খেলা।
আনন্দ কিন্তু আমি ভোরবেলা রোজ জেগে থাকি
একটি নতুন পাখি দেখবো বলে।

অন্তরালে গোপন নির্ঝর আছে বহুবিধ। তারই জন্যে বিষণ্ণ একাকী
আমার প্রতীক্ষা। দশটি সবুজ পাখি যেদিন প্রথম
এসেছিলো, দেখেছি ডানায় শুভ্র অকলুষ অরণ্য অম্লান।
এখন আনন্দ শুধু অভ্যাসের, শীতল নির্মোহ পরিশ্রম
কেবল দালান থেকে নিমগাছটার তলে।
হাজার অরণ্য আছে পৃথিবীতে, অনির্ভর প্রতিষ্ঠ সম্মান
হাজার পাখিকে শান্ত রচনা করেছে।
সেখানে প্রস্তুতি এক সমারোহ, সেইখানে সুশীল মহানে
উন্মন্ত দেবতা আর শঙ্খধ্বনি।
সবকিছু বাধিত নিয়ম যুগল নির্দেশী অধীর। ভোরবেলা যতো পাখি আসে
সব অন্ধ অলস উচ্ছ্বাস। শুধু মাঝে-মাঝে
দুপুরবেলার মনে হয় হাজার অরণ্য যেন চারিদিক, হাজার পাখির
কলরব অমন স্বাধীন। দেখি স্ফূর্ত আনন্দিত খনি
উন্মোচিত অভিজ্ঞতা সতত বুকের মধ্যে দূরে-যাওয়া নারীটির প্রীতি। ভোরবেলা
রোজ ভাবি একটি নতুন পাখি সেখতে পাবো যথার্থ অধীর।

মহানিশা

স্ফুরিত জ্যোৎস্নায় রাত্রি এনেছিলে জাগ্রত দিগন্ত এনেছিলে
মাঠ ভরে সক্ষম প্রস্তুতি যেন উপচার, স্বাভাবিক নন্দিত মন্দির।
কিন্তু কোন ঈশ্বরের অমূর্ত প্রখর, যেন নির্দেশের যেন সময় নিখিলে
একটি ঘোষণা এক অস্থিতীব্র। অনিবার্য প্রেমিক সংযোগ
কখনোই নয়। প্রীত সম্ভাষণ নয়। নিস্পৃহ নিবিড়
কেবল শ্রাবণধারা অনুভূত, নিরাসক্ত অরূপ সময়।

রক্তিম শহর ভরে বড়ো-বড়ো আলো। আরো বেশী লক্ষিত অক্ষয়
প্রেমিকার আপনের সান্নিধ্যে দীপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত দুইটি বাহুর
প্রগাঢ় আহ্বানে। আমি সমস্ত দিবস ধরে সকল বাগানে
অন্বেষণে যে-ফুল এনেছি তার বিনিময়ে প্রস্তুত বন্ধুর
আলিঙ্গন সহজ উজ্জ্বল নেবো। যে মুহূর্তে যুগল অসম্মান
সেই মুহূর্তেই নিঃস্ব অন্ধকার, অবলুপ্ত প্রেমিক সন্তাপ-ও।
সকলেই সজ্জিত আলোর দরজা খোলা রাখে, দাম্পিক গোলাপও
স্বাগত রঞ্জিন দীপ্তি উন্মোচনে, এমনকি বিনত টগর

ভোরবেলা শিশিরসিঞ্চিত নয় উজ্জ্বলতা করে জ্বালে। আমি
পথ না দেখতে পেলে কী করে ভিতরে যাবো, সজ্জিত আলোয়
দরজা উন্মুক্ত করে সে কারণে আমার প্রেমিকা। ধূসর বাদামী
গোধূলি কখনো ক.রো প্রেমিকাই নয়। কহুণা কখনো রিক্ত সান্ত্বনার স্নান।

অনিকেত দুইটি তরণী যেন তীরে এলো, ফসলের কীর্ণ অফুরান
দু-হাতে উজাড় করে অনাসক্ত অমস্ত প্রণতি।
স্মৃতির নির্সগ শ্বেত আপনার নীরব। বড়ো শহরের তীব্র লিখা—
এমনকি প্রেমিকাও প্রগাঢ় সান্নিধ্যে স্নান হেমন্তের সুরে বিরতি।
যেখানে উত্তাপ রাখি সেখানেই স্থির। অমূর্ত ঈশ্বর যেন মৌন অন্তরালে
দুইটি নিশ্চিত চোখ মেলে জেগে থাকে, সম্মোহন হিমে মহানিশা।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সপ্তরথী

এক : যদুনন্দন চক্রবর্তী

যে-মুহূর্তে জানল যদুনন্দন চক্রবর্তী সে পট মাত্র, পটুয়া নয়তো নয়তো, স্থির দেখে আর নেই দরকার তার বিহ্বলতায় চলে গেল কোনো-স্বপ্নেই-নয়-উন্মুখ-এমন-এক-মুখখানি ভুলে, চলে গেল ছিপ হাতে কল্পনার খালের ছায়াঘন তীরে, নামহীন নিরুদ্বেগে।
নিঃসংশয়ে জেনে যে-মাছ উঠবে, যদি ওঠেই কোনো, তা তার, যদুনন্দনের, হুহুঙ্কার জন্যে নয়, নয় তার সন্ধ্যার জন্যে।
এদিকে যত সব অতীত বিহ্বলতা, ঐ যদুনন্দনেরই, কুড়োনো সন্ধ্যায়-সকালে-রাত্রে, কুড়োনো তুচ্ছতায়, ছোট খুকুটার কান্নায় আর সহধর্মিনী কাদম্বিনীর আলিঙ্গনে, কুড়োনো আপনার অগোচরে, যদুনন্দনের, তারা পড়ে রইল দেড় মাইল দূরের কুটীরের আঙিনায় কেলে-ফেলে-দেওয়া ভিজে গামছার মত, উপেক্ষিত, ভাঙাপুল, স্যাঁতসেঁতে চেতনায় পচবার নিরতিতে, চেয়ে-চেয়ে দেখতে কুড়িহাত দূরের কলাগাছটার আজো অটুট সবুজ প্রকাণ্ড পাতায় একদিন কী করে পোকার বসতি হবে।
এমন একটি গ্রহসনের পরিপক্ক মুহূর্তে—জানল না যদুনন্দন, কারণ সে জানতে চায় না তো আর, কারণ সে জেনেছে জানার কোথাও কিছু ছিল না—নেই—ঘটল না কিছুই; যদিও ঘটতে পারত অবশ্যই কত কিছু আকাশ-পাতাল,

পাখি বন্ধ করতে পারত গান, ধূলিসাৎ হতে পারত কুটীর তিনটি দণ্ডের ভূমিকম্পের আক্রোশে, বেচারা কাদম্বিনীকে অতর্কিতে চিত করে নিরুপায় দেয়ালের দুর্বার ঘূর্ণিতে, ভুলিয়ে তার অনেক রাত্রির যা শুধু স্মৃতি আজ থামিয়ে শেষবারের মত খুকুর কান্না আর হাসি, সোনা-মুন্তার করণা ধুলোয় পৃথিবীতে।

অন্তত ঐ কলাগাছটাও তো পারত হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়তে, নিছক এক অকারণ দমকা-বাতাসের প্রচণ্ড প্রেমাবেগ সহ্য না করতে পেরে।

না, তেমন কিছুই ঘটল না কুটীরে, অথবা কল্পনার খালের ধারে, অথবা যে-পথ গেছে কুটীর হতে খালে, গেছে ছাড়িয়ে আরো দূরে দুর্নিবার দেওয়ার তরুর ওপারে, তাতে।

শুধু হাসল এই প্রহসনের যে একমাত্র দর্শক, যে আরো একটি বিহ্বলতা, নয় যদুনন্দনের, কিন্তু যে-বিহ্বলতা সে ক্রান্তদর্শী অম্বিতীয় পটুয়ার, যে এক অবিশেষ আনন্দের বীজাণুর সমষ্টি হয়ে মেঘে-মেঘের ব্যাপ্তিতে ঘোরে, ছিদ্র খুঁজে একটি প্রবেশপথের প্রাক্তন যদুনন্দনের হৃদয়ে, যার কিছুটা রইল পড়ে ঐ কুটীরের আঙিনায়, ঐ কোণে-ফেলে-দেওয়া ভিজে গামছায়—সেই অবিশেষ শুধু হাসল খুরধার খিলখিল এক হাসি।

কে শুনল সেই হাসি, তা কোনো প্রশ্নই নয় এই আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে, শীতের পীতবর্ণ নিসর্গ-শোভায়—এই হাওয়া যখন যেন করাত, কাটে কান, কাটে যদুনন্দনের ছুঁচলো নাকের কনা, কাটে অনোরও দেহের ও দেহাতীতের সে যা কিছু ছোঁয়, এই হাওয়া।

এ-ই শুধু, এর বেশি আর কিছু নয়। এ যদি অসমাপ্ত ছবি, নয় কোনো পূর্ণ অর্থের, তো কে সেই মন্ত্রিয়া পাগল যে চেয়েছে সমাপ্তি, একটি নিঃশেষ পূর্ণতা নিস্তব্ধের, চাইবে সে?

দুই : খেলা

জাগব তোমার খুশীর খেলায়, হব সূর্যাস্তের মেঘ—কবে? হয়তো হবে, হয়তো হবে না—হবে কি হবে না ভেবে লাভ নেই যদি সে খুশীরই খেলা অন্য জনার।

তাই পাঠিয়ে দিই দ্বীপান্তরে, গ্রামান্তরে অজস্র অদেখা মেঘ রাত্রির, কেদনার —পাঠিয়ে দিই অন্য এক শালবনের মাঝের ওপারে, যার চোখ নেই আজ রাতে, তবু বুকে যার হয়তো বেদনা জমলে। পাঠিয়ে দিই প্রার্থনা যা চাইল না তার দেবতাকে।

উড়ে যায় অদৃশ্য হাওয়ায়, উড়ে যায় অদৃশ্য মেঘ—এ এক খুশীর খেলা, আমারও। না-পাওয়া, না-পৌঁছোনোর অনন্তে এই একটিমাত্র মিল তোমার-

আমার। খেলি আমরা দুজনেই, এক খেলা খুশীর।
হয়তো এ শুধু মিল নয়, মিলনও—হয়তো এ একই, একটিমাত্র খেলাই তোমার-আমার। একটি বস্তু রেখা যার এক বিন্দুতে আমি, তুমি অন্য বিন্দুতে?
আমি তো জানিনি সকাল, আমি তো দেখিনি। কী করে বলব?

তিন : হরিণীকে

সৃষ্টি অন্ধকার স্তব্ধে অকস্মাতের মাতাল হাওয়া দরজা ভেঙে ঢোকাল যখন, হয়তো থাকলে দেখতে পারতাম ফুল ফুটছে।
পারলাম না থাকতে আরো কিছুক্ষণ, নিশ্বাস-বন্ধ-হয়ে-আসা মুহূর্তে; অনুভবে আমার জাগল রুদ্রের ধ্যান, তার নিদ্রিত রক্তাক্ত নয়ন।
তাই পালালাম, চাইলাম গোধূলির ধূসর অবলুপ্ত প্রান্তরে হরিণের বেগ, তার পায়ে-পায়ে উঠবে সময়, পড়বে সময়, যে-সময় ছুটবে।
তাই খুঁজে পেতে আমাকে আবার, তুমি যখন পাড়ি দেবে দুস্তর পারাবার, পাবে আমাকে এইখানে, এই করা-সময় মরা-সময় মরুর মাঝখানে, পায়ে-পায়ের গতিতে—
নয় গতির অতীতে, নয় ফুল ফোটার, নয় সৃষ্টির অন্ধকার স্তব্ধে।
আমি যে পারিনি থাকতে.....আমি রইলাম যেখানে ছিলাম সেই আমাদের শেষ মিলনের লগ্নে, সেই তুচ্ছতার স্তূপের বাঁ পাশে, পরিচিত চলার হাওয়ায়।
নয় সে-হাওয়া মাতাল, অকস্মাতের, দরজা-ভাঙা।
তুমি আমায় পাবে.....

চার : মই

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মরুর মিলল গম্বুজে। তার পর আরো এক অদৃশ্য সিঁড়ি দিয়ে উঠে, আরো উপরে, মিলিয়ে গেল সূর্যে, হারিয়ে যেতে চেয়ে।
যখন এল সূর্যাস্ত, এল বিজয়ীর সন্ধ্যা, বাদামী রঙের এক অভিনিবেশে টান ধরল শিরায়, আমার। যদিও হয়তো শুধু একটি মুহূর্তের তরে, আমার কুঁড়ের অপদার্থ চালা হঠাৎ হল স্বপ্নরাজ্যের বুড়ীর এলোচুল—সে পরল বহুরূপী বানরের সাজ।
বেদনায় বেকুব আমি চির-অপরাজিত আছাড় খেয়ে মরলাম সমুদ্রের তীরে-তীরে। মরুরকে দিলাম অভিশাপ, কাছে পেলে না ছিঁড়ে খামতাম না তার রঙবেরঙের পালক। সে কেন রইল না পাশে, এই সূর্যাস্তের ঐশ্বর্যের বাড়বাড়িতে, এই আমার নিরাভরণ কুটীরের বাগানে?—সে কেন পাগল হল সাত ঘণ্টা আগে, সে কেন চেরেণা পেল, মিলিয়ে গেল সূর্যে?

চির-অপরাজিত যদিও, আজো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল না কেউ মই জয়ের।
তবু ভালোবাসলাম—ঐ মরুকে: সুন্দর যারই অভাবের অনুভবের নাম।
সে-সুন্দরের পাষাণ-বোঝা বুকে নিয়ে পথ চলে মানুষ হবে তীর্থযাত্রী, যে-পাষাণ বুকে নিয়ে আমি বসে রইলাম আজ সন্ধ্যায়।
রাত্রি নামতে, গন্ধুজটাও মিলালো।

পাঁচ ঃ দুটি মরুর

দিনের উত্তাপে জ্বলে-যাওয়া প্রান্তর, প্রান্তরে নামল যখন সন্ধ্যা, সন্ধ্যার আভাস শীতল সেই অনুভূতির সংগীতে শুনলাম এক বিন্দু টলমল। জলের প্রার্থনা চিরকালের আজো তৃষিত—আমার। শুনলাম।
দিন যখন মেলে সন্ধ্যায়, ঘণ্টা বাজে মন্দিরে।
বেরিয়ে এল, জলের খোঁজে, দুটি মরুর সর্বের ক্ষেতের অন্তর হতে, ছবি ছড়িয়ে লাল আকাশের পটভূমিকায়। চোখে তাদের অভীপ্সা আমার প্রিয়ার, তার আজো পথ-হাঁটা অমৃতের তৃষায়, এক বিন্দুর, তার আজো না-পৌঁছানো।
আমি রইলাম পড়ে, যেখানে ছিলাম, পুড়ে-যাওয়া হৃদয়ে, রুক্ষ প্রান্তরে। আমি পড়ে রইলাম, যখন দিন মিলল সন্ধ্যায়।
যদি কান থাকে দুটি মরুর, যদি না থাকে তো অসীম আকাশের কাছে, এই স্বীকার, সীমার, আমার ঃ জীবন ভরে করলাম সরল রেখার ধ্যান, পৌঁছেতে চেয়ে সোজা রাস্তায় শেষের বিন্দুতে—যা দেখলাম তা শুধু সমুদ্রের এলোমেলো ঢেউ, তোলপাড়-করা, কেবলি বেঁকে-যাওয়া: আজো পাইনি বিন্দুর ধ্যানে যে-অবকাশ আকাশের, পেলাম শুধু অফুরন্ত প্রাণ ও অশেষ জড়ের সমষ্টি, মাংসল দেহের, পাহাড়।
এত আয়োজন বিশ্ব ভরে স্তূপের, কোন লগ্নে মিলবে তারা অকাশের আলিঙ্গনে।
কোন লগ্নে মিলব আমি আর আমার প্রিয়া, মরুরের তৃষা আর পাতাল-ঢাকা সেই অগোচরের ছোট সরোবর, অম্বিতীয়।
প্রান্তরে নামলে সন্ধ্যা দিনের কোলাহল পৌঁছোন মরুর গন্তব্যে, জাগাতে আবার, গতকালের মত, নদীর ভেসে-আসা কুলুকুলু স্বর, ছায়া স্বপ্নাতুর শিশুর চোখে।
মন্দিরে প্রদীপ জ্বলে ওঠে, ঘণ্টা বাজে।

ছয় ঃ অদৃষ্ট

আনন্দের বীজাণু ঘোরে কিলবিল করে, এই আপাত শূন্যে, এই অন্ধ তামসী রাতে, ঘোরে চোখের অগোচরে। আনন্দের বীজাণু ঘোরে, খুঁজে প্রবেশপথ একটি ছিদ্রের। তাদের না পেলেও চলে সিংহ-দ্বার, উন্মুক্ত, অবারিত। তারা

ছুটতে জানে তড়িতের বেগে, তারা কামড়ায় চোখের পলকে। শিকার ধরতে কোনো নেকড়েই নয় তত নিপুণ।

তাই ভাবি, সে-মানুষ হতে পারে কী-এক বেয়াল, কী পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ, সে গুণল দিন-রাত্রি-সকাল, শুনল গান কোলাহল, বাণী প্রেমের, গ্লানি হিংসার, দেখল খালি চোখেও যা-কিছু দেখা যায়, শুনল যা-কিছু শোনে কান, দেখল যে ফুল-পাখি-দুখ-সৌন্দর্য, তবু আক্রান্ত হল না সে ঐ লক্ষ কোটি বীজাণুর একটির দাঁড়ের কামড়ে, অমৃতের কোনো উপসর্গে ফুলে উঠল না তার বা পায়ের কড়ে আঙুলও।

বসন্ত আসে যায়, দরজার কিনারায় কিনারায়। আনন্দের, অমৃতের বীজাণু ঘোরে, কিলবিল করে!

তাই ভাবি, যখন সে-মানুষ উবু হয়ে বসে থাকে কিংশুকে বিশর্বন্ত বনে, বুক-ফাটা সূর্যাস্তের রশ্মি-লাগা পথে, তখন সে কী ভাবে। যখন সে হাটে, সে কোথায় যেতে চায়। আর যখন সে ভালোবাসে—তখনো, তখনো নয় কি কার একটু ছোট্ট দাঁত, দাঁতের একটি কেশের কামড়ে চিনচিন করে ওঠে না হঠাৎ তার কোথায় কী যেন একটা?

কী-প্রচণ্ড বেয়াল সে-মানুষের, কী তার পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ!

সাত : এক ইঞ্চি অন্ধকার

যখন সকাল হল, পারিনি।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এল, তখনো পারলাম না।

তারপর তো জানো সেই চিরকেলে গান: দুপুর কী করে বিকাল হয়, বিকাল সন্ধ্যা, সন্ধ্যা রাত্রি, রাত্রি আবার সকাল, সকাল আবার.....ইত্যাদি ইত্যাদি। পারলাম না।

চরমতম লঘু হয়ে যত কথা, পরমতম সঙ্গীত। অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সে এক, অভেদ্য এক ইঞ্চি অন্ধকার, আমার ও তোমার মধ্যে।

এই আমার জগত, হয়তো তোমারও—ওপারে তুমি, এপারে আমি, মাঝখানে কথা।

আর, শুধু দুর্ধর্ষ দুর্বিসহ হাওয়ার হুংকার শুনে গেলাম, শুনে গেলাম, শুনে যাই, সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় রাত্রিতে ও রাত্রির পরেও আবার সকালে।

অমল চক্রবর্তী

অনির্বাচিত তিনটি

১· কয়েকটি যৌবন আমি অসংখ্য বছর ধরে মুখে উড়িয়েছি
আমার এপাশে স্থির ঘুলেছিল মহিলার ঘরসিনী কেশ
অতি পরিচিত, তবু কথোপকথন-স্তব্ধ কোনো এক নারীর উন্মেষ
মনে পড়ে. আমার ঘূর্ণন থেকে দূরতর আপন গতির মিথাচারে
আমাকে পেরিয়ে তবু আমার নিখিল ঘিরে অতীত উৎসুক
গতিময়তায় আসে কাছাকাছি, আমি তাকে দেখে
বিরহের কেন্দ্রভূমি, বলে আজ দুই বাহু অনন্তে মেলেছি।

২· কেবল তুমি, কেবল তুমি থাকো
অদৃশ্যের আর্তনাদে
ঝরে যাওয়ার জলপ্রপাতে
আকাশতলে শুধু তোমার শরীর গড়া সাঁকো।
হে সুন্দর সাধ্যাতীত বিবেক নিয়ে জাগ
আমি তোমার, শুধু তোমার। বিপুল ধ্বংসমূলে
কিশোর বসি নতজানু, নাও এবার তুলে
এই অপটু করতলের অভিবাদন
পুষ্পহীনা মালায় মাকে ক্রমশ আজ ক্রমশ
পরাগ নামে মৌবাধীন ক্রমশ
স্পর্শ দিলে এখনই পুষ্পিত।

৩· আতঙ্কহীন, স্থান কাল ভুলে এইবার বলে ওঠা
এইবার কুঁড়ি শিশিরবিহীন স্তব্ধ অকালে ফোটা
লবণাক্ত খুলে প্রচুর জীবন অতি প্রাকৃতিক হাটা
এখন কোথাও থাকে না রক্ত কাটা।
এইবার বলি 'নীলাকাশ', বলি—রাত্রি পূর্ণচন্দ্রে'
দেখি ভালবাসা আসে শরীরের অদৃশ্য কোন রন্ধ্রে
মুখ থেকে যেই কথাই শব্দে অধিকার
অমনি আকাশ ফুটে ওঠে দূর অনন্তময়তায়।

অরুণানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবনবন্ধু

কেন সদাচারণার ক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত হবে না
ঘরের ভেতর জমছে এতগুলি হাঁড়ি, ঘাঁড়, কমলা, ডালিম
পশ্চিমে সূর্যের গায়ে অকাতর ক্লান্তির প্রতীক
কেন রাত্রি দিয়ে গেছ সাও নি প্রদীপ—
সদর দরজায় কে কে এসেছিল নাম মনে আছে?
সব না ভুললেও চিনি মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন বাতি,
সেদিন ঘরের মাটি কেটে নিয়ে গেছে কোন চোর,
সিন্দুকাঠিটির ভয়ে শিকেয় ঝুলিয়ে রাখছি সমস্ত আমার...
তালপাখা কয় নামে ভয়ে আছে, পুরনো ইস্কুলে
বেঞ্চিতে অনেক নাম—মুদ্রাদোষে ভোগে কোনজন
কেতে কেতে খাতকে পড়ে, আবোলতাবোল কিছু বলার আগেই
আমরা পালিয়ে বাঁচি—হয়ত পদার্থ ছিল, কিছু ছিল, হয়ত নিশ্চয়—
এখন নিরসঙ্গ কালে বারান্দায় বন্ধবন্দী ঘরে
নিজেকে টুকরো করে কেন ভাঙো, কেন যেন খেলো দুইজন।.....

বাতাবীতলা

আজ এই বাতাবী গাছের নীচে একলা দাঁড়ালাম;
বাতাবী লেবুর বল গড়িয়ে গড়িয়ে কবে মস্ত ময়দান
পারের তলায় ছিল, কিংবা কালো শহুরে কাকেরা
এরকম কয়েকটা গাছেই নিবাস করতো সেই আবিষ্কারে
সারাদিন কবিতা লিখতাম, আর কবিতা লিখেই কত
সময়ের অপব্যয় করেছি সেদিন, কিংবা ওদের মাধবী
ফুলের স্তবকগুলি ডালপালায় মিলেমিশে অনেক দুপুরে
গন্ধের বিশ্রিন্ন রূপে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করলে বড় হয়ে গেছি
মন বলতো, ওবাড়ির অনেককেই মনে হত এত কি আপন.....
এখনই এগিয়ে আসছে গল্পগুজবের সেই ম্লানতম কাল
ছায়ায় চাতালে বসবো অন্ধকারে গন্ধের আড়াল
কেন অকৃত্রিম ফুল চেয়ে থাকবে এতদিন, এত দীর্ঘ দিন।.....

উত্তরসূরী

গোলাপ বাগান আজো

রেলগাড়ির আলাপচারিও মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী হয়,
কিছু কথা কেন চিরদিন ধরে নিজের শক্তিতে
ভাসমান, চলমান.....বিবর্ণ, ধূলোট, ম্লান কত চেনাজানা—
সামাজিকতার থেকে বহুদূরে আমরা স্বাধীন
কেন মুহূর্তের দান বারবার ফোটে না বাগানে
এত সারপদার্থের মায়া ও মমতা, ছায়া, আলো অন্ধকার
কুয়ো কি গভীর করে খোঁড়ে কেউ গোলাপ বাগানে
বিতৈষী প্রস্তাব কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে যখন তখন—
অনায়াসে বাতি জ্বলছে বাতিওলা লাঠির আগায়
রক্তাক্ত খোঁচার ঘায়ে কেন ফেসে ওঠেনা হৃদয়
কেন হতে চাই শুধু ঘুরেফিরে প্রশান্ত নির্বোধ
কে আজো আয়নার সামনে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে!

ক্লান্ত পুরুষ

অতিচেনা পরিচিত এই ঘনিষ্ঠতা এর প্রতিকার কিসে,
সমস্ত চিন্তার জট একে একে খোলা সমীচীন
সমস্ত বইটা যেন্নি লাল-নীল পেন্সিলের দাগে
ভরে যায় পরীক্ষার আগে, কিংবা সাধারণজ্ঞানে
কয়েকটি তারিখ মাত্র মনে রাখা গভীরতাহীন—
এত বিমিশ্রতা নিয়ে পড়ে থাকা বিস্তৃত মেলায়
যাবহৃত দর্পণের আলো কিংবা অন্ধকার রূপোলী ঠিকানায়
কখনো দূরত্ব বাড়ে নদী, বালি, নদী, বালিকণা
নিকটের ভাবা কেন মনে হয় বিকট চিৎকার,
ডুবুরীর মত কেউ ডুবে আছে জলের আভাসে,
পরিচয় কি সহজ কত শক্ত মোটেই ভাঙে না।

পেয়ারা বাগান

বাদুইপুরের রাস্তা পেয়ারার উজ্জ্বল বাগানে
ভরে আছে, নাতিদীর্ঘ, হ্রস্ব, ফুলকায়—
আমি যখনো দেখি নি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে,

জঙ্গল অনেক দূরে.....বাগানই কি জঙ্গল আমার.....
পেয়ারা বাগানে আমি বুড়ো মালীটার পাশাপাশি
টো টো করে ঘুরে বেড়ালাম, আমি লাঠি হাতে করে
একটি দুটি তিনটি কাক তাড়িয়েছি, তবু
ফলে ত আমার আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই—
অনেক গল্পের মত মুখ খুলছে আবদুল লতিফ
বিন্দু পেয়ারার মেয়ে কেন ঝুলেছিল সাদা পেয়ারার ডালে.....
সব কটি বাগানের আলোছায়া পাগলাঘণ্টি ছুটির দুপুর—
পিকনিকে যাবে কি কেউ বাসভর্তি মায়াবী সকালে
পেয়ারার মত স্বাস্থ্য কেন নেই, কই রং, কোথায় সেদিন।.....

ষোড়শ বোধ

প্রেমশূন্য

ঘরে আমার অন্ধকারের অতি প্রবীণ দাবি
শীতল নিশিতলে
পাথর কাদা শেওলা নিয়ে আমার সংসার
দেখিনা নিজ মুখ।
প্রেমবিহীন হৃদয় আমার, জানিনা ভালোবাসা—
চিরকালের প্রবেশ-নিষেধ ঘরে
গড়েছি এক বিষণ্ণতার লালিত সংসার
ওরা আমার না ভাই না বোন কেউ

ওদের বুকে মেরেছি ছুরি, আমি ধ্বংসের মত
গুঁড়েছি মুখ ঈগল দেখে ভয়ে—
প্রেমশূন্য হৃদয় আমার জানিনা ভালোবাসা
কাউকে আমি মানিনা ভাই বোন
ওদের সঙ্গে করি লড়াই শত্রু ভেবে দিলে
ঘরে আমার অন্ধকারের প্রবল প্রতিরোধ
পাথর কাদা শেওলা নিয়ে আমার সংসার

এ দেশে যের অন্ধকারের রাজা ॥

প্রকাশ ভট্টাচার্য

হাসপাতালের কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে

কবরের চার পাশে রাত থমকে দাঁড়ায়। ঘোরে ফেরে
শেয়ালের মত। পেছনে অন্ধকার তার সঙ্গী;
কবরের ভিতরে এক সামান্য আলো ভিন্ন আর
কেউ ছিলনা; কিংবা থাকলেও থাকতে পারে
একটা দুটো জৈবিক জোনাকি।

এই অবসাদ প্রভবে আলোটা একা আরো
ভয়ঙ্কর হয়ে দুলছিল। যেন কাকে বাধা দেবে।
—এদিকে এক আলোর বাসনা নিয়ে বাইরে
মহানিশা বার বার হাঁকে। হাঁকে। ফিরে যায়।

শঙ্খশুভ্রজন বসু

নদি অভ্যাসের বশে

শুধু অভ্যাসের বশে বেঁচে আছি;
না হলে কিছুই নয়,—কিছু নেই।
অভ্যাসী আঙুল নাড়াচাড়া করে
দিনগুলি রাত হয়, রাতগুলি পরিণত দিনে।

খুঁজিনি কখনো এর মানে,
অমর্ত্য পাই নি কোনদিন
নিতান্ত এ প্রাত্যহিকতায়।
শুধু অভ্যাসের বশে আকর্ণ জটিল হাসি, বেঁচে থাকা,
না হলে কিছুই নয়,—কিছু নেই।

কোনমতে দিন এলো রাতির বসন ছেড়ে রেখে,
কপালে সিঁদুর মাখামাখি
চোখে মুখে ঘুম, লজ্জা, ক্লান্তি, অবসাদ
ও সব জলের ঝাপটা তুলে নিল,

কলসীতে জল ধরতে কাপলা হয়ে যায় সব ছবি—।
আড়ালের কাপড়টা ফের খুলতে হয়:

সারারাত ঘুম নেই দু চোখে, শরীরে,
তবু অভ্যাসের বশে শুয়ে থাকা,
দুহাতে কঠিন ছিলে বুক বেঁধে পড়ে আছি
অভ্যাসের বশে সব নিয়ে ঘিরে আছি।
অভ্যাসী অঙ্গুলগুলি চতুর প্রহর্তা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাবিষয়ক। ১

সমস্ত চুলোয় যাক, মস্তিষ্কে পুরোন বাসাখানি
কায়েমী কংক্রিটে বাঁধা, খড়-কুটো ইত্যাদি সমস্ত
রঙচটা ভালোবাসার আঁকিবুঁকি গত শতাব্দীর হাস্যকর
ফাঁপানো চুলের কারদা হুঁকোমুখো গাম্ভীর্যের মস্ত
আস্ফোটনী আভিজাত্য—আহা সব কী দ্রুত তৎপর
এক ইঞ্চি চুলে ও আঁটো পাজামায় ঋজু ও শ্রীমান
হয়ে দাঁড়িয়েছে, যত রঙদার শিরোপা ও খানদানী
মেলোড্রামাটিক প্রথা-বর্তমানে সব ছেঁটে কেটে
মাপজোখ করে ওই তাকে এক মস্ত অভিধান
নিত্যপ্রয়োজনমতো কিছু শব্দ এবং কিছু জ্ঞান
যাতে ব্যবহার করা যায় সেই মাফিক পকেটে
সুবিন্যস্ত আছে, গোরো যন্ত্রণা-রেখাঙ্কিত-সুখ-আদি
গত শতকীয় কিছু কাঁচামাল ফেলা গেছে, তার
পরিবর্তে লোকবুদ্ধানুমোদিত অকৃত্রিম খাদি
ব্যবহার করা যায় ইচ্ছামতো, রূপকসম্ভার—
অধিকন্তু রেখামাত্রে সঙ্কেতিত করে সারাবেলার.....

শঙ্খঘোষ সেনগুপ্ত

ভিক্ষুক মার্জারিক

বারান্দায় সারারাত শুনি এক ভিক্ষুকের ক্ষুণ্ণ গান; জেগে
আছি স্পষ্ট বোঝা যায়, কলকাতার মধ্যরাতে আজো

উত্তরসূরী

অঘটন ঘটে যায়, জন্মের ওপার থেকে ডাক দেয় হাওয়া।
ডাক দেয় অন্ধতাক্ষ কুয়াশা আস্বাদে
কে অন্ধ শব্দের ছলে সঙ্গীতের ছলে সঙ্গীহীন
ধুলোয় বিছানা পেতে আদিগন্ত শূন্যতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে।
আমি তার প্রতিবাদে শরীরের প্রতিটি পৌরুষ
আত্মজিজ্ঞাসার রক্তে সিক্ত, শুদ্ধ, শান্ত করে নিয়ে
সম্পূর্ণ পৃথক সব যৌবনে ভাসাবো ভেবেছিলাম।

শব্দ, ধ্বনি, শ্রুতি, অন্ধ মধ্যরাতে বেইমান হাওয়া,
কেন যে চীৎকার করে, সমুদ্র বিস্তার করে, কেন যে কেন যে, কেন
হাজার হাজার লুব্ধ মৃত্যুহীন মশা স্পর্শের দস্যুতা নিয়ে
বার বার স্মরণ করায় এ সহর কলকাতা (হে সহর কলকাতা!) ঝুঁকে যায়
পৌরসভা আছে তবু অন্ধের উদ্যমে উদাসীন
স্পষ্ট গান হয়ে ওঠে ভিক্ষুকের সনির্বন্ধতায়।
শরীরের সমস্ত শিউলীগুলি ঝরিয়ে অন্তিম
বিদীর্ণ দংশনে বলে, এসো হে নির্মম তুমি শিল্পীর লালসা উদাসীন,
এসো তুমি, অসহ্য তীক্ষ্ণতা বর্ষা, হাড়ে-মাংসে-রোমে
ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি নিদ্রিত কোষে সাইরেণ বাজাও।
মধ্যরাতে এইসব মনে হয়, মনে হতে পারে।

আশিস সামন্ত

ফিরে যেতে বড় ভয়

ফিরে যেতে বড় ভয়। প্রান্তরের বনছায়ে কেন সব রঞ্জিত ঝুমনা
নির্ভয় মুহূর্তে একা বসে থাকে? দুরান্ত সমীরে
কেন যে ব্যাকুল বিধী পরস্পর আন্দোলিত ব্যাপক উদ্যানে
ছড়ায় বিশুদ্ধ প্রীতি? হায় যদি না ডাকো মোহিনী
উন্মোচিত জলস্রোতে সবুজের সমান আভাসে,
ঝরে যাবো শব্দহীন, নষ্ট সব ফসলের মতন বিষাদে।

অথচ উৎকণ্ঠা পেলে বৃক্ষবান হয়ে উঠবো প্রসন্ন মন্দিরে।
বিহ্বল নদীর শব্দে অরণ্যের গহন তিমিরে
যেমন বৈদগ্ধ্য হাটে উজ্জ্বলতা নামক হরিণী

আলাতীত অন্ধকারে। বেগবান সমস্ত চেতনা
প্রসারিত করে দেবো অন্তরে, বাহিরে, বিশ্বে, নক্ষত্রে, সমীরে।
নির্মল পদ্মের দল বড়ো বেশী ভালোবাসি আমি। হে অভিসারিকা
স্পর্শের অতীত দীপ্তি গুঞ্জরের মতন নিবিড়ে
করে দাও উদ্ভাসিত। একদিন অবারিত পেয়েছি তোমাকে
ভেরের নির্ভীক রৌদ্রে। ফিরে যেতে তাই ভয়।
কেননা, প্রান্তর স্নিগ্ধ লুব্ধ হয়ে থাকে
প্রতিদিন চেতনায়। নিমীলিত স্নিগ্ধতায় আশ্চর্য গভীরে
চিরন্তন বৃষ্টি নামে পরবাসী সমুদ্রের নিরন্ত্র বিভাসে॥

জয়ন্ত রায়

বৃষ্টি অভ্যাকৃত কবিতা

সভাপতি মহাশয়

সকলেই জয়ন্তবাবু নয়। হাত, পা ইত্যাদি কারো
কিংবা কারো কারো আছে এবং মাথায় শিং নেই:
বিশ্বাস করুন কিম্বা না করুন—এই যে আমরো,
আমারো মাথায় কোনো শিং নেই, কোনো সময়েই
ছিলনা, অথচ, প্রিয় জয়ন্তবাবু, গতবার
আমার ভয়েই নাকি খুব শিং অতবড় লেজ
সমস্ত নিয়েও আপনি পালিয়ে ছিলেন। গুতোবার
ভয় আপনিও পান, সে সভায় আসেন নি। তেজ,
এ বছর বাড়লো নাকি, ভালো কিছু তেজ থাকা ভালো
মাইরি বলছি, আপনার বক্তৃতা কিন্তু ভীষণ জেরালো॥

শহরের আগুনে

কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে তীব্র ঝাড়লণ্ঠনের আলো
নেভাতে চেয়েছে যারা অন্য এক আগুনে তাদের
কখন নিভিয়ে গেছে মাঝরাতে হঠাৎ ফুঁ দিয়ে।
অথচ স্বপ্নের মধ্যে কি ভীষণ বৃষ্টির দাপট
তারা প্রত্যেকেই শিউরে উঠেছিলো বন্ধ ঘুম ঘোরে
জলের কাপটায়। শীত, আগুনের কাছাকাছি এসে

উত্তরসূরী

এত শীত এত বৃষ্টি, এক আগুনের কাটা জিভ্
ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে যায় অন্য সব সখের আগুন॥

বিবেকেন্দু পালিত

প্রেমিক

দেখে দুঃখ হয়। আমি যদ্যপি না পারি তাকে নিতে
অন্তরে অন্তিম করে, অল্পায়াসে, বাহুর সংগমে—
অন্তত সে ততক্ষণ রক্তমাখা, বিকলাংগ—শীতে
দাঁড়াবে। অশ্লীল চোখে, যারা শিস্ দেয়, তারা ক্রমে
বাছা বাছা চাটুবাক্য আওড়াবে; বক্ষে নাভিমূলে,
শোণিতে যতটা যায়, রাঙা তাল্ ফুটো করে, শেষে
বৃহৎ চক্ষুর জোরে অপেক্ষার মাসে নেবে তুলে।

নেহাৎ যদি না কেনো দেবী এসে স্তোক দেয় রেখে।

অপ্রমাদে কাটে বেলা; রৌদ্র আসে, রৌদ্র নিভে যায়।
নশ্বর, মসৃণ অতি, চাপ দিলে বিরল, ভংগুর
প্রতিটি স্রোতের নিচে একই জল শব্দে, ইশারায়
ফেঁপে ওঠে; কাপুরুষ, চেনে যাসি রক্ত আর নুন;—
উৎকর্ণ দুয়ারে, যদি আশীর্বাদে শোনে অন্ধকূপ।

পুরাণে যা ঘটেছিলো, এখন তা স্বর্গীয়, আগুনে।

হাইফেন উপকূলে

ভিটের নাটি বন্ধের, তারা কেমন?
চাতুর্বর্ণময়? সবাই কি রাতকানা?
বিপুলে উদর, সেরা সেটুক? বামন?
খুব কি হাসে? কামলহুড়ের ছানা!
উদাস সবই, চপল, এমন দিনে
প্রেমিক হয়ে, ছায়ায় দাঁড়ায় পথে।
চটুল মলাট পদ্য কিছু কিনে—
প্রলেপ বুলোয় বুকের মোপন ক্ষতে।

অবশ্য সে পদা রেখে না কো;
রমণীদের লজ্জা হয়েই বাঁচে।
ঘরে হেঁটে পার হয়ে যায় সাঁকো—
মুখটি রঙীন করে রোদের আঁচে।
বলতে পারো প্রেমিকও: প্রেম থেকে
জীবনটিকে সাচ্চা করে চেনে।
নইলে কি সে গোলাপগুলি ফেলে—
মাসকাবারে জীবনবীমা কেনে!

জীবনকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় ঋতুর শেষে উদ্ভাসিত....

বিধ্বস্ত দিনের বোঝা প্রার্থনা আপন করপুটে
তুলে নিয়ে মুক্তি দিল নীলকান্ত সুরের আকাশ।
মেঘের মিছিলে পাখি, সেই পাখি বিস্তারিত সহযোগিতায়
নির্ভার আশ্রয় নিয়ে হারাক রৌদ্র মাখে নীল দেহে, সমস্ত সত্তায়
কী দুরন্ত হাওয়ার দিন গত, এবং বর্তমানে স্থির
মসৃণ বিস্ময় করে ইতস্তত পুষ্পে তৃণে বৃক্ষ চূড়ায়:
দ্বিতীয় ঋতুর দিন সাঙ্গ হলে তৃতীয়ের কালে
উন্মোচিত হিরণ্ময়ে নীপবনে লোকালয়ে আরও.....
মেঘের মিছিলে পাখি, সেই পাখি বিস্তারিত সহযোগিতায়
হারাক রৌদ্র মাখতে উড়ে যায়, নীল দেহে রৌদ্র মাখে
এবং সহসা অজস্র সুনীল ঝর্ণায় স্নান করে পরিতৃপ্ত
কোথায় হারিয়ে গিয়ে একা একা সেই পাখি রৌদ্র হয়
রৌদ্র.....রৌদ্র, হিরণ্ময়
রৌদ্র
আহা আরও :

দ্বিতীয় ঋতুর শেষে উদ্ভাসিত নিসর্গ। উন্মোচিত সুরের আকাশ।

অভিমুখ কর

দুর্ঘটনার পরে

প্রবল ঝড়ের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা উড়ে যায়
নিশ্বাসবিহীন দেহ নিয়ে মগ্ন ভীড়ের গোলমালে
ডুবে যাব .....ডুবে যাব লক্ষ তরঙ্গের কণ্ঠস্বর
ডাকতে থাকে.....ডাকতে থাকে পানের দোকান ঠাট্টা নির্জন স্টিটন
রাস্তায় লোকজন নেই তবু এত ভীড়ের গোলমাল
নিশ্বাসবিহীন দেহ.....উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা উড়ে যায়।

জলের তলায় সেই লাজুক জলের স্বাদ নিতে
রাত্রির ভিতর নিশি-পাওয়া চলে যাওয়া
খেতে খেতে খেতে খেতে তারও পর তারও পর খেতে
যারা গিয়েছিল হয়ত তারাও শীতল দেহে অচেনা শয্যায়
কাকচক্ষু জলের তলায় শুয়ে আছে ক্লান্ত হয়ে।

ভীষণ পাষাণ ভুলে বাসনা যখন নিশ্বাসের মত ঘুরে
নির্বাসিত চতুর্দিক ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে
দেয়াল মিলিয়ে গেল, জ্যোৎস্নার তরল শূন্য প্রান্তরের ধূ ধূ

সেদিন শহরতলী অবিকল আরব্য-রজনী!
পৃথিবীর সব দরজা একসঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে
শহরে যাবার শেষ বাস গর্বিতার মত চলে গেল।

শান্তি লাহিড়ী

গ্রীষ্মকালীন অভিমানের নায়ক ও শিহনের পৃথিবী

উত্তরে, আরো উত্তরে। শহর গুণে গুণে। আবার সময়ের সোনালী চিকে দেশলাইয়ের বদ্‌টির মুখ ভেসে উঠবে এক মুহূর্ত। বুকের মধ্যে জ্বালা, বড় জ্বালা—সৈনিকরা কখনো কখনো সাধারণ মানুষ হয়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আকাশে—আকাশ! দেওদারের ডালে কী নতুন সবুজ। বোধহয় বাংলাদেশের শাল মহুয়ার বন বোলে বোলে ছেয়ে আছে ধুলোর সঙ্গে বকুল। আর ধান-কাটা মাঠের দক্ষিণ থেকে কী আগুনে বাতাস।

উত্তরের পাহাড়তলীর বিরাম। বন্দুকের নল বুকে করে কেউ ঘুমিয়ে। কারো গলায় গান। রক্তে? নীলিম অনুভূতির বিস্মৃতি—স্বপ্নের বিস্মৃতি। কিন্তু। শিরায় শিরায় অবিশ্বাস শত্রুর প্রতীক্ষা করছে। পাতাসরার শব্দ, বর্ষার সিঁড়ি ভাঙার শব্দ। কিংবা—ভয় করে, বড় ভয় করে—।

কিশলয়ের জল, পুতুকে মনে পড়েছে। মেঘ রং বদলায়, পাখি ওড়ে।—কাউকে চিনি, কেউ অচেনা। ওই রহস্যময় বরফমাখা পাথরের চাই—তার বিপরীত অন্ধকার, অবিশ্বাস। এটা কি মাস? বসন্ত নয়? হোরি আমার বড় প্রিয় খেলা! গোপাল মন্দিরের উঠোনটা কেমন রাঙা হয়ে গিয়েছিল আবিরে—কুমকুমে। গত শীতে আমরা যেখানে ছিলাম—একটা কর্ণা, কয়েকটা অচেনা ফুলগাছ। আর জ্বালা, বুকের মধ্যে জ্বালা।

উত্তরে বাতাস। এসো এই পাহাড়তলীতে রক্ত এনো বুকে। কবে আবার ঘরে ফিরব, সেই চেনা মানুষের ঘর। ধান-কাটা মাঠের আল পেরিয়ে—যেন তেপান্তরের মাঠ। চিকের আড়ালটুকু দুহাতে সরিয়ে চীৎকার করে উঠব, দেখ, আমি একজন সাধারণ মানুষ।

শচীন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ, স্মরণীয়েষু

তোমার কবিতা, কবি, অন্ধকার হৃদয়ে আমার
জ্বালে আলো সেই দীপ (রমণীর), স্পর্শমাত্রে যার
সব কালো আলো হয়; হৃদয়ের যন্ত্রণার লব
পবিত্রতায় উত্তরীয়ে ঢেকে রেখে, সমস্ত বৈভব
আমিও হারাতে চাই। স্নেহময়ী রাত্রির ছায়ায়
দিনের স্মৃতিকে খুঁজে প্রতীক্ষিত প্রহরের মালা
তাই গাঁথে এই মন; আবেগের সব ডালপালা
ইচ্ছার বৈশাখী ঝড়ে নুয়ে পড়ে....ভেঙে যেতে চায়।

অথচ এখনো অন্ধ আকাঙ্ক্ষার তীব্র মরুদাহ
সহস্র বুকের সুখ কেড়ে নেয়; ক্ষয়ের প্রচ্ছায়া
পূর্ণতার প্রত্যাশাকে ঢেকে ফেলে। আত্মঘাতী মায়া
প্রবৃত্তির হ্রদে তোলে সর্বনাশী ক্ষুধার প্রবাহ।

তবু এই কলুষিত আঁধারেও আছে একজন,
যে তোমার শুভ্রতার স্বপ্নে খোঁজে শান্তি অনুক্ষণ॥

বাসুকি ভট্টাচার্য

দুটি অনুভব

১. মহুয়া গাছের নিচে কতোকাল বসে থাকব একা
আকাশে ছড়িয়ে আছে গোধূলির রঙ
বেগুনেরী মেঘেরা কখন
আবার আসবে ফিরে এক ঝাঁক বকের মতোন
কবিতা কে লিখে গেছে সবুজ ফসলে
পাখির সংগীতে আমি কবিতের দুর্লভ আস্বাদ
পেয়েছি—অরণ্যে ঘন রহস্যের মাঝে

আমি কতোকাল ভাবো হারিয়ে রয়েছি
মহুয়া গাছের নিচে বসে থাকব নিস্পন্দ চিত্রের মতোন
ভালোবাসা এসে ডাকবে জিয়ন কাঠি ছোঁয়াবে কপালে॥

২. বলো না তাকে কঠোর কথা শয়তানের মতো
পাঁয়রিত ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না একতিল
রঙীন ফিতে দিয়ো না তাকে—লতায় বাঁধা বেণী
খোঁপায় তার নিয়ো না গুঁজে বিদেশী কোন ফুল
বুনো ফুল সে বুকে জড়ায় চুমু খায় আগ্রহে
কালো খোঁপায় কুচিমালা শহুতের দুপুরে

শোন শোন মৌমাছিরা গল্প শোনায় তাকে
পাখিরা তার হৃদয় ভরে নিবিড় ঘুম আনে
রাখাল শোনায় ভগ্নস্বরে পাঁয়রিতে কী যে জ্বালা
বলোনা তাকে কঠোর কথা প্রেমের কথা বলো॥

জাকিরাত নাসরুল্লাহ

গ্রীসের মাটিকে

পাষাণে প্রহার পড়ল। যথারীতি নির্ভুল নিয়মে
কয়েকটি অতিস্পষ্ট অক্ষররেখা ফুটে উঠল, তুমি

কুহকিনী, অসীম যৌন-প্রভাবে আমার দুই হাত
বেঁধে কালনিদ্রা গেলে। অতিকায় গর্ভের আপদ
মাঝে মাঝে কাঁপতে থাকলে আমি কামতপ্ত সারমের
তোমার আর্দ্রতাষন পংকের ঘোলাটে বুকে মুখ
ঘষতে ঘষতে ভাবলাম ঃ আমরণ লিপ্ত থাকা শ্রেয়।
তোমার চুলের জলে উপাধান সিক্ত হলে তুমি
দুই পা বিস্তৃত, ভিজ, টানটান, নিম্ন নাভিমূলে
অবিবেকী পাপ শিউরে শিউরে উঠছে, ওষ্ঠে বিজয়িনী
হাসি, শুয়ে আছো, যেন শয্যায় মরণ হলে ভলো।
যদিও দুইটি দেহ ব্যবহারীতি প্রমেয়ে বাকিম
আমি নিদ্রা যেতে চাই, যেখানে তোমার ভ্রূণ শুয়ে
কারণ এ কিংবদন্তী অমলিন বহু গ্রীষ্ম পীতে
গ্রীসের নাটকে নাকি ভ্রূণও বেচে ছিল পিতা হয়ে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

সংক্ষেপে ঃ কয়েকটি অসংলগ্ন সংলাপ

চিত্রার্পিত বালুস্তরান্তরে
শ্রান্ত মহিষীর মত একটি কালো বোরখা-মূর্তি
মাথায় তুষার কলসী, হাতের মুদ্রায় শিশুপুত্র এবং
বুকে এক দীর্ঘ যন্ত্রণার জল নিয়ে
বালিয়াড়ীর আড়ালে মিলিয়ে গেল
একটি কম্পমান কুহকেখার মত
তখন সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যে সুচারু নীচের পথটা
তাতে ধাবমান মার্কিনী মোটরে
সুরাপানরতা সেই রূপোজ্জ্বলাকে দেখলুম
তার হাতের ডিক্যান্টারে একটি মৃতা মিশরিণীর মুখ
আমার মাল্টীজ সহযাত্রী বললেন
শুনেছি কাইরোর বিপণীতে জলের দরে ওষুধ পাওয়া যায়
আরবী ঘোড়ার মত তেজীয়ান
যাই বলে সাদা বোটে চেপে
তিনি নেমে গেলেন কাইরোর উদ্দেশে

উত্তরসূরী

দু'পকেটে নিয়ে কিছু সুখী ভবিষ্যৎ
কিন্তু ফিরে এলেন ভর সন্ধ্যায় সানস্ট্রোকে কুপোকাৎ হয়ে
এখন আমাদের জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ভাসছে
পাটাতনের নিচে ঠাণ্ডা কুঠরীতে
সেই মাল্টীজ রসিকের শবদেহ শ্বেতকল্পে আচ্ছাদিত
শ্রীমতীকে এইমাত্র দেখে এলুম
অন্ধকারের রেশমে বিজড়িতা হয়ে
ডেকের এক নিভৃত কোণে পড়ে আছেন
কে জানে হয়তো তার মৃতপূর্ব স্বামী চিৎপাত হয়ে শুয়ে
শিবনের পৃথিবীর নশ্বরতা দেখছেন
সমুদ্রের কম্পমান ঢেউয়ে হাজার নক্ষত্রের ঝিকিমিকি
তাতে একটি মহিমময়ী মুখ
তার কুষ্ঠী শীর্ণা হাতে শিশুপুত্রের হাত
মাথায় কলসভরা সংসারের গ্লানি
ক্লান্ত মহিষীর মত মালিয়াড়ীর আড়ালে
বর্ষালি দিনের মত আপসা হয়ে গেল
সে মুখের আসল আমি জানি
যদিও তা বোরখায় ঢাকা ছিল

অন্নদাশঙ্কর রায়

এখন পথের শেষে

আমি কিন্তু তাও পারি তোমার প্রতিটি অঙ্গেতে
ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিতে কিংবা কোন বিষের জ্বালায়
অস্থির হয়ে উঠতে কিংবা ঐ পথে যেতে যেতে
অন্তিম গ্রহণ করতে, অভাবিত পাপের গুহায়।

পথে যেতে যেতে রোজ ঘরে ফিরে আসি।
প্রশ্ন করতে পারো, একটু বা হেলাভরে হেসে,
পথেই চলম যদি কর কেন এতো ভালবাসি।
আত্মরতি, হয়তো নিষ্ঠা, হয়তো প্রেমই শেষে।

আসলে অমৃত সবই, কিংবা বিষ। আমি
আমাদের দুজনের প্রথামত অকুণ্ঠিত প্রেমে

ভবিষ্যদ্বাণী

আকণ্ঠ মজেছি তাই পথে যেতে থামি,
ঘর দেখি আলো জ্বালি পথে যাই নেমে।
ভাবিনি, ভাবিনা এই আয়োজিত সময়ের পর,
এখন পায়ের নীচে হস্তপায় নীরেট পাথর।

বাসুদেব দেব

অপেক্ষায় আছি

সাল সন্ধ্যার মেঘের বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।
শহরতলীর অসুস্থ আকাশটা।
ঝাড়-উঁচু-করা কালো চিমনিগুলো তালবনের ধুলোমাখা পাতা সরিয়ে দুহাতে
ফকফক করে বোঁয়া ছিটিয়ে গাল দিচ্ছে বুড়ো আকাশটাকে—সর্ সর্।
মানুষগুলো মাথা নিচু করে হাঁটছে
যেন কেউ ওদের পিঠে ভার চাপিয়েছে।
মরা জটায়ুর মত আকাশটা শহরটাকে ধূসর পাখা দিয়ে ছেয়ে রাখতে চায়।
কিন্তু তাকি হয়? কোনোদিন এই
এবড়ো খেবড়ো,-অসংলগ্ন ইচ্ছার মতো পাকানো উচ্ছিষ্ট শহরটার
সেই চৌকিদার যদি হেঁকে বলে:
'যে সোনার জাহাজটা পাঠিয়েছিলাম ওপার থেকে,
তার কি হোল?'

সেইজন্যেই এখনো, বুড়ো আকাশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
বলতে পারি: 'যতোই হোক দেনা,
এই তো এলো বলে সেই সোনার জাহাজ।'

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাচাল

সন্ন্যাসিনী হাওয়ায় ওড়ে মাথার উকীব,
কে ঘিরেছে অঘন করে রাজকুমারের মত
জাঁকানো সাজ, মর্তবাসী জানাচ্ছে কুর্নিশ,
দুর্বিনীত দুঃখ আমার এখনো স্বর্গত।

উত্তরসূরী

হা রে আমার বেদনাহীন বিপুল উৎসুক
স্বপ্নরাজি ঝিকিয়ে ওঠে কুসুম সন্নিভ।
দার্শনিকের ধার ধারিনে, সহজে সম্মুখ
যে-আসে তার স্বয়ম্বরায় ছড়ানো পার্থিব।

অশ্বিসার হীরার মালা কণ্ঠে দোদুল্য,
ভিক্ষাপাত্র হয়েছে সে তো গোপন সমাচার,
গোপন তথ্য বেফাঁস করা কৃতঘ্নের তুল্য।
প্রকট মাত্র ভালো, যেমন প্রচণ্ড সংসার।

বাহির মাঠ ভালো এবং বাহির মনেই ভালো :—
সর্বনাশী ধ্বনির মত রাজকুমারের সাজ,
সূর্যোদয়ের বিভার চেয়ে দুপুর জমকালো,
সরীসৃপ রাতের থেকে রোদের পক্ষীরাজ।

বাঁচার মতন বাঁচতে হলে বুকের এ উদ্ভাস
একেবারেই স্তব্ধ করুন, স্তব্ধ করেই দিন;
রাজকুমারের রমা সাজে রটান সমুল্লাস—
প্রগল্‌ভতার রাস্তা ছাড়া অবস্থা সঙ্গীন।

জগন্নাথ চক্র

একটি কবিতা

কোনো এক অনার্য দ্বীপের রৌদ্রবিস্তারিত
তীক্ষ্ণ বালুকণা শীতল অরণ্য এবং
বড়ো বড়ো পাতাআঁকা ছায়াময়

ঊর্দ্ধ অনাবৃত নারীর বর্তুল গহ্বরে
একটি বর্বরপুত্র আজীবন মোরগ লড়াই
নির্দ্বিধায় খেলে যাবে হেসে খেলে
ভুঁড়ি মেরে হাতে উল্‌কি এঁকে লাল সাপ
নীল নাম পাখি ইত্যাদির অনবসাদ
আহ্লাদে

আমরা ভাই পারিসের
নাগরিক হয়েও এখন অঘ্রাত
বাতাসে ভাসা বসন্তমঞ্জরী।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

মুখোশ

আরো কিছুকাল এমনি করেই কাটানো যাবে
শস্য ক্ষেতের স্তব্ধ দুপুরে খবরদারি
সোপন খড়ের বিছানা একটু যত্নে ঢেকে
এমনি করেই আরো কিছুকাল কাটানো যাবে।
সামনে থাকবে নয়নাভিরাম দৃশ্য অনেক
পুঞ্জ পুঞ্জ কুমড়ো ফুলের হিরণ দ্যুতি
আরেশী কুকুর, গোলা পায়রার সবাক ছবি
অস্ত রৌদ্রে ভাসবে বিশাল প্রতিকৃতি।
কাঁপবে শ্যামল গৌরবে দূরে রাত্রিবেলা
পরিতাপহীন জ্যোৎস্না গড়াবে মুখোশ বেয়ে
অন্ধ পাখির শীৎকারে স্রোত রুদ্ধ হলে
সহসা হয়তো গহ্বর কিছু গভীর হবে।
খড়ের গোধূলি কখনো একটু কঠোর হলে
স্থির থাকা যাবে রুদ্ধ টানে নির্মোহ চোখে
বেঠিক হাওয়ার টুঁটিটা একটু সামলে রেখো
এমনি করেই আরো কিছুকাল কাটানো যাবে।

সন্তোষ চক্রবর্তী

রতন ঘোষালের মৃত্যু

রতন ঘোষাল, মারা যাওয়ার পর জানতে পারে না। গাছে
বাতাস উঠেছে কি না, আকাশে সূর্য উঠেছে কি না, নদীতে ঢেউ
উঠেছে কি না। গাছ, আকাশ, নদী,—বাতাস, সূর্য,
ঢেউ,—এরাও কেউ জানে না। রতন ঘোষাল মারা গেছে কি না।
অথচ, রতন ঘোষাল নাকি মারা গেছে। প্রমাণ। মেডিক্যাল কলেজের
বীণা তরফদার শপথ নিয়েছে, আজীবন অনূঢ়া থাকবে।.....
রতন ঘোষাল অবশ্য বলেছিলো, ঐদিন ঐ স্লেনেই সে পশ্চিম পাড়ি দেবে।
এবং বীণা তরফদার জানতো যে, তার মা-হওয়ার ক্ষমতা নেই॥

অরুণ মিত্র

অনামীকে একটি সনেট

প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অবশেষে ভ্রান্ত বর্তমান।
চতুর্দিকে অপ্রেমের নিষ্ঠুরতা প্রেতের হাসিতে
সমুজ্জ্বল অবয়বে। দ্বি-খণ্ডিত এ লাঞ্ছিত প্রাণ
এবং হৃদয় বুঝি জাগিবে না কখনো সঙ্গীতে।
লাঞ্ছিত সকল স্পৃহা কতকাল স্তব্ধ অসহায়
বাগানের ফুল্লদলে, আকাঙ্ক্ষিত নিবিড় পিপাসা
আপাততঃ রক্ত-হীন; তমোহীন শরৎ-জোৎস্নায়
বাথার্ত পৃথিবী হায় জাগিল না, বুকে ভালোবাসা॥
প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অবশেষে ভ্রান্ত-বর্তমান,
প্রেতিনীর নৃত্যোল্লাসে তাই বুঝি এ-পৃথিবী ভীত
অনাম্না সুন্দরী সব সর্বনাশী; এদের সমান
শাণিত ত্রিশূলে কেহ করিবে না কখনো খণ্ডিত।
সমগ্র বুকেতে ঘৃণা, চোখে বহ্নি, ঘাতকী হৃদয়
প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অপ্রেমের, পরম বিস্ময়।

আশিস গুপ্ত

বিবর্ণ খনির থেকে

তুমি বলেছিলে আলোকের কাছে যেতে এখন কিছু প্রয়োজন নেই
বিবর্ণ খনির থেকে
উদ্ধারণ প্রস্তরেরা দীর্ঘদূরে সূর্যরেখা ছুঁয়ে রাত্রির সাগরে স্থির আছে:
উন্মিলন পাখী, বিকেলের ছায়াগুলো আর আগমন বিচ্ছুরণ সেখানেতে
পৃথিবীর গতির সূত্রের মত ভীষণ নিয়মাধীন।
কিন্তু দ্যাখো এই পর্বতের যুগ্ম চূড়া বড় ঋজু, প্রগলভ অস্থির—
কেন এক কালিঘট ভেঙে আরও দীর্ঘ কালিস্রোত
নিরন্তর উত্তরণে সমুদ্রের নিবাদ জাহাজ।
তবে তার ঝরনা কি করে নিশ্চুপ থাকে বলো
অনেক সময় ধরে জেগে আছে সে যে।
জামনাটি, দুধিকাঠি ঠিক এক জায়গায় পড়ে;
কি করে নিশ্চিন্ত থাকে বলো এইবার টিলা, টিলার মাদল—
যতই আকাশ অন্ধকার আলোর ভেতর সংসেবত॥

সুনীল মুখোপাধ্যায় (১৯১১—১৯৬০)

সুনীলবাবু আমাদের মধ্যে আর ফিরে আসবেন না, এই নিষ্ঠুর সত্যটা আমরা এখনও মেনে নিতে পারিনি। মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। এই সংসারে প্রিয়জনের মৃত্যু এমন একটা ঘটনা যাকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে আমরা শিশুর মতোই অপারগ। মৃত্যুর কাছে আমরা শিশুর মতোই অসহায়। বিশেষতঃ অকালমৃত্যু যখন অতর্কিতে এসে আমাদের প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

সুনীলবাবুর অন্তরঙ্গ ছিলুম, এমন দাবি আমি করিনে; তাঁর অন্তরঙ্গ কে ছিলেন জানিনে; যাঁরা তাঁকে নিবিড়ভাবে চিনতেন, ভালবাসতেন তাঁদের মধ্যেও তাঁকে নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। বস্তুতঃ মৌল এক নিঃসঙ্গতাই, যাকে গ্যাসেট্ বলেছেন রাডিক্যাল সোলিট্যুড্, আধুনিক মনের নিত্যসহচর। যে-মন হতে ঈশ্বর নির্বাসিত; নিবিড় পরিবার-বন্ধন ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাতৃক্রোড় হতে যে-মন বেরিয়ে এসেছে, মুক্ত হতে চেয়েছে সামাজিকতার পর্দার।

সুনীলবাবুকে শেষ দেখলাম শ্মশানঘাটে; যে-ঘুম আর ভাঙবে না সেই ঘুমে তাঁর চির-জাগ্রত মন অচেতন। তবু, কী আশ্চর্য, মুখের সেই চির-পরিচিত বিষণ্ণ অথচ স্নিগ্ধ হাসিটি মিলিয়ে যায়নি—যে-হাসি দিয়ে গোপন করেছিলেন, গোপন করতে চেয়েছিলেন জীবনের সকল যন্ত্রণা, প্রজ্ঞার যন্ত্রণা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, সব স্বপ্ন, সব মোহ ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা; নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার অথচ নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার যন্ত্রণা; এক নির্বোধ, অনাত্মীয় অপরিচিত জগতে হৃদয় ও বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা,—আর এই সকল যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা।

যার ঈশ্বর নেই, প্রেমের ভিতর দিয়েও সাযুজ্য যে পায়নি, তার মুক্তি সৃষ্টিতে। অথচ শক্তির তুলনায় সৃষ্টি তাঁর স্বল্প—যথার্থ স্যোপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশে তিনি সার্থক হলেন না। তাঁর শক্তির প্রকাশ যে-ক্ষেত্রে সম্ভব ও বাঞ্ছিত ছিল, সে-ক্ষেত্রেও তিনি স্বল্পবাক্ হয়ে রইলেন চিরদিন। কেন এই বন্ধ্যাত্ব, জীবনের, প্রতিভার এই অপচয়? এ কী শ্রীমতী ওয়ার্ড Amiel সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাই—"sterility of genius?" এর কারণ কি খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর মনোবিশ্লেষণে অথবা যে-যুগে, যে-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন তার বিশ্লেষণে? এ প্রশ্নের জবাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী বিবাদ করুন, সুনীলবাবু আজ চিরদিনের মতো এ তর্কের বাইরে চলে গেছেন।

আর তাকে বিচার করার বিশ্লেষণ করার মতো ধৃষ্টতাও আমার নেই। আমি কি নিজেই সেই বিরল প্রজ্ঞার অধিকারী যা পেলে মানুষ নিজের ভিতরের সব অসঙ্গতি, বিরোধ ও সংশয়কে অতিক্রম করে জীবনকে দিতে পারে শিল্পের সুষমা? আর মৃত্যুর সামনে আমাদের প্রগল্‌ভ বুদ্ধিও বোবা। হয়তো অস্তিত্বের কেন্দ্রেই তিনি দেখেছিলেন মৃত্যুর মতোই এক জ্বালাবহ্‌নাতা যার মুখোমুখী হয়ে তিনি নীরব হয়ে গেলেন চির-জীবনের মতো? কেন না তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে, বুদ্ধির চাতুর্যে সাংসারিক সাফল্য জুটলেও জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সংসারী লোক যে কৃতিত্বের পূজারী সেই কৃতিত্বের দেবীকে উইলিয়ম জেমসের মতো "bitch-goddess" ছেনে তিনিও অবজ্ঞা বশতঃ তার পূজায় উদাসীন ছিলেন। তাঁর অন্বিষ্ট পরমার্থ ও তিনি পাননি; হয়তো সেই পরমার্থের অস্তিত্বেও তাঁর সংশয় ছিল। বস্তুতঃ এই চূড়ান্ত নাস্তিকের বক্তব্যই বড় মর্মান্তিক। যার বুদ্ধিবাদী মন সংসারের বাইরে কোনও ঈশ্বর বা ধ্রুবকে স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ, অথচ এই সংসারেও যে তার ঈশ্বর বা ধ্রুবকে খুঁজে পায়নি, সেই চির-নিঃসঙ্গ outsider কে হয় নীট্‌শের মতো পাগল হতে হয়, নয়তো আত্মঘাতী। সুনীলবাবুর মৃত্যু কি এক প্রলম্বিত আত্মহত্যার অবচেতন প্রয়াসে ছেদ টানল?

আপাত দৃষ্টিতে যাঁকে প্রশান্ত, সমাহিত মনে হত, ভিতরে ভিতরে কী অস্থিরতায় তিনি পীড়িত হতেন তা তাঁকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না। হয়তো সেই অস্থিরতা এক religious disquiet। স্টুয়ার্ট মিল যাকে বলেছেন 'divine discontent' এ disquiet তার থেকে আলাদা জাতের। ধর্মের মধ্যে মানুষ এতদিন জীবনের একটা সার্থক পরিণতির ঘোষণা পেয়েছে। বুদ্ধিবাদ ধর্মকে বাতিল করলেও কার্ল মেকার দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতকী মন থেকে Heavenly City-র কল্পনা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেগেল ও মার্ক্স ঐ অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ঈশ্বর ও স্বর্গকে নামিয়ে এনেছিলেন মাটিতে, ইতিহাসের বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে। হেগেলের ঈশ্বর যদি শীর্ষাসন ছিলেন তবে তার মাথা কেটে মার্ক্স দাঁড় করালেন এক কবন্ধ ঈশ্বরকে সর্বহারার একনায়কত্বে। তার উগ্র, বীভৎস চেহারা দেখে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনায় স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে চাইলেন beyond Marx। ঈশ্বরের বিকল্প এঁদের জানা ছিল বলেই হয়তো চূড়ান্ত নাস্তিকের আত্মঘাতী সংশয়ে এঁরা কখনো হননি, ব্যর্থ হননি।

আমাদের কালে আমরা বুঝেছি এই সব বিকল্প আসলে false gods. "When half-gods die, true God arrives, এমার্সনের এই আশ্বাস-বাণীতেও আমাদের আস্থা নেই, কেননা true God আমাদের কল্পনাতীত।

এবং কেন্দ্র যাই বলুন, মানুষের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে জেনেও সেই ব্যর্থতাকে, সিসিফসের মতো, মানবভাগ্য বলে মেনে নেওয়াতে সান্ত্বনা কদাচিৎ মেলে। সার্তর্ বলেছেন 'man is a futile passion'; ঐ futility বোধ জীবনে পরিব্যাপ্ত হলে হয়তো সকল passion-ই নিঃশেষিত হয়, এমন কি বেঁচে থাকার passion ও।

বস্তুতঃ নৈরাশ্যবাদের অন্ধকার যখন মানুষকে, মানুষের সভ্যতাকে একান্ত-ভাবে গ্রাস করতে বসেছে, তখন মানবেন্দ্রনাথের আশাবাদও কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিল: তেমন এক-এক হতাশ মুহূর্তে তিনি কল্পনা করতেন কিছু মানুষ সভ্যতার মূল্যবোধকে আশ্রয় করে ইতস্ততঃ দু-একটি আলোক-স্তম্ভ জ্বালিয়ে রাখবে, বাঁচিয়ে রাখবে সভ্যতার ঐতিহ্যকে, যেমন রেখেছিলেন মধ্যযুগের চার্চের আশ্রয়ে, ধর্মান্ধতার অন্তরালে কতিপয় মনীষী বর্বরদের হাত থেকে গ্রীক-রোমান-খৃস্টীয় সভ্যতার মহৎ উত্তরাধিকারকে। এরূপ প্রচেষ্টায় মানবেন্দ্রনাথ এ-দেশে যে আলোকস্তম্ভটি গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে যে কয়েকটি ক্ষীণ দীপশিখা তিনি জ্বালিয়ে গিয়েছেন, সুনীলবাবু তাদের অন্যতম। এক-একটি করে সেই দীপশিখাগুলি নিভছে: সেই আলো থেকে নতুন প্রদীপ জ্বলছে দেখলেও সান্ত্বনা পেতাম। আপাততঃ একটি উজ্জ্বল দীপশিখা নির্বাপিত হল, আর তার ধোঁয়ার আশে-পাশের অন্ধকার যেন আরও জমাট হয়ে আমাদের বুক ও মুখ চেপে ধরছে।

শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়

(সুনীল মুখোপাধ্যায় ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ লিখে অল্প সময়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর। সজ্জন ও সহৃদয় হিসেবে সবার প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্ববোধের কাছে সম্ভবত এগুলি সবই ম্লান। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের যে উন্নতশির মানুষটি একদা সমাজজীবনে আলোড়ন তুলেছিলেন, নায় ও সত্যবাদিতার জন্য জীবনপণ করেছিলেন সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সুনীল মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ। সম্ভবত সে বংশপরিচয় তিনি কোনদিনও ভোলেননি। মৃদু অথচ অনমনীয় চরিত্রের এই সরল মানুষটিকে যিনি দেখেছেন, যিনি সঙ্গ পেয়েছেন, তিনি কোনদিনই তাঁকে ভুলবেন না। যে-সামান্য কটি সাহিত্যপ্রবন্ধ তাঁর চিন্তাশীলতার নিদর্শন তার সবকটিই উত্তরসূরীতে প্রকাশিত। এছাড়া নিয়মিত তিনি The Radical Humanist-এ সম্পাদকীয় লিখেছেন, The Quest পত্রিকায় মাঝে মধ্যে লিখতেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন সচ্চরিত্র উদারহৃদয় ব্যক্তিকে হারাল, বন্ধুরা একজন ভালবাসবার, ভালবাসা পাবার বন্ধু থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হল।)

বি বে শী ক বি তা

একটি আধুনিক ভ্রমণী কবিতা

প্রথম কণ্ঠ

কি কথা আমার পাশে থেকে উঠে এল সহসা—
কোন রব ফুটে ওঠে অনুলা কণ্ঠে এক?
আমারে চাহি হানে বাক্য, যায় কি শোনা?
এ মার নাম ভাসে কি সে-নিঃশ্বাসে?

আমারে চাহি কণ্ঠে-এ আসে যে আমারি হতে
বন্ধ আমি আপনার চিত্ত বিক্ষেপের জালে—
কোন কণ্ঠ—দেবতার না অপরিচিতের—
এল আশ্রয়ের জন্যে আমার মৌনের ঘরে?

দ্বিতীয় কণ্ঠ

কোন নীড় তুমি বাঁধতে চাও আমার জন্যে
কালো কালিতে লেখা কেন, আগুণ জ্বলছে যখন!

তোমার ইসারায় মুখ ফিরিয়ে পিছনে হটেছি বহুকাল,
সকল কাঠিন্য থেকে তুমি আমায় নির্বাসিত করেছ—

চিরন্তন রাত্রি তবু আমাকে ধারণ করে রয়েছে
তোমার কাছে থেকে আমি ছুটে পালিয়েছি কালো ঘোড়ার চেপে—

তৃতীয় কণ্ঠ

তোমার কেশভার কিম্বা ফিনিক্স্-পাখীর ভস্মরাশি ঝেড়ে উঠিয়ে
তুমি কী নিদেশ করছ, সব বন্ধন খেয়ে গিয়েছে
মাকরাত্রি যখন প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে অনুশাসন সব

তোমার কালো ওষ্ঠাধরে কোন ইঙ্গিত ধরে রেখেছ,
কোন তুচ্ছ বাণী—সব যখন নির্বাক,
শেষ অনুলিপির কেন, অগ্নিকুণ্ড যখন স্তিমিত নির্বাণোন্মুখ?

তোমার মধ্যে পারব আমি বাস করতে, তোমার ভিতর থেকে।
আমি ছিনিয়ে ফেলে দেব সব আলো
সব দেহায়তন, সব বাঁধ, সব নিয়ম

তোমাকে ভুলে ধরব শূন্যের মধ্যে,
খুলে ধরব (বজ্রপাতের) বজ্রের সরণী
কিম্বা মানুষ কখন চেষ্টা করে নি এমন সমুচ্চকণ্ঠ।
এ রাত যদি রাত ছাড়া আর এক বস্তু হয়,
নবজন্ম নিয়ে এস তবে, হে সুন্দরের মঙ্গল-কণ্ঠ, জাগিয়ে তোল
একান্ত গুরুভার এই কর্মকে, বীজ যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে—
কথা বল: আমি ত এই পড়ে রয়েছি লিপ্সাময়ী ধরণী—
এই ত এল বাণী উষায়, বর্ষায়।
কথা বল না, আমিই ত ঊর্বরা ধরণী
বল কথা, দিন কেটেটি এখনো যদি থাকে ভূগর্ভলীন।

এ হল কবির বাগ্‌দেবীকে আবাহন—কিন্তু কবিপ্রেরণা নিয়ে কবির মধ্যে যে অনুপ্রেরণাকে আবাহন বা আহ্বান করা হয়েছে সে বলছে, 'আমাকে আবার কথা বলতে হুকুম দেওয়া কেন? আমি ত নীরব ছিলাম, বেশ ছিলাম।' আর একজন বললে, 'হাঁ ঠিক, অন্ধকারে, আরো অন্ধকারে, হাওয়া হয়ে চলতে চাই—চাই না স্থূল বাকোর মূঢ় দৃঢ়-আকার।' আরও এক কণ্ঠ বললে, 'অনুপ্রেরণাকে আমি নিয়ে যাব আরো দূরে—শূন্যের মধ্যে—বিদ্যুৎ-বজ্রের মধ্যে—অশনিকেতনের মধ্যে যেখানে মন্ত্রিত হয় মন্ত্র—যার কাজ শুধু কথা বলা নয়, পরন্তু নবসৃষ্টি, নবরূপায়ন, জড়বস্তুকে—কাদামাটিকে যে সবুজ জীবনে ফলিয়ে ফুটিয়ে তোলে।

ফরাসী থেকে
অনুবাদ। নলিনীকান্ত গুপ্ত

[* কবি হলেন Yves Bonnefoy—কবিতাটির নাম "Douve parle"—কবির প্রথম জীবনে আদর্শ ছিলেন Jouve নামে আর একজন আধুনিক ফরাসী কবি—সেই নামে অনুকরণে Douve নাম দিয়েছেন তাঁর অনুপ্রেরণাকে—
Poetry, July 1962 (Chicago-U. S. A.), পত্রিকায় প্রকাশিত।]

ফের্নান্দেজকে গার্সিয়া লরকা

কতো কঠিন

কতো কঠিন আমার মতন
এমন করে তোমায় ভালোবাসা!

তোমায় ভালোবেসেছি তাই, হাওয়া,
আমার হৃদয়, আমার
আপন মাথায় টুপি সবাই আমার আঘাত হানে।

কে কিনবে এই আমার থেকে
রেশমী ফিতে, কে কিনবে এই
সাদা রেশম কাপড়টুকুর
বেদনখানি রুমাল করবে বলে?

কতো কঠিন আমার মতন
এমন করে তোমায় ভালোবাসা!

অনুবাদ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পল ভালেরি

পরী

অদেখা অপরিচিত
বিলানো সুবাস আমি তাই
বেঁচে থাকি আর মরে যাই
বাতাসেই বিভাড়িত।

অদেখা অপরিচিত
প্রতিভা কিংবা দৈবঘটন?
হতে না হতেই বীজবপন
শুরু পুষ্পের নৃত্য।

নই পঠিত কি অধিগত।
ভ্রান্তি কি হয় লক্ষ্য
দ্রুত খ্যাতিরাও উচ্ছ্বাসে—

অদেখা অপরিচিত,
চকিত দেখার বক্ষ
ঘাগরা জামার অবকাশে!

অনুবাদ। সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

বরিস্ পাস্তেরনাক
সৃষ্টি প্রতিভার সত্তা

ঘাড়ের কাছে ছিন্ন পরিচিত সার্টটি নিয়ে
বীটোফেনের আবক্ষ মূর্তিটি যেন প্রসন্নিজত,
হাতের মধ্যে রেখেছে সে হাতের নীচে
গুপ্ত—নক্সাকারের মত কী নিহিত
বিবেক এবং স্বপ্ন, রাত্রি, ভালোবাসা,
এবং চতুরঙ্গ খেলার একটি বিশেষ কালো রাজা;
কী প্রচণ্ড দুঃখে জাগার জগদ্ঘাটকে
ধ্বংসফলের প্রস্তুতিতে, একটি সেনা অশ্বারোহী
পায়ের নীচে পিষ্ট করে এগিয়ে চলে
বস্তুজাত সাধারণী প্রত্যহকে।

তারারা সব তাদের তুষার-শীতল, চেনা,
ঝিলান করা ছাতের থেকে কী বিদ্রোহী
উঠছে জেগে, সুগন্ধী উদ্যানে তারা
দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—যেথায়,
নাইটিংগেল পাখীর মত আইসোল্ডের আঙুর শাখায়
"ত্রিস্তানের" কী জমাটবাঁধা দুঃখ চারণ।

বাগান, পুকুর, বাঁশের বেড়া, সৃষ্টিরা সব
বিশ্বভুবন,
চোখের জলের পবিত্রতা দিয়ে ঘেরা
ফেনায় ফেনায় পরিস্নাবী,
মাত্র কটি বিশেষ ধারার এই অনুভব
এই ভাবাবেগ আত্মগত মানব মনের
সঞ্চিত এ স্বপ্ন ধারা জীবনব্যাপী॥

অনুবাদ। নচিকেতা ভরদ্বাজ

উত্তরসূরী

হারমান হেস্‌-এর কবিতানুসরণে

প্রান্তর জুড়ে

মেঘের পর্দা আকাশ প্রমাণ,
সারা প্রান্তর জুড়ে বয়ে যায় হাওয়া,
আমার মায়ের হৃত সন্তান
প্রান্তরে তার একা একা আসা যাওয়া।

ঝড়ঝুটো পাতা সঙ্গে বয়ে যাও,
গাছে পাখি দের গানের আবেশ
পাহাড় পেরিয়ে ওপারে কোথাও
রয়েছে আমার সুদূর স্বদেশ।

এলিজাবেথ (১)

গল্পের সুর, গল্প শোনা ॥
রাত্রি গভীর, রাত্রির স্বপন—
সুন্দরী তুমি, এলিজাবেথ
তুমি কি আমায় মেবে যন্ত্রণা ?

তারই ওপর কবিতা আমার
তুমি তার সাথে, তুমি তার তুমি—
প্রেমের গল্প তোমার আমার
সন্ধ্যায় এই, আর শুধু তুমি।

নষ্ট কোরো না, ফেলো যাবা নয়,
মিল যাবে কোথা চকিতে ভেসে।
এখনি শুনবে ছন্দ-মিলন,
বুঝবে না তুমি উঠবে হেসে।

এলিজাবেথ (২)

সুদূরে শীর্ষে আকাশের গায়
খণ্ড শাদা মেঘের খেদ,
এত শাদা আর সুদূরে প্রভায়
সুন্দরী তুমি, এলিজাবেথ।

মেঘেরা যায়, ঘুরে বেড়ায়,
তুমি তা আদৌ লক্ষ কর না,
তবুও তোমার স্বপ্ন বিভায়
আঁধার রাত্রি ছড়ায় ছলনা।

মেঘ ভেসে যায় নুলো নিঃস্বনে,
ভুলবে এবার বিরামরীতি
শাদা মেঘ দেখে উঁকি মারে মনে
মিষ্টি তোমার স্বদেশপ্রীতি।

গভীর রাত্রির পথে

গভীর রাত্রির পথে দর্পণের আলো
ছড়ায় পথের বাতি সোঁদা ফুটপাথে—
রাত্রির অন্তিমক্ষণে হতাশা ছড়ায়
দুঃখে শোক পাপ জেগে থাকে তার সাথে।

জেগে আছ যারা সব রাত্রির প্রহর
শোক দুঃখে তোমাদের, আত্মীয় আমার,
উচ্চরোল হাসি শব্দে ভরেছ প্রহর
রক্তের বন্ধনে আজ করি নমস্কার।

সময়

তখনও সময় ছিল। যাওয়া যেত সেখানে অক্লেশে
সব কিছু উন্মোচিত হত সব বাধা অবশেষে
পরিস্রুত পরিস্রুত হয়ে থাকত হয়ত উজ্জ্বল
হারান দিনের সেই ক্ষণ স্বপ্ন স্মৃতি অবিকল।

পরিণাম এই ছিল। বিশুষ্ক সময় এল ধীরে
ব্যাপ্তিহীন ক্ষণধারী। নিয়ে গেল তখন অচিরে
অপরিবর্তন তার পদক্ষেপে চকিত আশ্লেষে
উচ্ছল যৌবন প্রভা রিক্ত করে নিষ্ঠুর নিঃশেষে।

ফুল, গাছ, পাখি

শুনো আজ একাকী তুমি,
সঙ্গীহীন মন, জ্বলো না,
প্রণতি রাখ গভীর মূলে
গাঢ় ফুলের যন্ত্রণা।

অনেক উঁচু গাছ
কষ্টে তার গ্রন্থি ছড়ায়,
চিরকালীন পাখি
সেই শাখায় গান গায়।

ফুল যন্ত্রণা মৌন, নীরব
পায় না খুঁজে কথার ভাষা,
বেড়ে ওঠে গাছ আকাশ ছাড়িয়ে
পাখি গান গায় অনন্তকাল।

মূল জর্মন থেকে অনুবাদ।

অমিত বসু

[Hermann Hesse :

জন্ম ঃ ২-৭-১৮৭৭, জর্মনী।
১৯২৩ সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ।
১৯৪৬ নোবেল প্রাইজ।
আলফ, ১৯৬২ মৃত্যু, সুইজারল্যান্ডে নিজ বাসভবনে।
একাধিকবার ভারত ভ্রমণ। প্রথম ভারত যাত্রা। ১৯১১।
একনিষ্ঠ ভবঘুরে-অন্বেষী।]

জীবনশিল্পী

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জীবনশিল্পী শব্দটি অন্নদাশঙ্করের উপহার। এমন মিতাক্ষর অথচ পর্যাপ্ত ভাষা খুব কমই দেখেছি। এই ভাষা শুধু উদ্দিষ্ট মহাপুরুষকেই সম্মানিত করে না, ভাষাকারের চরিত্রমানসকেও সূচিহ্নিত করে। অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের স্বল্পসংখ্যক সন্দীপ্ত উপাসকদের মধ্যে একজন। অধীত চিন্তা ও অনুভূত মনন তাঁর প্রতিটি উক্তিতে সমাহৃত বলে এরকম ধারণা সঙ্গত যে আলোচ্য লেখক বাংলাদেশের এই মতিচ্ছন্ন সময়ের ঈর্ষণীয় অনাতঙ্ক সুস্থির পুরুষ। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাই তাঁর প্রত্যেকটি উচ্চারণ অন্তত ধ্রুবতার প্রতিভাসে দীপ্যমান।

প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও অন্নদাশঙ্কর নিজেকে কোথাও পাঠকের চৈতন্যে আরোপ করেন না। প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌রীতি প্রভুসম্মিত, অন্নদাশঙ্কর প্রেমিকের স্বরে কথা বলেন। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী যেখানে প্রখর প্রাতিস্বিকতার কুসংস্কারে নিমজ্জিত, ভাষ্যকার অন্নদাশঙ্কর বস্তুচেতন ভারসাম্যে নির্মোহ। একটি উদাহরণ হাতের কাছেই পাচ্ছি :

> দুনিয়াটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হলো। একভাগে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, নীতি, সমাজ। অন্যভাগে আধিভৌতিকতা, বিজ্ঞান, কূটনীতি, রাষ্ট্র.....এই ধরনের খ্রীসিস ও অ্যান্টিথীসিস খাড়া করে একদল বললেন "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন কোনোদিন হবে না।" অন্যেরকল বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। মিলন ঘটতেই হবে.....থীসিসটা ছিল ভুল। অ্যান্টিথীসিসটাও।
>
> (রবীন্দ্রনাথ, পৃ৬৩-৬৪)

ঠিক যে কিপলিঙের স্তোকে তা নয়—তবে বীরবল প্রাচী ও প্রতীচীর পরস্পরনিরপেক্ষতা তাঁর 'আমরা ও তোমরা' নামক নিবন্ধে যেরকম ক্ষিপ্রতম ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন, মনে হওয়া স্বাভাবিক প্রগতির ঐ পুরোহিতের মধ্যে কোথাও যেন প্রতিক্রিয়াপ্রবণতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ঐ স্যাটায়ারসম্বর সন্দর্ভটিকে অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছি না, কিন্তু বিরোধাভাস-খচিত এমন কোনো-কোনো উক্তি সেই সন্দর্ভে রয়ে গেছে যা থেকে মনে হতে পারে বীরবল পূর্ব-পশ্চিমের অদ্বৈতমৈত্রীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। পক্ষান্তরে, আধুনিকদের মধ্যে আত্মস্থ মানুষ অন্নদাশঙ্কর দানপ্রতিদানে আস্থাবান :

রবীন্দ্রনাথ—অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

> রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে এটা আধখানা সত্য। বাকি আধখানা সত্য হচ্ছে পশ্চিমের উপরেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু নিয়েছিলেন বলেই তিনি কিছু দেওয়াতে পেরেছিলেন। নইলে ইউরোপ কি আর কারো হাত থেকে কিছু নেয়? সম্বন্ধ না ঘটুক, বিনিময় ঘটেছে। "দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে" কবির এই মন্ত্র অমোঘ (পৃ.৮১)।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর এই আস্থা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, প্রমাণ করেছেন। "রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ" নামক অমূল্য প্রবন্ধে সেই প্রমাণ বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর ভরসার কথা, অন্নদাশঙ্কর বাহির থেকে পাথুরে প্রমাণ প্রক্ষেপ করেন না, শিল্পসংস্কৃতির নিভৃত সদনগুলিতে আমাদের নিয়ে গিয়ে পরম প্রমাণের সম্মুখীন করেন। এবং সুখের বিষয়, রেনেসাঁস বলতে তিনি তার চিরায়ত তাৎপর্যটিই বুঝেছেন। এই মহতী জাগৃতী কোনো উদ্ভেল যুথচারিতা নয়, সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম বা Rinascimento—পৌত্রের ভিতরে পিতামহের পুনর্জন্ম। অন্নদাশঙ্কর সেই নবজন্মকে একটি সীমায়িত তথ্য বলে অভিহিত করেন না; পরন্তু তাঁর ধারণা,

> রেনেসাঁসের পালা এখনও সাঙ্গ হয়নি। ভারতের মৈত্রীসাধনার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ এবং গৌরবময় তার থেকে মনে হয়েছিল ভারতই এর জন্মদাত্রী হবে। এখন আমি অতটা নিশ্চিত নই। কিন্তু মনের কোণে কিসের আশা যে দেড় হাজার বছরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে ভারতই হবে মানবমৈত্রীর জন্মদাত্রী। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে দুর্বলতা অতিক্রমে কাটিয়ে ওঠা যায়। মানুষের অসাধ্য কী আছে? (পৃ.১০৬)

অন্নদাশঙ্করের অভিসন্ধিকে যদি ভুল না বুঝে থাকি, সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির একটি নাম রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিগত স্তরে ঐ মৈত্রেয়ী মমতার চূড়া তিনি স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু সমকালীন পটভূমির আপাত মানুষ তাঁর দুর্ভৈবলক্ষে বুঝতে পারেনি। সমকালভূমির অনাশ্রিত মানসিকতাকে অন্নদাশঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করেছেন। সেই ভবিষ্যতের একক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন। তবে কি টলস্টয় বা রবীন্দ্রনাথের মতো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা ইতিহাসকে আপাত-লক্ষ্য পরিণামী রূপ অর্পণ করেন? অন্নদাশঙ্কর সেই শিল্পলভ্য আস্বাদের শরিক নন্। বহিরঙ্গ প্রতিবেশ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেলিত ভাবিকথনের কিছুই নেই। তিনি শুধু ব্যক্তির স্বাধিকারের প্রতি তাঁর অনন্য প্রত্যয় অভিব্যক্ত করেছেন। অথবা, কথাটা অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তি বলতে তিনি শিল্পীকেই বুঝেছেন। এবং ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সমীভবনেই সেই শিল্পীর পূর্ণ-প্রয়াস। তাই অন্নদাশঙ্কর যখন বলেছেন, 'সমগ্রভাবে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ

কতকটা Universal, বাকিটা Oriental' (পৃ১৪০), তখন Oriental শব্দটিকে নিশ্চয় হেগেলিয় অর্থে ব্যবহার করেন নি, কেননা, আদিম শিল্পকর্মে উপাদানের নৈরাশ্যকেই হেগেল Oriental' বলে অভিধায়িত করেছিলেন। তাবলে অন্নদাশঙ্কর ঐ শব্দটি নিতান্ত প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন সেকথা মনে করারও কারণ নেই। হেগেল যদি আদিম অসামঞ্জস্যকে Oriental মনে করেন, অন্নদাশঙ্কর মনে করেছেন উত্তরকালের সুসমঞ্জস মনোভঙ্গীটিকে। অথচ ঐ অন্তঃ সামঞ্জস্যগুণ স্বভাবের মৌল অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাত এড়িয়ে গিয়ে নয়, স্বীকরণ করে। টলস্টয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই মূলসূত্রটির দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন

> টলস্টয় এত মহান ও বিস্ময়কর যে তাঁর সম্পর্কে কোনোকিছু বা কিছু জানা থেকে সমস্তই তাৎপর্যপূর্ণ। হলোই বা কলঙ্কের.....মহামানবের মধ্যে যদি নরাধমের থেকে থাকে সেটাও জানা দরকার। নরাধমের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম না করে মহামানব হওয়া যায় না, টলস্টয়ের জীবনে এটা সত্য হয়ে থাকলে অন্যান্য মহামানবের বেলাতেও হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং খোলা মন নিয়ে গবেষণা করতে হবে। শতবার্ষিকীর পরেও তো শতশত বর্ষ আছে।

অর্থাৎ তিনিই অন্নদাশঙ্করোক্ত Oriental যিনি Occidentকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছেন। ভবিষ্যতের মুক্তি, সুতরাং য়ুরোপীয়তা কিম্বা "ভারতীয়তায়" নয়, ওরিয়েন্টাল নিরাবৃত্তিতে। তাহলে, ওরিয়েন্টালেরই প্রতিশব্দই কি জীবনশিল্পী?

অন্নদাশঙ্করের চূড়ান্ত প্রতীতি এই জীবনশিল্পে। শুধু তাঁর প্রবন্ধগুলিতেই নয়, সন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে তাঁর এই সামগ্রিক উন্মোচনের আগ্রহ ব্যক্ত হয়ে রয়েছে। যখন জীবন তথা প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সহজাত বিচ্ছেদটিকেই সদর্থক সামর্থ্য বলে চতুর্দিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে তখন অন্নদাশঙ্করের অভিমুখিতা পবিত্র এক স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টান্ত। অন্তরের অন্তস্থল থেকে গোটা মানুষটির উদ্ঘাটন এবং তাঁর আত্মস্থ ধারাভাষণ তাঁর এই প্রবন্ধ ও চিঠিগুলিতে উৎসারিত হয়েছে। প্রবন্ধের নির্মম সূর্মিতি মেনে নিয়েও অধিকাংশ রচনা যেন সাংবাদিকতা-বর্জিত খোলা চিঠির মতো—প্রত্যক্ষ, অথচ ঐচ্ছারোতিক। পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েই বলছি, এক্ষেত্রে তাঁর প্রেমিকের আপিশকাটাই—অন্তরঙ্গ অথচ অনাবেগ—পাঠককে জয় করে। যেন স্বভাবত অভিজাত প্রৌঢ় প্রেমিক তাঁর জন্মদিনে বিশ্বের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত প্রেমের চিঠিগুলি সর্বসাধারণকে দেখতে দিয়েছেন, যেন চিঠিগুলির গন্ধচন্দন ঘরে ফিরে যাওয়ার পরেও আমাদের স্মৃতিভাজনে জাগ্রত হতে থাকবে। সেই প্রেমিকের মান-অভিমান, সমর্পণ ও প্রতিবাদের অপরূপ অন্তরসাক্ষ্য এই গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে।

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা। সম্পাদনা—অরুণী সান্যাল। অপালক্তা—সুবোধ্য পত্রী। নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-২০।

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উজ্জ্বল কভারযুক্ত সুদৃশ্য বাইন্ডিংয়ের আবরণে সুসজ্জিত এই সংকলনগ্রন্থটির সঙ্গে ১৯৬০ সালে মুদ্রণ ও অঙ্কিতের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের বরমাল্য আরোপিত হয়েছে। এই সংবাদ প্রকাশকের কাছে যেমন উৎসাহপূর্ণ, পাঠকের কাছে তেমনি তৃপ্তিকর। এই সংকলনটি, পূর্ববর্তী সংস্করণের দোষ-ত্রুটি কাটিয়ে, আরও কিছু প্রবীণ ও নবীন কবির অনুবাদের সমাবেশে সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নানা দেশের নানা মানুষের মধ্যে জাতিগত ও কালগতভাবে একটা বিরাট ব্যবধান থাকতে পারে। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে সমস্ত মানুষই এক। তাদের হাসির মধ্য দিয়ে যেমন আনন্দের প্রকাশ, দুঃখের মধ্য দিয়ে বেদনার তেমনি হৃদয়াকুতির তীব্র আবেগ প্রকাশিত হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে। হৃদয়বৃত্তির এই মৌলিকভাব নিখিল মানবের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে এক যুগ থেকে অন্যেক যুগ, কাল থেকে কালান্তরে যুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভেসে বেড়ায়। এই প্রেমের আবেগে মানুষ নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে—ব্যক্তিত্বের প্রসার-তার সঙ্গে কর্মে বিশ্বাস এনেছে, জীবনে আনন্দের সঙ্গে উৎসাহ পেয়েছে। তাই সমাজ যখন চরম বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত, অনিকেত আবহাওয়ার সেই দুর্দি-কড়ে দয়িত-দয়িতা পরস্পরকে আকর্ষণ করেছে। দৈহিক প্রেমের মধ্যেই আবার দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন 'দুঁহু-কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া';—কামের মধ্যেই প্রেমের শেষ নয় তাকে অতিক্রম করেই তার চিরন্তন গতির প্রবাহ। প্রেমের মূলে কাম, কিন্তু কাম তো প্রেম নয়। অথচ সংকলনে গৃহীত অনুবাদগুলিতে দেহাতীত প্রেমের অলৌকিক আবেদন—যা একটি সঙ্গীতের মত সুরের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মুখরিত হয়ে ওঠেনি।

প্রেমের কবিতা বলতে নর-নারীর হৃদয়ের আদি আকর্ষণই বুঝায়; কিন্তু বাংলায় 'প্রেম' শব্দটি খুব শিথিলভাবেও আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরপ্রেম ও মানবীয় প্রেমের পার্থক্য সব সময় ধরা পড়ে না। করুণ আবেগের গভীরতায় দুই-ই নিবিড়, আবেদনের তীব্রতায় দুই-ই প্রখর। তাই বৈষ্ণব কবিতায় এই জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈষ্ণবের পরকীয়াবাদ শৃঙ্গার রসের সৃষ্টিতে যে বিচিত্ররূপ ধারণ করে তাতে রাধা ও কৃষ্ণ এক এবং কবিতার আবেদনে প্রেয়সীকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরকে প্রেয়সী আহ্বানে কোন ভুল হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা। তুলসীদাসও

প্রেয়সীকে নিবেদিত আবেগেই দেবতাকে অঞ্জলি দিয়েছেন। আবার গ্রীক পুরুষ পুরুষের প্রতি হৃদয়াকুতি জানাচ্ছে।

সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন : 'খাঁটি লিরিক কবিতা ছাড়া অন্য কোন ধরনের কবিতা নির্বাচন করা হয়নি'। এই অর্থে বুঝি মহাকাব্যজাতীয় বা কাহিনী-মূলক প্রেমের কবিতার স্থান এখানে নেই। কারণ লিরিক কবিমনের ধ্যানস্থ-উচ্ছ্বাসে রচিত—বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্য অচেতন অনুভূতির দ্বারে আঘাত করে কবিচিত্ত সঙ্গীত ও ছন্দে যখন নেচে ওঠে তখনই জন্ম হয় লিরিক কবিতার। তাই প্রথম প্রেমের কবিতা রচিত হয় লিরিকেই। এর ভাব সহজ সরল, নিটোল এর শরীর, সাবলীল এর প্রাণ। এই সংকলনে এমনি অসংখ্য লিরিক কবিতার অনুবাদ হয়েছে, যা পড়ে পাঠক কবিচিত্তের স্বচ্ছ তলদেশ ছুঁতে পারেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি এমন কিছু কবিতা অনুবাদ করা হয়েছে যাদের 'লিরিক' বলা চলে কিনা তর্কসাপেক্ষ।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীনতম সাহিত্যের—যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মিশরীয়, হিব্রু, চীনা, গ্রীক, লাতিন, আরবী, জাপানী ও ফরাসী—এই কটি ভাষার খৃঃ পূঃ ষোলো থেকে সতেরো খৃঃ পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন হাজার বছরের প্রেমের কবিতা অনূদিত হয়েছে। প্রাচীন ও নবীন কবিদের মহার্ঘ সমাবেশে এই অনুবাদ সংকলনটি সমৃদ্ধ। অনুবাদকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম যেমন আছেন, তেমনি আধুনিক কবি-দের মধ্যে আছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বাণী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ সান্যাল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, চিত্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিবৃন্দ। প্রাচীন ও নবীন কবিদের এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত সমাবেশে সংকলনটির ঐতিহাসিক মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক সেই মত অনুবাদের মানের মাত্রা উঠতে পারেনি। কারণ এই রকম সংকলনে অনুবাদ ব্যাপারে কোন বিশেষ রীতির ব্যবহার মোটেই সম্ভব নয়। ফলে অনেক কবিতার অনুবাদ নেহাৎ শব-ব্যবচ্ছেদের মত। অনুবাদে বাহুল্য প্রয়োজন, কিন্তু তা কবিতার তলে তলে ফল্গুস্রোতের মত প্রবাহিত হবে, কবিকে আশ্রয় করে অনুবাদকের অনুভূতি সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। নিজে অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, অপরের অনুভূতিযোগ্য ব্যঞ্জনার সমাবেশেই অনুবাদ কবিতা সার্থক। মূলকবির রক্তাক্ত আবেগ যদি ভাষান্তরিত হয়েও শিল্প-সমৃদ্ধ হয়, তবেই তা পাঠকের অনুভবগম্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনেক কবিতার অনুবাদ অনুবাদকের পাণ্ডিত্যের প্রকাশ মাত্র; উদাহরণস্বরূপ বাণী রায়ের 'গ্রীক কবিতার অনুবাদে চাতকের দল' (পৃঃ ১৭৭) নাম করা যেতে

পারে। কবিতার সার্থক অনুবাদ মহৎ হয়, অনেক সময় মূলকে ছাড়িয়ে এক নবতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, বারবার পড়ে বিস্মিত হতে হয়। লেখকের কবিতা যখন প্রাচীন তখন সমকালীনের দুরূহ কণ্ঠে তাকে তুলে দিতে হলে অনুবাদ করা ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র অনুবাদই প্রাচীন কবিকে সমকালীনের কোঠায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে। অনুবাদকের কাজটা তাই অত্যন্ত কঠিন। আর অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্রয়োচনায় আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা নিষ্ফল ও দুর্ভেদ্যায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে যুগে তা বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' নাম দিয়েছি এবং আমাদের দিনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা হারিয়ে যায় না।' (বুদ্ধদেব বসু)। সম্পাদক অবন্তী সান্যাল বহু যুগের ওপার থেকে পৃথিবীর কয়েকটি ক্লাসিক সাহিত্যের কবিতার অনুবাদ উপস্থিত করে অসংখ্য বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বর্তমান সংকলনটির সমালোচনার জন্য মূল ভাষার কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কিন্তু না থাকলেও কবিতাগুলোকে এক একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কবিতা হিসেবে পড়ে তার রসোপলব্ধিতে কোন অসুবিধা হয় না। এবং আমরা এই দিক থেকেই সংকলনটির বিচার করব।

সংকলন প্রসঙ্গে অনুবাদক বলেছেন যে, 'প্রাচীন সাহিত্য বলতে আমরা খাঁটী ক্লাসিকাল সাহিত্যই বোঝাতে চেয়েছি' (পৃঃ ২৭)। সেহেতু রুবাদুরের corteria-গাথা, ইংরাজী সাহিত্যের লিরিক, বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী এই প্রেমের কবিতার সংকলনে স্থান পায়নি। কিন্তু আদি কবির 'রামায়ণ'কে আমরা নিশ্চয়ই ক্লাসিক আখ্যা দিতে পরাঙ্মুখ হবো না। অথচ সম্পাদক এর থেকে কিছু অনুবাদ করবার চেষ্টা করেননি। অপহৃতা সীতার জন্যে রামের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের সকরুণ আর্তি রামায়ণের তীব্রতম মুহূর্ত এবং প্রেমের কবিতা হিসেবে এই অংশটি মর্মান্তিক। প্রেমের কবিতার সংকলনে মহাকবিকে স্থান না দেওয়ার কবির প্রতি শুধু অবিচার করা হয়নি, সংকলনে শূন্যতাও থেকে গেছে।

তবে দ্বিতীয় সংস্করণে ভবভূতি থেকে 'সীতা' নামে যে অংশটির অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, প্রেমের কবিতা হিসেবে তা অনবদ্য;—যেমন,

দুটি বাহু তব কণ্ঠে আমার
এলায়িত দুটি মুক্তা-মালা,
শ্রোণীতটী, তোমার আর সবই স্থির,
অনহ কেবল বিরহ জ্বালা।

ভারতীয় অর্থে 'মেঘদূত' অনুবাদে কিছু দুর্বলতা পাঠকের অনুভূতিকে ভীষণভাবে পীড়িত করে। বাংলার মেঘদূত অনুবাদের এক বিরাট ঐতিহ্য বর্তমান। উনিশ শতকের মাঝামাঝি secular সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি যাবার সময় থেকেই মেঘদূতের অনুবাদ সুরু। ১৮৫৮ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত অনুবাদের ৩০ বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আরেকটি অনুবাদ করেন। কিন্তু এঁদের অনুবাদ গতানুগতিক পয়ার, ত্রিপদী লাচাড় এবং অক্ষরমাত্রিক ছন্দে। গতানুগতিকতা এড়িয়ে বাংলা মাত্রাবৃত্তে মেঘদূতকে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু যক্ষের নিবেদনে ৮টা স্তবক অনুবাদেই তাঁর অনুভূতি ক্লান্ত এবং কান নৈতিক পড়েছিল। স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র ঘোষ আশ্চর্যভাবে মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলার অনুবাদে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতকে অনুবাদ করার চেষ্টা না করে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতা ও প্রবন্ধে এর রস ও আনন্দকে ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, সংস্কৃতের ধ্বনিমাত্রাকে বাংলা ভাষার 'কোমলকান্তপদাবলী'তে প্রকাশ করা অসম্ভব। সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করে মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি বাংলায় অনুবাদ করে কাব্যটির অনুবাদের অবাস্তবতার কারণ দেখিয়েছিলেন; যেমন—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর আশ্রমে যাহারে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপ-রাজি স্নিগ্ধ ছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিল ধারা

এর পরেই বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূত' অনুবাদ আমাদের এক গভীর অভাব পূরণ করেছে। এইরকম একটা প্রতিষ্ঠিত অনুবাদকে বাদ দিয়ে সম্পাদক মহাশয় আবার কেন মেঘদূতের গতানুগতিক অক্ষরবৃত্তের আট মাত্রিক পয়ারকে গ্রহণ করলেন বুঝতে পারি না! উত্তরমেঘে ৮৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রদেয় শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয় অনুবাদ করেছেন—

তন্বী শ্যামা বিম্বধারা শিখরিদশনা
ক্ষীণকটি নিম্ননাভি উচ্চকিত হরিণী নয়না
স্তনভারানম্রতনু শ্রোণীভরে মন্থর চরণা
বিধাতার আদিশিল্প—নিরুপমা রমণী রচনা!
হেন নারী যদি সেথা থাকে,
আমার দ্বিতীয় সত্তা বলি, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে॥
(পৃঃ ৫০)

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তার যে মূলসম্পদ—ধ্বনিসঙ্গীত এখানে কিছুমাত্র আসেনি। শ্লোকটি পাঠের সঙ্গে পাঠকের অনুভূতি সাড়া দেয় না, সন্ধি ও শব্দের বন্ধে তা বন্দী হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ভাবধ্বনিময় অনুবাদ-টির সঙ্গে মন্দাক্রান্তার রেশটা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে—

তন্বী, শ্যামা আর সুক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীণমধ্যা,
জঘনগুরু বলে মন্দ ধীরে চলে, চকিত হরিণীর দৃষ্টি
অধরে রক্তিমা পক্ক বিম্বের, মৃণাল স্তনভারে ঈষৎ-নতা,
সেথায় আছে সে-ই, বিশ্বস্রষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের কবিতার ধারার পথিকৃৎ অমরু। কিন্তু তাঁর কবিতার অনুবাদের কৃত্রিমতাটুকু অনুবাদক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি; ফলে আশ্চর্যরকম অনুবাদ হয়েছে, যেমন—

আমার মুখ-সুরভি আঘ্রাণে
চকিতে স্থিরতম
রভসভরে ধরিল, সখি, কবরীখানি মম!
আমি কি করিলাম?
অধরে মোর অধর তার চাপিয়া ধরিলাম।

সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে মানভঞ্জন অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এই অনুবাদ প্রত্যেক পাঠককে সন্তুষ্ট করবে; ভাষান্তরিত হয়েও জয়দেবের ছন্দমাধুর্য নষ্ট হয়নি। একটি নমুনা দিই—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ (স্থিরে)॥ ৩

পদের আবৃত্তিতে ছন্দের যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, অনুবাদক বিজয়চন্দ্র মজুমদার আশ্চর্য চাতুর্যের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন—

অঙ্গের মম ভূষণ তুমি,
জীবন তুমি আমারই,
ভব-জলধি মাঝারে নিধি রত্ন;
রাখে সো! নিতি লভিতে প্রীতি
ভুবন মাঝে তোমার-ই,
হৃদয় ভরি যত্ন। ৩

ঋগ্বেদের 'পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ' অনুবাদটি একটি সুন্দর রসোত্তীর্ণ কবিতার রূপ নিয়েছে। কিন্তু কবিতাবলীর অনুবাদকের নাম না জানতে পারায় আক্ষেপ হয়।

মিসরীয় অংশে অতি সুন্দর অনুবাদ করেছেন অবন্তী সান্যাল এবং মণালাচরণ চট্টোপাধ্যায়; এতে কবি ও অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছটি অনুবাদ অংশটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

হিব্রু কবিতা সম্পর্কে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন; 'হিব্রু সাহিত্যের প্রেমের কবিতার দৈন্য কোনোকাল ঘোচেনি।' কিন্তু কবি সুরেশচন্দ্র সরকারের 'সলোমনের পদাবলী' আশ্চর্য সুন্দর একটি প্রেমের কবিতা। অনুবাদক অনুবাদে 'বর', 'বধূ', 'সখিগনীদল'-র পরিকল্পনাগুলো অভিনবভাবে সৃষ্টি করলেও পাঠকের বোধের সঙ্গে তা সুন্দরভাবে মিলিয়ে গেছে। 'বরের' কাছে চরম সমর্পণের ক্লান্তিহীন আনন্দ বধূর এই কথাগুলিতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—

আমায় তোমার বাহুর, তোমার বুকের
মোহর করে রাখো।
প্রেম-যে মৃত্যুর মতই শক্তিমান,
কবরের মতোই নিষ্করুণ তার ঈর্ষা,
তার জ্বলায়ে যে-আগুন আছে
লেলিহ তার শিখা।
শত জলধারায় নেভে না প্রেম;
শত প্লাবনেও ডোবে না প্রেম
প্রেমের দামে যে তার সর্বস্ব খোয়াতে বসে
কে তাকে দুষবে।

'চীনা' কবিতার অনুবাদ অংশটিই এই সংকলনের উজ্জ্বলতম সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি বধূর কথা' চীনা-অংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের 'সুন্দরীর প্রতি' কবিতাটি পাঠকদের অত্যন্ত তৃপ্তি দেবে। কবিতা পাঠ দেবে কিছু উজ্জ্বল পংক্তি পাঠকের স্মৃতির সঙ্গী হয়ে থাকে; যেমন—

আমি তবে হয়ে যাবো তোমার একান্ত
ছায়া, পিছনে পিছনে ফিরবো সমস্ত সময় ধরে
তুমি যেখানে যাবে, কিংবা এলে
তোমার আড়ালে রইবো।

এইরকম সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবের প্রেমের কবিতাগুলো পাঠককে মুগ্ধ করে। চীনদের কাছে বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে কামবোধের কোন বিরোধ নেই; তাই নারীর দেহে সাম্রাজ্য বিস্তারে তাদের কল্পনা অকপট। প্রেমের আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি গভীর কিন্তু ক্লাসিকের স্থৈর্যে তা আনন্দময় ও অপরূপ হয়ে উঠেছে। কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বা জীবনরহস্যের লীলা-খেলা এখানে নেই। প্রাত্যহিক জীবনের চেনাজানা ঘটনার দৃশ্য, দেহ-মন, কাম ও প্রেমের চিরন্তন আবেদনই তাদের কবিতায় মুখ্য স্থান লাভ করেছে। চীনা কবিতায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রবাসী স্বামীর প্রতি দয়িতার বেদনাবিধুর আকুতি; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দূরের মানুষকে' থেকে তা পাওয়া যাবে—

ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছি তবু
এক মুহূর্ত ভুলতে পারি না তাকে
ঘর ছেড়ে আমি দেখেছি রাস্তা নেই,
জানি না কিভাবে কোথায় আছে সে থাকে।

এইঅংশে বিরু সে প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের মাঝে অন্য একজন কবির একটি দুর্বল অনুবাদ চোখে পড়ল। কবিতাটির মার্জনা আবশ্যক। চীনা কবিতার অনুবাদক দিলীপ দত্তর কবিতা কেন সংকলিত হল না, জানি না।

'গ্রীক কবিতা' অনুবাদে বাণী রায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন; এই অংশের অধিকাংশ কবিতার সার্থক অনুবাদে পাঠকদের অজস্র ধন্যবাদ তিনি পাবেন। কিন্তু কিছু ত্রুটিকে তিনি এড়িয়ে উঠতে পারেন নি। গ্রীক কবিতার অনুবাদে অনুবাদকের যে কঠিনতম পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় তিনি সফল হন নি। এই অকৃতকার্যতার কারণ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করি। 'গ্রীক সাহিত্য শিল্প সাহিত্য নয়, বহু প্রাচীন বহু দূর দেশের বিস্মৃত কবিতা অনুবাদ করার কাজে অসংখ্য বাধা পাওয়া যায়। ভাষাগত, সংস্কারগত বাধা। গ্রীকপুরাণে কবিতাগুলি বহুমিশ্রিত। ক্লাসিকসের পাঠকের কাছে তার পরিচিতি আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে রস গ্রহণের অন্তরায়।' (উত্তরসূরী ঃ সপ্তমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা)। এই কথার পরও সাধারণ পাঠকের রসগ্রহণের অন্তরায় এমন কবিতা তিনি কেন অনুবাদ করলেন?

তবুও হৃদয়ে স্থায়ী রোমান্সে যে জানো।
স্তব্ধ হও বাচালের দল,
কিলোমেলা—জিহ্বাচ্ছেদ করেছি কি আমি?
চলে যাও পর্বতচূড়ায়
চিরসুপ্ত সে পার্থীয়—
সেখানে ইতুলোস্—সেরকে হও সে অধীর। (পৃঃ ১৭৭)

মূলের সঙ্গে মিলিয়ে 'প্রেম মাধুর্য' কবিতাটি পড়েছি; 'নিদাঘে তৃষার মধু তৃষিত অধরে,/নাবিকের চোখে মধু উদীচী শিখর' এই অংশটির অনুবাদের সততা এবং গোটা কবিতাটির রসোত্তীর্ণতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বিভাগের তিনটি কবিতা অনুবাদ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'হতাম যদি হাওয়া' পাঠকের স্মরণের অনুষঙ্গ হয়ে থাকে—

তুমি বসে আছ নির্জন উপকূলে
আমি যেন এক সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলই তোমার বুকের আঁচল তুলে
হাতড়াই যতে হৃদয়টা যায় পাওয়া ॥

লাতিন কবিতা অনুবাদের সমস্ত কৃতিত্ব কবি হরপ্রসাদ মিত্রের। তাঁর মিষ্টি হাতের সরসতা প্রত্যেকটি কবিতার আত্মার সংলগ্ন হয়ে আছে।

অরবীতে অবন্তী সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কয়েকটি স্বচ্ছ অনুবাদ পাঠকদের তৃপ্তি দেবে।

জাপানী বিভাগে দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কিছু অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। 'ওনো নো কোমাচির কবিতার একটি সুন্দর অনুবাদ করেছেন তরুণ সান্যাল ঃ

চন্দ্রমাহারা নিশীথিনী এ যে
প্রিয় সমাগম বিহ্ন।
তৃষিত দাঁড়াই, স্পন্দিত তাই—
বক্ষে শিখার নৃত্য,
সে আগুনে, হায়, নিঃশেষে পোড়ে চিত্ত।

'ফরাসী' অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা ছাড়াও - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ বিভাগটির মান উন্নত করেছে। 'রুবাইয়াৎ'-এ হাফিজের অনুবাদে স্বর্গীয় কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের দক্ষতা অসামান্য। এই সংস্করণে স্বর্গীয় কবির অনুবাদ খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু সম্পাদকের বক্তব্যে তাঁর উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

পরিশেষে, সম্পাদক দায়িত্বমুক্তির জন্য বলেছেন ঃ 'যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতিমান কবি। অনুবাদের সার্থকতা ও ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁদের বেশী।' কবিদের এই স্বকীয়তার উপর নির্ভর করায় ফলে সম্পাদকীয় কর্তব্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

অনন্ত দাশ

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের দুটি গান : পরিকল্পনার অসঙ্গতি

রবীন্দ্রনাথের মত কালজয়ী প্রতিভার ৭০ বছর ব্যাপী অনলস সাধনায় যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে বোধহয় বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। সাহিত্যের সবকটি শাখাতেই কবির প্রতিভাদীপ্ত রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। একথাও আমাদের শ্লাঘার বস্তু যে প্রায় রবীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই সমস্ত রচনাবলীর একটি সুউচ্চ মান রাখা সম্ভব হয় না, এমন কি সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই সুস্পষ্টভাবে একটি উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনামূলক বিচারে।

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে গত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদিত হল তার অনেক রচনাই ভাসাভাসা, ভাবপ্রবণ, উচ্ছ্বাসময়। প্রকৃতপক্ষে অনেক লেখাই পল্লবগ্রাহীতায় এসে পৌঁছেছে সে কথা বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা গেল শতবার্ষিকী উপলক্ষে।

একথা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করছি এ জন্যে যে এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা মুখ্যত অনুপস্থিত। কিন্তু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা না হলে কোন সাহিত্যমূলক রচনার মর্মস্থলে ঠিক পৌঁছান যায় না। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করে তাদের ভাবগত স্খলের অসঙ্গতি দেখান হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো বিলেতে সেক্সপীয়র সম্পর্কে যে ধরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে তার সামান্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বছর কয়েক আগে টাইমস্ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে, সেক্সপীয়রের কোন লেখায় একটা বিলিতি পাখীর ডাকের উল্লেখ আছে। যতদূর মনে পড়ছে এরকম ভাবে—Too-it; Too-hoo এ পংক্তিতে একদল পক্ষী বিশেষজ্ঞ এই বলে অসঙ্গতি জানিয়েছিলেন যে, এখানে সেমিকোলন দেওয়াটা সেক্সপীয়রের পক্ষে ভুল হয়েছে, কারণ তাঁদের মতে এই পাখীর দুরকম ডাকের মাঝের ব্যবধান এতক্ষণ স্থায়ী নয় যে, সেজন্য সেমিকোলন দিতে হবে। তাঁদের মতে ওখানে কমা বসানই উচিত। এ বিষয়ে মতবিরোধীরা বলেন যে, সেক্সপীয়র ওখানে সেমিকোলন দিয়ে ঠিকই করেছেন। যাই হোক বিবাদ যখন চরমে উঠল

তখন একদল পক্ষী বিশেষজ্ঞ টেপরেকর্ডার নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে সেই পাখীর ডাক টেপে তুলে প্রমাণ করলেন যে, শেক্সপীয়র ওখানে সেমিকোলন বসিয়ে ঠিকই করেছেন। সামান্য একটা সেমিকোলন নিয়ে কি তুমুল কাণ্ড না হল।

ওদেশে শেক্সপীয়র নিয়ে যে ধরণের আলোচনা কয়েক শতাব্দী ধরে হয়েছে, এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে ধরণের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এখনো হয়নি এবং হবার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

এই ভূমিকার পর আমার মূল বক্তব্য শুরু করা যাক। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর দুটি কবিতা।, এ দুটিই অবশ্য গান হিসেবে গাওয়া হয়েছে এবং এদের সাঙ্গীতিক দোষগুণের আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় বহির্ভূত। এখানে কেবলমাত্র তাদের সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমে আলোচিত কবিতাটি নীচে পুরোপুরি উদ্ধৃত হল (গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪)

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে॥
ও পারেতে উপবনে
কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধুধু মরু বালি বিনা রে॥

এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে॥

এই কবিতাটি পড়ে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দেওয়া হল। (১) কবিতার চিত্রকল্পগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বোধ্য—যেমন দ্বিতীয় পংক্তি "আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে" আবার পঞ্চম পংক্তিতে পড়ি "এ-পারেতে ধুধু মরু বালি বিনা রে—"

কিন্তু এ কি করে হবে? কবি বলছেন যে, তিনি নদী কিনারে বসে আছেন —তবে পঞ্চম পংক্তিতে সেই নদী তীরে "বালি বিনা ধুধু মরু" কি করে হয়? যদি এমন কথা বলা হয় যে, এটি একটি প্রতীকধর্মী কবিতা এবং এখানে একথাই কবি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব অপর মানুষের

সঙ্গতেই তার আনন্দ এবং মানুষের সঙ্গ না পেলে তার জীবনের সুখ চলে যায়; এমন কি সেই মানুষ যদি কাছেও থাকে তবুও তার সঙ্গে তার মনের মিল না হলে তার জীবনে কোন আনন্দ থাকে না; তা হলে আমি একথা বলব যে, এখানে শব্দ চয়নে ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটিযুক্ত কথা হল "বারি—বিনা রে।" (২) ত্রুটি এই কারণে যে, কোন জায়গা বারিহীন হলে তা শুধু মরুভূমি হয়ে যায়, এই ভৌগোলিক তথ্য আমাদের সবারেরই জানা আছে। তবে এ জায়গা যদি "বিনারে না ব্যবহার—কিনারে" ব্যবহার করা হোত তাহলে কন্ট্রাস্ট-টা আরও ভাল ফুটত। কারণ সে সময়ে বোঝান যেত যে, যদিও এ জায়গাটা জলের ধারেই তবুও এটা শুধু মরুভূমি এই কারণে যে এখানে মানুষের সঙ্গ নেই—তার হাসি, গান, খেলা কিছুই নেই। এতে বিরুদ্ধবাদীরা হয়ত বলবেন যে, প্রথম পংক্তির "কিনারে"-এর সঙ্গে মিল রাখার জন্যে "বিনারে" ব্যবহার করা হয়েছে—এতে আমার বক্তব্য হবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবির পক্ষে একটা লাগসই মিল নিশ্চয়ই খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হোত না—কিংবা তিনি হয়ত প্রথম stanza-টা অন্যরকম ভাবেও লিখতে পারতেন যাতে এই সাহিত্যগত contrast ও সাঙ্গীতিক রেশ সুন্দরভাবেই বজায় থাকে। বর্তমান চেহারায় এটা গানের দিক থেকে ঠিক থাকলেও সাহিত্যগত ভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। (৩) এই কবিতার দ্বিতীয় stanza-এ যা ষষ্ঠ পংক্তিতে "খেলা" কথাটি পরপর দুবার পুনরুল্লিখিত (repeated) হয়েছে। আমার মতে এতে কবিতার ঝংকারের বৈচিত্র্য কমে এক ধরণের একঘেয়েমি এসেছে। এখানে দ্বিতীয়বার 'খেলা' কথাটির বদলে অন্য কোন বাক্য ব্যবহার করলে এই ত্রুটি থাকত না।

এবার অন্য কবিতাটির কথা আলোচনা করছি। আগেরটির মত এটিও সঙ্গীত হিসেবে গীত হয়। এটি 'রাজা' নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নীচে রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) দশম খণ্ড থেকে (পৃঃ ২২৮—২২৯) পুরো উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা—ওমা, ওমা। যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো!

দ্বিতীয়া—আমাদের বসন্ত পূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা—আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই।

তৃতীয়া—যে তাকে পথে বের করবে তার জন্যে।

তৃতীয়া—ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি?

প্রথমা—হাঁ ভাই সর্বনাশের জন্যে মন কেমন করছে।

আলোচনা

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি ভয় লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যেজন ভাসায়।

দ্বিতীয়া—আমাদের ত পথে ভাসাবার শক্তি নেই. পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী।

ঠকুরদা—তার কাছে ধরা দিলে, ধরা নেওয়াও যা—ছাড়া পাওয়াও তা।

যেজন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

(স্ত্রীলোকদের প্রস্থান)

নাটকে এটি যদিও গান বলে চিহ্নিত হয়েছে তবু এটিকে একটি গীতি-কবিতা বলে গণ্য করলে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না। একটি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা হিসাবে এটি ত্রুটিহীন। কিন্তু যে কথা, আমি এবার আলোচনা করতে চাই সেটি হল এর সন্নিবেশ। আমার মতে সেখানে কিছু ত্রুটি আছে। এই কবিতার ভাবার্থ কোন পুরুষের মুখে বেমানান। যদিও নাটকে এটি একজন পুরুষের অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ভুলটা সেখানেই ঘটেছে। একথা সকলে জানেন যে পুরুষ হল উদ্যোগী সে কোন বাধা, বিঘ্ন না মেনে অজানাকে জয় করতে সর্বদাই উৎসাহী এবং এ জন্যে চরম সর্বনাশকেও ভয় করে না। কিন্তু নারী হল গৃহলক্ষ্মী; সৃষ্টিকে পালন করাই তার কাজ এ জন্যে সে খুব শান্তির মধ্যে জীবন কাটাতে চায় এবং যে কোনরকম অমঙ্গল ও সর্বনাশকে মনেপ্রাণে এড়িয়ে চলে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিজেই নারীকে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে কল্পনা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই কবিতাটি কোন স্ত্রীলোকের অংশে দিলে contrast-টা ফুটে উঠত। বর্তমান প্রেক্ষিতে এটা কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। কারণ যে নারী সাধারণত শান্তি চায়, সেই যখন সর্বনাশের আশায় বসে থাকে তখন বুঝতে হবে যে সমাজে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা অন্য কোথায় একটা গুরুতর অব্যবস্থা ঘটেছে। নাটকের situation-এ এর ব্যতিক্রম হল কবিতাটির প্রধান অসঙ্গতি।

জীবেন্দ্র কুমার গুহ

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

অনামী (২য় সং—মহাকাব্য, কালিদাস, গীতা, অবতারি, বাণী ইংরাজ কবি, দিলীপকুমারের সেরা গান ও কবিতা, সেবে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, পরমহংস, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য—১১৲

দ্বিজেন্দ্র কাব্যসঞ্চয়ন—(সম্পাদনা) মূল্য—৮৲

ছায়ার আলো (উপন্যাস) —৭৲

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(দ্বিজেন্দ্রলাল, বিপিন পাল, লোকেন্দ্র পালিত, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধুনাথ বসু, অনুকূলচন্দ্র সেন, চরিত্রচিত্র— সচিত্র ৩০০ পৃষ্ঠা) ১২৲

স্মৃতিচারণ ২য়খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, পরমহংস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রভৃতি সচিত্র—৩০০ পৃষ্ঠা ৬।০

অঘটন আজো ঘটে (উপন্যাস) ৪র্থ সং মূল্য—৫৲

দেশে দেশে চলি উড়ে—(৩য় সং—সচিত্র)—৬।০

ভাগবতী কথা (কবিতা) —৫৲

ভাগবতী গীতি—৪৲ **শ্রীচৈতন্য** (কা ব্য না ট্য)—৩।০ **মহাভারতী কথা**—৩।০ **তীর্থংকর** (৩য় সং)—৮৲ **দোটানা**—৩৲

ঋত্বিক মন্দির, পুণা-৪ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

THE RADICAL HUMANIST

(Formerly *Independent India*)

Founded in April, 1937 by

M. N. ROY & ELLEN ROY

Editor :

SIDNARAYAN ROY

Contributing Editors :

PREMNATH BAZAZ

Mg. Editor.

G. P. BHATTACHARJEE

V. B. KARNIK

A. B. SHAH

R. L. NIGAM

K. K. SINHA

This journal is the weekly organ of the Radical Humanist Movement and is dedicated to freedom, truth and co-operation.

Contributions should be typewritten and addressed to the Editor, The Radical Humanist, 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

Yearly Subscription

Inland—Rs. 12/-

Foreign—30 Shillings or 5 Dollars.

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২নং ন্যায়রত্ন লেন ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ, ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১০ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন

প্রবন্ধ

বিনয় সেনগুপ্ত। দর্শন বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ত্বে হোয়াইটহেডের অবদান ৩৭১। সুরেজিৎ দাশগুপ্ত। তন্ময়ের ৩৮৮। প্রমিতাভ দাশগুপ্ত। অন্তর্গত সবিতার উত্তরাধিকার ৪০১।

কবির ভাষা । কবিতাবলী

চিত্ত ঘোষ ৪০১। আলোক সরকার ৪০৫।

কবিতা

অরুণ ভট্টাচার্য সোমেন সোম শান্তিকুমার ঘোষ শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় সংকর্ষণানন্দ মুখোপাধ্যায় মলয়শংকর দাশগুপ্ত সুদেষ্ণরঞ্জন দত্ত অমিতাভ গুপ্ত রঞ্জন মুখোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত শান্তি লাহিড়ী নমিতা যন্ত্র মজুমদার পবিত্রকুমার চক্রবর্তী বিজয়কুমার দত্ত প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় বাসুদেব সেন হরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় অরুণ মজুমদার কালীকৃষ্ণ গুহ তারাপদ রায় (৪১৭-৪৬২)

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

বিবেকানন্দ ও বাংলা চলিত গদ্য। অনুলেখন দাশগুপ্ত ৪৪০।

বিদেশী কবিতা

টি. তরুণ, এলিট, ইলুয়ার্দ, এডোয়ার্দ লুমি-শিখর। হরীন্দ্র ঘটক। ই. ইউনডুসেক্কো। নির্মল ঘোষ। জিলান টমাস। স্নেহাঙ্কুর ভট্টাচার্য। টমাস। বিবেকেন্দু পালিত। লরকা। শান্তি লাহিড়ী ৪৪৯।

বিয়োগপঞ্জী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেশ চক্রবর্তী। দিলীপকুমার সেন। শান্তি লাহিড়ী ৪৫৪।

সমালোচনা সাহিত্য

সুরেজিৎ দাশগুপ্ত (একটি সমুদ্র, দিনরাত্রি)। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৪৫৭।

আলোচনা

আধুনিক কবিতার শব্দ। সামসুল হক ৪৬০।

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য
১বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২নং নয়নচন্দ্র সেন ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭নং চোরবাগী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নৃত্য-পরা মণিপুর, শৌর্য-ভরা জয়পুর অথবা স্বপ্ন-মাখা কোনারক — মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো আই-এ-সি সর্বত্রই আপনাকে সত্বর পৌঁছে দেবে। এই ভাবেই সে বিশাল ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে আপনাকে নিরন্তর সাহায্য করছে।

IAC/IA 81M

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স্

উত্তরসূরী
দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০

দর্শন বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ত্বে হোয়াইটহেড্-এর অবদান

বিমল সেনগুপ্ত

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ, এবং দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রায় সর্বত্র আরম্ভ হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রকে অনেকেই সমাজ বা রাজনীতি-দর্শনে পরিণত করতে চাচ্ছেন। দার্শনিকগণ জগৎ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন, জগতের যে মূল্য আলোচনা করতে চেয়েছেন, তা প্রায় নিরর্থক সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস হলেই আজকাল অনেকে মনে করেন। পদার্থ জগতের অভ্রান্ত সত্যতা বৈজ্ঞানিকগণ সংশয়াতীত ভাবেই প্রমাণ করেছেন। পদার্থের রহস্য, মনের রহস্য, দেহের রহস্য সবই ত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, সুতরাং এ ছাড়া যে সমস্যা তা আলোচনারই বিষয় নয়! দার্শনিকগণ কেবল সমস্যা সৃষ্টি করেন, সমাধান করেন না—প্রমাণও করেন না!

বিজ্ঞানের এ অপ্রতিহত প্রভাবের মধ্যেই বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ গণিত পারদর্শী হোয়াইটহেড্ এবং বারট্রান্ড রাসেল এক নূতন দর্শনশাস্ত্র রচনা করেছেন। রাসেল দর্শনকে বিজ্ঞান আশ্রিত করে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হোয়াইটহেড্ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং গতানুগতিক দর্শনের সংকীর্ণতা আলোচনা করেছেন তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে।

হোয়াইটহেডের চিন্তাসূত্র অত্যন্ত গভীর, বিস্তৃত পরিধি নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ এক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিষয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব অনেক। তবুও বিজ্ঞানময় জ্ঞানরাজ্যে বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এমন একজন দার্শনিকের মতবাদ আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

হোয়াইটহেড্ এবং রাসেল সম্মিলিতভাবে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা-তে গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলি নূতনভাবে আলোচনা করেন। এ

গ্রন্থখানি বর্তমান সময়ের একখানা শ্রেষ্ঠ এবং উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক অবদান। এ গ্রন্থের পর রাসেলের সঙ্গে হোয়াইটহেড্ মতবাদে আর এক হতে পারেন নি। যদিও উভয়েই দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ও রচনা করেছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা আর এক হননি। Science and the Modern world, Process and Reality, Adventure of Ideas, The Concept of Life ইত্যাদি গ্রন্থে হোয়াইটহেড্ তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতির স্বরূপ, সত্তার (রিয়ালিটি) স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

হোয়াইট্হেডের মতে দার্শনিক চিন্তার তাৎপর্য হল সঙ্গতিপূর্ণ, আবশ্যিক এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যবাদী জগৎ ব্যাখ্যার পদ্ধতি সৃষ্টি করা। বাস্তিক পদ্ধতির মত জড় পদ্ধতি জ্ঞানের নির্দায়ক নয়। একটি সামগ্রিকতা বা বৃহত্তর সামান্যতা এতে থাকবে, এতে সমস্ত খণ্ডকে অখণ্ডের পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

"Speculative Philosophy is the endeavour to frame a coherent, logical, necessary system of general ideas in terms of which every department of experience can be interpreted."

অবশ্যই এ ব্যাখ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং পর্যাপ্ত হবে। জ্ঞানদৃষ্টির বুদ্ধির দিক হল সঙ্গতিপূর্ণতা এবং যৌক্তিকতা আর অভিজ্ঞতার দিক হল প্রয়োগযোগ্যতা এবং পর্যাপ্ততা। জ্ঞানক্রিয়া সামান্যকে আশ্রয় করেই হতে পারে, সুতরাং ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কল্পনা বিলাস নয়—সামান্য এবং আবশ্যিক। এ পদ্ধতিকে কাল্পনিক বুদ্ধিবাদী পদ্ধতি বলা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়গম্য, স্পর্শ বা দৃশ্যগম্য বস্তু স্পর্শ বা দর্শন দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। এমন একটা কল্পনাবুদ্ধির সঙ্গে তা অন্তর্লীন আছে, যে সে কল্পনা-বুদ্ধির ব্যাখ্যা বস্তু জগতেও প্রযোজ্য।

কান্টের দর্শনেও এরকম এক কল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি হল গণিতের পদ্ধতি। হোয়াইটহেড্ মনে করেন, গণিতের অনেক সিদ্ধান্ত বহু শত বছর পর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়, কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে তারা পূর্বেই প্রমাণিত। বুদ্ধির সঙ্গে বাস্তবের এরকম মিল ঘটাতেই হবে এবং কল্পনা-বুদ্ধি প্রযুক্ত পদ্ধতি এ মিল ঘটাতে সক্ষম।

যুক্তি-নির্ভর ভাববাদী দার্শনিকদের পদ্ধতি আতান্তিকতা দোষে সীমাবদ্ধ। অমূর্ত ধারণাকে যখন বাস্তবতার মধ্যে প্রকাশিত বলে ধরা হয়, তখন বিষয়টা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হোয়াইটহেড্ একে বলেছেন "ফ্যালাসি অফ্ মিস্প্লেসড্ কন্ক্রিটনেস।" আবার অন্যদিক থেকে, বুদ্ধিবিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততাও এ পদ্ধতির দোষ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্তি

নির্ভর এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর। কিন্তু এ পদ্ধতির এক অকারণ অন্ধতা হল, সমিরেখার অনাপাত সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

বিজ্ঞান নিজ বিষয়ে বিচার, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু বিজ্ঞানোত্তর কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন, এখানে কোন বুদ্ধিপ্রয়োগ বিজ্ঞান অবান্তর মনে করে।

দর্শনের পদ্ধতি সম্বন্ধে হোয়াইট্‌হেডের সিদ্ধান্ত, কল্পনাশ্রিত বুদ্ধিই হল দর্শনের ভিত্তি। তিনি প্রচলিত বিচারমূলক বা বুদ্ধিমূলক পদ্ধতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দুইই অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর পদ্ধতি হল গণিতাশ্রয়ী। ডেকার্ত, কান্ট্‌ লাইবনিৎজ্‌ এ পদ্ধতিকেই ভিত্তি করে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

হোয়াইট্‌হেডের দর্শন সমগ্রতার বিশ্বাসী। প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রকৃতির যে রূপ পাওয়া যায়, হোয়াইটহেড্‌, সে স্বরূপ নির্ণয়ের যৌক্তিকতা সংশয়হীন সত্য মনে করেন নি।

ষোড়শ শতক থেকেই বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন। এ সময়কার ব্যাখ্যা ছিল সাধারণ বুদ্ধির পর নির্ভরশীল। সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর এসব ব্যাখ্যা প্রকৃতি, গতি, স্থান এবং মন সবই আলোচনা করে, পর্যবেক্ষণ করে, তত্ত্বগত ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থও হয়নি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর ব্যাখ্যায় বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর তথ্যগুলি প্রকৃতি ব্যাখ্যার অক্ষম বলে প্রমাণিত হতে লাগল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে—আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সাধারণ বুদ্ধি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ বুদ্ধি এখনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে আছে।

বিজ্ঞান এখন বহু শাখায় বিভক্ত, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য, এরূপ বিভাগ-বুদ্ধি না করে উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি এক করে, কটি জামানা সিদ্ধান্ত পাওয়া খুবই কঠিন।

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতির মধ্যে মুখ্য এবং গৌণ গুণ আবিষ্কার করে বর্ণ শব্দকে প্রকৃতি থেকে নির্বাসিত করেছেন। প্রকৃতি এখন খণ্ড বস্তুপুঞ্জ: স্থানিক এবং কালিক সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কের পরিবর্তন—এভাবেই প্রকৃতি চিহ্নিত হচ্ছে।

বিখ্যাত দার্শনিক হিউম সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সংবেদনলভ্য প্রত্যক্ষতা সংবেদন ব্যাখ্যার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। হিউমের এই ব্যাখ্যা দর্শন এবং বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিউটন পদার্থ জগতের ব্যাখ্যায় পূর্বগামীদের তুলনায় অনেক বেশী সার্থকতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোন তাৎপর্য বা মূল্য অনুসন্ধান করেন নি। তিনি পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে এক আপাতঃ অদৃষ্ট যোগসূত্র মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু এ অন্তঃশীল শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন নি।

হোয়াইট্‌হেডের মতে প্রকৃতির সমস্ত ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিক। নিউটন সম্বন্ধে তিনি বলছেন,

"He thus illustrated a great philosophic truth, that a dead nautre can give no reasons. All ultimate reasons are in terms of aim at value."

মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির যে রূপ অভিব্যক্ত হয় এবং অভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্য, তা বৈজ্ঞানিকদের আলোচনার বাইরে। কিন্তু সমগ্র সত্তার পক্ষে এ আলোচনা অনস্বীকার্য। অবশ্য হোয়াইটহেড্ বার্কলির মত মন বা অভিজ্ঞতা নির্ভর বিশ্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু "আমার চেতনার রঙে, পাল্টা হল সবুজ"—এ কথার তাৎপর্য তিনি অস্বীকার করেন না।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞান শক্তি, কর্মচাঞ্চল্য বা গতি এবং স্থানকালের প্রভাব ও এর পরিবর্তনশীল সম্পর্ক নিয়ে পদার্থজগৎ সৃষ্টি করেছে।

"The modern point of view is expresed in terms of energy, activity, and the vibratory differentiation of Space time."

প্রকৃতির এ ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে জড় পদার্থই ধরে নেওয়া হয়েছে। স্থান এবং কালকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক বিচার সুরু হয়েছিল, বর্তমানে পদার্থ-জগৎকে সদা কর্মচঞ্চল, পরিবর্তনশীল সম্বন্ধ দ্বারা পরিচালিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। গণিত-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হোয়াইটহেড পদার্থের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে এ কেবল প্রাণহীন প্রকৃতিকে প্রাণহীনভাবে অনুভব করা। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ আছে—প্রাণের ব্যাখ্যা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা। ডেকার্ত থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দার্শনিকগণ প্রাণ এবং প্রকৃতির দ্বৈত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এদের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। বস্তুবাদীগণ প্রাণকে প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বাই-প্রোডাক্‌শান্ বা এপিফেনমেনন্ তত্ত্বদ্বারা বস্তুবাদীরা প্রাণ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ আলোচনা করেছেন।

হোয়াইটহেড্ মনে করেন প্রকৃতি ও প্রাণকে কখনও দ্বৈত কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতি ও প্রাণের সম্মিলনই হল যথার্থ সত্তা—সত্তার এ রূপই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে।

প্রাণ শব্দের তাৎপর্যই আত্ম-আনন্দে। প্রাণ অর্থ হল ব্যক্তি সত্তার প্রত্যাকাঙ্ক্ষিত এবং সে সত্তা পদার্থ জগতের জটিল এবং সদাচলমান গতির সঙ্গে এক হতে চায়। হোয়াইটহেড্ ব্যক্তিসত্তার এ সমস্ততার মধ্যে প্রবেশকে বলেছেন, 'প্রিহেন্‌শান' এবং প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধির আনন্দকে বলেছেন 'অকেশান্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স'।

তিনি মনে করেন ব্যক্তি সত্তার বৃহতের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার এ আত্ম-উপলব্ধিই ঐক্যবদ্ধভাবে বিবর্তমান এবং সদাসৃজনশীল বিশ্বসত্তা গঠন করে। প্রাণশক্তি একটি ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিসত্তার পক্ষে সৃজনশীল মুহূর্ত। অস্তিত্বের এ উপলব্ধি বৃহৎ সত্তার মধ্যে অনুপলব্ধ কিন্তু অনুভবসম্ভব হয়ে আছে। বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মিলনের মুহূর্তকে শুধু সৃজনশীল বললে প্রাণশক্তির অর্থ স্পষ্ট হবে না। এ মিলনের উদ্দেশ্য আছে। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন বা পরমমানস সত্তার সঙ্গে মিলনে যে আধ্যাত্মিক গভীরতা আছে, হোয়াইট্‌হেডের আত্মোপলব্ধি ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কারণ অবিমিশ্র মানসসত্তা বলে তাঁর দর্শনে কিছু নেই। কিন্তু তিনি সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। পদার্থ জগতেও এ উদ্দেশ্য আছে। প্রোসেস-ই তাঁর কাছে সত্তা—এর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার সৃজনশীল আনন্দ এবং বৃহত্তর ঐক্য একই সঙ্গে আছে, এ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য প্রোসেস্-এর মধ্যেই আছে। আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ঘটনা হল, আত্মা বা মন গঠনের ঘটনাবলী, আবার আত্মা বা মনও ঘটনার মধ্যেই অস্তিত্বশীল।

বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে অবিরাম গতি এবং কর্মচাঞ্চল্য আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শূন্য গতি ও আধারহীন কর্মপ্রবাহের অর্থ নেই, তাই প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণকে এক করে দেখতে হবে।

"Our immediate Occasion is in the society of occasions forming the soul, and our soul is in our present occasion."

সুতরাং হোয়াইটহেড্ প্রকৃতিকে জড় প্রকৃতি না ভেবে প্রাণময় প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেছেন এবং জড় ও প্রাণের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতি ও প্রাণের মিলনই সৃষ্টিকে একটি মূল্য দান করেছে।

প্রকৃতি বিষয় হোয়াইট্‌হেডের বক্তব্যের পরই তাঁর মূল দার্শনিক তথ্য আলোচনা করতে হয়। হোয়াইট্‌হেডের প্রথম তথ্যগত প্রকল্প হল—অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা স্তরে স্তরে—ক্রমবিকাশমান হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার প্রতিটি ঘটনার একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে।

মানুষ যেমন বর্তমান ঘটনার অভিজ্ঞতাকে অতীতের ঘটনার অভিজ্ঞতার

সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে, তেমনি করেই প্রকৃতির আপাতঃ বিচ্ছিন্ন ঘটনা-গুলি পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : আমরা অনুভব করি যে আমরা স্পন্দিত বাস্তব জগতে বাস করি। প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব জগতে স্পন্দন অনুভব করাই দার্শনিক অনুভূতি। তৃতীয়ত : হোয়াইটহেড্ মনে করেন অন্তর্নিহিত মূল্য বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নয়, অস্তিত্বের অতি সামান্য জিনিস ও অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান। অস্তিত্বে এবং মূল্যে দ্বৈত নেই।

ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্তা বিবর্তিত হয়। হোয়াইটহেড্ প্রতিটি প্রত্যক্ষ মুহূর্তকেই সত্তা এবং রূপ ও ভাবময় বলে মনে করেছেন।

প্রকৃত সত্তাকে তিনি অভিজ্ঞতার আধার বলে প্রমাণ করেছেন। অভিজ্ঞতার দার্শনিক তাৎপর্য হল অনেকের মধ্যে নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে অনুভব করার আনন্দ এবং ব্যক্তিসত্তা যে বহু থেকে জন্মত হয়েছে তাও অনুভব করা। একের সঙ্গে বহুর এ ঐক্যকে তিনি বলেছেন প্রিহেনশান্ অর্থাৎ অনুভব করা।

হোয়াইটহেড্ সচেতন মন এবং বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাটি প্রায় এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রিহেনশান্ দ্বিতত্ত্বার ঊর্ধ্বে। তিনি পরিবেশ এবং চৈতন্য বা অনুভব দুই-ই অদ্বৈত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অনুভব গতিহীন নয়, অনুভূতির শক্তি আছে, তিনি একে বলেছেন, ভেক্টরস্ বিজ্ঞানের বা গণিতের ভাষায় ভেলোসিটি। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের নিজস্ব অথচ তারা আসে একেবারেই বাইরের ঘটনা থেকে। অনুভূতির ভেলোসিটি-র জন্যই এরকম সম্ভব হতে পারে। প্রিহেনশান্ ও স্থির নয়, প্রত্যেক অভিজ্ঞতারই একটি পূর্ববর্তী ঘটনার ইঙ্গিত আছে অথচ তা বর্তমানও বটে। ঘটনাগুলি বিষয়ের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতার জগতে এসে সাবজেক্ট-এ পরিণত হয়। কান্ট অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ক্যাটিগোরিস্ দ্বারা বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন, হোয়াইটহেড বিষয় থেকে সুরু করে বিষয়ী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। হোয়াইটহেডের মতে সাবজেক্ট-এর কোন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ পূর্ব সত্তা নেই, বা বাইরের কোন উৎস থেকে সৃষ্ট নয়, অভিজ্ঞতার প্রোসেস্-এর মধ্যে সাবজেক্ট সৃষ্ট হয়।

হোয়াইটহেড্ সত্তার স্বরূপকে ক্রমবিকাশ এবং ক্রমপরিণতির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা শেষ হলেই, সৃজন উন্মুখ বিশ্বে আবার নূতন ঘটনার সৃষ্টি হয় এবং এ ঘটনাগুলিই বিষয় হয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য থাকে।

ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি পূর্ববর্তী ঘটনাগুলিকে তাদের কারণ বলে চিহ্নিত করবে। এভাবে তিনি সময়কে প্রাণ, গতি এবং অনুভূতি দ্বারা অপূর্ব এক রূপদান করেন। তিনি আকার এবং বাস্তবে কোন দ্বৈতভাব স্বীকার করেন

না। এমন কি গণিতের সূত্রকেও তিনি সত্তার বিকাশ প্রক্রিয়ায় বাস্তবে মূর্ত হবে বলে বিশ্বাস করেন।

হোয়াইটহেড্ প্রধানতঃ গতিবাদী, কিন্তু তাঁর মতে বিশ্বের মূল উপাদান-গুলির গুণ পরিবর্তন হয়। কিন্তু মূল সত্তার পরিবর্তন হয় না। কারণ বিশ্বের তাৎপর্য হল আত্মোপলব্ধিতে, প্রকৃত ঘটনার আত্ম-উপলব্ধি হলেই বিনাশ হয়। আবার নূতন ঘটনা আসে। প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকার কারণ ঘটনাগুলি বিভিন্ন ধরণের লক্ষণের দ্বারা থাকে। প্রোসেস এ্যাণ্ড রিয়ালিটি গ্রন্থে তিনি সাতাশটি ব্যাখ্যার সূত্র এবং নটি অনুশাসন সূত্র (27 Categories of explanation, 9 Categories of obligation) ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ফিলোসফি অফ্ অরগানইজিম্ প্রমাণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দুটি প্রকৃত সত্তা একই উৎস থেকে আসতে পারে না। একটি ক্রমবিকাশমান দার্শনিক পদ্ধতি এরকম একটি সূত্র মেনে নেবেই।

তিনি আপেক্ষিক তত্ত্বে সমস্ত জিনিসকেই অস্তিত্বের দিক থেকে আপেক্ষিক ভাবে বিচার করেছেন। যে কোন রকম অস্তিত্বই, ভবিষ্যতে হয়ে ওঠার পরি-প্রেক্ষিতে অনুভব করতে হবে। সুতরাং হোয়াইট্হেডের জগৎ চিন্তায় অনুভব একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি বলেন,—

"There is nothing in the real world which is merely an inert fact. Every reality there is for feeling, it promotes feeling and it is felt."

ঘটনা, অভিজ্ঞতা, সত্তা ইত্যাদির আলোচনা থেকে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে হোয়াইট্হেডের মতে চরমসত্তার স্বরূপ কি? অবিরাম কর্মচাঞ্চল্যে, ঘটনাস্রোতে কার উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? তিনি উত্তর দেবেন—"ভগবান"। কিন্তু এ ভগবান জগৎ স্রষ্টা নন, বা সৃষ্টির আগে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই, তিনি বিশ্বময়। তিনি ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার গতি, অতীত থেকে বর্তমানে আসবার ঐকাবদ্ধ চেষ্টা দিয়েই পৃথিবী ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু তাতে বস্তুবাদীতা হোত। বর্তমান কি নূতন পারে অতীত? তাই তিনি ভগবানের সাহায্যে নূতনত্ব এবং সদা গতিবান হওয়ার দুর্বার সাহস সৃষ্টি করলেন। ঘটনার ধারাবাহিকতার মধ্যে অতীত ঘটনা ক্রমশঃ বিস্মরণ হয়, কিন্তু একেবারে বিস্মৃতির অতলের মধ্যে সে কখনও যায় না। সেজন্য, নূতন ঘটনা থেকে সৃষ্ট প্রথম ভাগে পুরাতনের জন্য সমবেদনা, তারপর সমবেদনার স্তর পার হয়ে ঘটনা বাস্তিসত্তাকে নূতন কিছু দান করে, এভাবে এক জটিল অনুভূতির রাজ্য তৈরী হয়—কিন্তু এ জটিলতাই সৃজনশীল আগ্রহ সৃষ্টি করে। হোয়াইটহেড্ পদার্থ থেকে আসা অনুভূতি এবং প্রত্যয়জনিত অনুভূতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য

করেন নি। তিনি বলেন, প্রকৃত ঘটনার প্রভাবজনিত অনুভূতিই পদার্থের অনুভূতির ন্যায় প্রতিভাত হয়। এ ভাবে তিনি বাস্তব ও মানসিককে এক করেন।

হোয়াইট্‌হেডের দর্শনে উদ্দেশ্যবাদ এবং সৃষ্টির কারণতত্ত্ব এক সূত্রে আবদ্ধ। ঘটনার অতীত থেকে বর্তমান, এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে হয়ে ওঠা হল কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আর হয়ে ওঠার মধ্যে যে উদ্দেশ্য রয়েছে সে উদ্দেশ্য হল 'আত্ম-উপলব্ধি'—এটি হল উদ্দেশ্যবাদ।

কাটিগোরিক্যাল অবলিগেশান্‌-এর প্রধান তত্ত্ব হল প্রতি অভিজ্ঞতাই ঐক্যবদ্ধ বোধের মধ্যে অস্তিত্বশীল। প্রতি ঘটনার নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, আবার বৃহতের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ঘটনাগুলি সৃজনশীল উদ্যম এবং সর্বোপরি একটি বোধ সৃষ্টি করে।

পদার্থবিজ্ঞানীরা এনারজি-কে সত্তার পরমস্ফুরণ বলে মনে করেন হোয়াইট্‌হেড্‌ ফিজিক্যাল এনারজি-কে অমূর্ত এবং অস্পষ্ট বলেন, তাই তিনি উদ্দেশ্য যোগ করেছেন।

হোয়াইট্‌হেডের উদ্দেশ্যবাদে ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানুষকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা নেই। ঘটনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সৃজনশীল বোধের ক্রমবিকাশ এবং চিরদিনই ক্রমবিকাশের মধ্যে আত্মার আনন্দ ও আত্মার অস্তিত্ববোধ, এই-ই উদ্দেশ্যবাদ। উদ্দেশ্যবাদকে তিনি শেষপর্যন্ত সৌন্দর্যতত্ত্বে পরিণত করেছেন। ঘটনার অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত সত্তার আনন্দ ও আত্মবোধ এক অর্থে সৌন্দর্যবোধেরই অভিজ্ঞতা। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের পরিবর্তে, হোয়াইট্‌হেডের মতে সমন্বয় হল সৌন্দর্য। ভাবের আকারে বৈপরীত্য এবং এ আকারের সঙ্গে ঘটনার বৈপরীত্য সমন্বিত হয় সৌন্দর্যতত্ত্বে। হোয়াইট্‌হেড্‌ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা দিয়ে সমাজ পদ্ধতিও বিশ্লেষণ করেন। তাঁর অরগ্যানিজম্‌ সদা গতিশীল থাকা, হয়ে ওঠার অনন্ত ঘটনাই ত ইতিহাস—সত্তাও তাই। সুতরাং প্রত্যেক ঘটনাকেই তার হয়ে ওঠা এবং বিনাশ হওয়া দুই দিক থেকেই দেখতে হবে। অরগ্যানিক্‌ প্রোসেস্‌-এর মধ্যে পদার্থের এবং মনের দিক এক হয়ে আছে। অতীতের বিলীয়মানতা এবং নূতন সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ, আর এ থেকে ভাবগত সম্ভব আহরণ হল মানসিক। আত্মা এ থেকে সমন্বয় করে একটি নূতন অবস্থা তৈরী করে।

প্রতি ঘটনাই সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণ ঐক্যতানিক কোন সমগ্রতা নেই। সুতরাং সত্তাতার উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস অনিবার্য। হোয়াইটহেড্‌ মনে করেন যখনই নূতন কিছু ভাববার বা করবার ক্ষমতা কোন সভ্যতার শেষ হয়ে যায়—তখনই সভ্যতার পতনের কাল সূচিত হয়। পৃথিবী সর্বদাই নূতন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। অনাগতকে মনের ধারণায় সৃষ্টি করে, বাস্তবে তাকে আনতে হয়,

একেই তিনি বলেছেন এ্যাড্‌ভেনচার। প্রাণবন্ত সভ্যতা সব সময়ই চিন্তার ক্ষেত্রে বর্তমানকে ছাড়িয়ে যায়। এ গুণ নষ্ট হলেই সভ্যতার পতন অনিবার্য।

দার্শনিক হিসাবে হোয়াইটহেড্‌ সমগ্রতাপন্থী। অরগানিজম্‌-এর দৃষ্টিতে সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করেছেন। তিনি একটি চলমান সত্তার চিত্র কল্পনা করেছেন। গতানুগতিক কোন মতবাদের মধ্যে তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ নয়। ভাববাদী, বস্তুবাদী, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী কোন নামেই তাঁর দর্শনকে পরিচয় করানো যায় না। তিনি বহুসত্তাবাদী, অথচ তিনি পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়ে একসত্তাবাদীদের চেয়ে বেশী বলেছেন। তাঁর অরগানিজম্‌ সাংখ্য দর্শনের ক্রমবিকাশের মত তবে পুরুষ প্রকৃতির পরিবর্তে এখানে আছে, অকেশান্‌, এক্‌চুয়েল এনটিটি, এইম এ্যাকটিভিটি এবং সর্বোপরি একটি উদ্দেশ্যবান। তিনি দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নি, দেহ, মন, পদার্থ ও আত্মার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি গতানুগতিক দার্শনিক সমস্যাকে নূতনভাবে এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর এক একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। চিন্তার গভীরতায়, বিজ্ঞান ও দর্শন জ্ঞানের সমন্বয় সাধনায় হোয়াইট-হেড্‌ বর্তমান শতাব্দীর বিস্ময়।

হোয়াইট্‌হেড্‌ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য অতীন্দ্রিয় কোন সত্তার মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। যা আছে সব পৃথিবীতেই আছে, কিন্তু তার মধ্যেও চিরচঞ্চল গতি, চির প্রকাশমান বিবর্তন, এবং সৃজনশীল অনুভূতি ও ঘটনার অভিজ্ঞতার ঐক্যতান রয়েছে। স্থির, অচঞ্চল জগতেরই উপাদান চিরচঞ্চল হয়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছে—এ ধারার কোন অন্ত নেই। হোয়াইট্‌হেড্‌ শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা শান্তি সবই, দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। বিজ্ঞানের একান্ত বিষয়মুখিনতা, ভাববাদের আত্মমগ্নতা দুই-ই তিনি অস্বীকার করেন। অভিজ্ঞতার সৃজনশীল স্পন্দন দ্বারা তিনি দেশ, কালের শূন্যতা পূর্ণ করেছেন। জীবনের মূল্য-বোধকে তিনি নীতিশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জগতের মূল তত্ত্বের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখছেন—

"In this philosophy, the basic fact is everywhere some process of self-realisation, which grows out of previous process, and itself adds a new pulse of individuality and a new value to the world."

বাস্তবিক, হোয়াইট্‌হেড্‌ সর্বত্র আত্মোপলব্ধির এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশের নিত্য নূতন সম্ভাবনার ও পৃথিবীর নূতন মূল্যায়নের বিষয় লিখেছেন। তাঁর আঙ্গিকের কাঠিন্য ভেদ করে তাঁর রসবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি সব সময়ই প্রকাশিত।

কলসেতু

(সূর্যমন্দির)

সুবোধ সরকার

"reclined laterally, left, with right and left legs flexed, the indexfinger and thumb of the right hand resting on the bridge of the nose, in the attitude depicted on a snapshot photograph made by Percy Apjohn, the childman weary, the manchild in the womb.

Womb? Weary?

He rests. He has travelled."

যার বর্ণনা এখানে জয়েস দিয়েছেন সে আধুনিক কালের অডিসিউস। তার নাম বিষ্ণুদত্ত, আশা ধূলিসাৎ। পেশা বিজ্ঞাপনের দালালি। সেই সূত্রে ১৯০৪-এর ১৬ই জুন সারাদিন বুকের মধ্যে বিবিধিত্বর বেদনা নিয়ে ডাবলিন শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। ডাবলিনই তার বিশ্ব। এই বিশ্ব পরিক্রমার অন্তে ঘরে ফিরে এসেছে ক্লান্ত হয়ে। পাশে তার স্ত্রী, তার পেনিলোপ নূরে. কিন্তু তবু সে নিঃসঙ্গ। আধুনিক অডিসিউসের নাম শ্রীযুক্ত লিয়োপোল্ড ব্লুম, একজন নিষ্ফল নাগরিক। ব্যক্তি ও বিশ্ব এবং বিশ্ব ও ঈশ্বরের মধ্যেকার ঐক্য ও সামঞ্জস্য যেকালে বিলুপ্ত, যেকালে সবরকম মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, পরিবেশ ও প্রত্যাবরণার ফাঁদে মানুষ বন্দী, আত্মিক মুক্তির অন্বেষণ যখন অনর্থক ব্লুম সেই যুগের প্রতীক, তার নূরে থাকার ভঙ্গিটি সেই যুগের পরাজিত শৃঙ্খলিত মানুষের ছবি।

আধুনিককালের যে-বিঘটন জেমস জয়েসের "ইউলিসিস" তার অনবদ্য ভাষা এ-বিশ্ব যেন এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ, নাটকের নায়ক-নায়িকা বলে কিছু নেই, সবাই জনতা এবং তাদের কেউই জানে না কার কোন ভূমিকা। লেখকের নিজের কি কোনও ভূমিকা নেই? যদি স্টিফেন ডেডেলাস লেখকেরই প্রতিরূপ হয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে অন্য এক মঞ্চে অন্য কোনও নাটকে গৌরবময় তার যে-ভূমিকা ছিল এই মঞ্চেও সেই একই নামে একই ভূমিকা অভিনয় করবে বলে সে কৃতসংকল্প। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের রূপকটি যদি যথার্থ হয় তবে জানতে হবে যে,

মধ্যস্থ জনতার দশা দেখে জয়স স্বরুচি, প্রবণতা ও শক্তি অনুসারে, একটা ভূমিকা নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছেন। ভূমিকাটি বিদূষকের। সকলের অঙ্গভঙ্গি, সকলের বিভ্রান্তি তিনি খুঁটিনাটিসহ নকল করে দেখাচ্ছেন মাত্র। কিন্তু যাদের নকল করেছেন তারা বুঝতে পারছে না যে আয়নায় নিজেদেরই দেখছে, তারা এটাকে ভাবছে তামাশা। বিদূষকের চোখে যে ধারা বইছে সেটা তাদের চোখে পড়ছে না।

অথচ কথা ছিল এক মহিমান্বিত নাটক অভিনীত হবে। চোখের সামনে সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। জয়স সেই বাগানের মালী, কাঁট দিয়ে তিনি ঝরা পাতাগুলো এক স্থানে জড়ো করেছেন। বাগান হলো আধুনিক পৃথিবী আর ঝরা পাতা আমাদের জীর্ণ মূল্যবোধ। এখন এমন একটা যুগ যখন মানুষকে একা একা অচেনা পথে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে হবে, যখন সব কিছু অনুপাত ও ব্যবধান একাকার হয়ে গেছে, যখন সব কিছু অস্থির ও অনিশ্চিত, প্রাক্তন ও বর্তমান যখন সম্পর্কশূন্য। আর এই বিশৃঙ্খলার মধ্য হতে জয়সের শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে, কুমোরের চাকা থেকে যেমনভাবে কাদার তাল উঠে এসে নেয় নির্দিষ্ট ও সুসম আকার।

জয়স এমন এক প্রকরণ আবিষ্কার করেছেন যা তাঁর কাল ও বিষয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট। "ইউলিসিস" যদিও অবক্ষয়ের যুগকে কাহিনীরূপ দিয়েছে তবুও তা হতাশা ও নৈতিবাদের মহাকাব্য নয়, এমন কি আর্ত আত্মার নাটকও নয়। শুধু এপর্যন্ত বলা যায় যে, উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমকালীন মানবিক পরিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ, নায়ক বা নায়িকা হবার মতো কোনও গুণই তাদের নেই। অন্য যে কোনও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চাইতে স্টিফেন, লিয়োপোল্ড অথবা মলিকে আমরা দিনের শেষে অনেক বেশী অন্তরঙ্গভাবেই জানতে পারি। যদিও ডিকেন্স বা দস্তয়ভস্কি অঙ্কিত চরিত্রগুলির মতো আমরা তাদের ভালোবাসতে পারিনে। অথবা এমা বোভারির মতো সুস্পষ্ট রেখায় তারা পাঠকের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় না। এর কারণ বোধকরি এই যে জয়সের চরিত্রগুলিকে আমরা বাইরে থেকে দেখবার সুযোগ পাইনি। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার জন্যে যতটা দূরত্ব উপন্যাসের চরিত্র ও পাঠকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় তা রক্ষা করতে "ইউলিসিস"-এর লেখক একান্ত অনীহ। কতটুকু সময়ের জন্যেই বা উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রকে আমরা একত্রে দেখতে পাই? কিছুক্ষণের জন্যে বেলা কোহেনের প্রমোদাগারে, পরবর্তী দীর্ঘ পরিচ্ছেদে গাড়ি-চালকদের আড্ডায় এবং উভয়ের তর্ক-বিতর্ক ও কথোপকথনের পরিচ্ছেদে স্টিফেন ও লিয়োপোল্ডের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তারা দুজনেই মাতাল ও দুজনেই নিজের নিজের জগতে মগ্ন। গ্রন্থের শেষে

যেন বিচ্ছিন্নভাবে যোজনা করা হয়েছে মলি ব্লুমের জটিল চেতনাপ্রবাহ। চরিত্রগুলোকে এভাবে আলাদা আলাদা করে উপস্থাপনার পেছনে লেখকের সচেতন পরিকল্পনা সক্রিয়। স্ব স্ব চেতনার আবৃত হয়ে একালে ব্যক্তিস্বরূপ যেরূপ পরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাকেই প্রকট করে তোলা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

কিন্তু তারা নিঃসঙ্গ হয়েও এমন কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় যা তাদের সমাজ ও শ্রেণী হতে বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কশূন্য করতে পারে। বরং আপন যুগের প্রতি তাদের আনুগত্য আপন শ্রেণীর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা সর্বদাই প্রশ্নাতীত। যেহেতু তারা বিশিষ্ট নয়, তারা জনতারই অন্তর্গত, তাই তাদের ব্যক্তিস্বরূপ চিনতে ও বুঝতে সময় লাগে। স্টিফেন ও লিয়োপোল্ডের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে, তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জড়ো করতে করতে তাদের জীবনের ও বিশ্ব-নগর ডাবলিনের পথে পথে তাদের নিঃসঙ্গ ভ্রমণের সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাই। তাদের সঙ্গে সারাটি দিন অতিবাহিত করার ফলে আস্তে আস্তে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জন্ম নেয়, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। ঐকান্তিক নির্লিপ্তির সঙ্গে জয়স স্বীকার করেছেন মানুষের অসম্পূর্ণতাকে। যেসব চরিত্রকে তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন সে সবই খণ্ডিত, কিন্তু যে-চিত্র তিনি এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ। "ইউলিসিস"-এর গঠন কৌশল, প্রকরণ, ভাষার সম্পদ, ধ্বনির মূর্ছনা—এসব কোনও কিছুর মধ্যেই সাধারণত্বের একটি কণাও নেই, কিন্তু পাঠককে যা অভিভূত করে তা হলো সাধারণ মানুষের জন্যে জয়েসের অনন্য প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের সার্বভৌম আন্তরিকতা, তার গভীরতা ও বিস্তার। স্টিফেনের বিশ্লেষণী উক্তিতে "ইউলিসিস" একটি "লিফ্‌ট ফ্রম দি পায়সোনাল্ টু এপিক্", শিল্পীর জগৎ হতে অপসরণ তথা সাধারণ মানুষের আত্মার অন্বেষণ।

সত্যি বলতে, বিশেষ কজন মানুষ নয়, আমরা যে জীববংশকে মানব আখ্যায় চিহ্নিত করি তা-ই জয়সের আগ্রহের বিষয়। এই মানবের কাল যেমন অন্তহীন তেমনই তার জীবন পুনঃপুন চক্রাবর্তনের সমষ্টি। আর সেই জীবন অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু যোগ করেছে যে-সেতুটি তা গাঁথা হয়েছে অসংখ্য পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যানে, ওই জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়াজাত জাতি-ও-ব্যক্তি-গত স্মৃতি দিয়ে। অনাদি অনন্তকালের পটে অতীত বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ আর ওইসব পূর্বোক্ত চক্র ফুটে উঠছে, আবার যাচ্ছে মিলিয়ে। যেমন "ইউলিসিস"-এ তেমনই তার সর্বশেষ বৃহৎ রচনা "ফিনেগানস্ ওয়েক"-এ যে জটিল অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক চিন্তার স্রোত বা চেতনাপ্রবাহকে ভাষার ফাঁদ পেতে ধরেছেন তা আসলে তো সংখ্যাহীন স্মৃতির পুঞ্জ এবং তার মধ্য হতে উত্থিত অতীতের অভিজ্ঞতা ক্রমাগত মিশে গেছে বর্তমানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, তারপরে সেই বর্তমানই

নির্ধারণ করেছে ভবিষ্যৎকে। এইভাবে বহুদিন আগে ফেলে আসা কোনও ঘটনা বা উপলব্ধিকে কুড়িয়ে এনে স্মৃতি তা সমর্পণ করে বর্তমানের হাতে তখন তা পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিকের উজ্জ্বল আলোতে। একই সময়চেতনা রূপ পেয়েছে টি এস এলিয়টের কাব্যেও :

Time present and Time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.

একালে বর্তমান উদ্ভ্রান্ত ও বৈনাশিক, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও হতাশার আক্রান্ত তখনই অতীত এসে আচ্ছন্ন করে মানুষকে। গলাডক বিগত দিবসের জন্যে বিষাদ চেখভ বা মেটারলিঙ্কের রচনাতে গোধূলির করুণ আলোতে রঞ্জিত, কিন্তু জয়স বা প্রুস্ত, কিংবা মান অথবা ফকনরের রচনাতে কাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্যে বিধৃত। অবশ্য জয়স যাকে "এপিফানি" বলেছেন বা বর্তমানের প্রতিটি অপসিয়মান মুহূর্তকেও আটক করে আবার ভূত ও ভবিষ্যৎকেও একটি অভিজ্ঞতার বিন্দুতে বিলীন করে নেয় তার সঙ্গে প্রুস্তের সময়কে ব্যবহারের পদ্ধতি মেলে না। শেষোক্ত লেখকের কাছে বর্তমান রিক্ত, অসহনীয়, একমাত্র আশ্রয় অতীত, শব্দহীন অন্ধকার ঘরে আপন প্রাক্তন বাতীত তার আর কোনও অবলম্বন ছিল না, স্মৃতিই তার অস্তিত্বের সঙ্গী। অতীতের অভিজ্ঞতা ফিরে এসেছে প্রুস্তের রচনাতে, কিন্তু সে-প্রত্যাবর্তন ক্ষণস্থায়ী, আবার তা করে পড়েছে স্মরণের স্তরে। পক্ষান্তরে উইলিয়ম ফকনরের "দি সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি" আপাত চোখে বেনজি, কোয়েনটিন ও জেসন কম্পসনের লিপিবদ্ধ তিনটি ধারাবাহিক চিন্তাস্রোত—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিবৃত হয়েছে কম্পসন পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী—কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে লেখকের প্রাধান্য বিষয় হলো বর্তমান কর্তৃক প্রাক্তনের বিনাশ। এই সর্বধ্বংসী বর্তমানকে বুঝবে কে? কোয়েনটিন পাগলের মতো পৈতৃক ঘড়ির কাঁটা দুটো ভেঙে অস্বীকার করতে চেয়েছে বর্তমানের অপ্রতিরোধ্য পদক্ষেপ। হায়, সে কি জানত যে ওই পদক্ষেপ স্তব্ধ হলে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দও থেমে যাবে! কোয়েনটিনের মৃত্যুর তাৎপর্য হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার অনিবার্য ব্যর্থতা। যে বিচ্ছেদ অসেতুসম্ভব তার মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টার আত্মক্ষয় না করে প্রুস্ত অতীতকেই সত্য বলে মেনেছেন: তাঁর উপন্যাসের নায়ক সোয়ান কখনোই সময়কে পরাস্ত করার জন্যে ক্ষেপে যায়নি, কারণ সে জানে যাকে আমরা বর্তমান বলি তা-ও একদিন হবে স্মৃতির খাদ্য এবং ততদিন অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

বিষাদ নয়, বর্তমানের সর্বধ্বংসী অভিযানের দরুন বিলাপ টমাস মানের

প্রথম জীবনের রচনাবলীকে মর্মস্পর্শী করেছে। জয়সের যেমন স্টিফেন ডেডালাস তেমনই মানের আঁকা চরিত্রগুলির মতো টোনিয়ো ক্রোগার, গুস্তভ আশেনবাখ, হান্স কাস্টর্প প্রভৃতি চরিত্র—এদের সমস্যা হলো একান্তভাবে শিল্পীর। জুর স্থলে বাস্তব তথা বিভীষিকাময় বর্তমানের প্লাবন হতে নিষ্কৃতির জন্যে তাঁর শিল্পী-চরিত্রগুলোকে মান্ পলায়নে প্ররোচনা দিয়েছেন, তারাও বিমুগ্ধ পর্বতের শিখরে আরোহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হয় আশেনবাখের মতো ওই কুহকের স্বর্গে মৃত্যুবরণ করেছে, নতুবা কাস্টর্পের মতো বাধ্য হয়েছে সমতল রণক্ষেত্রে অবতরণে। এবং একথা এখানে দাগিয়ে বলে রাখা ভালো যে ওই অবতরণ, শুধু মানের সাহিত্যে নয়, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যে জয়েস তাৎপর্যপূর্ণ। ডেটলেফ লিলিয়েন ও শ্রীযুতী ক্লোটরইহান তাদের প্রচুর প্রতাপান্বিত বস্তুবাদী অঞ্জনদের হাত এড়িয়ে আশ্রয় খুঁজেছে "ট্রিস্টান" সঙ্গীতের স্বপ্নরাজ্যে, যেমন হাম্সেনস্টোম-এর উৎপাত থেকে টমাস ও হানো বাডেনব্রুক পলায়ন করেছে শোপেনহাওয়ারের সর্বেশ্বরবাদ দর্শনে ও ওয়াগনারের বাতাহত সঙ্গীতের উল্লাসে। কিন্তু জার্মান কাল্চার বা প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে নিরাপদ স্থিতির অন্বেষণে বাস্তবিক কতটুকু। সৌন্দর্যের জগতে ক্রোগার যে-সান্ত্বনা লাভ করেছে তা আক্ষেপমুক্ত নয়; আর শোপেনহাওয়ারের কাছ হতে টমাস যে-শান্তি পেয়েছে তা-ও ক্ষণস্থায়ী, পায়ের তলা থেকে অতীতের মাটি সরে যাবার পরিণামে তার মৃত্যু। অতএব প্রাচীন সংস্কৃতিতে অব্যাহতির অন্বেষণ অর্থহীন; তাতে কারও কারও পক্ষে সাময়িক উপশম হয় বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি তার এমন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেই যা উপস্থিত প্লাবন থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করতে পারে; অর্থাৎ আধুনিক ব্যক্তির জন্যে কাস্টর্পের মতো বিমুগ্ধ পর্বত হতে নেমে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

এই সাম্প্রতিক সীমাবদ্ধতা অনুধাবনেই জয়স অন্বেষণ করেছেন সেই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী যা সময়কে উত্তীর্ণ করবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে, যার অনাদ্যন্ত বিশ্বসত্ত্বে বিধৃত হবে সব দেশের সব কালের মানবজীবন। তাই লিয়োপোল্ড ব্লুম "এভরিম্যান অব্ নোম্যান", জন্মসূত্রে আইরিশ হলেও সে আসলে চিরকালের ভ্রাম্যমান ইহুদী ও অডিসিউস, "স্ট্রেট্ প্রব্লেমস্ আর ইন্ দি স্ট্রীট"—নীটশের এই অমোঘ সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য পক্ষান্তরে স্টিফেন ডেডালাস একজন আইরিশ কবি হয়েও এ-মহাকাব্যের টেলিমাকাস; প্রতীকের অন্তরালে দুজনে পিতাপুত্রের শাশ্বত সন্ধানে নিরত। "ফিনেগানস্ ওয়েক"-এ ইয়ারুইকার কি শুধুই একজন সরাইওয়ালা? সে তো আসলে মানববংশের আদিপিতা, একটি সর্বজনীন চরিত্র। তার পুরো নাম

হামফ্রে চিম্পডেন ইয়ারউইকার। নামটির আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে এ-বইয়ের মর্মকথা। "হিয়ার কামস্ এভরিবডি"। জয়স প্রথম জীবনে "একজাইলস" নাটক লিখেছিলেন যার মননজীবী নায়ক এতই জটিল ও দূরের মানুষ যে তার স্ত্রী বার্থারও স্বামীকে মনে হতো অচেনা আগন্তুক। আর শেষ-জীবনে এসে তিনি ইয়ারউইকারের মতো চরিত্র আঁকলেন। দু জীবনে আঁকা এই দুটি চরিত্র জয়সের মানসিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ করছে। এবং এভাবেই তাঁর চরিত্রগুলো আস্তে আস্তে তাদের ব্যক্তিস্বরূপকে উন্মোচন করেছে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রাগৈতিহাসিক দিন হতে আজকের দিন পর্যন্ত মানবেতিহাসের গোলকধাঁধা পার হয়ে আসি। স্বভাবতই এই অনুক্ষু ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে নরনারীর প্রেম, জনক-জাতকের সন্ধান ও সংঘাত, মানবের মহিমা ও স্খলন, পাপ ও অনুতাপ, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন এবং জীবনের তাবৎ মৌলিক তথ্য ও সত্য। অতিসর সংকীর্ণ দেশ ও কাল থেকে জয়স তাঁর চরিত্রগুলোকে সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু ইতিহাসের বিশাল পটে তাদের স্থাপন করেছেন এমনভাবে যাতে তারা অনেকান্ত তাৎপর্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে তারা যে-চরিত্রটির ভূমিকায় অবতীর্ণ সেই চরিত্রই ইতিহাসে চিরন্তন, বিংশ শতাব্দীর ডাবলিন-জনতা সমগ্র মানবেতিহাসের বিশ্ব-জনতা; যেহেতু ইতিহাস শুধু চক্রাবর্তন তাই তা "জয়কের দুঃস্বপ্ন"; আর এই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে: যেমন অতীতে যা নিহিত তা বর্তমানে জীবন্ত তেমনই এর বিপরীতটাও সমান সত্য। একদা এলিয়ট এক ভাষণে "ইউলিসিস" প্রসঙ্গে বলেন:

"In some minds certain memories, both from reading and from life, become charged with emotional significance. All these are used, so that intensity is gained at the expense of clarity. In fact, when Joyce evokes the past his sole purpose is to illuminate the present."

বর্তমান তাঁকে উদ্বাস্তু করেছিল বলেই জয়সের সমগ্র মনোযোগ ন্যস্ত হয়েছিল ইতিহাসের তথা কালধারার স্বরূপ সন্ধানে।

বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় সন্ধানকার্যের পদ্ধতি প্রবাসিদ্ধ পন্থা হতে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। পন্থার দিশা জয়স পেয়েছিলেন কুড়ি বছর বয়সে একটি ফরাসী উপন্যাস পাঠে। বইটির প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ, লেখক এদোয়ার দুজারদাঁ। প্রথম পাঠেই জয়স হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বইটির বর্ণনাভঙ্গির অভিনবত্ব ও সম্ভাবনা। শুরু থেকে আরা পর্যন্ত পাঠকের যাত্রাবর্ত্ম নায়কের মনোরাজ্যের ভিতর দিয়ে, গল্পাংশ নিতান্তই সামান্য। "ইউলিসিস"-এর মতো বৃহদায়তনক উপন্যাসের পেছনে দুজারদাঁর বইখানির

কোনও দূরতম অবদান থাকতে পারে একথা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে জয়স ছিলেন অকৃপণ। উপন্যাস বিস্মৃত হলেও দুজারদাঁ তখনও জীবিত। জয়সের স্বীকৃতির ফলে অন্তত কিছুদিনের জন্যে তিনি প্রতিফলিত গৌরব ভোগ করেন এবং তাঁর বইটির পুনর্মুদ্রণও হয়।

দুজারদাঁর ক্ষেত্রে যা হলো, অর্থাৎ অন্তর্হিত তথা নির্বাসিত ঘটনার বর্তমানে প্রজ্বালন, সেটাকেই শিল্প-সম্মত স্থায়ী ও সর্বাত্মক রূপ দেওয়ার পরীক্ষাকে জয়স সার্থক করেছেন। এলিয়েটের উদ্ধৃত উক্তি হতে এমন কথা ভাবা ভুল হবে যে অতীত ও জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার স্থূলীকরণই জয়সের উদ্দেশ্য ছিল; পক্ষান্তরে ঐক্য ও দ্বন্দ্ব, সমতান ও সামঞ্জস্যই তাঁর অভিপ্রেত। জীবনকে অখণ্ড রূপে উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় যে সব কিছুর সঙ্গেই সব কিছুর সম্পর্ক আছে। কোনও কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়, অবান্তর নয়। সব চেয়ে অশোভন জিনিসটিরও এই অখণ্ডতার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্থান আছে। এটা শুধু উপন্যাস রচনার কৌশলের প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দার্শনিক তথা অধিবিদ্যক প্রতীতি। প্রকৃত প্রস্তাবে যে রচনা এইরূপ কোনও প্রতীতির দ্বারা প্রণোদিত নয় তা কখনো মহৎ সৃষ্টি হতে পারে না। ভার্জিনিয়া উলফের সঙ্গে জয়সের মুখ্য পার্থক্য এই নয় যে একজনের রচনা চিত্রপ্রধান ও আর একজনের রচনা সুরপ্রধান। উভয়ের রচনা রীতিতে আপাত সাদৃশ্য বিস্তর এবং শ্রীমতী উলফ যদিও জয়সকে অপছন্দ করতেন তবুও তাঁর "দি ওয়েভস" আর "বিটুইন দি অ্যাক্টস"-এর উপরে "ইউলিসিস"-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। "দি ওয়েভস"-এ আমরা ছয়টি মনের ভাবনা-চিন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বর্ণনা পাই বটে, কিন্তু এত বড়ো উপন্যাস হতে, গল্প দূরে থাক কোনও কাহিনীও খুঁজে বের করতে পারিনে। তদুপরি উপন্যাসের চরিত্রগুলি এতই বৈশিষ্ট্যহীন, বলা যায় ব্যক্তিত্বহীন, যে পরিচ্ছেদের শীর্ষে জবানবন্দীদাতার নাম না উল্লেখ করে দিলে কোন্‌টি কার জবানবন্দী তা বোঝাই দায় হতো। এ-বইয়ের লিপিচাতুর্য অবিস্মরণীয়, তা সত্ত্বেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উপন্যাসটি রচনার আগে ও কালে শ্রীমতী উলফ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত, এমন কি কখনও বা অচেতন, ছিলেন। তাঁর "বিটুইন দি অ্যাক্টস"-ও একই রকম উদ্দেশ্যহীন রচনা। আর এই উদ্দেশ্যহীনতার মূলে হলো কোনরূপ প্রতীতির অভাব। পক্ষান্তরে জয়স তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। যে-বর্ণনা, যে-চরিত্র, যে-বাক্য এবং যে-শব্দ সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়ক নয় সে-সবের কোনও মূল্য নেই তাঁর কাছে। সর্বব্যাপী কালস্রোত ও কিংবদন্তির ভাব-সত্ত্ব সম্বন্ধে জয়সের প্রতীতি বদ্ধমূল ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক জীবনের অসংখ্য খণ্ড ও ভগ্ন অংশ, কূট ও সূক্ষ্ম বিবরণ, বিরোধী চিত্র ও

বিবাদী সূত্রকে একত্র করে জয়স গড়ে তুলেছেন "ইউলিসিস"-এর এই আবশ্যিক অখণ্ডতা। আর এই নির্মিতির জন্যে তিনি যে-প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন তা হলো চেতনাপ্রবাহের, ইয়ুঙের ভাষায় "দি রেসিয়াল আনকনশাস"-এর, সূত্র ধরে ব্যষ্টিগত স্বপ্ন থেকে সমষ্টিগত পুরাণে প্রয়াণ। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে আবৃত করে যে-জীবন তা শুধু শিল্পের উপকরণ, তাকে ভেঙে চুরে মহৎ শিল্পী আনা এক জীবন গড়ে তোলেন, তারই নাম শিল্প এবং যে-ভিত্তির উপরে শিল্প গড়ে ওঠে তা-ই শিল্পীর প্রতীতি।

অর্থাৎ তা হলো জীবনের প্রতি শিল্পীর এক বিশেষ বোধ যা তাঁর সত্তার সঙ্গে নিগূঢ়রূপে সম্পৃক্ত, সুসংবেদ্য, যার শক্তিতে শিল্পীর সমস্ত কীর্তি একটি ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন ইয়েটস অথবা ব্লেকের কবিতা। ইয়েটসের প্রথম দিকের রচনাবলী সুন্দর ও উজ্জ্বল, চিত্তগ্রাহী, কিন্তু প্রতিটির থেকে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন। যতই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুসন্ধান করতে লাগলেন ও নিজেকে নিরন্তর আবর্তিত করার মধ্যে বাঁধলেন ততই তাঁর কাব্যে একটা প্রত্যয় ফুটে উঠতে লাগল। এ-সময়ের কবিতাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটি কবিতার থেকে আর একটি কবিতা অবিচ্ছিন্ন, সে-অবিচ্ছিন্নতা যেন একটিই সুরের বিস্তার। কবির ওই প্রত্যয় হয়তো অধিকাংশে পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু শিল্পীর কাছে তা আলো হাওয়ার মতোই অকাট্য সত্য। প্রকৃতপক্ষে ওইরূপ একটি প্রত্যয় ছিল বলেই জয়সের সমগ্র সাহিত্যকীর্তিতে চোখে পড়ে অসাধারণ সামঞ্জস্য, একটি অপ্রতিম মৌল বিবর্তন।

"এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যানের" সঙ্গে তার প্রথম খসড়া "স্টিফেন হিরো"র প্রতি তুলনাতেই ধরা পড়বে যে কেমন করে বাইরের অভিজ্ঞতা-গুলির যথান্বিত বিবরণ ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিল্পীর মানসিক প্রক্রিয়ার একান্ত অন্তর্মুখী বর্ণনায়। উপন্যাসটির পরিণত রূপে প্রতীকতার প্রতি যে-প্রবণতা দেখা যায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শৈশবের সঙ্গে জড়িত নানা ধর্মীয় প্রতীকের অবিরাম শিল্পগত মূল্যায়নে। গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে শিল্পের মন্দিরে নায়কের উপনয়ন, এইটেই তো এ-উপন্যাসের কাহিনী। ফলে উপন্যাসটিতে পরীক্ষিত প্রকরণ যাথার্থ্য পেয়েছে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত সাযুজ্যে। শুধু ধর্মীয় প্রতীকগুলি নয়, শৈশব ও বাল্যের কিছুই তিনি ভোলেননি এবং যাদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন তাদের কাউকে তিনি মার্জনা করেননি। তাদের অনেককে তো প্রকৃত নামে উল্লেখ করে তীব্র সমালোচনা ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেছেন। বাড়ির প্রতিকূল আবহাওয়া, বিদ্যালয়ের উদাসীনতা ও অত্যাচার, কিংবা বিদ্যালয়ের পরম্পরাহিতা ও স্থূলতা —এই সব মিলে নায়ককে জীবনবিমুখ, নৈঃসঙ্গ-অভিলাষী ও দাম্ভিক করেছে।

তাই স্টিফেন আপনাকে যুক্ত করেছে শিল্পীর মনোজগতের সহিত। সে বুঝেছে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিত্যাগ করে তাকে নতুন জগৎ গড়তে হবে। শিল্পই তো সেই নতুন জগৎ। স্টিফেন তার বয়ঃসন্ধির প্রবুদ্ধধ্বনি তুলেছে।

"His soul had arisen from the grave of boyhood, spurning her grave-clothes. Yes. Yes. Yes. He would create proudly out of the freedom and power of his soul, as the great artificer whose name he bore, a living thing new and soaring and beautiful, impalpable, imperishable."

এবং পুনরায় সমুদ্রের ধারে একটি মেয়েকে দেখে স্টিফেনের মনে হয় ওই মেয়েটি তার উল্লাস ও উত্তরণের প্রতীক:

"Heavenly God, cried Stephen's soul, in an outburst of profane joy..Her image had passed into his soul for ever and no word had broken the holy silence of his ecstasy. Her eyes had called him and his soul had leaped at the call. To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. A wild angel had appeared to him, the angel of mortal youth and beauty, an envoy from fair courts of life, to throw open before him in an instant of ecstasy the gates of all the ways of error and glory. On and on and on and on."

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতের বিরুদ্ধে জয়সের যুদ্ধ "ইউলিসিস"-এ আরও এগিয়েছে। শৈশব ও বাল্যের জগৎ ছিল অগভীর ও সংকীর্ণ, পরিণত বয়সের সমস্তই এখন বহুগুণে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে অর্থাৎ জয়সের যেটা-প্রাথমিক উপলব্ধি কালস্রোতে তার কোনও গুণগত পরিবর্তন হয় না, যা হয় তা সম্পূর্ণ পরিমাণগত, যা শিথিল ছিল তা-ই এখন হাড়ে মজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে বদ্ধমূল। স্টিফেনের ডাবলিন পরিত্যাগ বহুতর বর্জনশীলতার পরিচায়ক—এই নগরের বিশ্বাসহীন ধর্মাচরণ, সত্যচ্ছিন্ন সংস্কার, সহানুভূতিহীন সমাজ, ভাগাহীন জীবনধারা—এই নগর বিশে শতাব্দীর বিশ্বের কুক্ষিকা। মানুষ যে একাকী ও পরিত্রাণ এই উপলব্ধি তার সমস্ত জীবনচর্যায় কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকট রূপে সর্বদা প্রবাহিত। তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সে নিজেই ঘোষণা করেছে:

"The artist, like the God of the creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, irresponsible, refined out of existence, indifferent."

শিল্পের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পেছনের পৃথিবীকে অস্বীকার করতে চেয়েছে স্টিফেন। সর্বপ্রকার অস্বীকারের সে প্রতিমূর্তি।

পক্ষান্তরে লিয়োপোল্ড হলো "এ ওয়ার্কিং ম্যাথিথীসিস" আধুনিক জীবনের অর্থহীনতার অমার্জ অভিব্যক্তি। সে যেমন স্থূল তেমনই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ভস্তু ও পাখির দেহাভ্যন্তরের বস্তুনি সম্বন্ধে তার রসনাপ্রীতির প্রসঙ্গ দিয়ে পাঠকের সঙ্গে উপন্যাসে তার প্রথম পরিচয়; তার প্রিয় খাদ্য বিশেষ ভাবে রন্ধিত গরুর-যকৃৎ, তার আনন্দ মলত্যাগে। "ইউলিসিস"-এর বৃহত্তর অংশ ডাবলিনে শ্রীযুক্ত ব্লুমের যে কোনও একটি দিনযাপনের সবিস্তর বিবরণ: একলেস স্ট্রীটের বাড়িতে সকাল সাতটায় প্রাতঃরাশ, প্যাডি ডিগনামের শবযাত্রায় যোগদান, দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে গ্রন্থাগারে শহরের পথে পথে যাওয়া-আসা, গার্টি ম্যাক ডুয়েলের সঙ্গে অভিনয়, প্রসূতি সদনে হাজিরা, ডেডলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বেলা কোহেনের প্রমোদাবাসে উভয়ের অভিযান। সারাদিনের জন্যে তার সঙ্গী হয়ে পাঠকের মনে জাগে অশেষ বিরক্তি; এবং বারবার তার মনে এ-প্রশ্নই ওঠে যে লোকটার উদ্দেশ্য কী, কেন সে এভাবে ঘুরছে, এমন একটা লোকের বেঁচে থাকার কী সার্থকতা, পৃথিবীতে তার মূল্য কোনখানে! পাঠকের মনে একবার অমন প্রশ্ন জাগাতে পারলেই লেখকের লক্ষ্যভেদ। কারণ তিনি জানেন যে ওই প্রশ্ন কোন-না-কোন সময়ে গতি পরিবর্তন করে পাঠকের আত্মাভিমুখী হবে। দৈনন্দিনকার জীবনযাত্রায় আমাদের চেতনার চারপাশে অভ্যাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের যে কঠিন আবরণ গড়ে ওঠে তার মধ্যে ওই প্রশ্নের দুর্মর কীট প্রবেশ করিয়ে দেওয়াই জয়সের উদ্দেশ্য।

স্টিফেন ও লিয়োপোল্ড পরস্পরের পরিপূরক। একজন শিল্পী হিসেবে নির্বাসিত, অপরজন ইহুদী হিসেবে। লিয়োপোল্ডের মন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দর্পণ যার মধ্যে তাদের দুজনকে ঘিরে আবর্তমান বিশ্ব প্রতিফলিত, যার মধ্যে ডাবলিন শহরটা বিবিধ চিত্রকল্পে মূর্ত; সে যেমন আত্মচেতন তেমনই ঘটনার যথাযথ রূপ গ্রহণে ও সংগ্রহে সারাক্ষণ ব্যাপৃত। পক্ষান্তরে ডেডলাস সর্বদা বাস্তবকে পরিহার করে দুঃস্বপ্ন ও আত্মান্বেষণে মগ্ন। তার মধ্যে ব্লুম পেয়েছে আপন মৃত পুত্র রুডিকে, যার জন্যে একটা গোপন কাঁটা সারা-দিন থেকে থেকে খোঁচা দিয়েছিল। একজন পোড়-খাওয়া বাস্তববাদী স্নেহ-পরায়ণ পিতা, অপরজন স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ পুত্র। উপন্যাসের শেষে লিয়োপোল্ড অভিমানে ক্ষুব্ধ স্টিফেনকে শান্ত করতে করতে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাদের পথ এক হতে পারে? তখন অনেক অনেক রাত, দুজন দুটি পথ ধরে এগিয়ে যায়। কাহিনীর শেষ নয়, দিনের শেষ। এই রাতও ভোর হবে, দিনের পরে দিন আসবে, সূর্য উঠবে, জীবন-

স্রোত বয়ে চলবে অনাদি অন্তহীনতায়। এ-কাহিনীর শেষ কোথায়! অশেষ কাহিনীর একটি কণা "ইউলিসিস"। অকূল সিন্ধু বন্দী হয়েছে একটি বিন্দুতে। এ-উপন্যাসের শেষ সিদ্ধান্ত হলো এই যে শারীরিক অর্থেও স্টিফেন থাকবে নির্বাসনে আর লিওপোল্ড ডাবলিনে। স্টিফেন তো নির্বাসনেই ছিল। অর্ধাশনে জর্জরিত তার ছ মাসের প্যারিস-জীবনে ছেদ এনে দিল একটি টেলিগ্রাম, "মাদার ডাইং কাম হোম ফাদার" ডাবলিনে ফিরে এল স্টিফেন। কিন্তু ক্যাথলিকতার বিরুদ্ধে তার আপত্তি এত প্রবল যে মুমূর্ষু মা যখন তাকে প্রার্থনা করতে মিনতি করলেন তখনও সে তা রাখতে পারল না। তারপরে এল অনুশোচনা, তার প্রতিটি মুহূর্তকে তাড়া করে ফিরতে লাগল বিভীষিকা হয়ে:

"Silently, in a dream she had come to him after death, her wasted body within its loose brown grave clothes giving off an odour of wax and rosewood, a faint odour of wetted ashes."

আজ সারাদিন একটা অপরাধবোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, ডাবলিনের কোনও কোণেই সে অব্যাহতি পায়নি সেই বোকটার বারান্দা কামড় থেকে। যে প্রার্থনা সেদিন তার গলায় আটকে গেছল তা-ই আজ ফিরে ফিরে মনে আসছে।

"Her hoarse loud breath rattling in horror, while all prayed on their knees. Her eyes on me to strike me down. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet : inbilantium te virginum chorus excipiat."

লিওপোল্ড জৈব-অস্তিত্বসর্বস্ব বলে যে তার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় ছিল এমন কথা ভাবা ভুল; সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, চতুরও বটে। এবং তার মধ্যে যে একটা "টাচ অব দি আর্টিস্ট" আছে এ-কথাটা উপন্যাসের অন্তত একটি চরিত্র বলেছে, সে লেনেহান, অন্তত একটি চরিত্র সে-কথা মেনেছে, সে ম্যাকন্ন। শিল্পী হিসেবে তার যতটা হতাশা ছিল স্টিফেনের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পক্ষে তা যথেষ্ট। পক্ষান্তরে স্টিফেনেরও এমন অনেক নৈরাশ্য ছিল ব্লুমের সংস্পর্শে যার নিবৃত্তি। একজনের যেটা অভাব সেটাই অপরজনের স্বভাব। একজনকে বাদ দিলে অপরজন অপূর্ণ। ডেডালাস্ বিশ্লেষণী চিত্তবৃত্তি দিয়ে আর ব্লুম ঐহিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়ে সংস্কৃতি ও অসংস্কৃতির, হেলেনিজম ও হিব্রুইজমের বিভেদ নির্দেশ করেছে। প্রথাবিত জীবনের কড়-কব্জা একজনকে করেছে অবিচ্ছিন্ন, অপরজনকে আলালীন, একজনকে অন্তর্মুখী, অপরজনকে বহির্মুখী। একজন চিত্রপ্রকর্ষের, অপরজন স্থূল জৈব অস্তিত্বের প্রতিমূর্তি। এই দুটি বিপরীত চরিত্র কোনও সুসমঞ্জস ঐকতান সৃষ্টি করতে অক্ষম।

অথচ "ইউলিসিস" সত্যিই একটি অনন্য ঐকতান। আর তা সৃষ্টি করা জয়সের পক্ষে সম্ভব হয়েছে মলি ব্লুমকে এনে। সব শেষে তাকে আনা হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসে সে মোটেই প্রক্ষিপ্ত নয়। মলিই জয়সের বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেন্দ্র। পুরুষের অভীপ্সার ও পারস্পরিক বৈপরীত্যে বোনা জীবন একটা অচ্ছেদ্য জাল যার মধ্য দিয়ে মলির দীর্ঘ নৈশ রোমন্থনপরায়ণ ছেদবর্তিহীন স্বচ্ছন্দ ভাবণ অবহমান কাল ধরে প্রবাহিত। নারীর ঋতুচক্র-সদৃশ স্বতঃস্ফূর্ত অনুষঙ্গে তার অবাধ চিন্তার স্তরগুলি পরম্পরাক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। দান্তে বা গোটের নায়িকার মতো সরাসরি ভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের নয়, মলি এই অপলাপী যন্ত্রণা নির্ভুল যুগে কেন্দ্রাসীনা ধরিত্রীর উর্বরাশক্তির প্রতীক। তার কোনও ক্রিয়া নেই, কারণ তার মধ্যে সকল বিরোধ ও বিবাদ অবসিত। অপ্রতিরোধ্য সদর্থকতায় তার স্বগতোক্তির পরিসমাপ্তি :

"and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feal my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes."

মলির এই উক্তিতে অস্তিত্ব ও সৃষ্টির প্রতি যে-বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে তা যোগীসাধকদের গূঢ়তম অধ্যাত্ম অনুভূতিরই শামিল।

স্টিফেন ডেডালাস যদি স্বপ্নজগতের আর লিয়োপোল্ড ব্লুম বাস্তবজগতের মানুষ হয়ে থাকে, তবে মলি ব্লুম উভয়ের মধ্যেকার সেতু। জয়স বিশ্বাস করতেন যে স্রষ্টা বা শিল্পীর কাজ এই দুই বিপরীত জগতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সংগতিসাধন করা। ট্রিয়েস্তে একবার তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যে কোন দুজন ইংরেজ লেখকের উপরে বক্তৃতা করার জন্যে। তিনি ডানিয়েল ডিফো ও উইলিয়ম ব্লেককে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতার বিষয় হিসেবে। এই নির্বাচনের কারণ কী? প্রথমজন যেমন বাস্তবানুগ শেষোক্তজন তেমনই কল্পনা-ও-অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। জয়সের সাহিত্যিক বিবর্তনও এই ধারা অনুসরণ করেছে। বিবর্তনের এক প্রান্তে রয়েছে "এ পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান", অপর প্রান্তে অবস্থিত "ফিনেগানস ওয়েক" একটি যথাস্থিতবাদের পরাকাষ্ঠা, অপরটি প্রতীকবাদের। "ইউলিসিস" দুটি প্রান্তের সেতুবন্ধন। জয়স যখন "ইউলিসিস" রচনা শুরু করলেন তখন তাঁর সামনে হোমরের "অডিসি"-র মতো দান্তের "ডিভাইন কমেডি"-ও ছিল আদর্শ রূপে। "ইউলিসিস" ও "ফিনেগানস ওয়েক" হলো তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে 'ইনফার্নো' ও 'পারগেতোরিয়ো'। কিন্তু 'প্যারাডাইসো'-র খসড়া করাই সার হলো,

তা লেখার আগেই এল যে-স্বর্গ তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন সেখানের ডাক। তবে দান্তের মহাকাব্যের সঙ্গে জয়সের পরিকল্পনার যে সাদৃশ্য তারও সীমা আছে। স্ব স্ব তাৎপর্যে "ইউলিসিস" ও "ফিনেগানস ওয়েক" দুখানিই কমেডি। টীকা-টিপ্পনির খাতায় জয়স স্বয়ং লিখেছিলেন,

"Tragedy is the imperfect manner and comedy the perfect manner in art."

সুখী পরিণাম নয়, এখানে কমেডির অর্থ অখণ্ডতা। জয়সের উপন্যাস জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলোকে একত্র করে শিল্পসিদ্ধ এক অখণ্ড রূপ দিয়েছে।

(ক্রমশ)

কবিতাবলী । কবির ভাষা

চিত্ত ঘোষ

কথা সাজিয়ে কবিতার কতখানি ব্যক্ত করা যায় জানি না। অভ্যাসবশত যা লিখি বা ভিন্ন কারণে লিখতে সচেষ্ট হই, স্পষ্ট না হ'ক, বা যত অস্পষ্টই হ'ক, তার একটি আকার মানসে থাকে। কুণ্ঠার সে আকার যেন প্রায় নারী-স্বভাব। অথচ তার অভাবনীয় মায়া।

কবিতা হয়তো বা অনুভবের অতিত্র উত্তীর্ণ। উপলব্ধির নিকটতম কথা। কথার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ অসামান্য রূপ। শব্দ কবিতার শক্তি এবং সময় পটভূমি। জীবন আস্বাদ এবং কোন মৃত্যুই শেষ নয়। কবিতা রচনা বহুবিধ অর্জন এবং আরম্ভের অনুগামী বলে মনে হয়। মনে হয় সেই বিদীর্ণ মানস সততার আশ্রয়ে স্থিত হলে শূন্য সীমা সমীপবর্তী হতে পারে।

পৃথিবীর আদি কবিতার অশেষ আরম্ভ এবং তদবধি বিপুল উজ্জ্বল অফুরন্ত প্রবাহরূপ আমি সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে চাই।

আমরা দেখেছিলাম

আকাশে চোখ আর চন্দনার সাঁতার
রোদের রঙ গাছের গা বেয়ে নামে
কোনো ভোর জামুলের ডালে দাঁড়িয়ে দেখে
মেঘের হাত কলস উপুড় করে।
খুশি শিকড়গুলো আস্তে আস্তে ঠোঁট মেলে
নানা কোমলতা ভিজে ওঠে।
হাওয়ার মৌ মৌ করে বউলের গন্ধ
বিচিত্র ফড়িঙ উড়ে বেড়ায়
অনেক মৌমাছি চাক বাঁধে
মৌলিরা চাক ভাঙে, আগুনে জেলে পোড়ায়
দশহাতে মধু লুটে করে।

উত্তরসূরী

আর রাত্তিরে মোম জ্বালাবার জন্য
অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে।
সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে
হারিয়ে যায় চোখ আর চন্দনার সাঁতার
যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এসব দেখেছিলাম
সেখানে একটা নিশান পুঁতি।

একদিন ডাকবে

আমাদের গায়ের কেটে-বসা কয়েকটা দাগ
আর কিছুতে মোছে না।
বাতাহত সময়ের চিহ্ন সেগুলো।
মৌলিক মুহূর্ত অনাবৃত হলে
বড় বড় বৃষ্টির ফোটার শব্দ শোনা যায়
কোনো দৃশ্য আলোড়নের মত ফাটে
কোনো দিন প্রতিবিম্বের মত কাঁপে
কোন ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে মিলায়।
আকাশের রঙ ঘুরে ঘুরে এখন সাদা
অনেক মেঘ সাঁতরে সাঁতরে সূর্যকে ছোঁবে
ব্যাপ্ত ধ্বনিপুঞ্জে নড়ে ওঠে
দূরে বিন্দুর কাছে গিয়ে শুনব
আহত অশ্রুধ্বনিময়তা।
রাত্রি যেন তারা ধরার কৌশলী জাল ;
সেই জালে বন্দী চোখের চাউনি
ভিজিয়ে দেবে আমার ঘুম
আর সে ঘুমের জানালায় দাঁড়িয়ে
একদিন আমার নাম ধরে ডাকবে রোদ্দুর।

প্রবেশদ্বারের কাছে

প্রবেশদ্বারের দিকে দৃষ্টি পথ।
প্রাচীরে দুর্যোগ দৃশ্যে রচিত সময়
দৃষ্টির সম্মুখে যেন পরভোগ্যা প্রেমিকা আমার।

যাবো বলি—
ফেলে যাবো শুধু এই প্রতারিত অশুচি উষ্মায়
শিকড়ের মুখে চির অশ্রুপাত
শিরনাস্তি গাছে ফুল, পতঙ্গের সমন্বিত শোক।

ফিরে আসি নদীর উঠোনে, গন্ধে, জলে
ফিরে আসি বৃক্ষতলে, ছায়ার ভিতর
কমল স্নায়ুর স্রোত যারি
যৌত করে পাহাড়ের কঠিন উচ্চতা

প্রান্তসীমাতটে কার মুখ।
উপরিভাগের দিকে বিপুল বল্লরী শোভা
দূষিত বলয় পৃষ্ঠে অগণিত পাখি।
মুখশ্রী, হৃদয়, অশ্রু, স্বর
প্রবেশদ্বারের দিকে টানে:
দুটি শুপ্ত প্রতিমূর্তি কারা
প্রবেশদ্বারের কাছে থাকে।

যে দিকে

দিনগুলো ফেরাই কোনদিকে
কোনমুখো বিহ্বলভূমি, পথ!
পা মুড়ে বসতে চায় ছায়া
নিয়ে আসে নিকটের প্রতিধ্বনি, মুখ।

নদীর শিরায় টান, ছিন্নতা প্রবল
শালিখের গর্ত চোখ, বিলীনতা বায়ু
দিনগুলো পা ডোবায় জলে
ভেসে যায় সারি সারি নৌকোর একতা।

যে সব গাছের বুক ছায়া দিল, তারা
যে সব ফলের স্বাদ স্মরণীয়, তারা

উত্তরসূরী

যে সব হৃদয় ঘুরে স্মৃতি লক্ষ, তারা
দিনগুলোকে ঘিরে রাখে যেন।

এই জলে ধুয়ে ফেলো ধুলো
ভালবাসা ভরুক কলস।
যেন শিশুবৃক্ষ পায় জল
যেন জলে প্রিয় এক প্রতিবিম্ব থাকে।

যে দিকে ফেরাই যেন হৃদয়ের মুখ
স্পর্শ করে কোমলতা, আহত কঠিন।
যেন ভেজা মাঠ থেকে টলটলে হাওয়ায়
দিনগুলো সিঁড়ির মত ছায়া ধরে থুকে।

কবিতাবলী ১ কবির ভাষা

আলোকে সহকার

প্রথম জন্মদিন অলৌকিক অজানা। প্রথম জন্মভূমি, তার আকাশ, তার সমগ্রতার সচ্ছল আলোক—তারই অন্বেষণে আমার অভিযাত্রা। প্রথম জন্মদিন, তার গভীরতম অশ্রান্তি, শিকড়হীনতার যন্ত্রণা প্রতিটি রহস্যের চূড়ায় সংকেত নির্দেশ। এই শিকড়হীনতা, এই রহস্য কবিতার অন্তর্না পটভূমি। তন্ময় অন্তরালে একদিন হিরণ্ময় প্রস্তুতি, একদিন বিকীর্ণ সমারোহ, নিশ্চিত সংযুক্তি অথচ সেই আত্মীয়তা নির্মোহ অস্বীকার। সমস্ত জীবন মনে হয় অনিকেত, উদ্বাস্তু, সেইখানে এমনকি প্রেমিকাও অসম্পূর্ণ ভয়াবহ অন্ধকার, রৌদ্রদীপ্ত দিন অবরুদ্ধ অবগুণ্ঠনের গাঢ়তম আন্তরিকতায় মুহূর্ত প্রখরতম অরুণ নিনাদ। এই অন্ধকার, এই অবরোধ, এই প্রখরতম অরুণ নিনাদ আমার কবিতার অন্তর্লীন একাকীত্ব; কবিতায় যে মৌলিক দ্বিতীয় বিশ্ব রচনার প্রয়াস তার ভিতর সেই বাস্তব অভাবনীয়ের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করি।

জন্ম

যা কিছু স্থবির তাই মৃত। জীবন অর্ঘই
গতিময় বিদ্যুতি রেখার দ্যুতি। গোধূলিবেলার মেঘ
দিকে দিকে সম্পূর্ণ অথচ ম্লান দিগন্ত অথই
নিয়ে অবারিত করে অসীম নিস্পৃহ। একদিন সকালবেলায়
একটি বকুল তুলেছিলে অভিমান নিরুদ্ধ আবেগ।
আজ কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, আর্ত অস্বীকৃতি
আনে না দ্বিতীয় চিত্র রৌদ্রময়, প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠ স্পর্ধায়।

কেবল একটি স্থির শ্বেতপদ্ম সারাদিবসের দীর্ঘ স্মৃতি
নিয়ে উচ্চারিত। আর পশ্চিম আকাশে
হাজার রঙের মেঘ নিভে গেলে অন্ধকার নিস্পন্দ নির্বাক।

উত্তরসূরী

যেন স্বাভাবিক, যেন প্রত্যাশার ছিলো, যেন নীরব বিশ্বাসে
এই অন্ধকার কাছে চেয়েছিলে। দুপুরবেলার সেই
বাগান কি মনে আছে? সারাদিন বিকৃত ঘোষণা, তীব্র তীক্ষ্ণ ডাক।
অন্ধকারে কোনো প্রতিচ্ছবি নেই, এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

শুধু শ্বেতপদ্ম জ্বলে স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ গৌরব। দুপুরবেলার
বাগানে গোলাপ ছিলো, কৃষ্ণচূড়া ছিলো, তার মাঝে
শ্বেতপদ্ম খণ্ডিত প্রকাশ। বন্ধুহীন সান্দ্র অন্ধকার
শ্বেতপদ্মের পাশে কিছুই রাখে না। অন্ধকার তাই
ভালোবাসো? অন্ধকার কেবল একটি উচ্চারণ, সেইখানে তন্ময় উল্লাসে
নিজেকে সহেত করে শ্বেতপদ্ম। মৃত্যুর অদৃশ্য রোদনাই
দিকে-দিকে অমোঘ গোপন জাগে স্থবির নিস্পৃহ অস্বীকারে।

স্থবিরতা কখনোই ভালো নয়। কিন্তু কোন শান্ত ব্যবহারে
স্থবিরতা মৃত্যুকে নিঃশেষ মোছে। গতিময় সহেত আঁধার
যেন মৌন নিলীখিনী পার হয় তিমির ভুবন।
সহসা নদীর রেখা চোখে পড়ে, আম্রকুঞ্জতলে
একটি খড়ের বাড়ি দরজা-জানলা খোলা, নম্র উপচার
দ্বিতীয় প্রেমিকা শুভ্র হাতে আনে। স্থির শ্বেতপদ্ম রাখো
স্বাগত দু-হাতে আর মিলনমুহূর্তে জ্বলে আদিগন্ত অরূপ নির্জন।

ছবি

সকল ছবিই গাঢ় অন্বেষণ আনে। মাঝে-মাঝে
দু-একটি ইপ্সিত শুধু ধ্বনিময়। কিন্তু মাঝে-মাঝে
কোথাও সংযোগ নেই, কেবল সহসা এক অকথিত সাজে
নিয়ে যায় বিজন পথের শেষে। তখন সমস্তবেলা
অত্যন্ত আগ্রহ আর নিঃস্ব অনিকেত অনুভব।

কোথাও নিশ্চিত আছে পরিচিতি। যেখানেই অতন্দ্র নীরব
সেখানেই খোঁজ করি। সব নীরবতা জেগে থাকে।
রাত্রির বাগানে ফুল জেগে থাকে এক ছায়ালীন পরিচিতি

বুকে নিয়ে, সন্ধ্যার আকাশে মেঘ, সহসার বাঁকে
সেই দেবদারু। মনে হয় দীর্ঘ অন্তরাল
সকল ছবির মধ্যে জেগে আছে—ধ্বনিময় প্রসন্ন সম্প্রীতি
বিরাট কপাট খোলে বারবার, মেলে দেয় স্বাগত সকাল।

কিন্তু কোনখানে সেতু, মিলনী সংযোগ? গ্রহণ করার প্রয়োজনে
স্বচ্ছ উন্মোচন চাই। সব ছবি
সুদূর অপরিচয়। শুধু মাঝে-মাঝে সঘন নির্জনে
হাজার হীরার দ্যুতি অশ্রুময়, নিয়ে যায় আলো-অন্ধকার
বনের ভিতরে। সেইখানে পদচিহ্নহীন মাটি, সেইখানে মৌলিক পিপাসা
পাশ দিয়ে কখনো হরিণ চলে যায়, কখনো বা তামসী ছায়ার
ভিতরে বিদ্যুতি গাঢ় আবির্ভাব। এইসব অস্ফুট স্মৃতির
গুঞ্জনে আকাশ আরো নিশীথিনী, সব ছবি উদ্ভাবি আঁধার।

মুহূর্ত

সেইদিন আমার পড়ে না মনে যেদিন তোমায়
স্মৃতি থেকে আমি মুক্ত। সে কোনো আনন্দ নয়, দুঃখ নয়, যেমন মলিন
পাতা ঝরে যায় কিম্বা সন্ধ্যা নামে ম্লান অন্ধকার
তেমন সহজ সেই ভুলে-যাওয়া। ঘটনাবিহীন
মুহূর্তকে কেবা মনে রাখে, যে-মুহূর্ত কোথাও রাখে না কোনো ছবি।
শব্দহীন চিহ্নহীন মুছে গেল আমাদের প্রেম। তবু কোনখানে
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় চারিদিকে সবই
নিরাসক্ত কঠোর শীতল নিয়ে উপেক্ষার তীক্ষ্ণ ক্লেদ হানে—
এতো বড়ো দুঃখ তাকে এমন সহজে ভুলে-যাওয়া।

এখন যে রমণীকে ভালোবাসি, শ্যামলিম দীর্ঘ শান্ত ছায়া
নিয়ে যে রমণী আছে কাছাকাছি, দু-বছর আগে
তার নাম আমার অপরিচিত ছিলো। কী করে কখন সব এক হয়ে যায়
মিলিত উত্তাপে কাঁপে বসন্তেরা, স্বাভাবিক রক্ত অভিভবে
আমার রমণী আর আমি শুধু। তবু কোনখানে
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় ক্রূর হিংস্র হাওয়া

হঠাৎ বা পাশ দিয়ে চলে গেলো। সর্পিল ধূসর হতমানে
আহত আক্ষেপ যেন বটগাছ। মুহূর্ত হয়েছে ছবি কিন্তু কোন
নিস্তব্ধ ধারাজলে
সকলই অস্পষ্ট যেন বিকেলবেলার মেঘ, সমারোহ নিঃসীম মিলায়।

মুহূর্তকে ছবির আধারে মনে রাখি। কিন্তু কেন নিষ্প্রাণ প্রখর
চিহ্নহীন অসংখ্য মুহূর্ত এসে সব ছবি মুছে দিয়ে যায়।
বোঝাই যায় না কিছু! পরিচিত প্রীতিগুলি, বন্ধুজনার বিস্তীর্ণ প্রহর
চারিদিকে দ্যুতিময় বিচিত্র আকাশ জেবলে উত্তরের একটি রক্তিম
আজ তার স্মরণেও ভ্রান্তি আসে। ঘটনাও নিঃশেষ হারায়
ঘটনাবিহীন নিস্তব্ধ মুহূর্তের হাতে। সব ধ্বনি, শব্দ, আয়োজন
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় দিগন্ত অসীম
একটি মেঘের ভীত জ্বলে-ওঠা, নিভে-যাওয়া, অবিশ্রান্ত ধুলো-ওড়া পথে
দেখায় তামসী গাঢ় অন্তরাল, চিহ্নহীন প্রবাহিত গহন নির্জন।

অন্তগত সবিতার উত্তরাধিকার

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অতএব মিখাএল এঞ্জেলোকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি নাকি জীবনে দেবদূত দেখেন নি, তাই জানতেন না দেবদূত কি করে আঁকতে হয়। আরো মুস্কিলে পড়েছিলেন দেবদূতের ডানাজোড়া নিয়ে। ডানা দুটো কি উল, সিল্ক না হাড়-মাংস জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরী, কেউ তার হদিশ দিতে পারেনি। আর সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল বাঁধিয়েছিল দেবদূতের মাথার পেছনে জ্যোতিঃপুঞ্জ নোছের একটা গোলমেলে ব্যাপার। ওটা কি কোন শস্ত ধাতু দিয়ে তৈরী বা রামধনু ধাঁচের একটা বাতাসী ব্যাপার, মিখাএল বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই তাঁকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল।

দরজাটা বন্ধ করতেই মিখাএল অনুভব করলেন এই প্রথম তিনি আর মৃত্যু মুখোমুখী। মেরুদাঁড়ার ব্যারোমিটার নিয়ে ভয় কাঠবেড়ালীর মত ওঠানামা করতে লাগল। ওই পাথুরে টেবলটার ওপর চাকনার আড়ালে কে মরে হিম হয়ে আছে?

এসব কি ভাবছ মিখাএল। তোমাকে মাত্র তিনঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে। ছুরীকাঁচিগুলো কোথা থেকে বের কর। মরাই হোক আর জ্যান্তোই হোক, শরীরটা তো ঠিক একই জিনিস নিয়ে তৈরী। আত্মা-টাত্মা নিয়ে তোমার করেবার নয়। মোমবাতিটা ধরাও। এসো। চাকনাটা খোল।

.ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে জানি না এ আমি কি করছি। শীতাংশু কাম্পি মিখাএল একটানে চাকনাটা খুলে ফেললেন। তাঁর নাক একরাশ কিরম গন্ধকে শুকে নিল, যেন পুরোনো ফুলগুলো জলের ভেতরে মরে যাচ্ছে। ছুরীকাঁচির ঝকঝানিতে একটা দানব আর্তনাদ জাগল এবং মৃত লোকটির বাঁদিকের পাঁজর ঘেঁষে একটা বাঁকানো ইস্পাতের ফলক বিনাভূমিকায় ঢুকে গেল। মানুষের ঘৃণাকে ছাপিয়ে উঠল ডাক্তরের চিরাচরিত কৌতূহল। পরপর বাইশটি রাত নিষিদ্ধ ফলের লোভে লাশকাটা ঘরে মৃত মানুষের হাত পা মাথা বুক পেট শিরা-উপশিরা তন্তু মজ্জা মিখাএল ছিঁড়ে কেটে দেখলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মহান পোপের তর্জনীর খাড়া সংকেতে শাসিত মধ্যযুগের রোমোপ মিখাএলের এই গোপন নৈশাভিসারের খবর পেল না। ছবি আঁকতে বা পাথরে মূর্তি কুঁদে তুলতে গিয়ে শরীর-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পাঠ নেয়া সেদিন

খৃষ্টধর্মে নরহত্যার পাতকরূপে সিদ্ধ হত। ভারী কিমোনো গোছের পোষাকে ঢাকা শরীর আর মোমছাঁচ মুখ নিয়ে ফ্লরেন্টাইনরা পথে-ঘাটে হেঁটে যাচ্ছে, সাদা চোখে তাদের যেটুকু দেখার দ্যাখো। নগ্ন বা মৃতদেহকে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখে তার আনলে শিল্প-টিল্প করা চলবে না।

অথচ সিসটিন শ্যাপেলের গায়ে 'আদমের নবজন্ম' ঐ নৈশাভিসারের প্রবল ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত পরবর্তী রেনেসাঁসের চোখের সামনে অমন একান্ত প্রতীকী হয়ে ফুটে উঠত না। কখনো মনীষা প্রাঙ্গনকে অন্তর্গাহনের অবাধতার অস্বীকার করে। কয়েকটি বিষণ্ণ শতকের অন্ধালোক কাল পেরিয়ে পনের শতকের বুক ভেঙে হেলেনীয় অন্তর্গত সবিতার উত্তরাধিকার নিয়ে অলজ্জ ভোগবাদী ফ্লরেন্স সেদিন গায়ত্রীমন্ত্রের মত অতিস্ফীত হয়ে ফেটে পড়ছিল। দেবদূতের ডানার দরকার নেই—মানুষের একটা কাটা হাত, ছেঁড়া পা—তাই-ই সই। অ-মানুষিক থেকে মানুষিক জগতে পৃথিবীর বাঁকা শ্রেষ্ঠী ঘাড় ঘোর করে ঘুরিয়ে নেয়ার যজ্ঞ সেদিন শুরু হয়েছিল। সে যজ্ঞে যদু যাজ্ঞিক একটি মূল পুরোহিতকে ঘিরে মেডিচি রাজবাড়ীর খোপে খোপে অবিচলিত ভ্রমরের মত বাসা বেঁধেছিলেন। সেই পুরোহিত ফ্লরেন্সের একছত্র শাসক লরেঞ্জো দা মেডিচি। যাকে বলা হয় 'Single favourite topic of convorsation' য়োরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পাতায় লরেঞ্জো ছিলেন জনপ্রিয়তার মাপ-কাঠিতে ঠিক তাই।

তিনি অসীম বিত্তবান পুরুষ ছিলেন। ইতালীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা, তুরস্ক ও চীনের প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের দূতবৃন্দ হামেশা তাঁর রাজসভায় যাতায়াত করতেন। অথচ এ এক অবিশ্বাস্য সত্য, লরেঞ্জোর সৈন্যদল ছিল না, প্রহরী ছিল না। ফ্লরেন্সের রাস্তায়-রাস্তায় সাধারণ পথচারীর মত নিঃসংকোচে পুত্র-কন্যার হাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। নিজের ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি কক্ষ নির্দিষ্ট রেখে রাজপ্রাসাদের অন্যান্য ঘরগুলি যাঁরা পৃথিবীতে শিল্প সংস্কৃতি বিজ্ঞানের নতুন যুগ আনতেন, তাঁদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং লরেঞ্জো মানুষের ভিতে ভিতে ফিরতেন। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ একক। অথচ লরেঞ্জোর পিতা পিএরো দা মেডিচি বা তাঁর সুখ্যাত পিতামহ কসিমো পর্যন্ত এত সর্বব্যাপক জনপ্রিয়তায় সিক্ত হতে পারেননি। ফ্লরেন্সের লোক ইচ্ছে করলে একঘণ্টার নোটিশে লরেঞ্জোকে প্রাসাদ থেকে লাথি মেরে বের করে দিতে পারত। একথা ফ্লরেন্টাইনরা যেমন জানত, লরেঞ্জোও জানতেন। ফলতঃ শাসকের সঙ্গে জন-সাধারণের সম্পর্ক কখনোই একপক্ষের ঔদ্ধত্য বা অপরপক্ষের ভীরুতায় পর্যবসিত হত না। মাত্র সতের বছর বয়সে প্রাপণণ করে সেই যে একবার

লরেঞ্জো পিতা পিএরোকে এক দারুণ মিলিটারী কু্য থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর কখনো অন্তসন্ধান করতে হয়নি।

ফ্লরেন্সের অদ্ভুত পদ্মাসম্ভার পৃথিবীর বাজরের বাজারে চাহিদার ঠেলায় সেদিন উপচে পড়ত। মহাসাগরের তরঙ্গে বাণিজ্যপোতের রজতলক্ষ্ম পালের নিশ্চিন্ত আড়ালে চারদিকে ছাপিয়ে আসত তাল তাল সোনা। লরেঞ্জোর ঐশ্বর্যের সেই হিরণ্যদ্যুতি বহুজনকে অন্ধ করে রাখত। তাঁর যাদুকরী শাসন পর্যন্ত লক্ষ লোকের মনে পরম বিস্ময় জাগাত। কিন্তু শিল্পী, সংস্কৃতিবিদেরা তাঁকে শিরোপা দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধনমুক্ত চিত্তের অনন্যতার জন্যে। যে চিত্তের স্বাধীনতাকে সময় প্রতীচ্য হাজার বছর ধরে সাতসাতে অন্ধকার গরাদখানার পুরে রেখেছিল, লরেঞ্জো তার শিকল ভাঙার প্রথম ব্রতী। তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের কমলবনে সেদিন বুদ্ধিজীবী ও ভাবী যুগের স্রষ্টাদের মেলা বসেছিল। রেনেসাঁসের নিশাহরা প্রথম পুরুষের লরেঞ্জো তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের মায়াকর্ষণে একটি সুডৌল বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

এদিকে প্রস্তর-নগরের পথে পথে ছেনী বাটালি নিয়ে কিশোর মিখাএল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাথরের বুক থেকে দুধ আর মাখে খুজে বের করার জন্যে। নামী শিল্পী ঘিরল্যান্ডাইওর স্টুডিওর শিক্ষানবিশী করতে করতে এরোলো তখন ক্লান্ত। স্কেচ করতে ছবি আঁকতে, পুরুর আঁকা ফ্রেসকোতে রং বুলোতে আর ভালো লাগে না। শিকপাল ভাস্কর উনতেরোর সুযোগ্য শিষ্য বারতোল্‌ডোর হাতে প্রস্তর-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দিয়ে সদাগত হয়েছেন। ক্যানভাস নয় আমি পাথরের ওপর ছবি আঁকব। ঈশ্বরের শুভ্র পবিত্রতার মত পাথর। নববধূর মত পাথর। ওকে জোর করে আয়ত্বে আনতে চাও, অধীর হাতুড়ীর প্রবল আঘাত কর, নিষ্ঠুর কঠিন ঔদাসিন্যে যে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু পরম সহিষ্ণুতার সাথে ছেনীবাটালি দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে পরতের পর পরত পাথরের ঘোমটা খসাতে থাকে, এক সময় সে মূর্তিমতী দয়ার মত তোমার আনত ব্যাপৃত ভুজবন্ধনে ধরা দেবে। আমি উনতেরোর সাম্রাজ্যে আদ্যো অধীশ্বর বারটোল্‌ডোর কাছে যাবো।

কিন্তু তার আগেই ঘিরল্যান্ডাইওর স্টুডিওতে ইগলচক্ষু লরেঞ্জো একদিন নিয়তির মত এলেন ও শিক্ষানবিশীদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে মিখাএলকে ছো মেরে সোজা প্রাসাদে তুললেন। রাজানুগ্রহ, উজ্জ্বল স্বপ্নগুলিকে ফোটানোর অফুরন্ত সম্পদ ও সময়, সর্বোপরি বারতোল্‌ডোর শিষ্যত্ব—সমস্তই নবীন ভাস্করের হাতে ধরা দিল।

পনের শতকের ফ্লরেন্সে রেনেসাঁসের অভিনব পদক্ষেপে প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রাক্তন নির্বোধ সংস্কারাদির স্তম্ভগুলো তখন বিরাট অভিমানে ভেঙে পড়ছিল।

প্রচলিত সত্যবোধে ক্রমশঃ বিশ্বাস হারাচ্ছে হারাতে সময় প্রতীচ্য যখন ভাবসৈন্যে দেউলে হয়ে পড়েছিল, তখন কেমনভাবে মিখাএল, রাফাএল বা দা ভিঞ্চির মত শিল্পীদের পক্ষে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সামনে নবযুগের স্বর্ণিল দিগন্তরেখাকে পরিস্ফুট করা সম্ভব ছিল না বলা বাহুল্য। সমাগত মূর্তি ছবি ও ফ্রেসকোর মাধ্যমে পালাবদলের যুগের যে বিশিষ্ট ভাব ও ভাবনাগুলিকে তাঁরা বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়েছিলেন, তার পশ্চাদ্ভূমি রাতারাতি তৈরী হয়নি। এঁদের কর্মকণ্ঠ চেতনাকে যাঁরা শিক্ষিত, দীপ্ত ও চালিত করেছিলেন, সমকাল তাঁদের ধ্বংসতার নিক্ষেপ করেছে। কারণ কিছু অজ্ঞতা, কিছু ক্ষমাহীন ঔদাসীন্য, বাকীটা প্রাজ্ঞ মনন-শীলতার প্রতি অর্ধ-শিক্ষিত সাধারণের মারাত্মক ভীতি। এক-আধটা মিখাএল এঞ্জেলো বা রাফাএলে রেনেসাঁসের বসন্ত আসেনি। লরেঞ্জো দা মেডিচির দিগন্তকারী প্রচেষ্টায় ও পিপীলিকা-সংগ্রহে ক্রয়েসে বহু মনীষার প্রয়োগক্ষেত্র রচিত হয়েছিল।

যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কালের ঘর রেনেসাঁসের ফসলে ভরেছিল তাঁদের গোষ্টিবদ্ধ নাম প্লেটো আকাদামী। একটি শতাব্দীর সন্ধ্যায় নীল কামিজ পরিহিত শীর্ণদেহী কিশোর মিখাএল গুরু বারতোল্দোর হাত ধরে লরেঞ্জোর স্টুডিয়োলোতে প্লেটো আকাদামীর বিশ্ববন্দিত গুণিদের সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। প্লেটো আকাদামীকে বলা হত য়োরোপের মানস-স্পন্দন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বহতা নদী, এবং সেই নদী যার স্রোতে কেউ দুবার স্নান করে না, দ্বিতীয় এথেন্স, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। শতাধিক ওকের পাটায় হাজার হাজার বই ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি, গ্রীকরিলিফের অগণিত সমাবেশ, ছাদ থেকে শিকল দিয়ে নামিয়ে আনা স্বল্প পরিসরে তীব্রালোকিত পরিবেশ—এরই মাঝখানে প্লেটো আকাদামীর চন্দ্রসভা ও মুখোমুখী বিমূঢ় বিহ্বল মিখাএল এবং স্মিত বারতোল্দোকে ঘিরে একটি শতাব্দীর সন্ধ্যা।

টেবিলের একেবারে ডানদিক ঘেঁষে নির্লিপ্ত প্রৌঢ় মার্সিলিও ফিসিনো গাঢ় প্রসন্ন কণ্ঠে কথা বলছিলেন। ফিসিনো লরেঞ্জোর পিতামহ কসিমোর পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম প্লেটো আকাদামীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিন্তা-বৃত্তির পরিণতিতে ক্রীথাগ্রে ফিসিনো ছিলেন নিশ্চিত নৈরাজ্যবাদী। যদিচ তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত আলোকের পরিণামই নামহীন আকারহীন অন্ধ-কারে, তবুও প্রবল প্রাণশক্তির তাগিদে তিনি প্লেটোর সমস্ত আবিষ্কৃত রচনার অনুবাদ করেছিলেন। এরিস্টটল থেকে শুরু করে আলেকজান্দ্রিয়, কনস্টান্টীয় ও অন্যান্য মনীষীদের কালজয়ী দর্শন ও মৌল সৃষ্টির সমস্ত সম্ভারগুলিকে তিনি মধ্য-শতকগুলির সামনে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, মুদ্রণ

পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলিত প্রয়োগ ঘটিয়ে ফিসিনো ফ্লরেন্সে তথা সমগ্র য়োরোপে সেদিন যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁর রচনাসম্ভার প্রতীচ্যের চিন্তাবিদদের মানস রাজ্যে অবৈর্ষ নাড়া দিয়েছিল। দলে দলে তীর্থযাত্রীর মত ফিসিনোর শান্ত রম্য বাসগৃহে নানা দেশের মনীষী-সংগম ঘটত। কসিমো দা মেডিচি তাঁর সভাসংস্থাপিত মিথ্যাএলেন্দ্রোর সহায়তায় ফিসিনোকে স্থায়ীভাবে বেঁধে রাখবার জন্যে কারেগ্‌গির শৈল-নগরীতে একটি অনুপম প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্রাসাদের সামনে প্লেটোর একটি বিশাল প্রস্তরমূর্তি। তাঁর বলিষ্ঠ দক্ষিণবাহু ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। পায়ের নীচে অগ্নিপাত্রে অনির্বাণ দীপশিখা। এবং একটি ফলকে ক্ষোদিত প্লেটো সম্পর্কে ফিসিনোর সেই প্রসিদ্ধ প্রত্যয়সিদ্ধ 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা।'

ফিসিনোর সঙ্গে যে সৌম্যদর্শন বয়স্ক পুরুষটি কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর নাম খিস্তোফোরো ল্যান্ডিনো। ল্যান্ডিনো লরেঞ্জো ও তাঁর পিতা পিএরো উভয়েরই শিক্ষক ছিলেন। লেখক, বক্তা ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ও প্রাকৃতিক নিয়মাদির বৈজ্ঞানিক কারণসন্ধানী হিসেবে ল্যান্ডিনো তাঁর যুগে একক ছিলেন। রেনেসাঁসের অবরূদ্ধ পুরুষ বলে পরবর্তী কাল তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। রাজার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিণত প্রভাব অর্জন করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন হয়নি। মনীষী দান্তের সামগ্রিক সাহিত্যকৃতি তাঁর প্রভূত জ্ঞান ও নিরন্তর ধারণা জাগাতে বিশেষ সহায়তা করেছিল। ফ্লরেন্সে প্রথম প্রকাশিত দান্তের গ্রন্থাবলী সংলগ্ন ল্যান্ডিনো রচিত মুখবন্ধ ও টিকা দান্তে-বিশেষজ্ঞদের মতে আজ পর্যন্ত অনন্য।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার কাল পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে বাংলাভাষার অসম্মান মর্মান্তিক হলেও অভূতপূর্ব নয়। ইতালীয়ান, স্লাভ বহু আধুনিক ভাষাকেই যুগে যুগে এই একই অবমাননার বেদনাদায়ক সেতুবন্ধ পেরিয়ে মুক্তির দিকে যেতে হয়েছে। একদা অখ্যাত ও নিন্দিত ইতালীয়ান ভাষাকে কেবল একক প্রচেষ্টায় ল্যান্ডিনো যেমনভাবে শ্রদ্ধেয় এবং বুদ্ধিজীবীদেরও নির্ভরযোগ্য ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন, বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। পিনি, হোরেস, ভার্জিল প্রমুখ মহান সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ করে ল্যান্ডিনো ইতালিয়ান সাহিত্যের দিগন্ত-প্রসারকে বহুবা বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সেই বহু-কথিত উক্তিটিকে ফ্লরেন্স শিরোভূষণ করেছিল 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও বাস্তবজ্ঞানই একমাত্র মহৎ সৃষ্টির উৎস।' প্লেটোর 'রিপাবলিকের' নায়কের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'নগরের আদর্শ শাসক হওয়ার যোগ্য একমাত্র জ্ঞানী পুরুষ।' ল্যান্ডিনো এই উক্তিতে লরেঞ্জোকে ভূষিত করেছিলেন।

ভিভান থেকে উঠে সর্বপ্রথম যিনি মিষাএলকে অভিবাদন করলেন তাঁর নাম এঞ্জেলো পলিজিআনো। পলিজিআনো তখন মাত্র তারুণ্যে উপনীত। তিনি ছিলেন লরেঞ্জোর থেকেও অগ্রসরমনস্ক। এবং স্লেটো আকাদামীর সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা। মাত্র দশ বছরের বয়সে লাতিনে গ্রন্থ প্রকাশ করে পণ্ডিতদের মহলে তিনি অবিশ্বাস্য চাঞ্চল্য এনেছিলেন। সুতরাং পলিজিআনোর প্রথম শৈশবেই গুণগ্রাহী লরেঞ্জো তাঁকে প্রাসাদকক্ষে নিয়ে এলেন ও লাস্কিনো, ফিসিনো এবং অন্যান্য সেরা গ্রীক পণ্ডিতদের ওপর তাঁর শিক্ষার ভার দিলেন। লরেঞ্জোর স্বপ্ন সফল করে মাত্র বোল বছরের বয়সে পলিজিআনো হোমারের 'ইলিয়াদের' প্রথম খণ্ড অনুবাদ করলেন। এই অ-সুন্দর পুরুষটার সর্বাধিক খ্যাতি ছিল কবি হিসাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেন্তার্কা ছাড়া ইতালীয় কবি-কুলের মধ্যে তাঁর সমদক্ষতা সম্পন্ন কবি মধ্যযুগে আর কেউ ছিলেন না। পাজির কুখ্যাত ষড়যন্ত্রে নিহত লরেঞ্জোর ভ্রাতা গুলিআনো দা মেডিকির শৌর্যের আখ্যান অবলম্বনে পলিজিআনো একটি বিরাট বিবৃতিমূলক কাব্যরচনা করেন। কবিতাটি আংগিক ও বস্তুধর্মের দিক থেকে বহুকাল কবিবন্ধপ্রার্থীদের কাছে একটি বিশিষ্ট মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সেই কক্ষে তখন স্লেটো আকাদামীর কনিষ্ঠতম সদস্যটিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম পিকোদেল্লা মিরানদোলা। রেনেসাঁসের ভাস্কর ও চিত্রকর তাঁকে একযোগে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন য়োরোপের সবচেয়ে সুদেহী ও সুদর্শন পুরুষ বলে। তাঁর ওষ্ঠের গুণীজনোচিত তাচ্ছিল্যের বিদ্যুৎ-বিলাস, ললাট প্রান্তকে বেষ্টন করে অবাধ স্খলিত স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছ, সাগরের দু কিনারা নীলের মত দুই আয়ত চোখ, অপূর্ব গঠন সবই তাঁর সময়ে থেকে পরবর্তী দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত শিল্পীদের লোভনীয় শিল্প-খাদ্য হিসাবে সাগ্রহে গৃহীত হত। বাইশটি বিভিন্ন ভাষা জানতেন পিকো। স্লেটো আকাদামীর বর্ষীয়ান সদস্য-বৃন্দ প্রায়ই সন্দেহে উল্লেখ করতেন যে কেবল মাত্র খুঁজে না পাওয়ার দরুণই মিরানদোলা তেইশ নম্বর ভাষাটি শিখতে পারেননি! ভালবেসে ফ্লরেন্স তাঁকে কখনো 'ইতালীর মহান ঈশ্বর' 'সুন্দরতম ও স্নিগ্ধতম' এইসব নতুন নামে ডাকত। সুখ্যাত জীবনী-উপন্যাস প্রণেতা আরভিংস্টোন মিরানদোলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টাকে বিচার করতে গিয়ে বলেছেন—

"His intellectual concept was the unity of knowledge; his ambition to reconcile all religions and philosophies since the beginning of time. Like Ficino, he aspired to hold in his mind the totality of human learning."

মিরানদোলা স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা-

গোষ্ঠি একটি আন্তর্জাতিক মহাভাষার উৎস থেকে প্রবাহিত ও কালক্রমে দেশ ও সময়ভেদে পরিবর্তিত। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রথার সংগে মিরান্দোলাকে স্মরণ করে থাকেন।

ফ্লরেন্স তখন মরুদ্যানতার কাল। প্লেটো আকাদামীর সদস্যবৃন্দ প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন, ঈশ্বর আর চার্চের মাঝখানের ফারাকটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। তাছাড়া ভগবান ও ঐশ্বরতান্ত্রিক পোপের মধ্যে আপোষে রফা হতে প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে। তাছাড়া রোমের পোপ সিক্সটাস এমন সর্বনাশা রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েছেন যেখানে সৎ ও বিবেকী খ্রীশ্চানের পক্ষে তাঁর অনুশাসনের সম্মান রক্ষা দুরূহ হয়ে পড়েছে। যেহেতু প্লেটো আকাদামীর পৃষ্ঠপোষক লরেঞ্জো, স্বভাবতই মহান পোপ ফ্লরেন্সের এই শাসকটিকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেন। অতঃপর যখন প্রমাণিত হয় কুখ্যাত পাজী ষড়যন্ত্রে লরেঞ্জোর ভ্রাতার হত্যার পেছনে পোপের হাত ছিল, তখন ফ্লরেন্স আর রোমের মধ্যে সরাসরি বিচ্ছেদ ঘটে। পোপ ফ্লরেন্সের যাবতীয় চার্চকে অবৈধ বলে ঘোষণা জারী করেন ও পরিবর্তে ফ্লরেন্সও প্রকাশ্যে অসৎ ও পক্ষপাতদুষ্ট পোপকে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়। সমস্ত য়ুরোপে মধ্যশতকগুলিকে ঈশ্বর যখন পাকাপোক্তভাবে সমাজ, সম্প্রদায় ও উন্মেষণা প্রণোদনার প্রত্যক্ষ শিকার হয়ে উঠেছিলেন ও পবিত্র ধর্মসংস্কারের নামে বহুতর ঈশ্বরের রক্তপাত ঘটছিল, তখন মধ্যযুগীয় গুপ্তামী ও মূঢ় আত্মরতির ওপর প্লেটো আকাদমীর বিজ্ঞান সম্মত নতুন জীবন-বেদ, যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্ভীক বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রচারণা তীব্র ঝলায় চকিত হয়ে উঠেছিল। একদিকে ব্যক্তিত্বের সম্মান, প্রবল বলিষ্ঠ ভোগতৃষ্ণা, দেহের পক্ষপ্রদীপে রূপের আরতি অপর দিকে জ্ঞানের সম্ভবপর সমস্ত উৎসের দিকে নৌচালনার মাধ্যমে যে নবমানবতার সাধনা লরেঞ্জোর প্রাসাদকক্ষ থেকে সমগ্র য়ুরোপে ও য়ুরোপ থেকে ঔপনিবেশিক অভিযাত্রার দুঃসাহসী প্রয়াসে পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে সার্থক হয়েছিল, সুযোগ্য গ্রাহক হিসাবে মিথাএল তার দায়ভাগকে বাস্তি ও শিল্পীজীবনে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটো আকাদামীর সদস্যদের কাছ থেকেই তিনি সর্বপ্রথম শুনেছিলেন যে প্রকৃত ধর্ম ও জ্ঞান আসলে একই প্লেটোর এপিঠ-ওপিঠ। শ্রেষ্ঠ মানবতার মহিমাদীপ্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোম খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভবের বহুপূর্বে কিভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মহত্তম দিকগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছিল। এবং তারপর কিভাবে দীর্ঘকাল পৃথিবী অন্ধকার যুগের ইতিহাসের মত সব অবলুপ্তির যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। এখন এই কটি সোনা মানুষ—বর্বীয়ান ল্যাস্কিনো,

প্রৌঢ় ফিসিনো, কু-দর্শন পলিজিআনো, স্বর্ণকেশী মিরান্দোলা—মাত্র এই কটি লোক ল্যরেঞ্জো দা মেডিচির সহায়তায় কি করে পৃথিবীকে আবার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিতে চলেছেন। এঁদের বীজমন্ত্র কেবল একটি শব্দ—যে শব্দ কিশোর মিখাএল বা পৃথিবী—কেউ আগে কখনো শোনেনি। সেই শব্দটি—'মানবতাবাদী।' এই শব্দটি সম্মোহনের মত মিখাএলকে আকর্ষণ করত। এর পরিপূর্ণ অর্থ খুঁজতে তাঁকে বারবার ছুটে যেতে হল শেষটো আকাদামীর কীর্তিমান পুরুষদের কাছে।

মিখাএল, আমরা পৃথিবীকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। ধূর্ত নয় নীচ নয়, সৎ অর্থে যে মানুষ হবে, বিবেকী হবে। আত্মার অমরত্ব চাই না মুক্ত মন চাই, জীবনের কল্পনাহীন বিকাশ চাই। সে ভাবুক, দেখুক, খুঁজে নিক। যেহেতু একটি ব্যক্তির আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে ঠিক দ্বিতীয় ব্যক্তিটি পৃথিবীতে ফিরে আসে না, তাই একক ব্যক্তিত্বে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ পূর্ণ বিকশিত হোক, অসামান্য হোক।

ধর্মসংগ্রামের অন্ধতামসের ও নীহারিকার কাল কবে কেটে গেছে। তবুও সুখ্যাত চিত্রপরিচালক ফেলিনির হেলিকপটারে গ্রথিত ক্যামেরা কি করুণ বিস্তারিত চোখে শীতল যুদ্ধের এক্সনারকক্ষের ও অসংখ্য লোভের দুঃস্বপ্নে ঘুলিয়ে ওঠা পৃথিবীকে দেখে ফিরছেন। শিল্পীর স্বাধীনতা, মুক্ত গণতন্ত্র, মানুষের মুক্তি ইত্যাদি কথার ভিত্তিভূমি স্বৈরশাসনের লম্পট পরচারনায় বার-বার শিউরে উঠছে। ফিসিনো, ল্যান্ডিনো, পলিজিআনো আর মিরান্দোলার স্বপ্নের বালার্ক গ্রসা নতুন আরণ্য যুগের নির্মিত অন্ধকারে নিমগ্নতট। মানুষকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্যে অন্ধকার হিমশীতল রাতে মিখাএল এঞ্জেলোকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল। সে শবসাধনার দরজা খুলতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

অরুণ ভট্টাচার্য

কোন দুঃস্বপ্নের জাদুতে

সমস্ত রাত্রিকে নিয়ে একটিমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
সে তোমার স্মৃতি। তোমার দীর্ঘ দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে
আমার নিষ্ঠুর ঘুম। এবং তোমার যে উজ্জ্বল বাসনা
আকাঙ্ক্ষিত শিরায় স্নায়ুতে। রক্তে প্রবাহিত।
সমস্ত রাত্রি ধরে একটানা অখণ্ড স্মৃতির অবিরল
তোমার দেহের চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব মিলে এক সুঠাম শরীরী
কথা বলছে যেন। যেন সারারাত ধরে, সারারাত ধরে, সারারাত।

আমি মূঢ় বিবেকী বালক। কিছু বুঝতে পারছিনা। যেন এক
প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। স্তব্ধ। শীতল। ছায়া
গভীর প্রকাণ্ড। দুলছে, কাঁপছে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটায়।
কেউ নেই, কথা বলছেনা কেউ। শুধু চীৎকার করতে যাব
তোমার কি নাম। মনে পড়ছেনা। যেন আটকে যাচ্ছে
সব স্মৃতি সব নির্মম ইশারা। নাম
মনে পড়ছেনা। পড়ছেনা। যেন শুনতে পাচ্ছি দূরে প্রতিধ্বনি
তোমার নির্মল দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব মিলে
এক শরীরী প্রতিমা।

প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে শুধু তুমি আছ। একমাত্র প্রহরী জানালা।
আমি বাইরে সিংহদরজার। উঁচু কিন্তু নিরন্ধ্র এক প্রাচীর সম্মুখে
এখনো দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে থাকব। দাঁড়িয়ে থাকব, দাঁড়িয়ে.....

এবং জানবো আমি, সম্ভবত নীচে
কোনদিন তুমি নামতে পারবেনা সিংহদ্বার দিয়ে।

তখন তীব্র সূর্য ছিল মধ্যাহ্নগগনে
গংগার মাস্তুলে রোদ জ্বলে চিকিমিকি
আমার হাতের মুঠো তোমার স্প্রাংগুলে
শক্ত স্থির একখন্ড মাংসের মত
উত্তেজনাহীন।
তোমার মুখের শিরায়
একটা শান্তির রেখা, অথচ দৃঢ়তা।
জানতে, ভবিষ্যৎ স্থির এবং আমাকে
তোমার একান্ত যা কিছু নিশ্চিত গোপন।
তোমার নিকট প্রেম জীবনসদৃশ
ততোধিক সত্য ভাবনা সুস্থ অস্পীকারে।

আমি চমকে চমকে উঠছি। বারবার মুখে
দেখছি তোমার একটি প্রত্যয়ের ছায়া
স্নিগ্ধ কিন্তু তীব্র অহংকার জুড়ে
উদ্ভাসিত। আমি অক্ষমতা নিয়ে ঢাকছি
নিজেরই ভীরুতা
এবং আশ্চর্য আরো
ক্রমশ নিজেকে আমি গুটিয়ে নেবার
সিদ্ধান্ত করছি। ভয়, বে-অনাস্বাদিত,
তাকাতে পারছিনা ওই স্থির দুটি আঁখি-
পল্লবের দিকে। এবং হাতের মুঠি
শ্লথ হতে হতে চাচ্ছে। সূর্যকলঙ্কের
কোমল আভার মত মানসিক বৃত্তে
ঘুরছি। ঘুরছি, আমি ভয়ের আকারে
আঁকছি তোমার মুখ। ভীরু বালকের
স্বভাবে ভয়ের চিহ্ন আমাকে জড়িয়ে।

আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সুস্থ, কেননা
তোমার প্রেমের ভীষণতা থেকে দূরে
বহুদূরে আমি আছি আপনার সংকীর্ণতা নিয়ে
আমিই সে মূঢ় বালক, পালিয়েছি দূরে।

যেমন আছি

আমার নানাবিধ ভাবনার কথা ঘাসে গাছে কিম্বা
ফুলের অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। আপাতত
এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।

যে যেমন ভাবছে আমার তাইতে একান্ত সংগোপন ভাবনা।

সুতরাং ঘাসে গাছে ফুলে কিম্বা যেসকল মৌমাছি
ঘোরাফেরা করে' যাবতীয় সংবাদ আনছে কানে কানে,
তাদের আমাকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে:

আমার কাছে এসে বিরক্ত কোরোনা। আমার
নানাবিধ ভাবনার কথা তোমাদের অন্তরালে
লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। তোমরা সরে যাও সম্মুখ থেকে।
সরে যাও। ঘাম করতলে মুখ ঢেকে আমি
লুকিয়ে থাকবো যে কদিন আছি এ সংসারে।

জীবনানন্দের অতীতের পর

জীবনানন্দের কথায় একদা আমারো ঠিক বিশ্বাস জন্মায়নি
ভাবিনি আমরা সকলে এক নিদারুণ যন্ত্রণায়
বাস করি। ভাবিনি যে অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
অন্য এক নিগূঢ় চেতনা খেলা করে খেলা করে।

কৈশোরে জীবনানন্দ পড়বার পর দীর্ঘ দীর্ঘ সময় গিয়েছে।

আজকাল মনে হচ্ছে জীবনানন্দ যা বলতে চেয়েছিলেন
তার চেয়েও নির্মম নির্মমতর কাহিনী রয়েছে।

উত্তরসূরী

এবং সম্প্রতিকালে এতাদৃশ ধারণা জন্মাচ্ছে,
মনুষ্যমাত্রেই এক ভয়াবহ অতীতের শব
মুখ গুঁজে পড়ে থাকছে বছর বছর ধরে অচেতন হয়ে।
হয়তো বা মন্দবলে কখনো জাগছে কিম্বা চোখ মেলছে ধীরে
অসহায় পশুর মত গোঙাচ্ছে শুধুমাত্র দুচার সেকেণ্ড।

তারপর পড়ে থাকছে একসঙ্গে পাশাপাশি তারা,
দুইটি কুকুর এবং কয়েকটি বিড়ালের শব
অন্ধকারে লেপটে আছে। দূরে কাছে ভৌতিক প্রলাপ
অনুভবে একমাত্র এ মুহূর্তে মনে হতে পারে।

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত লঘু কবিতা

১ কে হে তুমি অর্বাচীন ডাকছ এই নিস্তব্ধ রাতিতে
একটু একটু প্রহেলিকায় ভেল্কো ছুরে সূচির বিনাশে
কে হে তুমি মূঢ় ছোকরা নাম ধরে চিৎকার করছ
আমাকে ঘুমোতে দাও। দুঃস্বপন ভাঙতে দাও ক্রমে।

২ আমি একটা সবুজ পাখি কালকে ধরেছি সন্ধ্যাবেলা
রাত্রিবেলা তাকে নিয়ে আদর করেছি। আমি আরেকটা
নীল পাখি আনতে বলেছি। তাকেও রাখবো একদিন কাছে।
পরদিন সব জানলা খুলে দিয়ে অতীব প্রভাবে
দুটিকে একসঙ্গে দেবো আকাশের অন্তিমে ভাসিয়ে।

৩ কয়েকটি বাচাল যুবা নিরন্তর গাছে চড়তে চড়তে
ভেংচি কাটলো একসঙ্গে সুনির্মল আকাশের প্রতি।
নিম্নে তাকাতে গিয়ে একটি হলুদ ফুল চোখে পড়ল যেই
সংক্ষেপে সকলে মিলে ঈশ্বরের নামে কিছু শপথ শোনালো।

৪ আমাকে বিমলা নাম্নী মেয়েটি একবার
ভালোবাসতে চেয়েছিল।
তাইতে কমলা নামে দ্বিতীয় মেয়েটি
একটা লাল পদ্মের সোয়েটার বুনে
পরবর্তী শীতকালে উপহার দিল।

শোভন সোম

হঠাৎ যে কে...

হঠাৎ যে কে বুকের মধ্যে ডেকে উঠলো, শোভন
কাপটা খেয়ে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিলো, শোভন
অন্ধকারে পথ হারালে যেমন কণ্ঠে ডাকে, তেমন আমার
কাপসা কণ্ঠে বালক কণ্ঠে কে ডাকলো ফের এমন মধ্যবেলায়!
তীক্ষ্ণ ছুরির মতন আমার কানে বিঁধলো.....শোভন....

দীর্ঘ ক্লান্ত উটের সারির দিন চলেছে পৌনপুনিক দিন
চিবিয়ে কাঁটা রক্ত গড়ায় কষে
কেবল বালি অসীম বালি বালির পরে বালি কেবল বালি
আকাশ পুড়ে খাক হচ্ছে, পায়ের নিচে বালি তপ্ত বালি
ভীষণ আলোয় হারিয়ে গেছে দিক দিগন্ত অন্ধকারের মতন
ঘুমে মলিন কাপসা কণ্ঠ কানে বিঁধলো যেন তীক্ষ্ণ ছুরি
হঠাৎ যে কে এমন করে ডেকে উঠলো, শোভন!
বালির পরে বালির স্তূপে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে আনে, শোভন.....

কোনো হাতের কোমলতায়, কোনো চোখের ছায়ার শীতলতা,
কোনো প্রেমের গভীর দীঘি, কোনো স্মৃতির বিলোল মদিরতায়
কোথাও কিছু চিহ্ন নেই, এমন কি নেই কুটিল মরীচিকার
হাতছানিও.....দিন চলেছে পৌনপুনিক উটের সারির মতন
হাওয়ার শাসন মুছে দিচ্ছে পিছন দিকে পায়ে চলার দাগ
ঘোর নেশায় বেরিয়ে যাচ্ছি কোনখানে কোন দেশের থেকে কোথায়
কোথায় যে এই মধ্যবেলায় এমন একা বুকের ভিতর হঠাৎ
মলিন কণ্ঠ বলে উঠলো, শোভন

চিনতে আমি পারছিনা কে এমন ভাবে ডেকে উঠলো, শোভন
কোথাও চেনার চিহ্ন নেই, সকল চেনা ভুলে গিয়েছি, চেনার
সহজ সূত্র মেলেনা আর, সকল দাগ হাওয়ার মুছে গেছে
আলোর ভীষণতার ভিতর দিক দিগন্ত কোথাও নেই, যেমন

উত্তরসূরী

আলোর তীব্রতার ভিতর দিক দিগন্ত হারিয়ে গেছে যেমন অন্ধকারে
বক্ষ জুড়ে দারুণ তৃষ্ণা, মেলার ঘোরে পেরিয়ে যাচ্ছি কোথায়

জলের মতন কণ্ঠে আমার হঠাৎ যে কে ডেকে উঠলো, শোভন...
ভ্রষ্ট স্মৃতির কোথাও নেই দীঘির রেখা।...বুঝি কোথাও ছিলো
কঠোর ক্রোধে শুকিয়ে গিয়ে বালির নিচে জলের কণ্ঠে
কেঁদে মরছে, শোভন?

মিত কথন

শান্তিকুমার ঘোষ

"বিয়াল্লিশে, একটি প্রহর হেলো সম্পূর্ণ নিটোল।
যখন সকালে দেখা প্রথম সোনার আলো নেমেছে চুলের গুচ্ছে;
আয়ত ভ্রমর চোখে শরতের প্রসন্নতা।
কী যে হোলো—দুষ্টুমি ছিল বা মনে—যেললাম প্রশ্ন করে:
'জলযোগ মেলে এমন দোকান কোনো পাবো এই পথে?'
হার মানো নি কো তুমি। বলেছিলে প্রীত হেসে:
'ওদিকে আমিও যাচ্ছি, দেখাতে পারবো তাই সঙ্গে আসো যদি।'
এভাবে দিনের শুরু প্রভাতের শুভদৃষ্টি সন্ধ্যায় উঠলো ফলে
বিধুর চুম্বনে।
একসঙ্গে পথ চলা। ফাল্গুন হাওয়ার গড়া পথ যেন স্বচ্ছ লঘু
নীলিমার মায়া;
সরে গিয়ে হর্মাসারি অন্তরের রূপ শুধু মন স্বপতির:
যতগুলো সাঁকো
বন্ধুতার ঘিরে রয় নদী-নদরীর জল। পথ চলা এক সাথে:
পথের আনন্দ যেন মুক্ত আলো সুড়ঙ্গের অন্ধকার ছিঁড়ে;
হঠাৎ টিলার বাঁকে সমুদ্রের রূপ। করতালি দিয়ে তুমি উঠেছিল বলে
'মাটিতে পা রেখে দূর মাথা আমি তুলে দেবো ঊর্ধ্ব মেঘপানে।'
আমিও প্রগাঢ় স্বরে জানিয়েছি ধীরে:
দিনের সংক্রমে কিন্তু সমতল থেকে প্রাণ
চায় আজ পাহাড়ের ছায়া, কর্ণায় অবাধ খুশি, কাছের আকাশ।

মন্থর মেঘের রাশি বেদনার স্পর্শে ছিলো তারুণ্যের দিনগুলি—
তোমার দাক্ষিণ্যে হোলো দীপ্ত বেগবান।"
"যা ভাবিনি দূরতম স্বপ্নে কোনোদিন
তা-ই যদি কান্তি নিলো, হোলো গান হাসি, তবে কেন
এত শীঘ্র হবে হর্ষ শেষ
তুমি আকস্মিক ছুটে-আসা অগ্নিতারা সোনার লিখন এঁকে
আমার নিকষে
মিলাবে তৃষিত শূন্যে।
যেন দুই দারুখণ্ড অসীম সাগরে, একবার মুখোমুখি ঢেউয়ের চূড়ায়:
তুমুল তরঙ্গ এসে পরক্ষণে করে দেয় বিচ্ছিন্ন সুদূর।
পলাতক দণ্ড পল, পিছিল মুহূর্তগুলি। এখনি সজল হবে
প্ল্যাটফর্মে স্পন্দমান ক্রুর লম্বা ট্রেন।
রইবে সম্বল পিছে কাগজে আঁচড় দ্রুত তোমার ঠিকানা।"
"যত বড়ো ভাবো তুমি তেমন বিশাল নয় ঘনিষ্ঠ পৃথিবী।
এই চেনা রাস্তা বেয়ে যত দূরে যাই কেন ফিরে ফিরে আসা দ্বারে
অন্তঃশীল টানে।
দুঃখের কলস ঘূর্ণী, সপ্ত সিন্ধু পিছে রেখে একই ঢেউ
ঘাটে আনে আবার তরণী।
রমণীয় জনস্থান: আলোকিত উপস্থিতি: ছাড়াতে না চায়
সঙ্গ লাগে এত স্নিগ্ধ যাকে—
তার ছন্দে বাঁধা পথ বিচ্ছেদের শীর্ষে শীর্ষে,
তার মুখ মনে নিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসি আমের নিখিল।"

নিসর্গ নিষ্ফল অতি

নিসর্গ নিষ্ফল অতি ছোঁড়ে পুষ্পবাণ:
শূন্যে তুলে ধরে মেঘ মুক্ত স্তনচূড়া:
সঙ্গমের কিছু ঊন ফেনিল ঘূর্নির টান
ঊর্মিল সিন্ধুর।

প্রকৃতি সমুদ্র ছায়—
বালকের মতো রূপ এক ত্রয়োদশী
উন্মাদনে ভরে দৃশ্য আমার যামিনী॥

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ল্যাম্পপোস্টের নীচে

ঠিক এই মুহূর্তে কিছু মনে আসছে না
যা বলে তোমায় মন পাওয়া যাবে—
কতদিন কত কথা বলেছি, অনেক ভেবে
তার দু'একটি কথাও মনে করতে
পারছি না, সব যেন গোলমাল হয়ে
গেছে, তোমাকে সেদিন একটি ল্যাম্পপোস্টের
আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
অবধি—কেননা
ঠিক সেই সময় আমি এক অপূর্ব সুন্দরী অভিনেত্রীর
জীবনচিত্র দেখে ফিরছিলাম, যে নাকি তার যশ, অর্থ এবং
যৌবন নিয়েও সুখী হতে পারেনি,—
অবশেষে.....
এবং তোমাকে দেখে
মনে হলো, তুমি আমার যৌবন, অর্থ যশের
তলায় দাঁড়িয়ে আছো।

এবং আমি সেই অবধি ভাবছি, অনেক ভাবছি।

সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তিন চিত্র

১ ঘুম ভাঙতে বিমলার মুখটা মনে এল,
বর্ষার বিকেলে ঐ বারান্দায় সেজে ছেলে দুটি
হারমোনিয়মের তালে তাল রেখে জোরে চেঁচে যায়
তেমন বিস্ময় বড় স্মৃতির ভেতরে—
কেন মুখগুলি ভাঙা আয়নাতেই বিচিত্রিত হবে,
হাতে করে দোকানদার এঁকে রাখছে একশোখানা টিপ...
কোন্ দিক বেছে নেব, কোন্ হাওয়া, সমস্ত আমার
প্রত্যেক ভাবাই এত আকর্ষণ করে বারবার

হাওয়ায় এখনো ভাসছে বিমলার সেই কণ্ঠস্বর
চারিদিকে ওরই স্বাস্থ্য, ওর দর্প, তীব্র অহংকার!

২ বৈঠকখানায় দিনে বসবো না একাধিকবার
মহাপুরুষের কত পদধূলি জমেছে ওখানে
মাদুরে, শীতলপাটি চিত্রিত শিল্পের অবিকল,
গন্ধর্ববণিক কাল এসেছিল হরদ জোগাতে...
জানলার ওপারে রাস্তা, ভালুকওলারা বড় যায় না এখন
শিশুকালে ভালুকের পিঠে যারা চড়েছে সবাই খুব বীর
কাঠঠোকরার কাঠ এখনো কানের মধ্যে গাঢ় বেজে যায়
স্কুলের প্রার্থনাগীতি সেই এক সেই এক বাজে—
এত যে বানানো দুঃখ মানুষের...মন এক পুরো বাষ্পাবাজ,
বড় অসুখের বড় তকমাধারী ডাক্তার এখনো
ব্যবসায় ব্যস্ত আছে, ঘুরে বেড়াবার ছুটি চাই—
ছাদেই বেড়াবো নিত্য বৈঠকখানাটা থেকে দূরে, বহুদূরে।

৩ প্রায় সব বৃন্দকেই ভীষণ সুন্দর মনে হয়
যারবার জেগে ওঠে বনাধিকার সেই সুপ্রাচীন গভীর...
আমাদের কাঁঠাল-ছায়ায় এসে বসতো দুপুরে গরুরা
রোমন্থনে ফেনা মেখে সাবানে ঘুন্ধুদ তোলা লেপের কাঠিতে
রোজকার খেলা ছিল...ওরা সব প্রাকৃত এখন,
সমুদ্র কি সরে গেছে পাহাড় কি গলে হল জল...
বিশুকাকাদের বাড়ি গাছে গাছে লেকে থাকছে অযত্নের কত পাকা ফল,
নিরমাবর্তিতায় কাল দেছে, সূর্য বড়ো ওঠে কি নিয়মে,
দেয়ালে আমার জন্যে চতুষ্কোণ ঐ ক্ষেত্র সযত্নরক্ষিত।

যাচ্ছো কী হীরক দ্যুতি সূর্যে
এবং আকাশ জুড়ে প্রতিভাস, ভূল, শসা
বৃক্ষলতা ছোট পাখি ঘাসফুল ইত্যাদিতে বিচিত্র বিস্ময়!

উত্তরসূরী

দূরের সর্বাঙ্গে দ্যাখো প্রতিদিন বিপুল আগ্রহে,
কেমন নিপুণ শিল্প, জন্ম প্রাণ আনন্দ ভৈরবী:
কী উজ্জ্বল রৌদ্র এলে জলস্থলে বিকিরিত হাসি।

ঐ দূরে বাষ্প নেই, জ্বালা নেই, যত খুসি হাত
রৌদ্রে রাখো, মনকে বিছিয়ে দাও পুড়বে নাকো :
দূরের সর্বাঙ্গে দ্যাখো প্রতিদিন বিপুল আগ্রহে
তিলান্তরে বিকশিত, পুষ্পিত আনত

কেমন নিপুণে শিল্প : ভালোবাসা যার অনামিক ॥

অলোকরঞ্জন দাশ

দুটি কবিতা

১· এত সুখ রাখবো কোথায়
বলে সে,
দুঃখ যদি সুখের চেয়ে অধিক,
আমায় দুঃখ দিস কেন রে!

২· তুমি অন্ধকারের পুত্র যেন,
অন্ধকারের মতই একাকার,
তুমি জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতা
তুমি একলা বুকের হাহাকার।

অমিতাভ দাশ

সৌরলিপিকে

একবার দুবার কিংবা তিনবার তোমার দু-হাতের
মধ্য থেকে চলে যেতে পারে ট্রামের হাতল মুখ
উড়ন্ত আঁচল, যদি দৃষ্টান্ত বাড়াতে হয় তবে
যোগ করো সুখ স্বপ্ন মহিমার সান্ত্বনা পুত্রবধূ,

কিন্তু তারপর, মানে চতুর্থবারের সময়
অন্য একটা ট্রাম এসে, যাত্রীহীন চালকবিহীন
অন্য একটা ট্রাম এসে ঘণ্টার দুঃশব্দে বলে যাবে
পায়ে হেঁটে চলে যাও কুমারটুলীতে
সুখের স্বপ্নের মহিমার দীর্ঘ রূপসী পুতুল
সেখানে অপেক্ষা করছে স্বর্গীয় বরনে।

বাহিরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

একান্ত আপন অরেকটি

১· যেন কাউকে তুলে নেবো দূরের গাড়িতে
পূর্বাহ্নে সবাই গেছে সম্মুখে নীলাভ লক্ষ্যতায়...
চৈত্রের ভোরের বেলা লুপ্ত মন শীতল বিষাদে
চতুর্দিকের গাছপালায় জন্মের নৈঃশব্দ্য ডুবে আছি
সবুজ আদেশ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাদ্রুম
জনস্রোত বয়ে যায় কোন মহাসমুদ্রের দিকে।

কৈশোরের সকলেই চলে গেছে দূরের গাড়িতে
কেউ দুর্গাপুরে কেউ পরবাসী জিলাই সিঙ্গাপুরে
কেউ ঊর্ধে আরো দূরে লোকান্তরে আত্মঘাতী হয়ে...
ইস্কুলের মাঠে শুধু কোকিলের স্বর
প্রাচীন দুঃখের মত দোল খাচ্ছে ভুতুরে হাওয়ায়
যেন শেষ কেউ ছিল—তাকেও গাড়িতে তুলে নেবো
একলা আজ বসে আছি ডুব দিয়ে চৈত্রের বিষাদে...
সবুজ আদেশ তুলে মহাদ্রুম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

২· বাড়ির বাহিরে এলে গাছপালা...গাছপালা...স্মৃতি...
অন্ধকারে স্নাত পাতা খুলে নেয় অরণ্য প্রাচীন
মনে পড়ে শিরীষের গন্ধে হেঁটে সকালে ইস্কুল
পাহাড়ে দুরন্ত বৃষ্টি—তারপরে কর্ণা কিছুক্ষণ

উত্তরসূরী

পিতামহ অধ্যুষিত গ্রামের বুকের গর্তে জল.....
অনুগত দিন...স্নিগ্ধ ভালবাসা...সহিষ্ণু মমতা...
আরো দূরে আরো দূরে কবেকার তন্ময় হরিণ
পা গুটিয়ে শুয়ে আছে মুখ রেখে সিংহের কেশরে

ঘরের ভিতরে হিংসা...উন্মোচিত সমস্ত আয়ুধ...
বাড়ির বাহিরে এলে সহিষ্ণু স্মৃতির গাছপালা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কলকাতার সুযোগ জলপাইগুড়িতে

১। ট্রেনে

জনাকীর্ণ নগরেতে সবচেয়ে নির্জনতা আছে।
গুঁড়ো এলাচের মত ছোট হয়ে যাচ্ছে সব স্মৃতির রেণুতা
লোহার বিকীর্ণ জংঘা পিস্টনের উদাত চিবুক
কামদার ক্রোধে ছুঁয়ে যাচ্ছে; আমি অন্তরে বাহিরে
খাঁচায় সোয়ানো রাত-চরা ভাঁশ বাংকে ছিটিং
স্বপ্ন দেখছি ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন দেখছি ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন
বাইরে রাত্রির অজস্র অশ্রুস্রাব, দেখছি ভেঙে যাচ্ছে দেখছি :
আমি যেন কোনদিন বাড়ীঘর ছেড়েছি ইস্কুল
কাহার উজ্জ্বল সুখ কাহার কোমল বুক ভেঙে
যেন সদাগর-পুত্র, গর্জমান পথ-উপকূল
প্রবল হুঙ্কার ছেটে, গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে এখানে
আবার পেয়েছি খুঁজে··ধুত্তোর, নীচের সিটে একটি মানবক
পেন্সার চাচাচ্ছে, অবে মাতৃক্রোড়ে নতনের রাজি
ভোর মা কি দেবগাভী সুরভি যে দিবারাত্র বাঁট...
যেন চলেছি যেন স্খলিতাংগে স্বপ্ন মধাবরসী কুটিলায়ন্তনী শ্যাম্বাল নারীর
অপার সংহত দেহে মহেন্দ্রাসনে ডুবে যাচ্ছি যাবো
আমার সোলাপ-বালা, আমি, আর দুস্বনের মতো
মাকে তপ্ত অন্ধকার—বাকি সব তরংগে ডোবাবো।

২· নং বাস

লালবাজারের টিকলি-আঁটা সকাল খানেকটা পরে জলপাইগুড়ি।
আমি খাস কলকাতার অন্তর্পাতী সাধারিটোলার
সুবোধ, বেকার থাকতে বাড়ীর ফরমাস খেটেখেটে ফেরবার
হঠাৎ দরদম করে বে করে তো মহাকেলেংকোরী
বৌটারও বাচ্চা হবে, তবু একটা সামান্য চাকরী
জোটাতে পারছি না; জেঠু ছোটকাকা কত্তানা বড়দি
পলতে আঁটা বমশেল, কি ভাগ্যি যে মরি নাই, এমন সময়ে
অকস্মাৎ শিকে ছিড়তে অগত্যা সুবোধ আমি জলপাইগুড়ি

৩· ফোর আপ

ঘুরঘুরে অন্ধকারের সঙ্গ, বুকে ঘোলা দিতে মুতোয়ার
জীবনের বিবি কলল। ঘামো না জীবিকা কলল, চলি
বেরিয়ে এলাম ঘনিহারী হবে সকরিগলি

যুবক কলজে ছিঁড়ে টলছে কৃষ্ণচূড়া। সদা পরিচিত
সুরেজিৎ বলতে পারে ইন্টিশান রোডে কবে কৃষ্ণচূড়া ফোটে।
ওআইদার 'কানালা' দেখে হল থেকে ছটকে আসা বিমূঢ় যুবক
পাড়ার আড্ডায় দম ফেলে বলেছিল : বাব্বা মরা মরা মরা
দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল না আমরা কেউ বেঁচে আছি।
ধোঁয়াশার ছিপি-আঁটা কলকাতার কলংকী বাতাস
যেমন নতুন প্রেমে যুবাটিকে সাপটে ধরেছিল

•

তেমনি প্রথমে
স্নিগ্ধ বিস্মিত হর্ণ কলজে ফাটা কৃষ্ণচূড়া সদা পরিচিত।
ইন্টিশান সাক্ষী সেবে, জলপাইগুড়ি যতো ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার আমার ভালবাসা
খোড়ো ঘরের জানালা দিয়ে টপকে দেখা দুপুরে
হর্ন-সু বাঁধে জানলোনাই জোয়ার কাঁপা তিস্তা
শীতলাডাঙো বাটির মতো শিলতে আসা আকাশ
নদীর চড়ায় আশ্বি কালের যুযুরে টোকসি
জীবন ভালো লেগেছিল আমার, বউয়ের, খুকুর
কেন আর একটু ভাল লাগার জন্যে মরা ঠিকটে থাকতাম

উত্তরসূরী

৪· কের ইন-এ

অক্ষরকবচ বোল্ড্ হওয়া, কিস্তু ভাল না লাগার অভিলাপ
প্যান্টের প্রথার এ'টে জন্মেছি আমরা কলকাতার সুবোধ;
নির্ভুল নিশানা সামনে, অস্তাচলে সময়ের অশ্বের-পুরীষে বন্ধপদ
দণ্ডিতের প্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, উদ্যত ধিগার তৈরী ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পেছনে
কাটাতার বেয়ে পূর্বপুরুষের রক্ত ঝরছে—এবার আমরা।
আহত শোণিতে সব দৃশ্যাবলী ধূয়ে যাচ্ছে, অন্ধ সাইক্লপ্স্
দারাপুত্রপরিবার সমবেত বন্ধুবর্গ কাউকে চিনছে না
হে পুত্র ফিরিয়া চাও অভিমানী দুর্যোধন পার্থ মিত্র সভা-পরিষদে
বুক ধমকম করত, সব চোখঢাকী ভালোবাসা
ইতর চোয়ালে চিবিয়েছে। আজ ইস্টিশান রোড বেয়ে পেছনে তাকাতে
ভয় পাই। ডাইনীর রোষে ঘোড়ালির ধুলো চাটছে উন্মাদ কুকুর।
অথচ সমস্ত পাবে এখানে, জলপাইগুড়ি মিনিএচ্যর স্কেলে কলকাতা
উদ্যত শাটারে ধরে রাখছি যতটুকু পারি এখানের প্রেম
অতঃপর কলকাতায় খুবলে নেয়া কোন এক ন্যস্ত অবকাশে
তার ছবি মেলে ধরব, যাবে আমি রাখিয়া এলেম।

শান্তি লাহিড়ী

এই রাত্রি। ঘুম নেই

সারা নিশীথ ধূপ ছিটোনোর ধূপদানিতে
ক্রমে ক্রমে সুগন্ধাকৃতি বোকা হল,
জল ছিটোনোর কাগজের ওই ফুলদানিতে
পাপড়িগুলো রং উঠে সব বোকা হল।
বৃষ্টি অবুঝ, অকোরে তার অশ্রুধারায়
দরজা খুলে, সমস্ত রাত কেউ এলো না,
যমাকৃতি কুপিসি-কদম সৃষ্টি ছাড়ায়,
ছড়ায় মাঠে। মাঠের পথে কেউ এলো না।

দাঁড়িয়ে ছিলেম মাঠের আলে সন্ধেবেলা
চাঁদ উঠেছে কখন যেন, চোখ মেলিনি,

পায়ের কাছে নূপুরগুলো করছে খেলা
শব্দে আমি অবাক হয়ে চোখ মেলিনি।
কেয়াবনের কাঁটায় আমি আহত যে
ফুলের কথা হঠাৎ কখন ভুলেই গেছি
এখন ক্ষতের রক্তে ভীষণ সকাতরে
রাঙাকেয়ার পাপড়ি হঠাৎ তুলতে গেছি।

বাইরে সেদিন আকাশ ছিলো ঝলমলি!
হাওয়া খেলেম বিভোর হয়ে স্মৃতিচারণ—
বন্ধু কজন—গুনতে গিয়ে কেবল জ্বলি—
আগুন হল, কুয়াশা সব স্মৃতিচারণ!
এখন আমি আটশিলা কি কার্শিয়াং-এ
কোথাও যেতে পারিনে, এই মায়া-কানন
এখন আমার চতুর্দিকের চতুর রঙে;
চারদেয়ালের আকাশ বানায় মায়াকানন।

এবার ফিরি ঘরের মধ্যে কবরখানায়
কবে আমি মরে গেছি আঠারোতে,
চেষ্টা নিলাম ভয় করে ফের হাল্কা ডানায়
মৃত আমি পৌঁছে গেলাম আঠারোতে।
ভালোবাসার রাঙা হয়ে আরশিখানা
তুলে আমি মুখের কাছে—মুখে আমার
কোথায় কিশোর! পালক ছেঁড়া ভাঙা ডানা—
নিরুদ্দেশের ছোট্ট চড়ুই মুখে আমার।

ছুটে গেলাম দেয়ালে নীল চিত্রলেখায়,
ভেবেছিলেম সাগর বুঝি ঘরের কাছে,
টুকরো হয়ে কাঁচগুলো সব কেমন দেখায়
বিঁধে থাকা। সমুদ্র কার ঘরের কাছে?
এবার আমি বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই
নিরভিমান ভালোবাসার সহস্রদল।
ভালোবাসা, একে একে দুহাত বাড়াই—
নিরভিমান, বুকের কাছে সহস্রবল।

নজিবর রহমান মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ, আমি ও আমরা

জানি তুমি কখনো বিমর্ষতার চর্চা করোনি
আর আমি তোমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে
সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম।
অনেক আশা ছিল আমার, অনেক সাধ।
হিমালয়ের শ্বেতচূড়ায় চড়ব
ডুব দেব সমুদ্র-গভীর-অবগাহনে
নীল আকাশের কোলে সোনালী রেখায়
রেখে যাব আমার হৃদয়-পদ্মটিকে।

অথচ আমার কাল,
বিলাসী, নির্লজ্জ কাল আমার
লঘু আরামের নেশায় মেতে,—
উপুড় হয়ে পড়ল পেয়ালা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে
নিঃশেষ মধু।

অনেক আশা ছিল আমার, অনেক সাধ।
ভেবেছিলাম দেখে যাব
মানুষের সঙ্গে মানুষের
গভীর এক নিবিড় প্রতায়।

অথচ আমার কাল
নিষ্ঠুর, কঠিন কাল আমার
ক্রূর অন্ধ, গাঁগাঁ রাগে
লাথি ছুঁড়ছে—

উপুড় হয়ে পড়লাম আমি, আমার বন্ধুরা
আমার দেশের, আমার কালের মানুষ
আর আমাদের সমবেত হৃদয়
অগাধ যন্ত্রণার পাক বেয়ে বেয়ে
অনেক কান্না কাঁদল।

জানি তুমি কখনো বিমর্ষতার চর্চা করোনি
কিন্তু, আমি, আমরা
অগাধ যন্ত্রণার পাকদণ্ডীপাকে
অনেক কান্নার মোড়কে
জড়িয়ে পড়লাম।

পরিমল চক্রবর্তী

প্রেম ও অপ্রেম

ফিরে এসো, ফিরে এসো, সেনালিয়া, সুদূরের বাঁকে
হারিয়ে যেও না আর। আমার চোখের শান্ত হ্রদে
কতো জল, একবার চেয়ে দাখো মনোমিতা। তুমি
এবার অপ্রেম থেকে চিরতরে প্রেমে ফিরে এসে
আমাকে ঘনিষ্ঠ করে তোমার হৃদয়ে নাও; যাকে
এতোকাল যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী করে তুমি
সুখী ছিলে, এইবার সুনিবিড়ে তাকে ভালোবেসে
মুক্তি দাও, থামো তার মনের উঠোনে ক্ষীরু পায়ে॥

আমাকে প্রেমের থেকে অপ্রেমের হাতে সঁপে দাও
এইবার, সেনালিয়া; 'এজেলিয়া' ফুলের মতন
হৃদয়ে সৌরভ ছিলো যতো, এইবার মুছে নাও
তোমার হৃদয়ে। আমি দুঃখের পাতালে নেমে, মন
কান্নার প্রমুখ করি। তারপর আকাশের চোখে
চোখ রেখে, মন রেখে সমুদ্রের অতল গভীরে—
প্রেমের প্রগাঢ় ছবি মুছে ফেলে, অনিরুদ্ধ লোকে
একা একা বিস্মৃতির একক আস্তরে ফিরে যাই॥

বিজয়কুমার দত্ত

চিতাপ দুঃখের স্মৃতি

১· সব কিছু বদলে যায়—শহর মানুষজন লোকালয় পথের চেহারা,
নাকি সবই ঠিক থাকে ? আসলে চোখের মণি ক্ষয়ে যায় রোজ
রজনীগন্ধার ঝাড়, বেলকুঁড়ি করানো বকুল
তেমন বিহ্বল সাদা দেখায় না আর।
জানি এ সংসার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঝলায়
কেবলি আঘাতে মুড়ে করে দেয় স্বপ্নের শরীর
প্রাক্তন বিশ্বাসরিক্ত প্রণয়ের নরম শয্যায়
হাওয়া আজ ভারী লাগে অমল সন্ধ্যার।
বুকে কোন রক্ত নেই অস্থি ভাসে নিহিত শরীরে
সারারাত জেগে থাকা নিশ্চল প্রতীক্ষা মগ্ন অন্ধকার ঘিরে।

২· জ্বর গায়ে বাড়ী আসে অফিস ফেরত এক কেরাণী যুবক—
সোমবার অপরাহ্ণ। ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকে
তখন উত্তাল ধ্বনি ট্রাম বাস অগুন্তি মানুষ
যেন এক বাঁধভাঙা স্রোত, হঠাৎ প্লাবিত করে
শহর বাতাস এই বিকেল পাঁচটার,
তখন সে যুবকের ক্ষীণজ্ঞান জ্বরতপ্ত বিষণ্ণ স্মরণে
মনে পড়ে ছেলেবেলা, উজ্জ্বল চকিত তীক্ষ্ণ অধীর কৈশোর
রমনী উত্তাপ গাঢ় উদ্দাম জীবন।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুমহারা অস্থির কান্নায়
জীবনে প্রথম তার মনে হল এ পৃথিবী নিশ্চল হৃদয়
বিকীর্ণ আঁধারে ঢাকা করুণ সময়।

৩· মনে কোন অভিমান রাখিনাকো। কেন না সংসারে
সাজানো সুখের চিহ্ন ভেঙে যায় কাঁচের মতন—
জীবনে কোথায় ছিল আলোকিত হৃদের জোয়ারে
রাত্রীর নীলাভ কম্পন। অভিমানে অবগাঢ় মন

কেবলি হারায় আজ রক্তের উন্মুখ স্বর, সানন্দিত গান,
যমুনা-সঙ্গীত-লিপ্সু যৌবনের অমের সম্মান।

আমরা অনেকদিন পৃথিবীতে রক্তেছি নীরবে
যুদ্ধের বীভৎস লোকে, শান্তির বিনীত পরাজয়ে
সচকিত ভগ্নকণ্ঠ। কতবার নিহত দলিত লিপ্ট মানুষের শবে
বুকের বিকীর্ণ ক্ষত ভরে গেল সুমিত হৃদয়ে।

মনে কোন অভিমান ছিল কি ছিল না এতদিন
সময়ের বাঁকা রোদে ভেসে যায় পিপাসার্ত প্রেম রক্তহীন।

জসীম উদ্‌দীন

স্বীকারোক্তি

আমি অপরাধী আমার কোরোনা ক্ষমা।
আমি মূঢ়, আমি শয়তান, পলাতক
দেখো না ঐ মুখ, কোনদিন আর এর ছায়া মাড়িয়ো না
সকলই সইবো জীবনের ভুল যতই দুঃখ হোক্।

একান্তভাবে ভালোবেসেছিল তবের যাখোনি কিছু
আবেশিত হাসি, উচ্ছল মন ইন্দ্রিয় সুখ তাও,
গোপন হৃদয় স্পর্শ করেও পাওনি অন্য কিছু
আমাকেই দিলে দু'হাতে উপড়ে নিজের জীবনটাও।

আমি অপরাধী আমার নেইকো ক্ষমা
গায়ে নিয়ে এক মিথ্যের আবরণী
তোমার সঙ্গে বৈষিক প্রতারণা
করেছি ভেবেছো, কি করে শোনাবো মনের পরাবলী।

করবে না জানি বিশ্বাস তুমি আর।
সমুদ্র স্বাদ কল্পিত নয় জানো,
কিভাবে দেখাবো আমার স্বপ্ন নিয়ে
তোমাতেই আছি। নিবিড় রাতের গানও

উত্তরসূরী

যদিও তোমার প্রেমের যোগ্য নই
আকাশ-মাটিতে কঠিন অঙ্গীকার
দৃঢ়তা আমার স্থায়ী হল না তো কই
পরাজয় মানি, বঞ্চিত অধিকার।

ক্ষতবিক্ষত অবসান মেলা দিন
আত্মায় গ্লানি, আমার নেই তো সুখ
বিষাদ জীবন শূন্য, দীর্ণ দীন,
অপরাধী আমি নিজের দুহাতে ঢাকবো আমার মুখ।

আমি অপরাধী আমার কোরোনা ক্ষমা।

বাসুদেব দেব

তিস্তা-তীর-বাসী-কে

তিস্তা স্নিগ্ধসখী, সহসা মেঘডম্বরুতে ব্যাকুল
উতল হলো। পাহাড় দ্যাখো ঢাকলো কালো মেঘে।
জানালা বন্ধ করো যুবক। ঘর ভিজবে। ফুল
গন্ধরাজ ভিজবে যুবকের তলার বৃষ্টি লেগে॥

তিস্তা স্নিগ্ধসখী, ভাঙবে এখন, ডাকবো গাঢ়স্বরে—
ঘাঘরা দুলবে, ঢেউ ছড়াবে। আকাশ মগ্ন পোত।
যুবক তোমার উঠোন ভেঙে অন্ধকার ঘরে
ভাঙন-ভীরু অবক্ষয়ের প্রবহমান স্রোত॥

নবীন মুখোপাধ্যায়

অনুর নির্জন

তোমার রক্তে কোনো সোচ্চার নেই। তোমার শিয়রে
বাদামী আলোর নীল বিস্ফোরণ, হাওয়া
দিলে বিবর্তন অশরীরী প্রচুর ক্ষমতা।
প্রসবিনী, শরীর তুলোর রোগা স্বাভাবিক সাদা বিবৃতিতে
একদিন ছিল। হাওয়া দিলে
চোয়ালের বিশিষ্টতা অজস্র পথের নির্মম
জন্তু ভেঙে সগর্বিত সুডৌল গালের প্রত্যাশা
ঘরে যেতো। প্রসবিনী, তোমার শিয়রে
এক স্তূপ বরাবর পরিণতি-হীন কান্না, মাংসল আওয়াজ
অনুর নির্জন কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে
একটা গোটা দেশের বিক্রম
জ্বালায় সর্বত্র আজ।

প্রসবিনী, কেন
তোমার রক্তে আজ ছোট বড় স্তরের মতন
শান্তির প্রতায়, ঢেউ খুঁজে চলে কোনো আলোড়ন।

রফুল মজুমদার

হে জলধি স্থির থেকো

হে জলধি, স্থির থেকো নিশ্চিত গহনে।
তোমার দর্পণে আজ মুখ দেখে যাবো,—
এই বলে সারাদিন শুধু বসে আছি,
পরিচিত সময়ের জলঘড়ি মেপে।

পিপাসার জল দেবে প্রতিশ্রুত ছিলে,
তোমাকে রেখেছি তাই মনের কোণায়।
যদিও আমার দৃষ্টি প্রসারিত নয়,
তবু আজো স্বপ্ন দেখি শৈকাহত ছবি।

উত্তরসূরী

হে জলধি স্থির থেকো সকল সময়।
আমি এই জীবনের তরী বেয়ে শুধু
চলে যাবো অন্ধকারে অতি সাবধানে,
নক্ষত্রের ভয়ঙ্কর ছবি মনে রেখে।

আমি তবু কোনদিন করুণা চাই না,
কোন ঘৃণ্য নারীমূর্তি দেখতে চাইনি,—
যা থেকে অন্ততঃ এই সমস্ত শরীর
যন্ত্রণায় বন্ধ হয়ে ডুবে যেতে পারে।

অলীক শুধু

দিলীপকুমার সেনের জন্য একটি সনেট

অথচ কোনদিন তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে না।
এখন আমার কাছে ঊষ্ণ বিশ্রাম চাই। পৃথিবী
কারুর নয়, পৃথিবী আমাদের সকলের। প্রশ্ন
তবুও মনে জাগে : কৃষ্ণচূড়ার গাছ সর্বত্রই
তো আছে। নবযাত্রার ধ্বনি সর্বদাই কানে আসে।
বহুদিনের পুরোনো রোদ্দুর বুকে করে এখানে
কারা আসে ? নক্ষত্রের নীল আলো একটু একটু
করে জমিয়ে জমিয়ে অতঃপর আমি লব হবো।

তুমি দীর্ঘ দিন রাত্রি জেগে জেগে কবিতা লিখেছো
নিস্তব্ধ রাত্রে তুমি যে সব শব্দ শুনেছ, যে সব
উচ্ছিষ্টের পদশব্দ, অন্ধকারে ঘর্ষণের শব্দ,
প্রত্যাশিত আলোর শব্দ, সে সবই আজ তোমার।

আমরা চিরদিন সূর্যকে বিশ্বাস করে এসেছি
এবং বিশ্বাসেই আমাদের প্রেম, আমাদের মৃত্যু...

তারাপদ রায়

একটি অসমাপ্ত মৃত্যুকথা।

প্রিয়বালা: মহেন্দ্র ও জনৈক শ্মশানবন্ধুর কথা

পাত্রপাত্রী

প্রিয়বালা—জনৈকা মধ্যবিত্তা মহিলা; মহেন্দ্রের স্ত্রী এবং হন্তা।
মহেন্দ্র—৩৪ ফাল্গুনে, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে নিহত জনৈক যুবক; প্রিয়বালার স্বামী।
শ্মশানবন্ধু—প্রিয়বালার প্রেমিক; মহেন্দ্রের বন্ধু, শ্মশানবন্ধু এবং অনাত্মীয় হত্যাকারী।

সময়—৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ সন্ধ্যাবেলা, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া তিথি।

পটভূমিকা

মফস্বলের এক প্রান্তে কোনো এক সাবেক কালের পুরনো দোতলা বাড়ি; কাঠের বারান্দা, সিঁড়ি। এদিকে ওদিকে অস্পষ্ট জোনাকি। একতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। সেই ম্রিয়মান আলোয় সমস্ত কিছু কেমন যেন অস্পষ্ট, অপ্রাকৃত। চারদিক ফাঁকা নিস্তব্ধ, বারান্দার নীচে দু-একটা শীত শেষের অকাল ঝরাপাতা স্তূপ নিষ্কম্প এবং প্রায় অস্তিত্বহীন।

ঘুপসি উঠলে, প্রিয়বালা এবং তার প্রেমিককে দেখা যেতো। প্রথমে প্রিয়বালাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না; অনুমান কেবলমাত্র একটি ক্লান্ত নারীদেহকে অনুমান করা যাচ্ছে। সে প্রায় অন্ধকারে পরীর এদিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে এলোমেলো করে জড়ানো ছাই রঙের আলোয়ান, শিথিল খোঁপাতনো শাড়ি। প্রিয়বালা যেন কোনো দিকে না তাকিয়ে চোখ খুলে রেখেছে। প্রিয়বালার প্রেমিক সেও যেমন ক্লান্ত তবুপরি তার দাঁড়ানোর মধ্যে একটা অসহায়তার আভাস মিলছে। লণ্ঠনের আলো এসে তার মুখে চোখে কপালে পড়েছে। সে স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে প্রিয়বালার শরীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কপালে কুঞ্চিত ভ্রূ যেন মাকড়সার মত স্থির।

ঘুপসি ওঠার পর থেকেই মৃদুস্বরে অন্তরালে একটা অনুচ্চারিত কোলাহল যেন অনুভব করা যাচ্ছে। কারোর পায়ে চলার শব্দ কিম্বা আসা কিছু একটা অসহন আওয়াজ অন্ধকারের ভেতর থেকে উঠে আসছে। লণ্ঠনের শিখাটা একটু একটু করে কাঁপছে, পায়ের শব্দটা যেন একটু স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। প্রিয়বালা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে অন্ধকার; লণ্ঠন নিয়ে গেছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা ছায়া উঠে এলো।

শ্মশানবন্ধুর কথা

উত্তরের বারান্দার কাঠের সিঁড়িতে কারা হাটে
ও ঘরেতো কেউ নেই, মহেন্দ্রের ঘরে আজকাল
কেউই থাকেনা জানি। তবু ওই হলুদ দেয়াল
এ কার ছায়ায় কাঁপে বারবার, কার ছায়া জানালার কপাটে?
মহেন্দ্র কি এ বাড়িতে, ওই ঘরে এখনো রয়েছে
সেতো আর বেঁচে নেই, নাকি এই বাঁচা না বাঁচার
কোনো গূঢ় অর্থ নেই জীবনের সমস্ত রেখায়
কোনো খানে সীমা টেনে বলতে পারি না,
এর পরে সব মুছে গেছে।

উত্তরসূরী

মহেন্দ্র, এখন তুমি আর বেঁচে নও; স্নান আয়নায়
এই ধূলো জমা কাচে তুমি আর নিজের ছায়াকে
কোনোদিন খুঁজেও পাবে না, শোনো, মহেন্দ্র তোমাকে
পরশুরাতে ডোমনার শ্মশানে রেখে এলাম চিতায়।
তুমি কেন ফিরে এলে, এই ঘর দেয়াল-জানালা
তরুলতা, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমা, প্রিয়তমা নারী
সে আর তোমার নয়, এই শান্ত ছায়াময় বাড়ি
তুমি আজ বহুদূর দূরতম নিঃসঙ্গ নিরালা।
হে মৃত যুবক, শোনো, আমি সেই অবার্থ প্রেমিক
যে পারে ছিনিয়ে নিতে বরমালা, গৃহসুখ নারীর শরীর
আমি সেই দুঃসাহসী, আমি সেই হত্যাকারী বন্ধুতা স্মৃতির—
সব মূল্য এক পণ্যে বিরোধি বিকিয়ে,
তবু তুমি ফিরে এলে ঠিক।
অমল জোনাকিপুঞ্জে, ধানখো, কুয়াশার অন্ধকারে
আর কোনোদিন তুমি শীত গ্রীষ্ম তৃষ্ণার ইচ্ছায়
আশ্রয় পাবে না খুঁজে, ডোমনার ঘাটের চিতায়
সব ইচ্ছা ছাই হয়ে ধোঁয়া হয়ে ভেসেছে জোয়ারে॥

প্রিয়বন্ধুর কথা

জানিনা রক্তের নীচে কলঙ্কমনসার কাঁটাবন
আছে কিনা; নাকি এই শিরায় শোণিতে জ্বালাধরা
এই দেহ তীক্ষ্ণ বিষ, তীক্ষ্ণ, তীব্র ব্যর্থতায় ভরা
আরেক মনসাগুল্ম, ব্যর্থ দুঃখে জ্বালালো যৌবন।

মহেন্দ্র, আমাকে তুমি বহু সুখে সুখে দিয়েছিলে
এই শান্ত গৃহকোণ, এই স্তব্ধ পাদপের ছায়া,
অঙ্গনের পুষ্পগুচ্ছে মাধবীর পল্লবিত মায়া,
সংসারে যা কিছু প্রাপ্য, হাতভরে তুলে দিয়েছিলে।

বিরঞ্জন শান্ত উষা মধ্যাহ্নের অস্ফুট গুঞ্জন,
চন্দ্রাবলী স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্র যামিনী;
তুমি সব দিয়েছিলে সুখে নম্র দিবস-শর্বরী,
সব আলো, ভালবাসা, প্রীতি গাঢ় ঘন আলিঙ্গন।

তবুও কোথায় রক্তে কোন্ এক নিবিড় যন্ত্রণা
আমার আত্মাকে হত্যা করে ক্রূর আদিম উল্লাস
এই দীর্ঘ যৌবনের প্রতি দিনে, প্রতি মাসে মাসে
নিষ্ঠুর কৌতুক সেই সর্বনাশা; তুমি তাকে কখনো জান না।

মাধবীর এই ফুল, এই দুটি স্নিগ্ধ চোখ যাবে
কিছুই রাখোনি চোখে, ভাবোনি তোমার প্রিয় গানে
আরো কারো প্রিয়তর, এই ভালবাসার সম্মান
পরিণত হতে পারে কোনদিন অলীক প্রবাদে।

হে নিহত, যে বিষ তোমার অস্থি, নীলাভ শরীরে
আমি তাকে সে যন্ত্রণা রক্তে-রক্তে দীর্ঘদিন জানি,
জানি মৃত্যু, পলে পলে জ্বলে যাওয়া দেহের যন্ত্রণা, আমি জানি
শিরায়—শোণিতে—রক্তে, অন্ধকারে, গভীর তিমিরে।

অন্ধকার, চতুর্দিকে সঞ্চারিত শূন্য অন্ধকার;
ও ঘরে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েছি, বারান্দায়
ফুলদানিতে কোনো ফুল রাখিনি গুছিয়ে। এ কোথায়
ফিরলে তুমি? নাকি মৃত্যু নেই এ ইচ্ছায়, কামনায়?

মধুমন্তের কথা

মাধবী বিপিন বাসী প্রিয়তম পাখীটির গান
জ্যোৎস্না কালে শোনা যাবে; ততক্ষণ এই নিমগন্ধ অন্ধকার,
পায়ের তলায় শাদা নিমফুল; একদা তোমার
শরীরের কোন অংশে এই গন্ধ তীব্র বহমান?

বাসক পুষ্পের সজ্জা, পথের দুপাশে স্রোণ ফুল,
শীতের ধূসর রঙ অপরাহ্ণ অস্পষ্ট আকাশে;
এখনো কি বেঁচে আছি? মজা সড়কের দুই পাশে
এখনো'ত জমে আছে দূরতম বসন্তের প্রথম বকুল।

প্রিয়বালা, তুমি বিষ দিয়েছিলে, তবু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে;
তোমার কলমিলতা, মৌরলা মাছের খেলা ককখকে জলে,
সাদের মাধবী বেন কে কোটার আগাছায় বৈঁচির জঙ্গলে,
স্নিগ্ধকণ্ঠ পাখী ডাকে চন্দ্রবাম তৃতীয় প্রহরে।

আরো সমর্থন আছে, তুমি শুধু বাঁচতে দিলে না,
এই আলো ছায়াময় নিবিড় গভীর পৃথিবীর
ধুলোয়—হাওয়ায়—রোদে প্রতিদিন ইচ্ছার শরীর
কি আশ্রয় খুঁজেছিলো, কেউ তাকে কখনো জানে না।

প্রিয়বালা, একদা কৈশোরে তুমি বেনারসী শাড়ীর সিঁদুরে,
চন্দন তিলক ভালে লাজনম্র প্রথম সিন্দূরে
থর থর কেঁপেছিলে, দিন তাকে নিয়ে গেছে দূরে
সান্নিকটে ছিলে তবু স্মৃতি, প্রেম স্বপ্নময় ঘরে।

আরেকবার তুমি সেই নীলেশ্বর শিবের পার্বনে,
কি যেন কিনতে গিয়ে হঠাৎ ভীড়ের মাঝে উজ্জ্বল মেলায়
কোথায় হারিয়ে গেলে, খুঁজে পাওয়া ধূসর সন্ধ্যায়
তোমার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, প্রিয়বালা, সব আছে মনে।

এক বিন্দু জল দিয়ো, এইখানে এই বিল্বপাদপের মূলে
একটি মাধবীলতা বুনে রেখো, মাধবীর শুভ্র নীরবতা
আমাকে থাকুক ঘিরে আর তুমি নিষ্ঠুর মমতা
আমাকে শ্লাঘিত করো, আর এই জানলা রেখো খুলে।

সন্ধ্যার আকাশ বড় স্নিগ্ধ ছিলো, গোধূলির একটি দুটি তারা
জানালা কম্পিত মেঘ, মেঘে বড় সুখ ছিলো, আমার মৃত্যুকে
তুমি বুঝি কোনোদিন বুঝতে পারবে না, কত দুঃখে
চতুর্দিকে ঘুরছে ফিরছে জীবনের চঞ্চল ইশারা।

সাধো ইচ্ছা আজো বেঁচে, জানি আর কোনো অনুভবে
কোনো স্পর্শ, কোনো শব্দ, কোনো আলিঙ্গনে—
তার কোনো তৃপ্তি নেই
তবু তুমি জল দিয়ো, ফুল দিয়ো আর শোনো সেই
জানালাটা খুলে রেখো—আজ কিংবা কাল মেঘ হবে।

বিবেকানন্দ ও বাংলা চলিত গদ্য

উনিশ শতকের শেষার্ধ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের পর্ব। সাম্রাজ্যবাদ তখন শাসনের ঔদ্ধত্য ও শোষণের নৃশংসতা নিয়ে যেমন প্রকাশিত হচ্ছিল, তেমনি নিপীড়িত দেশ ও শোষিত জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল জাতীয় চেতনা—জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের এই স্বৈতরূপ। ইং ১৮৫৮ এর পর হতেই বাঙালীর জীবন আধুনিক যুগের প্রস্তুতি পর্ব ছাড়িয়ে প্রকাশের পর্বে উত্তীর্ণ হোল, আর ঠিক এই পর্বের প্রথমভাগেই (ইং ১৮৬৩) স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর মধুসূদন-বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকাশে উজ্জ্বল, যৌবন রবীন্দ্রনাথের নবীন আলোকচ্ছটায় প্রদীপ্ত।

বিবেকানন্দ ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক—এক মহা বিপ্লবী সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক নন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যাঁরা মুখ্যত সাহিত্যিক নন, তাঁরাও অনেক ক্ষেত্রে ভাষা-শিল্পের রূপান্তর ঘটিয়েছেন তাঁদের বলিষ্ঠ চিন্তায় ও প্রখর ব্যক্তিত্বে। ইংরেজী ভাষায় বার্ক, ফরাসী ভাষায় ভল্‌তেয়ার আর বাংলাতে রাজা রামমোহনের মত স্বামী বিবেকানন্দও এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীজী এক গভীর সমাজ চেতনা ও এক মহান ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছিলেন। তাই তাঁর ভাষা ছিল প্রচারধর্মী। সেখানে সাহিত্য-তপস্বীর অনুশীলন যতখানি ছিল, তার অধিক ছিল এক মানবপ্রেমিক কর্মীর প্রাণচঞ্চল আবেগ। এই পশ্চাৎপটের আলোকেই একমাত্র বিবেকানন্দের ভাষারীতির আলোচনা সম্ভব।

হাজার বছর ধরে বাংলা কবিতা রচিত হয়ে এলেও বাংলা গদ্য-রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সামগ্রী। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই জানেন যে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে উইলিয়ম কেরী উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং কেরীর নেতৃত্বেই আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (ইং ১৮০০-১৮১৫) অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ গঠিত হয়। এই যুগের প্রধান লেখক ছিলেন উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি।

এঁদের সকলের গদ্যরচনাই পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'বেদান্তগ্রন্থ' নিয়ে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের আবির্ভাব। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের ব্যবহার করে রামমোহন বাংলা গদ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন; বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হল।

উনিশ শতকের প্রথম হতে আধুনিক বাংলা গদ্য বিভিন্ন লেখকের রচনা-রীতির মধ্য দিয়ে আপনার সাহিত্যিক প্রকাশের যে আদর্শ খুঁজে ফিরছিল এবং বিভিন্ন রীতি নিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষায় তা সর্বপ্রথম সাহিত্যিক রূপ লাভ করল। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রকৃত সাহিত্যিক যুগ আরম্ভ হল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে 'ছন্দ-ভিত্তি' স্থাপন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তারই উপর তাঁর কারুকীর্তির নিদর্শন নির্মাণ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের লেখনীতে বাংলা সাধুভাষার উৎকর্ষ দেখা গেল। কিন্তু সেকালে চলিত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করলেন মাত্র দুজন লেখক—প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যে যে বিশেষ রীতির প্রবর্তক, সেই রীতির তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও, একক নন। কালগতভাবে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ—এই দুজন স্বামীজীর পূর্বসূরী। তাই এঁদের ভাষা-রীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা-যোগ্য।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আওতায় প্রকাশিত চলিত ভাষায় রচিত প্রথম পুস্তক উইলিয়ম কেরীর কথোপকথন। কেরীর কথোপ-কথন-এর ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তাই সে ভাষার সাহি-ত্যিক মূল্য নির্ণয় করার প্রশ্ন ওঠে না। এদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র শুধু প্রথম চলিত গদ্যের রূপকারই নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক। প্যারীচাঁদ রচিত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁরই সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মুখবন্ধে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। যিনি পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এর থেকে বোঝা যায় যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্যারীচাঁদ চলিত বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন তা ছিল নিতান্তই সীমিত। সাহিত্যে কথিত ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি কোন জোরালো দাবি তুলতে পারেননি। এদিক থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ২০শে

ফেব্রুয়ারী তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন:

"বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।.....চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলাও কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, সে ভাষা কি দর্শনবিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?.....ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোখে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এত চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।" স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর ১২ বছর পরে ইং ১৯১৪তে সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী এই বাণি তুলেছিলেন। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এ বিষয়ে এর চেয়ে নতুন ও সংগত কথা বোধহয় তাঁরও জানা ছিল না।

কথা ভাষাকে আশ্রয় করলেও প্যারীচাঁদ সাধুভাষার প্রভাব একেবারে বর্জন করতে পারেননি। ভাষা-শিল্পী হিসাবে প্যারীচাঁদের অক্ষমতা অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে কালীপ্রসন্নের রচনায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন যত বড় ভাষা-শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন জীবনরসিক। সেকালের বাঙালী-জীবন-সমালোচনায় তাঁর যতখানি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, ভাষা-শিল্পের উৎকর্ষের দিকে তিনি ততখানি দৃষ্টি দেননি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের ভাষাকে অসংলগ্ন ও অপবিত্র বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কালী-প্রসন্নের অপরিণত ভাষাই পরবর্তীযুগে বিবেকানন্দের হাতে প্রাণবন্ত হয়েছে।

সঙ্গীতে, শিল্পে বিবেকানন্দের অনুরাগের কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু বাংলা চলিত ভাষার যে তিনি একজন অসামান্য লেখক এ-কথাটি অনেকেই বিস্মৃত হন। বিবেকানন্দের জীবন মাত্র ৩৯ বৎসর। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ তিনটি বছর তাঁকে আমরা সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে দেখতে পাই। বিবেকা-নন্দের মৌলিক গদ্যরচনার বই মোট চারটি,—'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই চারটি বই-এর রচনাংশ ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজীর প্রথম মৌলিক গদ্য রচনা সাধুভাষাতে। প্রথমদিকে তিনি নিজস্ব কোন লিখনশৈলী ঠিক করে উঠতে পারেননি, বঙ্কিম প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। যেমন—"সমষ্টির জীবনে

ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব. এ অনন্ত সত্তা—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"—(বর্তমান ভারত)।

'পরিব্রাজক' বইটি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণের কাহিনী। এ বইএর অধিকাংশ জাহাজে ভ্রমণকালে ও প্রবাসে রচিত। এই সময় থেকে ভাষা-রীতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পথ স্থির করলেন, চলিত ভাষায় 'পরিব্রাজক' রচিত হল। পরিব্রাজকের গদ্যরীতির একটু নিদর্শন তুলে দেওয়া হল—

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ-হাত গভীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ হিম-শীতল 'গাঙ্গাং-বারি মনোহারী' আর সেই অদ্ভুত 'হর্ হর্ হর্' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের 'হর্ হর্' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র স্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কর্ণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজল-প্রীতি; গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গাবারির বৈরাগ্য স্পর্শ! .....গোলবারে আমি একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উদ্বস্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতি-দ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত; আর শুনতাম—সেই "হর্ হর্", দেখতাম—সেই হিমালয়-ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে প্রতিমুহূর্তে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—"হর্, হর্, হর্"

—(পরিব্রাজক)।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হবার প্রায় ৩৭ বছর পরে স্বামীজী চলিত ভাষায় 'পরিব্রাজক' বইটি লেখেন। তাই কালী-প্রসন্নের দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তাছাড়া তখন ছিল

সাধুভাষার যুগ। ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথকে পড়তে হয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ', বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়েই তিনি স্বভাবশিল্পীর মতোই তাঁদের ভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক রূপ দিয়েছেন।

'পরিব্রাজক' রচনার পর চলিত ভাষার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় হাত দিয়েছিলেন। পরিব্রাজক সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী আর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' মৌলিক চিন্তা-সমন্বিত প্রবন্ধ পুস্তক। কিন্তু স্বামীজী পরিব্রাজক বই-এ যে চলিত গদ্যরীতির মান তুলে ধরেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। যেমন:

"আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দুদিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবার আস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।"—(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।

বাংলা কথ্য ভাষায় লিখিত স্বামীজীর পত্রগুলির গদ্যভঙ্গীও অপূর্ব। স্বদেশ ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যিকদের, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পত্রেও এমন অকুণ্ঠ, প্রাণবন্ত ভাষার নিদর্শন মেলে না। বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতির একটি অপূর্ব সঞ্জীবনী শক্তি ও স্বচ্ছন্দ রূপ দেখা যায়। ধরা যাক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর কথা—

'ঘাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গী। খামখুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা-পাতার চিত্রবিচিত্রের কি ধুম।...

মনের অশান্তি, তার মানে কোনো কাজ নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যাও, ঘরে ঘরে যাও: লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর। নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ।"

কিম্বা পত্রাবলীতে সেই মহৎ আত্মার উচ্চারণ,—

"এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরহিত্যরূপ আত্মাত্মিক্ষয় গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। শত শত যুগের অবিশ্রাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি?"

কিম্বা সেই বজ্রগম্ভীর প্রার্থনা।—

"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ীর মধ্য হতে।...এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব জীবনীশক্তি। এরা এক ঘুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।...অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি ফেলে দাও। আর তুমি হাওয়ায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও: কেবল কান খাড়া রেখো। তোমার সেই হাওয়ায় বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে, কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভারতের উদ্বোধন "ওয়াহ্ গুরুজীকী ফতে।"

ভাষার এই পৌরুষ সেই পুরুষসিংহের ব্যক্তি-স্বরূপ থেকেই উদ্ভূত। তাই চলতি বাংলায় এমন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারও পক্ষে সম্ভব হোল না।

অনুলেখন বাগচী

ডি. এচ. লরেন্স

বিদায়

ও কে ওরা দেখ বন্ধ করেছে খাঁচায়।
ছোট ছেলেপুলে ঘুরে ঘুরে করে
খাবার টুকরো ঠোঁটে দেয় ভরে,
পথে যাচ্ছে লোক বলাবলি করে—"যাস্‌রে,
কি ভয়ানক পাখী, ওর কাছে যাস্‌নে।"
শিস্ট ভদ্র পথচারী কয় "আহাহে,
(হায়) আকাশের রাজা বন্দী আজকে কি মোহে!"
আশাহীন আক্রোশে
ক্ষেপে ওঠে না কো রোষে,
অপরাজেয় সে, নির্ভীক চোখে তাকায়।
প্রদীপ্ত তার বুক
উড়ে যেতে উৎসুক,
(ধীরে) সূর্যের পানে দুইচোখ তুলে রয়॥

অনুবাদ : অনীল ঘটক

এডোয়ার্ড মুর্হি-স্মিথ

অনুপস্থিত

বজ্রগর্ভে ঘোর ঘনঘটা। পড়লো বাজ?
না পাওলেও প্রস্তুতি যেন চলছে আজ।
কঠিন পাহাড়ে মেঘের সার। একটি তার
পীনাগ্রভাগ যেন সে প্রোথিতভর্তৃকার।

উত্তরসূরী

নারীর উরসে গগনচুম্বী যুগমন্থন।
কাঁপে ভেদ করি সূক্ষ্ম ভাষার আস্তরণ।
দগ্ধ ধবল মর্মরতল: চিত বিভল,
ঊর্ধ্বে বাজনী করবে কি তারা হিমশীতল?

অসহ্য কামনা-বিবশা কামিনী, যুগ্মভাব
অনুপস্থিত উদাসী পুরুষে। ব্যর্থ আশ,
স্তনাগ্রচূড় মেঘমেদুর কাঁপে বিধুর
দূরে সরে যায় দাহনতপ্ত স্পর্শাভাস॥

অনুবাদ। অনীশ দাস

২. ইতালো কালভিনো

স্বামীর করাঘাত

"কে তুমি ওখানে?"
"আমি বয়সের জীর্ণতা,
আমি তোমার কাছে এসেছি।"
"পরে এসো।
এখন আমি বড় ব্যস্ত
আমার এখন অনেক কাজ।"
"বেশ তো বাছা,
কিন্তু মনে রেখো
আমি তোমারই জন্যে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছি।"
লেখকের কাজ শেষ,
টেলিফোনে কিছু কথা,
এবং অবশেষে তালা ডিম খেয়ে
দরজা খুলে দেখি,
বাইরে কেউ অপেক্ষা করে নেই।
তবে কি বন্ধুরা কেউ
ছেঁদো ঠাট্টা করে গেল?

অথবা সম্ভবত
আমিই ভুল করেছি নামকরণে:
বয়সের জীর্ণতা নয়,
আমাকে ডেকেছিলো প্রবীণতা।
থামতে জানে না বলে
অবশেষে সে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেছে।

অনুবাদ। শিবলি মোয়

কিশলয় ঘোষ

স্থির হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও

স্থির হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও, বে-আর্ত গলায় ক্ষত নিয়ে
জ্বলছো এবং এপাশ-ওপাশ করছো। সারারাত
নিঃশব্দ সমুদ্রে ভেসে আমরা শুনেছি
নুনের চাদরে ঢাকা ক্ষত থেকে উৎসারিত ধ্বনি।

চাঁদের অর্ধেক ক্রোশ নিচে আমরা শিউরে উঠেছি শুনে-শুনে
মুখর ক্ষতের থেকে রক্তের মতন এই নির্গলিত সমুদ্রের স্বর,
প্রবল গানের ঝড়ে নুনের চাদর ভেঙে পড়লে, সকল
নিমগ্ন মৃতের স্বর বাতাসে সাঁতার কেটে ভাসে।

মন্থর বিষণ্ণ পাল ছিঁড়ে একটা পথ করে দাও
নিরুদ্দেশ নৌকোর দরোজাগুলি খুলে দাও বাতাসের দিকে
এখন যাত্রার জন্যে আমার ক্ষতের অন্ত খুঁজে,
সমুদ্রের স্বর পেয়ে ওঠে নুনের চাদর এই কথা বলে।
স্থির হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও যন্ত্রণাকে ঢাকো
অথবা আদেশ মেনে আমরা তোমার সঙ্গে নিমগ্নের মতো নিয়ে যাবো।

অনুবাদ। স্নেহাঞ্জন ভট্টাচার্য

উষ্ম গান

একে একে আসে তারা
অন্ধকারে ঃ বন্ধু কজন,
এবং কয়েকজন ইতিহাসখ্যাত নাম নিয়ে।
কেমন বিলম্বে তারা আলোকিত হতে শুরু করে।
অদৃশ্য হবার আগে তবুও দাঁড়ায়
পুঙ্খানুপুঙ্খ-সঠিক রূপে: সমস্ত অতীত

তাদের সমস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করে
বিড়ম্বনাপূর্ণ এক পোষাকের মতো।
এই মানুষেরা যারা, ভেবেছি যে, বেঁচেছে শুধুই
প্রতি উষ্ণ আলোড়নে কম্পিত সত্তায়
সমূহ আবেগ ফের জয় করে নিতে।
তারাই স্মরণে আনে, এখন দূরের।

বস্তুত, এখনো তারা পায়নি বিশ্রাম,
তথাপি যে-হেতু তারা বিচ্ছিন্ন এখন,
পৃথক পতন হতে,
নিজেকে সত্তার গাঢ় অনিচ্ছায়,
দুরূহ বিশ্বাসে
নক্ষত্রের মতো কক্ষপথে।

অনুবাদ। বিমলেন্দু পালিত

ফেব্রুয়ারিকে পাল্টিয়ে লিখল

যাদবেন্দ্র

(বোধহয় সে নিজের জ্যামিতি জানত না।)

একদিন সকাল দশটায়
যুবকটি ভুলল।

তার হৃদয় ভাঙা ডানা আর নকল ফুলে
ভরে উঠেছিল।

সে মৌখিক গ্রহণ করল
শুধু একটি শব্দ বাদ পড়ে গেল।

যখন সে তার দস্তানা খুলল
সূক্ষ্ম ছাই পড়ল হাতদুটি থেকে।

খুলন্ত বারান্দা থেকে সে দেখল একটি বৃত্তজ
এবং নিজেকেই বারান্দা ও বৃত্তজ ভাবল।

অবশ্য সে দেখছিল কেমন করে ওই ফ্রেমে
বন্ধ ঘড়ি তাকে লক্ষ্য করছিল।

সে দেখল তার ছায়া রেশমী সাদা ডিভানের
উপর ছড়িয়ে স্থির।

এবং বালকটি খুব জ্যামিতিক
কুড়ুল দিয়ে ভেঙে ফেলল আরশি।

যখন আরশি ভেঙে গেল, ছায়ার একটি প্রচণ্ড স্রোত
তার অলৌকিক প্রকোষ্ঠ প্লাবিত করল।

অনুবাদ। অর্ক্য সাহিড়ী

বিয়োগপঞ্জী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে আমরা আন্তরিক-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি। মণিলাল পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন কারণ বাঙালীর আয়ু বিচারে আটাত্তর বছরের পরিণত বয়সই বটে। "স্বয়ংসিদ্ধা", "অপরাজিতা", "রাগিণী", "জাগ্রতা ভগবতী" ও "দুঃখের পাঁচালী" প্রমুখ অসংখ্য উপন্যাস ও কাহিনীর রচয়িতা মণিলাল বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমাজে একটি বিশেষ পরিচিত নাম। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে যুগের এবং এ যুগের এমন কোন পত্র-পত্রিকা ছিল না যা মণিলালের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয় নি। কেবল উপন্যাস সাহিত্য নয়—নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ অবদান। মূলত নাটকার হিসাবেই মণিলাল সর্বপ্রথম খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। বাজীরাও, মাধবরাও, অহল্যা-বাঈ প্রমুখ তাঁর রচিত বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক কেবল সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চেই নয়, অপেশাদার নাট্য-রসিকদের দ্বারা বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্যই মূলতঃ তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশ অধ্যাপক পদে বৃত হন। শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের শিশুপাঠ্য জীবনীর সঙ্কলন "ছোট থেকে বড়" ও "মন্দ থেকে ভাল" এই পর্যায়ের প্রখ্যাত রচনা।

মণিলালের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। মধ্য বয়সে তিনি কাশীতে আসেন। ব্যবসায়ের প্রবল মোহে বহুদিন তিনি স্থায়ীভাবে কাশীতে বাস করেছিলেন—কলকাতার সঙ্গে সমস্ত সম্ভ্রম ছিন্ন করে। এমন কি তাঁর প্রিয় রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী মণিলালের সমস্ত মন বাণিজ্যের মোহজালে আবদ্ধ থাকলেও, একটি সাহিত্যিক সত্তার প্রভাব তিনি কোন সময়েই অস্বীকার করতে পারেন নি।

প্রবাস থেকে আমরা একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করা মাত্র তিনি সানন্দে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। তারই ফলে কাশী থেকে সর্বপ্রথম 'প্রবাসজ্যোতি' মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাসের দাদামশায় কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায়।

ভাগ্য-বিপর্যয়ে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাও একদিন তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ল। মণিলালকে আবার সাহিত্যের আঙিনায় ফিরে আসতে হয়।

মানুষ মণিলালও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। অগ্রজের স্নেহদৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুজ সাহিত্যিকদের ঘিরে রাখতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গমহলের যথার্থ অভিভাবক। কেবল সাহিত্যিক সমাজই নয়, যে কোন ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই ঐ সদালাপী, অমায়িক ও সামাজিকতার আদর্শ নিরিখ বন্ধোবৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে গেছেন।

মৃত্যু প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান। সুতরাং মণিলালের মত একটি সফল জীবনের পরিসমাপ্তিতে শোক প্রকাশ করব না। তাঁর গুণগ্রাহী সাহিত্যিক সমাজ ও প্রকাশকদের কাছে আমাদের কেবল নিবেদন এই যে, মণিলালের অপ্রকাশিত রচনাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক। আজও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। তাঁর শেষ বৃহৎকর্ম নূতনভাবে সম্পাদিত মহাভারতের শেষটুকু সম্পাদনা করে যেন যথাসময়ে প্রকাশিত হয়।

(উত্তর ভারত ১৩৭৩) সুরেশ চক্রবর্তী

নিলীপকুমার সেন

উনিশশো তেষট্টির জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় নিলীপকুমার সেন মারা গেছেন, এ মৃত্যু নির্মম! কফিহাউসের ওপর তলায় কবির স্মৃতিতে সম্প্রতি শোক সভা হয়ে গেল। মৃত্যুর নির্মমতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমাদের মেলাতে পারি না। দীর্ঘ আটমাস হাসপাতালের নির্দিষ্ট বিছানায় শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণা, মনের নিঃসঙ্গ বিভীষিকা—এই নিয়ে তেত্রিশ বছরের এক হৃষ্টপুষ্ট কবিকে দিন রাতের চব্বিশটি ঘণ্টা জেগে থাকতে হয়েছে। মনে হয় মৃত্যু যেন সেদিনই তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যেদিন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। মাঝখানের এই দীর্ঘসময় একটা দুর্বিসহ নরকবাসের যন্ত্রণা!

• কি হবে বেঁচে?

• না, না, আমি বেঁচে থাকবার কোন অর্থ খুঁজে পাইনা।

• অসম্ভব, এ অবস্থায় আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনাও করতে পারিনা।

• জানেন, এক এক সময় আমার মনে হয় কি হবে কবিতা লিখে? মানে, আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে?

• প্রেম? জীবনসঙ্গিনী? জানিনা এগুলো সত্যি মানুষ পায় কিনা!"

যখনই কথা হয়েছে রাস্তায়, চায়ের দোকানে, কোনো মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর বসে, এমনি টুকরো টুকরো কথার মধ্যে দিলীপ সেনের একটি নিরাসক্ত একা, বড় একা একটি ক্লান্ত কবিসত্তাকে খুঁজে পেয়েছি। জানিনা, কবি হাউসের মুখর, উজ্জ্বল কবিসভায় তাঁর জীবন দর্শন অনাবৃত ছিল কিনা!

দু'পুরুষ আগে কবির পূর্বপুরুষেরা থাকতেন নাটাগড়-ঘোলায়। দু'পুরুষ ধরে, পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনের সময় থেকে ছিলেন হাওড়ায়। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দিলীপ সেন ছিলেন সবচেয়ে ছোট এবং বোনেদের একমাত্র আদরের ভাই। পিতার আকস্মিক মৃত্যু এবং সাংসারিক বিরূপতায় বি, এ পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে উঠল না। তারপর বিরাট অভিজ্ঞতার সংসার ক্ষেত্র এবং সব শেষে সুখলাল কারণানী হাসপাতাল। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে কবিকে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় সুখলাল কারণানী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'উত্তর তরুণের নায়ক' কবি দিলীপ সেনের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কবিতা রচনায় তাঁর জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তাঁর কবিতায় সর্বত্র অশ্রু-লিপ্ত-বেদনা ভিন্ন আত্মদহনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি উদ্ধৃতি দিলাম।—'ও যেন সেই এক সম্মোহিনী দ্বীপ, যার দিকে সব নাবিকের সমুদ্র যাত্রা, অবশ্যম্ভাবী পরিণামের মতো হয়ত পৌঁছে দেবে। রবীন্দ্রনাথের উত্তর পাঠক বা উত্তর সাধক হিসেবে আমরা একদিন অন্তত নিশ্চিত জানব—আনন্দের সে নির্বিকল্প বেদীর পাশে অশ্রুলিপ্ত ও বেদনাতিক্ত একটি স্থান, চিরস্থায়ী হয়ে আছে, তা আমাদের আত্মদহনের চিহ্ন আমাদের কাব্যানুসন্ধান।'

'....audience does not know what to do, whether to laugh or to cry, that will be a success for me.' লেখকার এই উদ্ধৃতিটি উত্তর তরুণের নায়ক গ্রন্থের ভূমিকায় কবি দিলীপকুমার সেন সেদিন তুলে ধরে যে 'বক্তব্যকে' রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যনাটকের সার্থকতা সম্বন্ধে, জানিনা সেইটিই তাঁর জীবন রঙ্গমঞ্চের শেষযবনিকা সম্বন্ধেও ভেবেছিলেন কিনা। তবে আজ আর তাঁর failure অথবা success সম্বন্ধে আমাদের ভাববারও অবকাশ নেই। জানিনা, কবি দিলীপকুমার সেনের এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার পর বেদনার্দ্র তিরোধানে আমরা শোক এবং দুঃখের বহির্প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়ে বন্ধু বিচ্ছেদের আশাহীনতায় আর্তনাদ করে উঠব অথবা দুর্ঘটনার তিল তিল যন্ত্রণা থেকে মুক্তির নিশ্বাস নেব বুক ভরে।

স্নিগ্ধ লাহিড়ী

কৈশোর অভিজ্ঞান ॥ দুটি উপন্যাস

সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর একটি অনবদ্য গদ্যকবিতায় লিখেছেন॥

কখনও যেখানে মানুষের পা পড়েনি
সেখানে নরম সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠার
পরাক্রান্ত নিঃশব্দতা
কতদিন শুনিনি।

হয়ত শুনেও না কেন দিন যায়॥

(দ্বিতীয় পৃথিবী, প্রেম)

এই আশঙ্কা যতই সত্য হোক, পরাক্রান্ত নিঃশব্দতা তাঁর অন্বেষণে সব সময়েই কাজ করছে বলে মনে হয়। এই অনুভূতি এঁর একই সমুদ্র নামক প্রথম উপন্যাসেই দুর্বার এবং দ্বিতীয় উপন্যাস দিনরাত্রিতে তীব্রতর ও পুনর্নব হয়ে উঠেছে। প্রথম উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৫৩-৫৭, দ্বিতীয়টির ১৯৫৭-৬১। প্রায় এক দশকব্যাপী একটি প্রস্তুতিবৃত্ত যেন। অথচ বাজারে পনেরোতম উপন্যাসের তুলনায় কতো শীর্ণশরীরী এই দুটি বই—একটিতে ১৪৬ পৃষ্ঠা অন্যটিতে ১৫৪। সব মিলিয়ে দুশো পৃষ্ঠার পরিসর। হয়তো প্রথানুগত সমালোচনার এই পরিমিতিকে উপন্যাসের পথে অকিঞ্চিৎকর অথবা শ্বাসরোধী বলবেন। কিন্তু প্রস্তুতিপরায়ণ এই কবি-ঔপন্যাসিকের রচনার পাঠক দুখানি বইকেই উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত করবেন।

তার কারণ তিনি উপন্যাস ফেঁদে বসেননি, উপন্যাসের আয়তনে একটি কবিতার বীজকে অঙ্কুরিত হতে দিয়েছেন। কবিতা থেকে উপন্যাসের জন্মকে তিনি কোথাও প্রাণপণে লুকিয়ে ফেলেননি, অথচ মুখ্যর জীবন সম্পর্কে একটি জীব-চেতনাকেও অস্বীকার করেননি, সেই কারণে আমি তাঁর উপন্যাস দুটিকে কাব্যোপন্যাস বলবো না। কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তাঁর উপন্যাস উপন্যাস।

দুখানি গ্রন্থের কোনটিতেই বহুদারম্ভ নেই। আছে অনেকগুলি আরম্ভ ও

একই সমুদ্র—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।
দিন রাত্রি—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সমাপনের অন্তর্লীন বৃত্তান্ত। এরি মধ্যে ঐকিক একটি প্যাটার্ন পাঠকের চোখে পড়ে যায় যা নিহিতার্থের মূলে একান্ত বাস্তব ও জীবন্ত। বস্তুত, ঘটনার মতো এত শঠতা আর কার আছে? ঘটনা মানবচরিত্রকে আমন্ত্রণ করে এবং অতঃপর পরিবর্তিত করে ফিরিয়ে দেয়। ঘটনার হাতে ঘুরে-ঘুরে চরিত্র ধাতব গুণ যতই অর্জন করুক, মৌল ধাতুরূপ হারিয়ে ফেলে। অথচ জীবন তো শুধু পরিবর্তন নয়, অপরিবর্তনীয় সারসত্তা বলে কিছু নিশ্চয় আছে। অতএব ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে না এড়িয়েও ঘটনা থেকে একরকম আত্মপ্রত্যাহার ভালো। সুরেজিৎ দাশগুপ্তের নায়কচরিত্র, অনেকটা এইরকম বিবেকী বোধে, ঈষৎ সংলগ্ন থেকেও বিবিক্ত, এবং বিবিক্ত হয়েও পৌরুষের স্নিগ্ধতায় রমনীয়। সে যখন বিদ্রোহ করে, ঝড়কে সমর্থন করে, তখনো গাছপালার উৎপাটন তার কাম্য নয়, শিকড়ই তার লক্ষ্য। ঘটনার শিকড় অর্থাৎ চরিত্রের কেন্দ্রীয় মুহূর্তটি খুঁজে পাওয়ার আর্তি তার অপরাপর অসম্পূর্ণতাকে মুহূর্তে ঢেকে ফেলে। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যে কতো সচেতন তার একটি প্রমাণ, যৌবনের আলেখ্য এঁকেই তিনি কৈশোরের আলেখ্য আঁকতে শুরু করে দিয়েছেন। যৌবন থেকে তাঁর অন্তর্গতি অনিকেত জন্তুর নয়, প্রত্যাবর্তন কৈশোরের আক্ষলীন আশ্রয়প্রবণতায়। এখানে প্রত্যাবর্তন উৎসমুখী বলেই অন্তর্গতির নানান্তর। সুচেতনই সুমন হয়ে উঠেছে। সুচেতনের ঐলী নির্মিতি আবার ফিরেছে তার ভাঙাচোরা উপজ্ঞা ও উপাদানের দিকে। প্রেমের যুগ্মতা ফিরে এসেছে নিঃসঙ্গ স্বপ্নসংকোচে, পরাক্রান্ত নিঃশব্দতায়। আধুনিক প্রেমিকের পরিবেশ নেই অথচ পরিপ্রেক্ষনী আছে, অনোনা স্বৈতত্ব নেই অথচ অর্পিত অননাতার বিষন্ন মাধুর্য আছে। সুচেতন যতটুকু সঞ্চারিত, সুমন তার শতাংশও নয়। পারমিতা যেটুকু সংবেদনশীল, ডলিমাসি তার কণামাত্রও নয়। সুমন এবং ডলিমাসির অস্তিত্বের মধ্যে কোনো তারবার্তা ঘটে না, কিন্তু এই দুই প্রতিহত চরিত্র দুই প্রান্ত থেকে একটি ট্র্যাজিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে, যা অনেকটাই ব্রিল্‌কের এপিটাফের অনুষঙ্গে সুন্দর।

> ঘুমে এরাও নিরাবরণ। চৌবাচ্চে অনন্ত রাত্রির লণ্ঠন, উৎকণ্ঠার আলু। বিছানার উপর ঘুমি ঘসে, ঘাটুতে মুখ ঘুজে। একবার মুখ তুলল, কাকাকে, কেন কিছু শুনতে চাইছে। শুনল, জানালার গাইনের পাতায় গাছেদের গায় সজল বাতাস বইছে আহত পাখির কান্নার মতো। আর কিছু নয়। (দিনরাত্রি, পৃঃ ১৩৩)

বয়ঃসন্ধির দলিল আঁকতে বসেন নি সুরেজিৎ। তা সত্ত্বেও যে এক এক জায়গায় তাঁর লক্ষ্য অপব্যাঘাত হবে তার জন্য তিনি নিজে যে দায়ী নন। দিনরাত্রির পরে একই সময়ে রচিত হলে তাঁর কৈশোর সম্পর্কিত মূল প্রতিপাদ্যই নষ্ট হতো, কিন্তু যেহেতু হতে-থাকার একটি উহ্য কালানুক্রম সেক্ষেত্রে

থাকতো, সমালোচক লেখকের অভিপ্রায়কে অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করতে পারতেন। কিন্তু লেখক দিনরাত্রি গ্রন্থে কৈশোরকে পুনর্বার রচনা করে নিতে গিয়ে যেমন মূলত সফল হয়েছেন, স্বাভাবিক সৌর্বাপর্য লঙ্ঘনের দরুন এক-একবার চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত।

> .....সর্বাঙ্গের মোরগ ঝাঁকুনি তার ঘরেই গেছে। তাহলে কে একটা মোরগ ধরে এনে টেবিলের উপর রেখে দিলেই হতো। সুখন চেয়েছিল রংগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজাতে, তারপর এমনভাবে জিনিষটা ফুটে উঠবে যে দেখতে হবে মোরগের মতো। কিন্তু সেরকম নয়, দেখতে শুধু মোরগের মতো। তাই এভাবে সাজানো রংগুলোকে ভাঙবার সুবিধের জন্যে নাম দেবো—মোরগ। (পৃ: ৭২)

এ শুধু অবাস্তব নয়, আপত্তিকর। প্রতীকপন্থার পরিভাষা যে কোনো কিশোর জানবে না এমন কথা বলছি না। কিন্তু কৈশোরের একটি ভূগোল আছে যেখানে বড়ো-বড়ো অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পাথর ছড়ানো বলেই তার আবেদন এত অমোঘ। তাই এই রকম কালানৌচিত্য শুধু লেখকের projection বা অভি-ক্ষেপটিকে অত্যন্ত উগ্রভাবে স্পষ্ট করে।

প্রাকরণিক নৈপুণ্যের দিক থেকে একই সমুদ্র যতটা সার্থক দিনরাত্রি ততটা নয়। তার অন্যতম হেতু প্রথমোক্ত উপন্যাসের অনুপুঙ্খতা। এবং চিন্তন সেখানে অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

> অনুভব করল সেই মুহূর্তটি যখন সে তার হাতে স্পর্শ পেয়েছিল পারমিতার হাত। অপূর্ব সংযম যখন করে পারাবত ফিরে এল। চলার পথটিকে সৃষ্টি ছেয়ে গিয়েছে। অন্তহীন জলরাশির মধ্যে ভাসছে মোহরে নৌকো। তিনি নৌকোর কিনারা ধরে দাঁড়িয়ে। এমন সময় দূরে দিগন্তে দেখলেন একটা বিন্দু। সেই বিন্দু ক্রমে পারাবতের রূপ নিল। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন মোহা। মহাশাসনের জল সরে গেছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি কপোত উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কপোত ফিরে এল তাঁর হাতে। তার চঞ্চুপুটে এক সবুজ কিশলয়। আদিবৃক্ষের অভিজ্ঞান। (একই সমুদ্র—পৃ: ১৪৫)

আদিবৃক্ষ এখানে archetype-এর সমর্থদ্যোতক। কৈশোরের বিশ্বাসে এই প্রাকরূপ মেলে। কিন্তু এই কৈশোরের দ্বিতীয় কৈশোর। তাকে অর্জন করতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দিনরাত্রিকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যে শ্রীমণ্ডিত করেননি হয়তো: কিন্তু সেই সৌর সরলিমাকে মূলত আবেগে ত্বরান্বিত করেন নি তিনি, শিল্পীর নন্দন ধৈর্যে আমাদের সর্বধূসরী অনাস্থাকে বিশাল একটি সম্ভাবনার সামনে স্থগিত রেখেছেন, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

আধুনিক কবিতার শব্দ

কীটসের 'এনডিমিয়ন' কবিতা সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন যে, এর প্রথম লাইনে ছিল : A thing of beauty is a constant joy.

পরে অবশ্য আমরা পেলাম : .....joy for ever. বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না এই পরিবর্তনে কবিতাটির আত্মা কী পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে। লাইনটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে ভাসতে থাকবে।

এখন এ-কথা আর কাউকে না বলে দিলেও চলে যে সব অর্থবহ যে কোন শব্দ সংযোজন করলেই বাক্যের ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে প্রসারিত হয় না। কোন শব্দের নিজস্ব অভিধানিক অর্থ ছাড়াও ভিন্ন দ্যুতি থাকে। আর, এই ভিন্ন দ্যুতি সম্পন্ন শব্দই কবিতার পক্ষে পরম প্রয়োজ্য এ-কথা মনে করি।

জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় 'মানুষ' শব্দের পরিবর্তে 'মানব' কথাটির ব্যবহারই বোধ হয় বেশী ইংগিতপূর্ণ। এবং ঠিক একই ভাবে আমরা আবিষ্কার করতে পারি 'দেহলতা' বা 'তনুলতা' ইত্যাদি না বসিয়ে জীবনানন্দ 'শরীর' শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা আমাদের কী রকম উত্তেজিত করলেন।

আবার বলি, শব্দের একটা অভিধানগত অর্থ নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে হবে, এলিয়টের ভাষায়, চোর যেমন মাংসের টুকরো দিয়ে প্রহরী কুকুরকে ভুলিয়ে রাখে। 'তা বুঝতে গেলে পাঠককে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না—সক্রিয় অধ্যবসায়ই কবিতা উপভোগের চাবিকাঠি।'

তাই আধুনিক কবিরা শব্দ সম্পর্কে এতো বেশী সচেতন। তাঁরা কবিতার সানডন রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছেন শব্দের মধ্যে। হাজারো রকম মালা-মসলার শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে শব্দ, এই শব্দই কবিতার মূখ্য উপাদান। শব্দের কারুকার্যই একই বস্তুর ব্যঞ্জনাকে ভিন্নতর করতে পারে। শব্দের পরীক্ষাই কবিতার পরীক্ষা। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি :

> শব্দ অর্থের ধ্বনিত্ব ও বিচিত্র যোগাযোগের পরেও এ-কথা বলা যায় যে কবি মাত্রই শব্দ ব্যবহারে, সঙ্গীতে প্রতিভাবানের মতই অথবা ছবিতে রঙ ব্যবহারের মতই সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দেবেন। কেননা, অবাধ্য শব্দ প্রয়োগেই কবিতার সুনির্দিষ্ট অবয়ব তৈরী হয়। বিশেষত শব্দপ্রয়োগের তিনটি উদ্দেশ্য থাকে: প্রথম সূত্র সংযোজনা, দ্বিতীয় চিত্রকল্প, তৃতীয় কবিকুশলতার 'পরম তত্ত্ব তনুতন্ময়তা।'
>
> (অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার অর্থ ও বাংলা কবিতার কয়েকজন)

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে-কোন শব্দ একটা না একটা উদ্দেশ্য সাধন করে। যাঁর যে রকম লক্ষ্য তিনি সেই রকম শব্দই গ্রহণ করবেন। এই শব্দ গ্রহণ করার চাতুর্যের উপরই কবিকৃতি নির্ভর করছে। এ-সম্পর্কে আরাগঁ বলেছেন 'তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতি পদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারেবার ভাঙতে হয়।'

স্পষ্টতই আমরা সকলে জানি, এ-যুগের সঙ্গে পূর্বতন যুগের কী বিশাল ফারাক। আমাদের পূর্বের সে জীবন সম্পূর্ণ ভাবেই অতীত ঃ কী সামাজিক কী অর্থনৈতিক অবস্থা একান্তভাবেই নবীন। সুতরাং এদের ফলশ্রুতি হিসেবে চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর, এই নতুন চিন্তাকে রূপ দেয়া যায় একমাত্র নতুন ভাষার সাহায্যে, নতুন শব্দের সাহায্যে। নতুন শব্দ বলতে শুধু এই বুঝলে না যে নবাবিষ্কৃত শব্দ, পুরোনো শব্দের নতুন এবং অভিনব প্রয়োগকেও বুঝতে হবে। এখানেই শিল্পীর আবিষ্কারের আনন্দ, যেখানে শিল্প চিরাগত বহমান থেকে যাচ্ছে।

আধুনিক কবো আমরা লক্ষ্য করছি গদ্যের ভাষাকে অবলীলাক্রমে কবিতার টেনে আনা হয়েছে, নিছক ঘরোয়া শব্দ—এমন কি গ্রাম্য প্রবাদ এখানে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে নেই। শুধু তাই নয় একেবারেই গ্রামীণ শব্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খাস ইংরিজি শব্দ, সংস্কৃত শব্দ আধুনিক কবো অবাধ ঢুকে পড়েছে। এই স্বাধীনতা পাবার ফলে আমাদের পুরোনো প্রচলিত কাব্যিক শব্দ ঃ ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতিকে বাদ দিতে হয়েছে নির্মমভাবে। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে 'যাথানি', 'পাসরিল' ইত্যাদি শব্দগুলিকে ব্যবহার করেছেন সে-সম্পর্কে বক্তব্য, অসীম প্রয়োগ নৈপুণ্যে সেগুলি পুনরায় সজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে বিভাসিত। এই দু'এক বছর আগে পর্যন্ত কবিতায় প্রচুর অব্যয়ের ব্যবহার আমরা দেখেছি। বিশেষ করে সংযোজক এবং বিয়োজক অব্যয় ঃ যেহেতু, অতএব, এবং, ও, কিংবা, সুতরাং, কারণ ইত্যাদি। এমন কি কবিতার প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি অব্যয় দিয়ে শুরু করার ঝোঁক ছিল। ইদানীং তা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুধী আরাগঁ যে কথা বলেছেন ঃ

> 'ভাষা খুঁজি বাজারের স্তরে স্তরে
> যে ভাষা ঘুমের ঘোর ভেঙে করে সূর্যরশ্মির মতো
> যে ভাষা স্বচ্ছ জলে তৃষা মেটায়—'

আমরা সেই কথাই একটু অন্যভাবে বলতে পারি, শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা আনতে হবে; সেই সঙ্গে একটি শব্দের মধ্যে দিগন্তপ্রসারী ব্যঞ্জনার স্থান, অর্থাৎ অর্থঘনত্ব সৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, কোন কবিতার একটিমাত্র শব্দ আমাদের চিন্তা এতোদূর প্রসারিত করে যে মনে হয় আমরা আমাদের পূর্বপিতামহদের রহস্যময় অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'শ্রাবস্তী' 'বিদিশা' আমাদের কাছে dreamy heavy land; এও একপ্রকার ধ্বনির সৃষ্টি।

কোন কিছুই ফেলনা নয়—সব কিছুরই সার্থকতা আছে, একথা আধুনিক কবিরা বুঝেছেন। হাটু, সেমিজ, ঘুতনি, আঙুল, ছুঁয়ে ছেনে, টেরিকাটা, ঠ্যাং, বিয়োবার, ব্যাং, পেঁচা, কাঁকড়া, বোলতা, ইঁদুর খড় তাড়ি জঞ্জাল প্রভৃতি শব্দগুলোকে অসূর্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

> এই বলে ছিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
> উৎপল কন্যের মনে দাঁড়িয়ে রহিল হাটুজল
> হলুদে মেঘের শাড়ি, ঢেরকাটা দিয়ে ঘেরে, এলোমেলো আয়নের খড়
> চারিদিকে শনো থেকে ছেনে এসে ছুঁয়ে ছেনে ফেলেছে শরীর।

আধুনিক কাব্যের আরেকটি লক্ষণ—কোন শব্দের বা কোন চিত্রের বারবার ব্যবহার। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর লিয়র পাঁচবার শুধু 'never' কথাটি উচ্চারণ করলো, তাতেই তার ট্রাজেডি আরো মর্মন্তুদ আরো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একদা এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরেজি কিংবা অন্য কোন বিদেশী শব্দকে আমাদের নিজেদের মতো করে পরিবেশন করা (বিষ্ণু দের এলিয়টের কবিতা দ্রষ্টব্য) হোত, কিন্তু যখন আজ আমরা এক বৃহৎ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—যে দরজা দিয়ে বিশ্বের সব লোকই প্রবেশ করছে—তখন শব্দ-গুলোকে তাদের রীতিতেই রাখতে পারি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন:...

> এ-সিদ্ধান্তে বোধ হয় অনেকে সায় দেবেন যে যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনুদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক জীবনানন্দের পরিহতে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার।

কোন কোন কবির কোন কোন শব্দের প্রতি একটা নেশা আছে। সেই সব শব্দগুলোকে ঘুরে ফিরে তাঁরা ব্যবহার করেন। বোদলেয়রের শব্দের সংখ্যা পরিমিত ছিল: নির্বেদ, শূন্যতা, গহ্বর, সমুদ্র, জাহাজ, মাস্তুল, শব, কফিন, কবর, কঙ্কাল, চিত্ত, মধুর, কৃষ্ণ, শীতল, সুগন্ধ, ভাইনি, পিশাচী; স্নিগ্ধকেশ; গম্ভীর, বিলাসী, অন্ধকার, উজ্জ্বল, রহস্যময়—এই সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কথা উল্লেখ অপেক্ষা রাখার কথা নয়।

আমার সমস্ত কথার সারাংশ হলো এই দাঁড়ায়, সুধীন্দ্রনাথ [illegible] কথাতে:

> কখনও যদি লিখবার ইচ্ছে কথা মানসে [illegible] আপনি জোগাবে। তা না হলে পূর্বে [illegible] লাভ নেই, কারণ 'কবিতার ইতিহাস থাকে [illegible] ইতিহাস'।"

সামসুল হুদা